উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তন : সমীক্ষণ ও বিশ্লেষণ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধীনে
পিএইচ. ডি. উপাধির জন্য উপস্থাপিত
গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক
জ্যোতির্ময় রায়

তত্ত্বাবধায়ক
ড. নিখিল চন্দ্র রায়
বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
নভেম্বর, ২০১৮

<u>ঘোষণা</u>

আমি **'উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তন : সমীক্ষণ ও বিশ্লেষণ'** শিরোনামে একটি গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা করেছি। এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি অধ্যাপক নিখিল চন্দ্র রায়ের তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। গবেষণাপত্রের কোন অংশই অন্য কোনো উপাধির জন্য দাখিল করা হয়নি। এই অভিসন্দর্ভটি আমার স্বরচিত এবং মৌলিক রচনা।

(জ্যোতির্ময় রায়)

গবেষক

বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

রাজা রামমোহনপুর, দার্জিলিং, সূচক - ৭৩৪০১৩

অধ্যাপক নিখিল চন্দ্র রায়
অধ্যাপক,
বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

Accredited by NAAC with Grade 'A'

ENLIGHTEMENT TO PERFECTION

ডাকঘর : নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি
রাজা রামমোহনপুর, জেলা : দার্জিলিং
সূচক - ৭৩৪০১৩, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

স্মারক নং : ....   তারিখ : ....

শংসাপত্র

জ্যোতির্ময় রায় আমার তত্ত্বাবধানে **'উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তন : সমীক্ষণ ও বিশ্লেষণ'** শিরোনামে একটি গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা করেছেন। যতদূর জানি এই অভিসন্দর্ভটি তার মৌলিক রচনা।

এই অভিসন্দর্ভটিকে আমি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি. (বাংলা বিভাগ) পরীক্ষার জন্য দাখিল করার উপযুক্ত বিবেচনা করি। আমি জ্যোতির্ময় রায়ের সাফল্য কামনা করি।

(অধ্যাপক নিখিল চন্দ্র রায়)
অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
রাজা রামমোহনপুর, দার্জিলিং,
ডাকসূচক সংখ্যা- ৭৩৪০১৩

<u>কুম্ভিলকবৃত্তি প্রতিরোধী শংসাপত্র</u>

আমি জ্যোতির্ময় রায়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে **'উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তন : সমীক্ষণ ও বিশ্লেষণ'** শিরোনামে পিএইচ.ডি. গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছি। আমার সর্বোত্তম জ্ঞান ও ধারণা অনুযায়ী জ্ঞাপন করছি যে, আমি গবেষণাকর্মে কোনোরূপ কুম্ভিলকবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিনি।

তাং :

(জ্যোতির্ময় রায়)

গবেষক

বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

রাজা রামমোহনপুর, দার্জিলিং,

ডাকসূচক সংখ্যা- ৭৩৪০১৩

অধ্যাপক নিখিল চন্দ্র রায়
অধ্যাপক,
বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

Accredited by NAAC with Grade 'A'
ENLIGHTEMENT TO PERFECTION

ডাকঘর : নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি
রাজা রামমোহনপুর, জেলা : দার্জিলিং
সূচক - ৭৩৪০১৩, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

স্মারক নং : ....   তারিখ : ....

<u>কুম্ভিলকবৃত্তি প্রতিরোধী শংসাপত্র</u>

জ্যোতির্ময় রায়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে **‘উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তন : সমীক্ষণ ও বিশ্লেষণ’** শিরোনামে আমার তত্ত্বাবধানে পিএইচ.ডি. গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছেন। আমার সর্বোত্তম জ্ঞান ও ধারণা অনুযায়ী জ্ঞাপন করছি যে, গবেষক এই গবেষণাকর্মে কোনোরূপ কুম্ভিলকবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করেননি।

(অধ্যাপক নিখিল চন্দ্র রায়)
অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
রাজা রামমোহনপুর, দার্জিলিং,
ডাকসূচক সংখ্যা- ৭৩৪০১৩

‘‘উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তন : সমীক্ষণ ও বিশ্লেষণ’’

সংক্ষিপ্তসার

উত্তরবঙ্গ নামে নির্দিষ্ট কোন ভূখণ্ড পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতবর্ষের মানচিত্রে না থাকলেও গঙ্গার পূর্ববর্তী সাতটি জেলা (জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দার্জিলিং, মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং আলিপুরদুয়ার) উত্তরবঙ্গ নামে সমধিক পরিচিত। এই উত্তরবঙ্গ নামটি বর্তমানে সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শুধু যুক্ত নয় প্রশাসনিকভাবেও জুড়ে আছে। যদিও স্বাধীনোত্তর সময়ে উত্তরবঙ্গের সীমানা যথেষ্টই সংকুচিত হয়েছে দেশভাগ, কাঁটাতারের বেড়াজালে। এই উত্তরবঙ্গে অর্থাৎ তরাই ডুয়ার্স অঞ্চলটি নৃতত্ত্বের জাদুঘর হিসাবেও আখ্যায়িত। আত্রেয়ী-পুনর্ভবা-মহানন্দা-বালাসন-তিস্তা-রায়ডাক-সংকোশ বিধৌত এই সাংস্কৃতিক বলয়ে ভারতের প্রধান চারটি ভাষা বংশের (ভারতীয় আর্য, দ্রাবিড়, অস্ট্রিক এবং ভোট-চীনীয়/ভোট বর্মী) মানুষই বসবাস করে। এই অঞ্চলটিকে মিনি ভারতবর্ষের প্রতীক হিসাবেও ধরে নেওয়া হয়। উত্তরবঙ্গ এমন একটি অঞ্চল যার জলপথ এবং স্থলপথ দিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জীবন ও জীবিকার টানে বহু জনজাতি-জাতির আগমন ঘটেছে। তারা কখনও স্থায়ী হয়েছে আবার কখনও চলে গেছে অন্যত্র। এই পরিযায়ী সমাজের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব এখানকার ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনচর্যায় প্রভাব বিস্তার করেছে। বিচিত্র ভাষা ও সংস্কৃতির সমন্বয়ে উত্তরবঙ্গের একটা নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য এবং সম্ভাবনা তাই সবসময় বিদ্যমান।

উত্তরবঙ্গে বসবাসকারী বহু জনজাতির অন্যতম একটি জনগোষ্ঠী হল রাজবংশী জনসমাজ। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারির পরিসংখ্যানে জানা যায় যে মোট রাজবংশী জনসংখ্যার ৭৭.১৯ শতাংশ এই উত্তরবঙ্গেই বসবাস করে। সুপ্রাচীন ঐতিহ্য, পরম্পরা ও লোকায়ত ভুবনের অধিকারী এই কৌম জনগোষ্ঠী প্রাক্-ঐতিহাসিক কাল ধরে এখানে বসবাস করে। প্রাচীনকাল থেকে এই অঞ্চলে সাংস্কৃতিক বিমিশ্রণের ধারাটি সক্রিয়। কালের নিয়মে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সমাজ সংস্কৃতি বিবর্তিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। রাজবংশী সমাজও এই রূপান্তর, বিবর্তন প্রক্রিয়ার বাইরে

থাকেনি। কোচ-রাজবংশ ও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব তো ছিলই। ধারাবাহিকভাবে কৌম সমাজ থেকে জীবনচর্যায় আর্যীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়ে মনীষী পঞ্চানন বর্মার নেতৃত্বে বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় 'ক্ষত্রিয়' পরিচয়ের অধিকারী হয়। মাতৃতান্ত্রিক পরিচয় তথা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বলয়টি ক্রমশ শিথিল হয়ে সামগ্রিকভাবে পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটি অব্যাহত। দ্রুত এক সাংস্কৃতিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে রাজবংশী সমাজ আজকের সময়ে উপনীত হয়। আর্থসামাজিক কাঠামো পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজ, জীবনচর্যা, পেশা বৃত্তি, পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস সহ মনন দর্শনও পরিবর্তিত হয়, বদলে যায় সাংস্কৃতিক বলয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে বিগত পাঁচ-ছয় দশকে এই পরিবর্তন বিশেষ করে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ত্বরান্বিত হয়েছে। এই বিবর্তমান সাংস্কৃতিক বলয়টিকে সময়কালের নিরিখে তুলে ধরার প্রয়াসই গবেষণার বিষয়। সেই উদ্দেশে গবেষণার বিষয় সূচিত হয়েছে ''উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তন : সমীক্ষণ ও বিশ্লেষণ।'' প্রকল্পটির মধ্যে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর কয়েকশ' বছরের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ধারাবাহিক পর্বগুলি সমীক্ষণ ও বিশ্লেষণে তুলে ধরা হয়েছে।

সংস্কৃতি সমষ্টিগত জীবনের সামগ্রিক রূপ। আবার সমাজ বলতে একটা জনসমষ্টিকে বোঝায়। অর্থাৎ নির্দিষ্ট জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত একটি সংগঠিত ও সংযোজিত সমাহার হল সমাজ। সমাজের একটি সাংগঠনিক রূপ থাকে। সমাজের সঙ্গে সংস্কৃতি সম্পৃক্ত একটি বিষয়। নৃতত্ত্ববিদ ই বি টাইলর তাঁর 'প্রিমিটিভ কালচার' গ্রন্থে সংস্কৃতি সম্পর্কে বলেছেন 'Culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, customs and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society.' সংস্কৃতি সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে সৃষ্টি হয় তাই সতত: পরিবর্তনশীল। সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে দ্বন্দ্ব অনিবার্য এবং আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয় সময়কাল প্রেক্ষিতকে ভিত্তি করে। মানুষের সৃষ্টির সামগ্রিক রূপই হল সংস্কৃতি। আবার সামাজিক পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন কারণ থাকলেও অর্থনৈতিক কারণটি মুখ্য। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে জীবন, ধর্ম, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি পরিবর্তিত হয়। রাজনৈতিক আধিপত্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এমনকী ভূ-প্রাকৃতিক পরিবর্তনও বিবর্তনের কারণ।

রাজবংশী জনগোষ্ঠী সুদীর্ঘ সময়কালে সুদৃঢ় হয় অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে। বিবর্তনের ধারায় প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়ে পরম্পরাগত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অধিকারী হয়েছে। জীবনচর্যায় যেমন কৌম চিহ্ন বহন করে তেমনি লোকায়ত সমাজ সংস্কৃতির মধ্যে ভূ-সাংস্কৃতিক এবং নৃ-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যও ধরে রেখেছে। কিন্তু আর্থসামাজিক কাঠামো পরিবর্তনের সাথে সাথে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির পরিসরটি দ্রুত বিবর্তমান হয়। বিশেষ করে বিগত পাঁচ-ছয় দশকে এই বিবর্তন ত্বরান্বিত হয়েছে। বিভিন্ন সংকটে আবর্তিত হয়ে এই জনগোষ্ঠী আজকে বিবিধ প্রশ্নেরও সম্মুখীন। তার প্রেক্ষিতে ক্ষোভ, বিক্ষোভ, আন্দোলনের ক্ষেত্র যেমন তৈরি হয় আত্ম সচেতনতারও বিকাশ ঘটে; সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে যা অনুধাবনযোগ্য। গবেষণা প্রকল্পে এই বিষয়টি পর্যায়ভিত্তিক বিভিন্ন পর্বে ধরা পড়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে রাজবংশী সমাজের নৃ-গোষ্ঠীগত পরিচয় প্রসঙ্গে বিভিন্ন গবেষক, নৃতত্ত্ববিদ, সমাজবিদ তথা ব্রিটিশ প্রশাসক, সর্বেক্ষকদের অনুসন্ধান ও প্রতিবেদন রিপোর্টকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। হ্যামিলটন বুকানন, মন্টোগোমারী মার্টিন, হজসন, ইউলিয়াম হান্টার, ডি এইচ ই সান্ডার্স এবং জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ারসন-এর মত পণ্ডিতবর্গ এই জাতির নৃ-গোষ্ঠীগত পরিচয় নিয়ে বিভিন্ন মতামত দেন। পরবর্তীকালে আরো বেশ কিছু গবেষক, পণ্ডিত, বিদগ্ধজন এ বিষয়ে সবিশেষ আলোকপাত করেন। অনেকের মতে রাজবংশী জনগোষ্ঠী মঙ্গোলীয় নৃ-গোষ্ঠী শাখার বৃহত্তর বোডো গ্রুপের অন্তর্গত হয়েও দ্রাবিড়ীয় সংমিশ্রণ ঘটেছে। খ্রিস্টপূর্ব দশম শতাব্দীর কোন এক সময়ে ইন্দোমঙ্গোলীয় জনপ্রবাহ উত্তর পূর্ব ভারতে বিস্তার লাভ করে। তারপর ধীরে ধীরে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বসবাস শুরু করে। ছড়িয়ে পড়ে উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ (অধুনা বাংলাদেশ), উত্তর বিহার এবং হিমালয়ের সানুদেশ নেপাল অঞ্চলে। ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বখতিয়ার খিলজির (১২০৩ খ্রিস্টাব্দ) তিব্বত আক্রমণের সময় ও তিব্বতের মধ্যবর্তী ভূ-খণ্ড পর্বতময় ও জঙ্গাকীর্ণ ছিল। ঐ এলাকায় সে সময় ইন্দোমঙ্গোলীয় কোচ, মেচ, থারু জনজাতির বসবাস ছিল। চ্যাপ্টা নাক, অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ চোয়াল, ছোট ছোট চোখ ও ভ্রু ইত্যাদির গড়ন দেখে এদেরকে তিনি বৃহত্তর বোডো পরিবারের সদস্য হিসাবে আখ্যায়িত করেন। এইসব বৃহত্তর বোডো গ্রুপের একাধিক শাখা অসম সহ উত্তরবঙ্গে পাকাপাকিভাবে বসবাস শুরু করে এবং বিস্তৃত অংশ জুড়ে এক বিরাট রাষ্ট্র গড়ে তোলে। এদেরই একটি অংশ যোড়শ শতাব্দীর

সূচনায় 'রাজবংশী' হিসাবে আখ্যায়িত হয় কোচ-রাজবংশের অভ্যুত্থানে। কোচ-মহারাজাদের আনুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রসার ঘটে এবং বিভিন্ন ধর্মীয় ঘাত প্রতিঘাতে 'রাজবংশী' হিন্দু জাতির সংশ্লিষ্ট হয়।

পরবর্তীকালে কোচ ও রাজবংশী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভিন্নতা নিয়ে ব্রিটিশ আধিকারিকদের মধ্যে বিভ্রান্তির সূচনা হয়। রাজবংশীদের বৃহত্তর একটা অংশ দাবি করেন যে 'রাজবংশী' জনগোষ্ঠী একটি স্বতন্ত্র ক্ষত্রিয় জাতি এবং বঙ্গদেশে আর্যীকরণের (চতুর্থ-সপ্তম শতাব্দী) সময়পর্বেই তারা হিন্দু ধর্ম, ভাষা সংস্কৃতির অংশ হয়ে ওঠে। পরশুরামের ক্ষত্রিয় নিধনের ভয়ে তারা হিমালয় সন্নিকটবর্তী এলাকায় আত্মগোপন করে থাকার ফলে ভঙ্গ-ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হিসাবে প্রতিপন্ন হয়। পুরাণ, শাস্ত্রাদির তথ্য সাপেক্ষে মনীষী পঞ্চানন বর্মার নেতৃত্বে 'রংপুর ক্ষত্রিয় সমিতি' আন্দোলনে মুখর হয়। ব্রিটিশ সরকার ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারির প্রতিবেদনে কোচ ও রাজবংশীদের পৃথক হিসাবে বর্গীকরণ এবং রাজবংশী জনগোষ্ঠীকে 'ক্ষত্রিয়' হিসাবে নথিভুক্ত করেন। রাজবংশী জনগোষ্ঠীর উদ্ভব ও স্বতন্ত্রতা নিয়ে বিদ্বজ্জন ও পণ্ডিতবর্গের মধ্যে এখনও কিছু বিতর্ক আছে। তবে রাজবংশী জনগোষ্ঠী এই 'ক্ষত্রিয়' পরিচয়ে সমাজ সংস্কারে যেমন ব্রতী হয় তেমনি জাতিসত্তার উন্মোচন, আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি ও হৃত গৌরব উদ্ধার এবং সমাজ সংস্কৃতির সামগ্রিক বিকাশে উদ্যোগী হয়। স্বাভাবিকভাবে জীবনচর্যার রীতিনীতি, হিন্দু ধর্মীয় সংস্কার বিধি, সংস্কৃতির সংমিশ্রণ, আত্তীকরণের মধ্য দিয়ে পরিবর্তন সূচিত হয়। পাশাপাশি লোকায়ত সংস্কৃতির পরিচর্যার মধ্য দিয়ে নিজস্ব কৌম সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে পরম্পরা ও ঐতিহ্যে বহন করে স্বাতন্ত্র্যতা রক্ষার চেষ্টা করে। প্রথম অধ্যায়ে নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বিষয়গুলিকে উত্থাপন করে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর উদ্ভব ও বিকাশ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে কোচ-রাজবংশের প্রেক্ষাপটে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির বিস্তার নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। কারণ কোচ-রাজবংশ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে 'রাজবংশী' জনগোষ্ঠীর সূচনা এবং মহারাজাদের ধর্মীয় মনোভাব ও উদারতায় হিন্দুধর্মের অংশ হয়ে ওঠা, সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তন। লোকায়ত সংস্কৃতির বৃত্তটিকে অনুসরণ করার সাথে সাথে বর্ণহিন্দুদের সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হওয়ার প্রবণতার মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক বিবর্তনের বিষয়গুলি এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। ধর্মীয় মনোভাবে প্রকৃতিবাদ, বৌদ্ধিয়, শৈব, শাক্ত

থেকে শঙ্করপন্থী ‘একশরণ’ বৈষ্ণবীয় ভাবধারার সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনার সম্প্রসারণ ঘটে। পরিবর্তন ঘটে সমাজব্যবস্থা, খাদ্যাভ্যাস, সংস্কার, রীতি-আচার-বিচারের। কিন্তু তা সত্ত্বেও কৃষি নির্ভর রাজবংশী সমাজ নিজস্ব লোকায়ত বলয়টিকে লালন পালন করে কৌম ধর্ম এবং সমাজ ও সংস্কৃতিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়। কোচ-রাজবংশের অভ্যুত্থানে এবং তাদের ধর্মীয় ঔদার্যে সংমিশ্রণ, সংশ্লেষণ, আত্তীকরণ ইত্যাদি সাংস্কৃতিক বিনিময় প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে স্বতন্ত্রতা রেখেই রাজবংশী একটি শক্তিশালী জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়। বলা যায় বর্ণহিন্দু তথা বৃহত্তর হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতির অনেক কিছুকে গ্রহণ করেও নিজস্ব লোকায়ত ও ভূ-সাংস্কৃতিক বলয়টিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়েছে। এই অধ্যায়ে এই বিষয়গুলি পর্যায়ক্রমে উত্থাপিত হয়েছে।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সময়ে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্বে (১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দ) কোচরাজ্য ব্রিটিশ সরকারের করদমিত্র রাজ্যে পরিণত হয়। ব্রিটিশ সরকার প্রথমেই কোচ রাজ্যের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। ফলে সামাজিক বিন্যাস, জোতদারি ব্যবস্থার সূচনা, চুকানীদার, দর চুকানীদার, আধিয়ার আন্তঃসম্পর্ক, রাজবংশী সমাজের খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, লোকাচার, পূজা-পার্বণ, রীতিনীতি এমনকী ধর্মীয় পরিসর ইত্যাদিরও পরিবর্তন শুরু হয়। পরবর্তীকালে এই পরিবর্তন ধীরে হলেও সময়কালের প্রেক্ষিতে ঘটতে থাকে। এতদঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। প্রশাসনিক ও ব্যবসা বাণিজ্যের কারণেও অনেকে এখানে এসে বসবাস শুরু করেন। বিভিন্ন প্রেক্ষিতে সমাজ সংস্কৃতির পরিবর্তনের বিষয়গুলি এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় মনীষী পঞ্চানন বর্মার নেতৃত্বে ‘ক্ষত্রিয় সমিতি’র আন্দোলন এবং তাঁর সমাজ সংস্কারের বিষয়গুলি গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনার পরিসরে উঠে আসে। ধর্মীয় বিবর্তনের বিষয়টিও এ প্রসঙ্গে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়। সামগ্রিক ভাবে এই অধ্যায়ে ব্রিটিশ সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ, কর্মকাণ্ড, তাদের বাণিজ্য বিস্তার সহ পঞ্চানন বর্মার ‘ক্ষত্রিয়করণ’ আন্দোলন, সমাজ সংস্কারের উদ্যোগ সহ রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতি বিবর্তনের বিষয়গুলি বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ স্বাধীনোত্তর সময়কালেই রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তন দ্রুত সম্পাদিত হয়। স্বাধীনতা, দেশভাগ এবং ধারাবাহিক অভিবাসনের ফলে উত্তরবঙ্গের জনবিন্যাসের সঙ্গে সমাজ কাঠামোর ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। জোতদার শ্রেণির

অবসান, আধিয়ারদের সংকট, পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি, জীবন-জীবিকার প্রতিযোগিতা, কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার, যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষার প্রসার নানাবিধ কারণে রাজবংশী সমাজের সামগ্রিক পরিবর্তন ঘটে। বিশ্বায়নের প্রভাব, তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ইত্যাদি কারণেও এই পরিবর্তন ত্বরান্বিত হয়। ক্ষোভ, বিক্ষোভ, আন্দোলনও এই পর্বেই সংগঠিত হয়। এবম্বিধ কারণে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তন বিভিন্নভাবে পরিলক্ষিত হয়। বর্ণহিন্দুদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি, রাজবংশীদের একটা শ্রেণির মধ্যবিত্তে পরিণত হওয়া এবং সংস্কৃতি বিষয়ে উদাসীনতা, গ্রামে পৃষ্ঠপোষক কিংবা অবস্থাপন্ন পরিবারের সংখ্যা কমে যাওয়া এই পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে। রাজনৈতিক প্রভাবও একটি অন্যতম কারণ। আবার এই সময়কালেই রাজবংশী সমাজের একটি অংশ আত্মসচেতন হয়ে ওঠেন, তারা সংগঠিত হয়ে নিজস্ব সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য ধরে রাখার বিষয়ে উদ্যোগী হয়। এই সামগ্রিক বিষয়গুলি বিস্তারিত ভাবে এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। কারণ স্বাধীনোত্তর সময়কালের কয়েক দশকের ঘটনাবলী রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

'সাহিত্যে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি' শীর্ষক পঞ্চম অধ্যায়ে রাজবংশী সমাজের লোকসাহিত্যের বিস্তৃত উপাদানগুলি প্রসঙ্গে এসেছে। ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন, ছিল্কা অর্থাৎ শ্লোক, কিচ্ছা বা লোককাহিনি ইত্যাদির সঙ্গে বিভিন্ন পর্ব ভিত্তিক, পূজা-পার্বণ কেন্দ্রিক গান, ব্রতকথা, লোকনাট্য সেইসঙ্গে ময়নামতীর গান-যুগীর গান-গোরখনাথের গান সহ রতিরাম দাসের 'জাগ গান-কানাই-ধামালী' মদনকামের গান, মনসা-বিষহরির মাড়েয়া গান, রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগীর 'গোসানীমঙ্গল' কাব্যে তৎকালীন সময়কালের রাজবংশী সমাজ জীবনের বহু ছবি পাওয়া যায়। প্রাসঙ্গিকতায় কোচবিহার রাজন্যপোষিত অনুবাদ সাহিত্যচর্চার বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে। জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ারসন, ড. দীনেশ চন্দ্র সেন, বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ সহ মনীষী পঞ্চানন বর্মার রাজবংশী ছড়া, গান, ছিল্কা, শ্লোক সংগ্রহ ও প্রকাশ করার বিষয়গুলির প্রতি সবিশেষ আলোকপাত করা হয়েছে। আবার বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে উত্তরবঙ্গের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সূত্র ধরে রাজবংশী ভাষায় সাহিত্য সৃজনের একটি ধারার সূচনা হয়। দীর্ঘ আলোচনা তিনটি উপ-অধ্যায়ে (লোকসাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতি, বাংলা সাহিত্যে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি এবং রাজবংশী সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি) সন্নিবেশিত

হয়েছে। এই অধ্যায়ের বিষয় বিস্তারে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি এবং বিবর্তনের ধারাগুলিও চিহ্নিত হয়েছে সাহিত্য সৃজনের বর্ণ বিন্যাস এবং মনন ভাবনায়।

গবেষণা প্রকল্পটির মূল বিষয়টি আলোচিত হয়েছে এই অধ্যায়ে। এই অধ্যায়ে রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের বিভিন্ন ধারা প্রক্রিয়াগুলি কারণ সহ চারটি উপ-অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচিত হয়েছে। পূজা-পার্বণ ও আচার সংস্কার, লোকায়ত সংস্কৃতি, ধর্মীয় সংস্কৃতির পরিবর্তন সহ সাহিত্যে সাংস্কৃতিক বিবর্তনের বিভিন্ন পর্বগুলি সমাজ প্রক্রিয়ার ধারায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সামাজিক, অর্থনৈতিক এমনকী রাজনৈতিক কারণগুলি মুখ্য হলেও আরও কিছু কারণ বিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে। শিক্ষার প্রসার, যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থার উন্নতি সর্বোপরি বিশ্বায়নও উল্লেখিত কিছু কারণ। সেইসঙ্গে রাজবংশী সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব, শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা ও নিজের সংস্কৃতি বিষয়ে উদাসীনতা, অন্য সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ, হীনমন্যতাবোধ, অনুকরণ ইত্যাদি বিষয়গুলিও যুক্ত। বর্ণহিন্দুদের প্রভাব ও আধিপত্য বৃদ্ধি বিষয়টিও রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের একটি কারণ। সামগ্রিক প্রেক্ষিত বিচারে কীভাবে রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তন সংঘটিত হয়েছে তার বিস্তৃত আলোচনা এই অধ্যায়ে সংযুক্ত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও রাজবংশী জনগোষ্ঠী তাদের চিরায়ত সাংস্কৃতিক বলয়, কৃষ্টি, ঐতিহ্য, রীতি আচারের প্রতি সংরক্ষণশীলতা, নৃগোষ্ঠীগত পরিচয় বজায় রাখার প্রয়াসের বিষয়টিও অধ্যায়ভুক্ত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে এই অধ্যায়ে গবেষণা প্রকল্পটির মূল বিষয় ‘‘উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তন’’-এর ক্ষেত্রটি দলিল দস্তাবেজ, তথ্যাদি, পত্র-পত্রিকা, গ্রন্থাদি, ক্ষেত্র সমীক্ষার সাপেক্ষে সমীক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

বিষয়ক্রম

	পৃষ্ঠা
মুখবন্ধ	i-iii
ভূমিকা	১-২৬
প্রথম অধ্যায়	
উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের নৃ-গোষ্ঠীগত ও ঐতিহাসিক পরিচয়	২৭-৪৪
দ্বিতীয় অধ্যায়	
কোচ রাজবংশের প্রেক্ষাপটে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি	৪৫-৭২
তৃতীয় অধ্যায়	
ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতা এবং রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি	৭৩-১০৭
চতুর্থ অধ্যায়	
স্বাধীনোত্তর সময়ে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি	১০৮-১৩৫
পঞ্চম অধ্যায়	
সাহিত্যে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি	১৩৬-২২৩
লোকসাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতি	
বাংলা সাহিত্যে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি	
রাজবংশী সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি	
ষষ্ঠ অধ্যায়	২২৪-২৯৯
রাজবংশী সংস্কৃতি রূপান্তরের ধারা	
পূজা-পার্বণ ও আচার সংস্কার	
লোকায়ত সংস্কৃতি	
ধর্মীয় সংস্কৃতি	
সাহিত্যে সাংস্কৃতিক বিবর্তন	
উপসংহার	৩০০-৩১৬
পরিশিষ্ট - ১ বিষয় নির্দিষ্ট সাক্ষাৎকার	৩১৭-৩৩৮
২ তথ্য সহায়ক ব্যক্তিবর্গ ও বিশেষ কৃতজ্ঞতা	৩৩৯-৩৪২
গ্রন্থপঞ্জি	৩৪৩-৩৫৮
নির্ঘণ্ট	৩৫৯-৩৭৯

মুখবন্ধ

বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সমৃদ্ধ সংস্কৃতির বহু বিষয়াদি লক্ষণীয়ভাবে আজও স্পষ্ট, যা থেকে এই জনগোষ্ঠীর নৃ-গোষ্ঠীগত পরিচয় এবং কৌম চিহ্নগুলি ধরা পড়ে। আবার সংস্কৃতির বহু উপাদান অস্তমান। এক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতির পরিসর আজকে প্রভাবিত এবং অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লেষণ ও আত্তীকরণের প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত। বিগত চার-পাঁচ দশকে এক সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ঘটনা প্রবাহে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর বর্তমান সমাজ ও সংস্কৃতি। বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠী যেমন দ্রুতলয়ে বিশ্বায়নের শরিক তেমনি গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভাষা সংস্কৃতি মনন দর্শনের ক্ষেত্রেও বিবর্তমান। সমাজ কাঠামোর সঙ্গে অর্থনৈতিক অবস্থান পরিবর্তিত হয়েছে। খাদ্যাভ্যাস থেকে পোষাক পরিচ্ছদ, রুচিভাবনা সেইসঙ্গে লোকায়ত ধর্মীয় পরিসরটিও বদলে গেছে। পুরোনো রীতি পদ্ধতি কিংবা আচার সংস্কারের সঙ্গে বর্তমান সময়ে যেমন পরিবর্তিত তেমনি বর্তমান প্রজন্মও বিচ্ছিন্ন। লোকায়ত ভাবনার চৌহদ্দিতে যুক্তি, বুদ্ধি ও শিক্ষা মনস্কতার সম্প্রসারণ ঘটেছে। গ্রাম ও শহরের ব্যবধান কমেছে। বিনোদনের উপকরণ, মাধ্যম পালটেছে। রাজবংশী সমাজের লোক সাংস্কৃতিক বৃত্তটি আজকে মিশ্র সংস্কৃতির গ্রাসে সংকটাপন্ন। নৃগোষ্ঠীগত চিহ্নগুলিও ক্রমশ বিলীয়মান। বর্তমান রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি দ্রুত এক পরিবর্তনের শরিক। এই পরিবর্তনকে বিষয় করেই প্রকল্প গ্রহণ ''উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তন : সমীক্ষণ ও বিশ্লেষণ।'' প্রকল্পটির উদ্দেশ্য রাজবংশী সমাজের এই সাংস্কৃতিক বিবর্তনের বিষয়টির এক ধারাবাহিক নিবিড় পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা, মূল্যায়ন, কারণ, যুক্তি, ব্যাখ্যার মধ্যে দিয়ে অনুধাবন করা। যা ভবিষ্যৎ সময়কে যেমন চিহ্নিত করবে তেমনি অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সেতুও রচনা করবে। এই গবেষণা প্রকল্পটির মধ্যে দিয়ে বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠীর বিবর্তমান সাংস্কৃতিক বিন্যাসকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যেখানে জীবনচর্যা থেকে অভ্যাস, লোকায়ত বলয়, ধর্মীয় পরিসর থেকে সাংস্কৃতিক বিন্যাস এমনকী ভাষা সাহিত্য চর্চার বিষয়টিকেও আলোচনায় রাখা হয়েছে। এই গবেষণা প্রকল্পে কাজের সূত্রে বিভিন্ন শ্রেণির

মানুষের সনির্বন্ধ সহযোগিতা পেয়েছি। তাদের প্রত্যেককে আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। যারা তথ্য দিয়েছেন, মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন, অনেকে বই পুস্তক, প্রবন্ধ, পত্র-পত্রিকা দিয়েছেন, অনেকে ক্ষেত্র সমীক্ষায় সঙ্গী হয়েছেন তাদেরকে আমার শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। বিভিন্ন লেখকের তথ্য, উদ্ধৃতি আমার এই গবেষণা প্রকল্পে ব্যবহার করেছি, তাদেরওকে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। অকপট ঋণ স্বীকারে বাধিত থাকলাম।

গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার, কোচবিহার; ন্যাশনাল লাইব্রেরী, কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা; সেন্টার ফর স্টাডিস অব লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড কালচারর্স লাইব্রেরী, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়; কলকাতা লিটিল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী ও গবেষণা কেন্দ্র, কলকাতা; এডওয়ার্ড লাইব্রেরী, আলিপুরদুয়ার; কল্যাণী ইউনিভার্সিটির কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, গৌহাটি ইউনিভার্সিটির কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী। এইসব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

যারা বিভিন্ন সময়ে আলোচনা ও পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, যাদেরকে বাদ দিয়ে এই গবেষণা প্রকল্পটি সম্পন্ন হত না তাদের নাম সবিশেষ কৃতজ্ঞতায় ও শ্রদ্ধায় উল্লেখ করতে হয় — ড. গিরিজাশংকর রায়, ড. দিগ্বিজয় দে সরকার, ড. বিমলেন্দু মজুমদার, ড. অমলকান্তি রায়, মাননীয় বিজয়চন্দ্র বর্মন, চেয়ারম্যান, রাজবংশী ভাষা আকাদেমি, ড. আনন্দগোপাল ঘোষ, ড. নিখিলেশ রায়, ড. তপন রায় প্রধান, ড. সত্যেন্দ্রনাথ বর্মন, ড. নারায়ণ চন্দ্র বসুনীয়া, ড. মাধব অধিকারী, ড. রাজর্ষী বিশ্বাস, ড. প্রসূন বর্মন, কটন বিশ্ববিদ্যালয়; ড. তপন কুমার বিশ্বাস, কল্যাণী ইউনিভার্সিটি; পরিমল রায়, অ্যাসিট্যান্ট লাইব্রেরীয়ান, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়; ড. বেলা দাস, আসাম ইউনিভার্সিটি; ড. দীপক কুমার রায়, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়; অধ্যাপক বরুণ চক্রবর্তী, কলকাতা; অধ্যাপক শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, কলকাতা; অধ্যাপক রামকুমার মুখোপাধ্যায়, কলকাতা; উৎপল কুমার ঝা, প্রাক্তন সচিব, বাংলা আকাদেমি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার; বিশিষ্ট সমাজসেবী ও রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, কোচবিহার; গৌতম সরকার, বর্ষীয়ান সাংবাদিক; লোকসংগীত গবেষক দীনেশ চন্দ্র রায়, ময়নাগুড়ি; দাদা-বন্ধুবর সুকুমার নাগ, খোকনদা, কোচবিহার; ড. বিপ্লব সাহা, শিলিগুড়ি মহাবিদ্যালয়; পরিতোষ কার্য্যী, তুফানগঞ্জ; সুজিত বর্মন, কামাখ্যাগুড়ি; জ্ঞানবিলাস যোষিত রঞ্জন রায়, মিঠুন বৈশ্য, শুভঙ্কর দাস, ফারুক

শেখ মণ্ডল, সমীর রক্ষিত প্রমুখ। এর বাইরে আরও অনেকে বিভিন্নভাবে নিরন্তর সহযোগিতা করেছেন। উল্লেখ করতে হয় শ্রেয়সী সেন, অনন্যা দাশগুপ্ত ও জলি মজুমদারের নাম। যারা আমায় বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। আমার কন্যাসম শ্রমণা মিশ্রও আমায় গবেষণায় সহায়তা করেছে। তাকেও সস্নেহে বিশেষভাবে স্মরণ করি।

উৎসাহ, তথ্য ও পরিসর দিয়ে প্রতিনিয়ত সাহায্য করেছেন আমার মামা শ্রী রাজেন্দ্রনাথ দাস, মা সুখেশ্বরী রায় এবং দিদিমা ঁ দীনমালা দাস। যারা নিয়মিত রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির অতীত ও বর্তমানের নানাবিধ তথ্য উপস্থাপন করেছেন। উল্লেখ করতে হয় আমার স্ত্রী অসীমা সরকার, আমার ১৩ বছরের শ্রীমান শুভার্থী বাবু ও ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রী কৌস্তভ রায়ের নাম। কারণ তারাও আমাকে পরিসর ও সুযোগ দিয়ে এই প্রকল্প রূপায়ণে সহযোগিতা করেছে। আমি তাদের কাছেও সমানভাবে ঋণী।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি শ্রীমতী তনুশ্রী ধরের প্রতি কারণ তিনি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে এই প্রকল্পটির যাবতীয় তথ্যাদি সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে পাঠযোগ্য করে তুলেছেন এবং সমস্ত প্রকল্পটির রূপায়ণে দায়িত্ব নিয়ে অংশীদার হয়েছেন। তার ঋণ আমার কাজের সঙ্গেই চিরকাল সম্পৃক্ত থাকল। সর্বশেষে বুবুন কুমার বর্মণ, শিলিগুড়ি, সৌন্দর্য ও সৌকর্যসহ গ্রন্থাকারে প্রকাশের সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে আমায় বাধিত করেছেন। সকলকে আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। যা কিছু অসম্পূর্ণতা তা আমার নিষ্ঠা ও অযোগ্যতার কারণে।

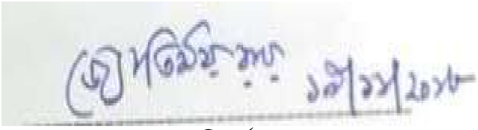

কোচবিহার　　　　　　　　　　　　　　　　　জ্যোতির্ময় রায়

নভেম্বর, ২০১৮

ভূমিকা

সমাজ বলতে একটা জনসমষ্টিকে বোঝায়, যে সমষ্টির একটি সাধারণ ঐতিহ্য, প্রথা, জীবনপ্রণালী কিংবা একটি সাধারণ সংস্কৃতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে একই সাথে বসবাস করে এবং সেই গোষ্ঠী সদস্য একত্রে সুদীর্ঘকাল বসবাসের ফলে পরস্পরের প্রতি সচেতনতা ও ইতিবাচক মনোবৃত্তি প্রকাশ পায়। অর্থাৎ সমাজ বলতে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এমন একদল জনসমষ্টিকে বোঝায় যারা এক সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। মূলত: সমাজ ও সংস্কৃতির প্রত্যয় পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটি আরেকটির পরিপূরক।

সমাজ একপ্রকার সমষ্টিগত সত্তাকেই প্রকাশ করে। সমাজ বস্তুত ব্যবহারিকতা, নানা প্রক্রিয়ার নিয়ম-রীতি, কর্তৃত্ব, পারস্পরিক সহায়তা, বিভিন্ন গোষ্ঠী ও বিভাজন নিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনতা দানের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা একটি সতত পরিবর্তনশীল ব্যবস্থা। এভাবেই সমাজ সম্পর্কিত বিষয় বর্ণনায় অধ্যাপক ম্যাকাইভার এণ্ড পেজ তাঁদের Society নামক গ্রন্থে সংজ্ঞায়িত করেছেন — Society ... is a system of usages and procedures of authority and mutual aid, of many groupings and divisions, of controls of human behaviour and of liberties. The everchanging, complex system we call society. [১]
অর্থাৎ নির্দিষ্ট জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত একটি সংগঠিত ও সংযোজিত সমাহার হল সমাজ।

সমাজের একটি সাংগঠনিক রূপ থাকে। গোষ্ঠীবদ্ধতার মধ্য দিয়ে সমাজের পরিসর কাঠামোগত হয়। সেখানে অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম ও আত্মীয়তার উপর ভিত্তি করে সমাজ বিন্যাসের ভিন্ন ভিন্ন ধরন গড়ে ওঠে। সমাজের প্রকারভেদে বিভিন্ন বিষয় ও পেশাবৃত্তিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। স্বাভাবিকভাবে রাজবংশী সমাজ সম্পূর্ণভাবে কৃষিজীবী সমাজ (agricultural society)। কয়েকশ' বছর ধরে এই কৃষিকে ঘিরেই সমাজ কাঠামো সুদৃঢ় হয়েছে। অন্যান্য সমাজের কিছু বৈশিষ্ট্য আত্মস্থ করলেও তা ব্যাপন (Diffusion) প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়েছে। বিভিন্ন উপাদান, প্রযুক্তি, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ধর্ম-আচার-প্রথা এমনকী ভাবনারও সম্প্রসারণ

ঘটেছে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায়। সেটা শুধু একরৈখিক বিবর্তনবাদে (Unilinear evolutionism) সীমাবদ্ধ নয়। অনেকক্ষেত্রে বহুরৈখিক (Multilinear evolutionism) থেকে সর্বজনীন বিবর্তনবাদেও (Universal evolutionism) সম্পন্ন হয়েছে। একরৈখিক বিবর্তনবাদের ধারা অনুযায়ী মাতৃতান্ত্রিক সমাজ থেকে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে রাজবংশী সমাজে পিতৃতান্ত্রিক ধারার সূচনা হয়। ধর্মের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটে। আত্মায় বিশ্বাসের আদি ভাবনা থেকে সর্বপ্রাণবাদের (animism) রূপান্তর ঘটে। সেইসঙ্গে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আসে বহু ঈশ্বরবাদ (polytheism) এবং একেশ্বরবাদের (monotheism) ভাবনা। রাজবংশী সমাজের সরল সমাজ বিবর্তনের ধারায় জটিল সমাজে রূপান্তরিত হয়।

সমাজের সঙ্গে সংস্কৃতি একটি বিষয়। রাজবংশী সমাজের সংস্কৃতি কতগুলি বৈশিষ্ট্য বহন করে যা গোষ্ঠী পরিচয়কে চিহ্নিত করে। রাজবংশী জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতির পরিসর তৈরি হয় গোষ্ঠী ভাবনা ও জীবনযাপনের কৃত্যাদিকে ভিত্তি করে। ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় তা উন্নীত হয়েছে যাকে আমরা নৃ-গোষ্ঠীগত ভাবনায় বিবর্তন হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। অনেকগুলি ধাপ অতিক্রম করতে হয়েছে রাজবংশী জনগোষ্ঠীকে। তবে মূলত কৃষি অর্থনীতিকে ভিত্তি করেই সংস্কৃতি আবর্তিত হয়েছে। কারণ কৃষিকে ঘিরেই রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি। সংস্কৃতি যেহেতু নৃবিজ্ঞানের ভাষায় কাজের সমার্থক 'man and his work' স্বাভাবিকভাবে সংস্কৃতি তাই মানুষের জৈবিক অস্তিত্ব ব্যতিরেকে আর যা কিছু তার সত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়। সংস্কৃতি শব্দের মূল অর্থ যেখানে 'কর্ষণ করা' (ইংরেজি culture শব্দটি এসেছে জার্মান শব্দ 'kalture' থেকে যার অর্থ 'কর্ষণ করা')। তাই সাধারণত সংস্কৃতি বলতে আমরা নাচ-গান-পূজা-পার্বণ নয় সংস্কৃতি শব্দটির অর্থ আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত। এ প্রসঙ্গে ই. বি. টাইলর সংস্কৃতির সংজ্ঞাটি উল্লেখ করা যেতে পারে 'Culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, customs and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society.'[২]

রাজবংশী সমাজের সংস্কৃতির একটি নির্দিষ্ট ধরন অতীতে ছিল। বর্তমানে তা বিবর্তিত হয়ে ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকগুলি ধর্ম, শিল্প, সমাজ সংগঠন, প্রযুক্তি প্রভৃতির চরিত্র বৈশিষ্ট্য পরিবর্তমান। স্বাভাবিকভাবে সমাজ কাঠামোর সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ধারাটি লক্ষণীয়।

উত্তরবঙ্গের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী রাজবংশী সমাজ। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারি অনুযায়ী রাজবংশী জনগণের ৭৭.১৯ শতাংশই এই উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা। রাজবংশী জাতিগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক উৎপত্তি নিয়ে পণ্ডিত মহলে বহু বিতর্ক বিভিন্ন ভাবে উত্থাপিত হয়েছে। কিন্তু সকলেই একমত হয়েছেন যে রাজবংশী জনগোষ্ঠী বৃহত্তর বোড়ো জনগোষ্ঠীরই একটি অন্যতম শাখা। মূলত: ইন্দোমঙ্গোলীয় হলেও কালের স্রোতে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়ীয় সংস্কৃতির সংযোগ ঘটে। মধ্যপন্থা অবলম্বন করে অনেকে সংকর জাতি হিসাবেও উল্লেখ করেছেন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বে রাজবংশীদের উৎপত্তি বিষয়ে বহু নৃতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, গবেষক এবং ব্রিটিশ সিভিলিয়ানরা রাজবংশী জনগোষ্ঠীর জাতিতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব এবং সংস্কৃতি নিয়ে নানাবিধ কাজ করেছেন। আজকের সময়ের নিরিখে যা শুধু গুরুত্বপূর্ণ নয় অত্যন্ত মূল্যবান। বলা যেতে পারে তাদের অনুসন্ধান ও পরিসর ধরেই পরবর্তীকালে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা নির্ণীত করার চেষ্টা হয়। আবার রাজবংশী নৃ-গোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কযুক্ত রাজবংশী অধ্যুষিত অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস অর্থাৎ প্রাগজ্যোতিষপুর, কামরূপ, কামতা ও পৌণ্ড্রবর্ধনের ইতিহাস তথা কোচবিহার রাজ্যের ইতিহাস। আজকের উত্তরবঙ্গ তার একটি ভূখণ্ড মাত্র। পশ্চিমবঙ্গ কিংবা ভারতবর্ষের মানচিত্রেও যা চিহ্নিত নয়। কিন্তু গঙ্গার পূর্ববর্তী সাতটি জেলা জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ 'উত্তরবঙ্গ' নামে সমধিক পরিচিতি পেয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি ভাবে স্বীকৃতিও পেয়েছে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। প্রশাসনিকভাবেও এই 'উত্তরবঙ্গ' নামটি ইদানীং ব্যবহৃত হচ্ছে। যদিও স্বাধীনোত্তর সময়ে এই উত্তরবঙ্গের চেহারাটি যথেষ্টই সংকুচিত হয়েছে কাঁটা তারের বেড়াজালে। তা সত্ত্বেও বর্তমান উত্তরবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের একটি অন্যতম অংশ এবং উর্বর সাংস্কৃতিক অঞ্চল। আর এই বর্তমান উত্তরবঙ্গের অন্যতম জনগোষ্ঠী হল এই রাজবংশী সমাজ। সুপ্রাচীন কাল ধরেই নিজস্ব ঐতিহ্য, পরম্পরা ও লোকায়ত ভুবনের অধিকারী এই জনগোষ্ঠী নানা সংশ্লেষণ ও বিবর্তনকে স্বীকার করেও নৃ-গোষ্ঠীগত চেতনায় নিজস্বতা বজায় রেখেছে। এই উত্তরবঙ্গের বাইরেও নিম্ন অসমের গোয়ালপাড়া, ধুবরী, কোকরাঝাড় জেলার বিশাল অংশ জুড়ে, বাংলাদেশের রংপুর, দিনাজপুর সহ নেপালের কিছু জেলায় এবং আমাদের বিহার, মেঘালয়, ত্রিপুরা প্রদেশেও এই জনগোষ্ঠীর মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। 'পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলাতেও

রাজবংশী পরিচয়ের কিছু মানুষ বসবাস করে যদিও তাদের পেশা, বৃত্তিগত (তারা অধিকাংশই মৎস্যজীবী) দিক থেকে শুধু নয় উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের সঙ্গে তাদের দেহ গঠন, ভাষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও পার্থক্য লক্ষণীয়।[৩] গবেষকরা সামগ্রিকভাবে রাজবংশীর উদ্ভব নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। কারো মতে অস্ট্রিক বা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর বংশধর আবার কারও মতে মঙ্গোলীয় নৃ-শাখার অন্তর্ভুক্ত জনগোষ্ঠী অনেকে আবার মধ্যপন্থা অবলম্বন মিশ্র বা সংকর জাতি হিসাবে আখ্যায়িত করেন। আবার রাজবংশী ও কোচ নিয়েও মতভেদ আছে। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মতে রাজবংশীরা মূলতঃ মঙ্গোলীয় পরবর্তীকালে দ্রাবিড়ীয় সংস্কৃতির সংযোগ ঘটে। ফ্রান্সিস হ্যামিলটন বুকানন-এর মতে অধিকাংশ রাজবংশীই হল কোচ এবং তাদের উৎস এক।[৪] ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে মন্টোগোমারি মার্টিন বুকাননের তথ্য সমূহের উপর ভিত্তি করে 'The History, Antiquity, Topography and Statistics of Eastern India' নামক গ্রন্থে সন্নিবেশিত বুকাননের রিপোর্ট (Account of the District of Rangpore, 1810) রাজবংশী জনগোষ্ঠীর ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান। এই রিপোর্ট অনুসারে বৃহৎ বোড়ো নরগোষ্ঠীর অন্তর্গত কোচ ও রাজবংশীরা মূলত: এক জাতি। আবার এই রিপোর্টে একথাও বলা হয়েছে যে সমস্ত রাজবংশীই কোচ নয় তবে তাদের অধিকাংশই কোচ।[৫] রিজলীও বুকাননের মতটিকে সমর্থন করেন।[৬] শুধু তাই নয় রিজলী কোচ, রাজবংশী, পলিয়া, দেশীয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলিকে একই শাখার লোক বলেও বর্ণনা করেছেন।[৭] ১২৬১ খ্রিস্টাব্দে রচিত ফার্সি ইতিহাস গ্রন্থ 'তবকাত্-ই নাসিরী' তে 'কোচ-মেচ-থারু' এই সম্প্রদায়ত্রয়কে মঙ্গোলীয় শাখার লোক হিসাবে উল্লেখ করেছেন।[৮] আবার একদল ঐতিহাসিকদের মতে বিষ্ণুপন্থী রাজবংশীরা দ্রাবিড়ীয় এবং শিবপূজক কোচ সমূহ মঙ্গোলীয়।[৯] ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রাজবংশীদের মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠীর তিব্বত-ব্রহ্মদেশীয় ভাষা শাখার লোক বলেছেন। ভাষাচার্য চট্টোপাধ্যায় অনুমান করেছেন যে খ্রিস্টাব্দ গণনার সময়েই আসাম, পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে তিব্বত ব্রহ্মদেশীয় ভাষা শাখার বৃহৎ বোড়ো জাতির মেচ-কোচ-কাছারি প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলি বসতি স্থাপন করেন।[১০] ভাষাচার্য চট্টোপাধ্যায় এও বলেছেন যে কোচেরা নিজেদের রাজবংশী পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেন।[১১] আবার রাজবংশীদের ধর্ম সম্পর্কে প্রায় সকল বরেণ্য পণ্ডিতগণের অভিমত যে কোচবিহার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ বিশ্বসিংহের আমলে তা হিন্দুকৃত হয়েছে।[১২] তবে

এই বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। রাজবংশীরা নিজেদের বংশপরম্পরায় ক্ষত্রিয় মনে করে।[১৩] নানা কারণে পরবর্তীকালে ভঙ্গ ক্ষত্রিয় বা ব্রাত্য ক্ষত্রিয়রূপে পর্যবসিত হয় এবং তারা মনে করেন রাজবংশী ও কোচ আলাদা। রাজবংশীরা পূর্বাপর হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন। বঙ্গদেশে যখন আর্যীকরণ ঘটে তখনই হিন্দুধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতিকে রাজবংশীরা গ্রহণ করে। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে যে রাজবংশীরা আর্যভাষাকে গ্রহণ করে তার সমর্থন মেলে হিউয়েন সাঙ এর বিবরণেও।[১৪] উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় হিন্দু এবং বঙ্গদেশের অন্যান্য হিন্দুশাখার সঙ্গে এদের ধর্ম-কর্ম্ম ও আচার অনুষ্ঠানের কিছু বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় শুধুমাত্র আঞ্চলিকতার প্রভাবে। যুক্তি হিসাবে বলা হয় পৌণ্ড্রদেশ থেকে রাজা মহাপদ্মনন্দের ভয়ে ভীত কিছু সংখ্যক পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় করতোয়া নদী অতিক্রম করে রত্নপীঠ বা জল্পেশ দেশের অবস্থান ভূমিতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং ব্রাহ্মণের অভাব অদর্শনজনিত কারণে বৈদিক অনুষ্ঠানে বিরত থেকে ম্লেচ্ছ সংসর্গে ক্রমশ ম্লেচ্ছে পরিণত হয় ও ম্লেচ্ছ ভাষায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতেই সমগ্র উত্তরবঙ্গ মৌর্য সাম্রাজ্যের অধিকারে আসে এবং মৌর্য আনুকূল্যে তাদের অধিকৃত সমগ্র অঞ্চলেই বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বিরোধী বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারে সমগ্র আর্যাবর্তে বর্ণাশ্রম ধর্ম লোপ পায়। বেদ চিহ্নিত যজ্ঞবিধি বিরোধী বৌদ্ধদের সঙ্গে স্বাভাবিক কারণেই দেবদেবী সেবক হিন্দুবর্ণাশ্রম ধর্মী ক্ষত্রিয়দের সংঘর্ষ বাঁধে। নিজেদের ধর্ম ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ক্ষত্রিয়দের কেউ কেউ আত্মগোপন করে। পরবর্তীকালে এরাই দক্ষিণবঙ্গের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বা পোদ সম্প্রদায়ভুক্ত জনগোষ্ঠী হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। অন্যেরা আদি বাসস্থান পরিত্যাগ করে উত্তরদিকের অরণ্যবেষ্টিত মঙ্গোলীয় উপজাতি অধ্যুষিত রত্নপীঠ বা জল্পেশ ও তার পার্শ্ববর্তী কামতাপুর বা কামরূপ অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে রাজবংশী নামে আখ্যায়িত হয়। আবার প্রথম শতকে তিব্বত-চিনীয় গোষ্ঠীর অন্তর্গত বৃহৎ বোড়ো শাখার তিব্বতী-ব্রহ্মভাষী কোচ, মেচ, বোড়ো, কাছারি, রাভা ইত্যাদি উপজাতির লোকেরা উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করে। এই উপজাতিগুলির মধ্যে কোন কোনটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী হিসাবে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করে চলে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম রক্ষণশীল অংশটি দ্রাবিড় গোষ্ঠীর লোকেদের সঙ্গে মিশে গিয়ে একটি সমন্বিত জনসমাজ গঠন করে। এই সমন্বিত জনসমাজই রাজবংশী সমাজ, যাদের সঙ্গে পরবর্তীকালে আর্যদের রক্তগত সংমিশ্রণ ঘটে থাকতে পারে অনুমান করা হয়।

প্রাচীনকাল থেকেই এই জনগোষ্ঠী আর্য ভাষা ও সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করার চেষ্টা করছে এবং আত্মীকরণের প্রাথমিক পর্যায়ে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যেই ভারতীয় আর্যভাষাকে নিজেদের ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেছে। কিন্তু ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক থেকে আর্যীকরণের এই স্রোত এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে এখনও বর্তমান। এই সূত্রেই রাজবংশীরা নিজেদেরকে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হিসাবে দাবি করে।[১৫] পরবর্তীকালে তারা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সরকারি আধিকারিক ও সর্বভারতীয় ক্ষত্রিয় সমাজেরও স্বীকৃতি লাভ করে। তাছাড়া সামাজিক মর্যাদার দিক থেকেও রাজবংশীরা কোচদের থেকে উন্নত, আচার সংস্কারও ভিন্নতর। স্বাভাবিকভাবে কোচেদের মধ্যে নিজেদের রাজবংশী পরিচয় প্রবণতা তৈরি হয়। কোচ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা এবং রাজবংশী পরিচয় গ্রহণের মধ্য দিয়ে বিষয়টি সহজতর হয়।[১৬] ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও বলেছেন যে কোচেরা নিজেদের রাজবংশী পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেন।[১৭] স্বাভাবিকভাবে কোচ সম্প্রদায়ের মানুষ রাজবংশী সমাজের মধ্যে সমন্বিত হয়েছে বলা যায়। আবার রাজবংশী জনগোষ্ঠীর একটা অংশ মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠীর এটাও বলা যায়। পাশাপাশি এটাও সত্য যে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সবাই মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর নয় (বিশেষ করে রংপুর ও দিনাজপুর সন্নিহিত অঞ্চলের) রাজবংশীদের একটা বড় অংশ আর্য ছিল।[১৮] চেহারাগত দিক থেকেও সেটা পরিলক্ষিত হয়। রাজার আত্মীয় স্বজন যাদেরকে এই অঞ্চলের রাজবংশীরা বলেন রাজগণ, তাদের মধ্যে মঙ্গোলীয় বৈশিষ্ট্য বিশেষ করে গালের চোয়াল, নাক ও গাত্রবর্ণ সাধারণ দরিদ্র রাজবংশীর চেয়ে অনেক প্রকট।[১৯] এছাড়াও আরো একটি বিষয় প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গের সীমান্ত অঞ্চল বিশেষ করে বর্তমান আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার অবস্থান। পূর্ব উত্তরে আসাম, উত্তর ও উত্তর পশ্চিমে ভুটান ও নেপাল, পশ্চিমে বিহার। সেই সঙ্গে অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলার উত্তর পূর্বভাগের বিস্তৃত অংশ সুদীর্ঘকাল ভুটানের শাসনাধীন ছিল।[২০] ব্রিটিশের আগমনে ও হস্তক্ষেপে পরবর্তীকালে ক্ষমতার হস্তান্তর হয় মাত্র। স্বাভাবিকভাবে সীমান্তবর্তী বিভিন্ন জাতি ও উপজাতিদের সঙ্গে রক্ত ও সংস্কৃতির সংশ্লেষণ ঘটে। তেমনি গাঙ্গেয় সংস্কৃতির প্রভাব মালদহ অঞ্চলের রাজবংশী সমাজের মধ্যে পড়ে। তাছাড়া রাজবংশী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশ প্রধানত রংপুর, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলাকে ঘিরে আবর্তিত হয়। সম্প্রসারিত হয়ে গোয়ালপাড়া ও উত্তরবঙ্গের অন্যত্র প্রবেশ করে।[২১] স্বাভাবিকভাবে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ জেলায় সম্প্রসারিত

হতে সময় লাগে, পরিবর্তনের প্রবণতাও কম। পরবর্তীকালেও মালদহ এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অরাজবংশী বর্ণহিন্দুদের আচার অনুষ্ঠানের প্রভাব অপেক্ষাকৃত বেশি পড়ে। তুলনামূলকভাবে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং দার্জিলিং জেলার সমতল ভাগে রাজবংশীদের আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে সমতা যেমন দেখা যায় তেমনি পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সামঞ্জস্য লক্ষ করা যায়।

রাজবংশী জনগোষ্ঠী হাজার হাজার বছর ধরে নানাবিধ চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এসে পৌঁছেছে। সামগ্রিকভাবে লক্ষ করলে প্রতীয়মান হয় যে সুদীর্ঘকাল বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সঙ্গে পাশাপাশি অবস্থান এবং বর্ণহিন্দুদের ধর্ম-সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে স্বতন্ত্রতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। নিজস্ব ধর্মীয়-বিশ্বাস, আচার-সংস্কার, দেব-দেবী, প্রকৃতিভাবনা তথা জীবন-জীবিকায় ব্যতিক্রমী ভাবনা আজও নিভৃতে বহন করে রাজবংশী সমাজ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে হিন্দুধর্মের সংস্পর্শে শাস্ত্রীয় রীতি-নীতি অনুসরণ করলেও জীবন ধর্মে লৌকিক অধ্যায়টি বিস্তৃত অংশ জুড়ে বহমান। তবে রাজবংশী সমাজজীবনের সঙ্গে বৃহত্তর বঙ্গজীবনের সাংস্কৃতিক সংশ্লেষণ (Cultural assimilation) উত্তরোত্তর ঘটতে থাকায় বর্তমান প্রজন্মের মেলামেশা, আদব-কায়দা, শিক্ষা-দীক্ষা, আদান-প্রদান, পোশাক-পরিচ্ছদ এমনকী চিন্তা-চেতনা মননভাবনার ক্ষেত্রে পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবে ঘটেছে। সেই সঙ্গে বিশ্বায়নের প্রভাব, লোক-সাংস্কৃতিক পরিসরের সংকোচনে রাজবংশী সমাজেও সংস্কৃতির বিবর্তন নজরে পড়ে। সামাজিক ক্ষেত্রে যেমন, ধর্মীয় ক্ষেত্রেও প্রাচীন-সংস্কার, রীতিনীতির পরিবর্তন লক্ষণীয়। তা সত্ত্বেও বলা যায়, রাজবংশী সমাজ-সংস্কৃতি ভিন্নতর গোষ্ঠী-পরিচয় বহন করে। যা আচরিত ক্রিয়াকলাপ কিংবা জীবনচর্যার বিভিন্ন পদক্ষেপে প্রতিভাত হয়।

রাজবংশী জনগোষ্ঠী সমাজ জীবন এবং মনন চর্যার যে ভিন্ন সংস্কৃতির ধারা ও ঐতিহ্য পালন করে, তা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। সুদীর্ঘকাল বর্ণ হিন্দুদের সঙ্গে সহাবস্থান, সংস্পর্শ, সংশ্লেষণ প্রভৃতি কারণে তারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী — সামাজিক ক্রিয়াকলাপে যেমন জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে ইত্যাদি আচার-অনুষ্ঠানে বর্ণহিন্দুদের অনুসরণ করলেও নিজস্ব লৌকিক আচার-সংস্কারের পর্বটিও নিষ্ঠা সহকারে পালন করে। সেখানে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ কোনও বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।

রাজবংশী সমাজে বিভিন্ন প্রকার বিয়ের (যেমন — ঘরজেয়া বিয়ে, ঘর সোন্দানি বিয়ে, উঠানি বিয়ে, পানি ছিটা বিয়ে ইত্যাদি) প্রচলন কম হলেও বিয়ের বিভিন্ন পর্বে লৌকিক বিষয়গুলি আজও গুরুত্বপূর্ণ। যেমন — গুয়াকাটা অনুষ্ঠান, পানিছিটা বাপ, মিস্তর ধরা, আঠোয়ারি ভাঙ্গা, দানীবুড়ি ইত্যাদি পর্বগুলি যথাসম্ভব অনুসৃত হয়। মৃত্যুর ক্ষেত্রেও কিছু কিছু অনুষ্ঠান লৌকিক স্তরেই রাজবংশী সমাজ পালন করে। যেমন — ডোকা-ভাঙা, শ্মশানে বাঁশ পুঁতে নিশান টাঙানো, প্রেতকর্ম সম্পাদন, ধূমালী পারলৌকিক কীর্তন পর্ব এবং এছাড়াও আরও কিছু লৌকিক আচার বিচার। ধর্ম পালনের ক্ষেত্রেও বর্ণহিন্দুদের প্রায় সকল দেব-দেবীর প্রতি বিশ্বস্ত থেকেও সারা বছর ধরে নিজস্ব দেব-দেবীর পূজা অর্চনা, ব্রতপালন, বিশ্বাস ও সংস্কারের মাধ্যমে নিজের ও পরিবারের মঙ্গল কামনা করে। বৃক্ষপূজা থেকে শুরু করে শিব, মনসা, কালী, বুড়া ঠাকুর, তিস্তা বুড়ি, মা লক্ষ্মী, সোনারায়ের গান, জাগ গান, বাঁশ খেলা, বুড়াবুড়ি, গোরখনাথের পূজা, ভাণ্ডানী প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা অর্চনা, আচার সংস্কার সহকারে তারা পালন করে। এছাড়াও নানা ধরনের আঞ্চলিক লৌকিক দেব-দেবীর পূজা ও ধর্মীয় রীতির মধ্যে আমাতি বা অম্বুবাচী পালন, বিভিন্ন তিথি নক্ষত্রে সেবা নৈবেদ্য প্রদান, ধানের গাছি বোনা, ফুল আনা, যাত্রাপূজা, ব্যাঙের বিয়া ও হুদোম দ্যাওর পূজা, যাইটল বিষহরির পূজা ও গান, মাড়েয়া বিষহরির আসর, বিভিন্ন ধরনের কালী ও শিবের পূজা, মাশান ঠাকুরের পূজা, কার্তিক পূজা, চড়ক পূজা, গারাম ঠাকুরের পাটে পূজা, বিষমা বা বিষুয়া পরব পালন, দোল সওয়ারীর পূজা ও মেলা প্রভৃতি ছাড়াও বিভিন্ন নদীকে দেবতা জ্ঞানে পূজা, বৃক্ষপূজা, বৃক্ষকে ঘিরে উৎসব সবেতেই লৌকিক রীতি-সংস্কারে রাজবংশী জনগোষ্ঠী নিবিষ্ট হয়। এছাড়াও তন্ত্রমন্ত্র, লৌকিক বিশ্বাস, সংস্কারে পরিবার ও পরিবারের বাইরের কিছু অনুষ্ঠান সুদীর্ঘ কাল ধরে সম্পন্ন হয় একেবারে শাস্ত্রীয় রীতির বাইরে অবস্থান করে। সেখানে অনেক ক্ষেত্রে ধর্ম, বিশ্বাস ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। যেমন পীরের থানে হত্যে দেওয়া, মানত, পূজা প্রদান; বিভিন্ন মেলার আয়োজন ইত্যাদি বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠীকে বরাবর ভিন্ন ভাবে আলোড়িত করে। সামগ্রিক ভাবে বলা যায় রাজবংশী সমাজের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে অদ্ভুত এক সমন্বয় যেমন দৃশ্যমান, তেমনই ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রাচীন বৌদ্ধ প্রভাব থেকে শৈব, শাক্ত প্রভাব বর্তমান আবার বৈষ্ণব প্রভাবও কয়েক শতাব্দী ধরে প্রকট। অদ্ভুত সমন্বয় ও সাযুজ্যও লক্ষ করা যায়। এ-প্রসঙ্গে কোচবিহারের মদনমোহন মন্দিরের নাম উল্লেখ

করা যেতে পারে। আবার রাজবংশী পরিবারের ঠাকুর পাটে কালী, গাবুর, রাখাল, কুবের, শিব থেকে মাশান, সোনারায়, বুড়াঠাকুর, তিস্তাবুড়ি, গৌরাঙ্গ; এমনকী পীরবাবার থানেরও অদ্ভুত সমাবেশ দেখা যায়। দুধ, চিড়া, আটিয়া কলার (বিচি যুক্ত কলা) সাধারণ নৈবেদ্য দিয়ে বাড়ির গৃহকর্তাই অনায়াসে পূজা-অর্চনায় ব্রতী হয়। সেখানে মন্ত্র থাকলেও শাস্ত্রীয় নয়। আসলে রাজবংশী সমাজের ধর্মীয় আচার-সংস্কার লৌকিক অধ্যায়টি গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে আর্য-অনার্যের বহু উপাদান লুকিয়ে আছে সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন সূচিতে। প্রকৃতিবাদ তথা সর্বপ্রাণবাদে (Animism) রাজবংশী সমাজে বিশ্বাস আজও লক্ষণীয়। রাজবংশী সমাজে উর্বরা সংস্কৃতি (Fertility Culture) -র প্রভাব প্রায় সমস্ত আচার-সংস্কারে দেখা যায়। বিশেষ করে ব্রতকথা, বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজার প্রকার ভেদ এবং কৃষি-কৃত্যাদির বিভিন্ন পর্বে। মেচেনী, হুদোম দ্যাও, ভাণ্ডানী সবেতেই উর্বরা সংস্কৃতির উপাদান সক্রিয়। বট পাকুড়ের বিয়ের ক্ষেত্রেও তা দৃশ্যমান। সকল নদীই রাজবংশী সমাজের কাছে দেব-দেবী, দেবস্থান। নদী, জলকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করার রীতি রাজবংশী সমাজে প্রচলিত। যা জল সংস্কৃতির (water culture) উদাহরণ। নদীতে নদীতে আত্মীয়, পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ রাজবংশী সমাজ এটা বিশ্বাস করে। তাই তো বিশ্বাস ভাবনায় ধরলা তিস্তা নদীর স্বামী, করলা নদী আর দুলালী দীঘি সন্তান-সন্ততি।

আদিম সংস্কৃতির উদাহরণ বহন করে লৌকিক ও প্রাকৃত বিশ্বাসে। জাদু বিশ্বাস, তন্ত্রমন্ত্র সমাজ-সংস্কারে নিহিত আছে লৌকিক ধর্মের অবয়বে। রাজবংশী সমাজের ধর্মবিশ্বাস, আচার-বিচার, পূজা-অর্চনা, ব্রতকথার মূল উৎস জাদুবিদ্যা। রাজবংশীদের মধ্যে এই জাদুবিদ্যা, তন্ত্রমন্ত্রের প্রভাব জীবনচর্যার নানা স্তরে যেমন — সন্তান জন্মানোর নিয়মাচারে, রোগব্যাধির চিকিৎসায়, শুভাশুভ কামনায় ও দৈনন্দিন যাপন কার্যের পরতে পরতে সূক্ষ্ম ভাবে কাজ করে। রাজবংশী সমাজের লোক-সংস্কৃতির পরিসরটি আক্ষরিক অর্থে বিস্তৃত। আর এই পরিসরে ধরা পড়েছে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সামাজিক বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়। ফলে রাজবংশী সম্প্রদায় সুদীর্ঘকাল বিভিন্ন জনজাতির সঙ্গে সহাবস্থান এবং বর্ণ হিন্দুদের ধর্ম-সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ রূপে বর্ণ হিন্দুর ধর্ম গ্রহণ করেননি, আবার তাদের অতীত কালের ধর্মীয় বিশ্বাস যেমন, পূজা উপলক্ষে গ্রামের মাঙ্গলিক থানে পশুবলী, নদ-নদীকে দেবতা জ্ঞানে পূজা-অর্চনা, বড় বৃক্ষকে দেবতা জ্ঞানে তেল সিঁদুর মাখিয়ে প্রণাম ও প্রার্থনা জানানো প্রভৃতি ত্যাগ করেনি।

রাজবংশী জীবনের মঙ্গলবোধ, শ্রেয়োবোধ অতীত ধর্মবিশ্বাসই তাদের মধ্যে জাগ্রত।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহারাজ বিশ্বসিংহ ও তাঁর পুত্র মহারাজ নরনারায়ণের সময়কালে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর মধ্যে হিন্দু ধর্মবিশ্বাস ছড়িয়ে পড়ে। বলা যায়, রাজবংশীদের বৃহৎ অংশ এই সময়ে হিন্দু ধর্মাবলম্বী হয়ে পড়েন। রাজবংশী হিসাবে স্বতন্ত্র পরিচয়ের সূত্রপাত এই সময় থেকেই। অবশ্য সামান্য অংশ, কোচ পরিচয় নিয়েই থেকে যায় নিজস্ব গোষ্ঠী পরিচয় বহন করে। যদিও পরবর্তীকালে তারা বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের (পঞ্চানন বর্মার ক্ষত্রিয়করণ আন্দোলন) মধ্য দিয়ে বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র রাজবংশী জনগোষ্ঠীই নয়, কোচ-খেন-যুগী-জলধা ইত্যাদি জনগোষ্ঠীও সামিল হয়। এই প্রক্রিয়ার ধারা আজও অব্যাহত। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব প্রভাবও এই জনগোষ্ঠীকে ধর্মীয় ভাবনায় সমৃদ্ধ করেছে। শংকরদেবের প্রভাব এক্ষেত্রে ব্যাপক। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের সময়কালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে এবং বলা যেতে পারে শৈব, শাক্ত ভাবনার সঙ্গে বৈষ্ণব ভাবনার মহাসম্মিলন ঘটে।

রাজবংশী সমাজের প্রধান আরাধ্য দেবতা — মহাদেব, কালী এবং মনসা দেবী। সামাজিক মঙ্গল সাধন, পারিবারিক সুখ শান্তি, সমৃদ্ধি, ফসল বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু লৌকিক পূজা রাজবংশী সমাজে প্রচলিত। বিশেষ করে মনসাদেবীর পূজা পারিবারিক যে কোনও শুভকর্মের প্রারম্ভে সম্পন্ন হয়। কালীর তো বহু প্রকারভেদ। শিবও বিভিন্ন নামে পূজিত। বাণেশ্বর, যণ্ডেশ্বর, জটেশ্বর, বটেশ্বর, জল্পেশ্বর আবার মাশান, সোনারায় সবই শিবের প্রকারভেদ। পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তীয় ভূখণ্ড (জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার) তো শৈবভূমি হিসাবে আখ্যায়িত। মহাকাল হিসাবে শিব পূজা পেয়ে আসছেন প্রান্তীয় ভূ-খণ্ডের বিভিন্ন জায়গায়। জীবজন্তুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে রাজবংশী সমাজে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা প্রচলিত। ভাণ্ডানী, শালেশ্বরী, বিষহরি, বুড়াঠাকুর, গোরখনাথ, মহাকাল, সোনারায় এমনকী নবান্নোৎসবে শিয়াল ঠাকুরের নামেও অর্ঘ্য প্রদান করা হয়।

রাজবংশী সমাজে তন্ত্রসাধনার একটি পরিসর ছিল। ওঝা, ভৌরিয়ারা তার উদাহরণ। এর মূলে রয়েছে বৌদ্ধীয় প্রভাব। ময়নাগুড়ি (জলপাইগুড়ি) অঞ্চলে তন্ত্রসাধনার বেশ কিছু প্রাচীন ক্ষেত্রের চিহ্ন আজও বর্তমান। নেপাল, ভুটান সন্নিহিত পাহাড় সংলগ্ন তরাই ডুয়ার্স সহ কামরূপ-

কামাখ্যা ছিল সেকালের তন্ত্র সাধনার অন্যতম ক্ষেত্র। রাজবংশী সমাজে তন্ত্রমন্ত্র, তুকতাক্, তাবিজ-মাদুলি, ওঝা-কবিরাজের প্রভাব যথেষ্ট। রাজবংশী সমাজে প্রাচীনকাল থেকে ব্রতকথার প্রচলন আছে। আশা-আকাঙ্ক্ষানিষ্ঠ বিশেষ ধর্মাচারণের ক্ষেত্র হিসাবে ব্রতপালন অনতি অতীতে প্রচলিত থাকলেও বর্তমানে প্রায় লুপ্তের পথে। ষাইটল, সুবচনী, ধরমঠাকুর, ষাটপূজা, কাতিপূজা কোথাও কোথাও হলেও সংখ্যায় তা হাতে গোনা। আঞ্চলিক ভেদে আরও বহু দেব-দেবীর পূজা রাজবংশী সমাজে প্রচলিত। কোথাও কোথাও ব্যক্তি কিংবা কোনও শক্তি উৎসকেও দেবতা জ্ঞানে পূজা করা হয়। যেমন — সন্ন্যাসীকাটা, ফালাকাটা, তুলাকাটা, মল্লিক ঠাকুর, রাজাঠাকুর এরকম স্থানিকভেদে বিভিন্ন ব্যক্তি দেবদেবীর পূজা অর্চনা রাজবংশী সমাজে প্রচলিত। তা কখনও পরিবার কিংবা গ্রামকে ভিত্তি করে সম্পন্ন হয়।

রাজবংশী সমাজ মূলত কৃষিজীবী। যদিও হাল আমলে বৃত্তি পেশার প্রসার ঘটেছে। বর্তমানে রাজবংশী সমাজ খাদ্যাভ্যাসে বেশ কিছু বিধিনিষেধ পালন করে। বিশেষ করে ক্ষত্রিয় আন্দোলনের পর সমাজ-সংস্কারের অংশ হিসাবে শূকরের মাংস, মদ ইত্যাদি বিষয়ে বিধিনিষেধ অনুসরণ করে। নৃতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক গবেষকদের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে রাজবংশীরা ষোড়শ শতাব্দীর পর থেকে যখন একটু একটু করে হিন্দু ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, তখন থেকেই সমাজের মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে ধীরগতিতে। সেই সময় থেকে বলা যেতে পারে, তাদের সমাজ মাতৃতান্ত্রিকতা থেকে পিতৃতান্ত্রিকতায় প্রবেশ করে। এই সময় থেকেই সমাজব্যবস্থায় নারীর তুলনায় পুরুষের কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।[২২] কিন্তু রাজবংশী সমাজ হিন্দুধর্ম গ্রহণ করার পর পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় প্রবেশ করলেও তাদের অনেক সংস্কার, বিশ্বাস, প্রথা প্রভৃতি চলমান ছিল। রাজবংশী সমাজে অতীতে নারীদের বিশেষ ভূমিকা ও গুরুত্ব ছিল। বিধবা বিবাহ সুদূর অতীত কাল থেকে প্রচলিত। পর্দা প্রথারও বিশেষ প্রচলন ছিল না। রাজবংশী নারীরা পুরুষদের মতো সমানভাবে পরিবারের কাজকর্মে অংশ নিতে পারে। অতীতে 'কন্যা পণে'র বিশেষ প্রচলন ছিল। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে এই রীতির পরিবর্তন ঘটতে থাকে। 'কন্যাপণে'র পরিবর্তে বর্ণহিন্দুদের মতো 'বরপণে'র প্রথা চালু হয়। ইদানীং সেটি রীতি হিসাবে প্রচলিত। 'বেটি ব্যাচে খাওয়ার' সেই প্রচলিত প্রবাদ এখন উলটো কথা বলে। 'ঘর জামাই' রাখার প্রথাও এখন অবলুপ্ত। বিয়ের অন্যান্য প্রকারগুলোও সচরাচর চোখে পড়ে না।

এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, বিয়ে বিষয়ে বর্ণহিন্দুদের রীতি-নীতি বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। তবে লৌকিক বৃত্তটি এখনও রাজবংশী সমাজ মেনে চলার চেষ্টা করে। 'বৈরাতী' (বিয়ের রীতি-নীতি অনুসরণ করে এই বৈরাতী) এখনও সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। সেখানে প্রাচীন লৌকিক সংস্কার রীতিগুলো অনুসৃত হয়। রাজবংশী সমাজে বিয়ের ক্ষেত্রে বর্ণহিন্দুদের মতো 'গোত্র' মানা হয় না। রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়দের মধ্যে বিয়ে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। রাজবংশী সমাজে সমান্তরাল ভাইপো (Parallel Cousin) ও আড়াআড়ি ভাইপো (Cross Cousin) জ্ঞাতি-সম্পর্কিত লোকজনের সঙ্গে বিয়ে হয় না।[২৩] রাজবংশী সমাজে গোত্র বিভাগ (সবাই নিজেদের কাশ্যপ গোত্র হিসাবে পরিচয় দেয়) না-থাকলেও গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা ছিল। একেকটি গ্রামে মাত্র কয়েকটি গোষ্ঠীর লোক বসবাস করতেন। ইদানীং আর্থ-সামাজিক কাঠামো পরিবর্তনের ফলে সে ছবিটা পালটে গেছে। আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেও রাজবংশী সমাজে একই গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীতে বিয়ে হত। কিন্তু বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও বর্ণ হিন্দুদের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় একই গ্রামে বিয়ের সম্বন্ধ বিরলপ্রায় হয়ে উঠেছে। রাজবংশী সমাজে বর্তমানে একরৈখিক বংশধারাই (unilinial descent) প্রচলিত, আর তা হল — পিতৃসূত্রীয় (patrilinial), মাতৃসূত্রীয় নয়। কোচ সমাজে অতীতে মাতৃসূত্রীয় বংশধারা অর্থাৎ মাতৃতান্ত্রিক রীতিনীতি থাকলেও বর্তমানে তাদের মধ্যে পিতৃসূত্রীয় ধারাই প্রচলিত।

রাজবংশী সমাজে একাধিক সামাজিক স্তর (social startification) নেই অর্থাৎ এই সমাজে কোনও সামাজিক অসাম্য (social inequality) নেই বলে বিয়ে বা সামাজিক কোনও ক্রিয়াকাণ্ডে জাতিগোষ্ঠীর মধ্যেই সম্পন্ন হয়। সবাই কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত। সেখানে গিরি (জমির মালিক) কিংবা আধিয়ার-প্রজার (যারা জমিতে ভাগচাষে যুক্ত) মধ্যে বৃত্তিগত কোনও প্রভেদ নেই। তবে সামাজিক মর্যাদা (status), সামাজিক আধিপত্য (social domination) কিংবা আর্থিক বিষয়গুলি গুরুত্ব পেত। বর্তমানে সে অবস্থারও পরিবর্তন ঘটেছে। কারণ ইতিমধ্যে পেশাগত ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। সম্পূর্ণ ভাবে ভূমিনির্ভর সমাজ আর নেই। শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। যুক্তি-চিন্তারও বিকাশ ঘটেছে। ফলে সামাজিক বিন্যাসের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। এর প্রভাব রাজবংশী সমাজের সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। ঘরবাড়ি, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে চিন্তা-চেতনায় তা লক্ষ করা যায়। ধর্মাচরণের ক্ষেত্রেও লৌকিক বৃত্তের সংকোচন

ঘটেছে। বিশেষ করে শহরাঞ্চলে, শিক্ষিত লোকের মধ্যে। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে ৯-১০ বছরের মধ্যে মেয়েদের বিয়ে হত। সে ধারার পরিবর্তন হয়েছে, বর্ণহিন্দুদের মতোই সময়-বয়স ধরে সম্পন্ন হয়। একাধিক বিয়ের অনুমতিও সমাজ আর অনুমোদন করে না। অতীতে এটা বহুল প্রচলিত ছিল, অবস্থাপন্ন পরিবার হামেশাই এটা করতেন। রাজবংশী সমাজে এখনও বিয়ে বা অন্য কোনও অনুষ্ঠানে 'অসমীয়া' ব্রাহ্মণের প্রতি ঝোঁক থাকলেও তথাকথিত ব্রাহ্মণদের দিয়ে কাজ করতে দ্বিধা করেন না। ওঝা, কবিরাজ, ভৌরিয়াদেরও সেই সামাজিক সম্মান নেই। সমাজে দেওয়ানীদেরও সে আধিপত্য নেই। জমিজমা কিংবা যে কোনও বিরোধের মীমাংসায় তাদের ডাক পড়ে না। রাষ্ট্রীয় আইন ও বিচার ব্যবস্থার অধীনে সামাজিক বিরোধের বিষয়গুলি নিষ্পত্তি হয়। সম্পত্তির ভাগীদার এখন মেয়েরাও। তারাও সমান অংশের অধিকারী। অতীতে ছবিটা অন্যরকম ছিল। পারিবারিক সংস্কারের ক্ষেত্রেও শিথিলতা লক্ষণীয়। রাজবংশী সমাজে স্ত্রী-মহিলারা বহুবিধ আচার সংস্কার মেনে চলেন। বিশেষ করে হিন্দুধর্মভুক্ত হওয়ার পর বহুবিধ আচার সংস্কারের অন্তর্ভুক্তি ঘটে। পরবর্তীকালে বর্ণহিন্দুদের প্রভাবে আচার সংস্কারের যেমন পরিবর্তন ঘটে তেমনি ক্ষত্রিয়করণ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতেও তথাকথিত রাজবংশী সমাজের আচার সংস্কারের আরো কিছু পরিবর্তন ঘটে। সেইসঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব তো ছিলই। বিশেষ করে বিবাহিত মহিলাদের ক্ষেত্রে শুচিতা বিষয়ক নিয়ম আচারগুলি উল্লেখযোগ্য। বলা যেতে পারে প্রত্যুষে বিছানা ছাড়া থেকে রাতে শুতে যাবার আগে অবধি বহুবিধ আচার সংস্কার পালনীয় কর্তব্য হিসাবে সমাজে প্রচলিত। ভোরবেলা বিছানা ছেড়ে উঠোন ঝাড়ু দিয়ে গোবর জল ছেটানো প্রাথমিক কর্তব্য হিসেবে বিবেচিত। জনশ্রুতি ঝাট না দেওয়া বাসি উঠোনে পা রাখলে আয়ুক্ষয় হয়। উঠোন ঝাড়ু দেওয়ার জন্য আলাদা ঝাড়ু নির্দিষ্ট থাকে। রাজবংশী ভাষায় যা 'বান্নি' হিসাবে পরিচিত। ঘরের ভিতরে ঝাড়ু দেওয়ার জন্য আলাদা ঝাড়ু নির্দিষ্ট থাকে। বাসি থালা বাসন ধোওয়ার পর স্নান করে রান্না ঘরে প্রবেশের নিয়ম। রাজবংশী মহিলারা গোয়ালঘরেও অনেকে স্নান না করে প্রবেশ করেন না। স্নান না করে রান্না করা তো দূরের কথা এক গ্লাস জলও গুরুজন কাউকে দেন না। অনেকে রান্নার কাপড় চোপড় আলাদা রাখেন। এই কাপড় পড়ে বিছানায় বসা শোয়া কিংবা অন্য বাড়ি যাওয়ার নিয়ম নেই। গোবর দিয়ে লেপা মোছার বিষয়টি রাজবংশী মহিলারা যত্নের সঙ্গে মানেন। খাবার জায়গাটি মোছা নিয়ামাচারের

অবশ্য কর্তব্য। গোয়াল ঘর রাজবংশী সমাজের কাছে পবিত্র, ডাং ধরি দেবীর অবস্থান। শুচিতা বিষয়টি রাজবংশী মহিলাদের মধ্যে একটু বেশি, বাথরুমে গেলেও হাত-পা ধুয়ে ঘরে আসার নিয়ম। ঋতুস্রাবের সময় বেশ কিছু নিয়ামাচার মেনে চলে রাজবংশী মহিলারা। তিন-চারদিন রান্না করা, পূজার ঘর, গোয়াল ঘরে না ঢোকা, এমনকী জলের কল কিংবা কুয়ো ছোঁয়ায়ও নিষেধ। গবাদি পশুকেও ছোঁয়া নিষেধ। হাল্কা বিছানায় মাটিতে শোয়ার রীতিও অনেকে মানেন। যদিও আজকের সময়ে অনেক কিছুই শিথিল, গ্রামগঞ্জে একটু আধটু নিয়মাচার প্রচলিত শহরে দেখাই যায় না।

রাজবংশী মহিলারা সমস্ত তিথি নক্ষত্র পাল পরবে কিছু না কিছু নিয়ামাচার মেনে চলে। অন্নপ্রাশন, বিয়ে এমনকী মৃত্যু অশৌচের ক্ষেত্রে আচরণীয় কৃত্যাদি পালন করে। কিছু পূজা আচার মহিলারাই সম্পন্ন করে। বুড়াবুড়ি পূজা, কড়াকড়ি পূজা, কাতি পূজা, হুদোম পূজা, সুবচনী পূজা, লক্ষ্মীপূজা, বিষহরি ইত্যাদি পূজা ব্রতগুলিতে মহিলারাই নিয়ামাচারে পালন করে সংসারের কুশল কামনায়।

রাজবংশী সমাজে বার নক্ষত্রের গুরুত্ব সৌরতত্ত্বকে স্মরণ করায়। সূর্যের অবস্থান দেখে যেমন সময় নির্ধারণ করে তেমনি মঙ্গলবার, শনিবার খরা বার হিসাবে বিবেচিত। একাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা তিথিতে পোড়া খাওয়া, মাথায় সাবান দেওয়া, বাচ্চাদের চুল নখ না কাটা বিধি পালন করে। মাথায় সাবান দেওয়ার ক্ষেত্রেও নিষেধ পালন করে। রবিবার, বৃহস্পতিবার বাঁশও কাটে না। রাতে হলুদ না দেওয়া, সূচনা দেওয়ার নিয়ম পালন করে। রাতে সাপকে যেমন লতা হিসাবে, তেমনি হলুদকে রং আর চুনকে দই বলে চিহ্নিত করার রীতি প্রচলিত। অতীতে রাজবংশী মহিলারা কোথাও যাওয়ার সময় কাটারী নিয়ে যেত। বিশ্বাস লোহার এই কাটারী সঙ্গে থাকলে ভূত-দ্যাও-এর নজর থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। রাস্তায় যাওয়ার পথে নদী কিংবা ঠাকুরের পাট থাকলে গুয়া পান দেওয়ার রীতিও প্রচলিত ছিল। গরু নিয়ে একাধিক সংস্কার রাজবংশী সমাজে প্রচলিত ছিল। গাভী দিয়ে হাল না মারা, বিয়ের গাড়িও গরু নয় মোষের গাড়ি হত। গলায় দড়ি বাঁধা অবস্থায় গরু মারা গেলে গৃহকর্তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। গলায় দড়ি পেচিয়ে ভিক্ষা করে পুরোহিত ডেকে প্রায়শ্চিত্ত করার নিয়ম রাজবংশী সমাজে আজও প্রচলিত। প্রায়শ্চিত্ত না করলে সমাজ চ্যুত করত গ্রাম সমাজ।

অতীতে রাজবংশী মহিলারা স্বামীর নাম উচ্চারণ করতেন না। সন্তান-সন্ততিকে ঔষধপত্র মহিলারা খাওয়ানোর রীতি প্রচলিত ছিল। রাজবংশী সমাজে পাঁচ-ছয় দশক আগে রীতি ছিল মামা ভাগিনেয় বউমার সঙ্গে কথা বলবে না, তার হাত থেকে সরাসরি কোন বস্তু নিতে পারবে না। ভাই বউ-র সঙ্গে ভাসুরের সম্পর্কও ছিল কঠোর। কথা বলা তো দূরের কথা ছায়াও মারাবে না। অসুখ বিসুখ হলেও তার ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না। হঠাৎ কোন ভাবে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেলে ভাসুরকে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সারাদিন উপোস করে রাতে আকাশের কয়েকটি তারা গুণে অন্ন গ্রহণ করতে হত। ভাই বউকে সবসময় সতর্ক থাকতে হত। তবে বর্তমানে বিধিনিষেধ অনেকটাই শিথিল হয়েছে। মামা শ্বশুর ও ভাসুর নিয়ে একটি সুন্দর প্রবাদ প্রচলিত ছিল —

আটো জাগা ঘন ভাসুর
তাতে আসিল মামা শ্বশুর।

অর্থাৎ বাড়িতে একাধিক ভাসুর বর্তমান থাকলে ভাই বউকে যথেষ্টই সংকুচিত থাকতে হয়, তারপরে যদি মামা শ্বশুরের আগমন ঘটে এবং ঘরের সংখ্যা কম থাকলে বউয়ের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ত।

মহিলাদের চলাফেরায় কিছু রীতি আচার ছিল। চলাফেরা দেখেই মেয়ের গুণাগুণ বিচার হত। লোকপ্রবাদ প্রচলিত ছিল 'মাও গুণে ছাও, কুলা গুণে বাও'। চলা-বলা, ছোঁয়াছুঁয়ি, কাজকর্ম বিষয়ে বেশ কিছু বিধিনিষেধ আরোপিত ছিল। ভাসুর, মামা শ্বশুর কিংবা মান্য ব্যক্তির সামনে মাথায় কাপড় অর্থাৎ ঘোমটা দেবার রীতি প্রচলিত ছিল। এমনিতে রাজবংশী সমাজে পর্দা নসীন বিষয়টি নেই। ভরদুপুর, সকাল, সন্ধ্যা, অমাবস্যা, সংক্রান্তি কিংবা শনিবার, মঙ্গলবার রাস্তাঘাটে বেরোনোর বিষয়ে এয়োতি স্ত্রীর কিছু লোকাচার ছিল।

রাজবংশী সমাজে 'ছুয়া ঘর' (প্রসূতি ঘর) তৈরির বিশেষ প্রচলন নেই। সাধারণত শোবার ঘরটিকে ধুয়ে মুছে প্রসূতির ঘর হিসাবে ব্যবহারের রীতি ছিল। ভাবী মাকে বেশ কিছু কঠোর নিয়ম রীতি পালন করতে হত। সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণের সময় ভাবী মা কিছু খাবে না। গ্রহণের সময় ভাবী মাকে শুয়ে থাকতে হবে। পানের পিক পেরোনো, ঘর মোছার ন্যাতা ডিঙোবে না, চাল ধোয়া কিংবা কাপড় নিংড়ানো জল ডিঙোবে না। সন্ধ্যায় দরজায় বসবে না। খোলা চুলে থাকবে না। দ্যাও ঠাকুরের কুনজর থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য আরো কিছু বিধিনিষেধ পালন করতে হত।

এসব সত্ত্বেও বলা যায়, রাজবংশী সমাজ জীবন নিয়ে পর্যালোচনা করতে হলে রাজবংশীদের উদ্ভব বিকাশ, অতীত আচরণ, ধর্মবোধ, আচার-আচরণ, সংস্কার-সংস্কৃতি, কৃষি শিল্প, জীবনযাপন, বিভিন্ন অনুষ্ঠান, লৌকিক বৃত্ত ইত্যাদি বিষয় লক্ষ্য করতে হবে। এখনও কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিজস্ব গোষ্ঠীভাবনা, মৌলিকত্ব, মনন-চিন্তনের ভাব ব্যঞ্জনা, জীবন চর্যা ইত্যাদি ক্ষেত্রে রাজবংশী সমাজের বিশেষত্ব ধরা পড়ে। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের কৃষ্টি-সংস্কৃতি অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে ড. চারুচন্দ্র সান্যালের অভিমত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি 'The Rajbanshis of North Bengal' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন :

> The study of folk life and culture of these people has become important when attitudes are changing has due to impact of western civilization and more so after partition of bengal when a large immigration of people from lower North and East Bengal is taking place in this area and within a very short time a profound culture mixing is sure to take place and some of the age long customs may disappear altogether.[২৪]

রাজবংশী সমাজ বিবর্তমান। ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তা সংঘটিত হয়েছে। আর্থসামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন হয়েছে, ভৌগোলিক পরিবেশ পরিবর্তিত হয়েছে, শিক্ষার প্রসার ঘটেছে, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে, সর্বোপরি মনন দর্শনেরও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। রাজবংশী সমাজের ধর্মকর্মাদি থেকে লোকায়ত পরিসর আচার সংস্কার, খাবার দাবার, পোষাক আশাক, রুচি ভাবনা সর্বোপরি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলটিও পরিবর্তমান। সময় যাপন থেকে বিনোদন সবেতেই পরিবর্তনের ছোঁয়া, আধুনিকতার পরশ। তাই রাজবংশী সমাজের এই সাংস্কৃতিক বিবর্তন বিষয়টি বক্ষমান প্রকল্পের বিষয়। কারণ যে কোন জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পরিসরের মধ্যেই সেই গোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য লুকিয়ে থাকে। কারণ যে কোন

জনগোষ্ঠীর সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে হলে যেমন উদ্ভব, বিকাশ, অতীত, আচার, ধর্মবোধ, সংস্কার, সংস্কৃতির বিষয় জানতে হয় তেমনি তুলনামূলক আলোচনার নিরিখে বর্তমান সময়ের ধর্মচেতনা, দেবদেবীর প্রকারভেদ ও তাদের প্রকৃতি, পূজা উৎসব, ব্যবহৃত উপকরণ, লোকায়ত বৃত্ত, সঙ্গীত বিনোদন যাবতীয় বিষয়গুলি মূল বিবেচ্য। প্রসঙ্গত 'রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তন' প্রকল্পে উক্ত বিষয়গুলিই মুখ্যত সমীক্ষণ ও বিশ্লেষণে উঠে এসেছে।

রাজবংশী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের সামাজিক প্রতিষ্ঠান ক্ষত্রিয় সমিতি। প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে। স্বাধীনতা লাভের পূর্বেই বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় কোচ ও রাজবংশী যে পৃথক জাতি এবং রাজবংশী যে ক্ষত্রিয় শ্রেণিভুক্ত এই আন্দোলন ক্ষত্রিয় সমিতির মাধ্যমে সংঘটিত হয়।[২৫] দীর্ঘ আন্দোলনের প্রেক্ষিতে তৎকালীন জনগণনা আধিকারিক ও 'ম্যালে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের প্রতিবেদনে রাজবংশী ও কোচকে পৃথক পৃথক জাতি হিসাবে স্বীকার করেন। কিন্তু ক্ষত্রিয় হিসাবে স্বীকৃতি পেতে অপেক্ষা করতে হয় আরো দীর্ঘ কয়েক বছর। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারিতে কোচ ও রাজবংশীদের শুধু পৃথকই নয় রাজবংশীদের ক্ষত্রিয় হিসাবে স্বীকৃতি দেন। ক্ষত্রিয় সমিতির দীর্ঘ আন্দোলনের প্রেক্ষিতে এই স্বীকৃতি আদায় সম্ভব হয়। আন্দোলনে উঠে আসেন রাজবংশী সমাজের নবজাগরণের প্রতীক রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মা। পঞ্চানন বর্মার নেতৃত্বে 'ক্ষত্রিয়করণ' আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাজবংশী জনগোষ্ঠী স্বতন্ত্রতার সঙ্গে 'রাজবংশী ক্ষত্রিয়' হিসাবে পরিচিতি পায়। তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে রংপুর ধর্মসভা সহ বিভিন্ন শ্রেণির পণ্ডিত মহলের ব্যবস্থাপত্রে রাজবংশীদের ক্ষত্রিয় স্বীকৃতি আদায় করেন। যদিও কিছু ব্যক্তি এর বিরোধিতা করেন। পরবর্তীকালে তিনি রাজবংশী জনগোষ্ঠীকে তপশিলী তালিকাভুক্ত করতেও সক্ষম হন।

কোচ রাজবংশকে ঘিরেই বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠী সংগঠিত হয় এবং সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত দিক থেকে একটি স্বতন্ত্র ধারাও বহন করে কয়েকশ' বছর ধরে। কিন্তু লক্ষণীয় এই সাংস্কৃতিক ধারার বিবর্তন বিগত কয়েক দশক ধরে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিশেষ করে ধর্মবিশ্বাস, সংস্কারের লোকায়ত ভুবনটি ক্রমশ বিবর্তমান। প্রাচীন বেশ কিছু লোকাচার, সংস্কারের আনুষ্ঠানিক ধারা আজকে ক্রমশ লুপ্তপ্রায়। বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন দৃশ্যমান। অবসর, বিনোদনের পরিসরটি সংকুচিত হয়েছে। লোকশিক্ষা ও বিনোদনের ক্ষেত্রগুলিও হারাতে বসেছে। লোকসাহিত্যের নানাবিধ উপাদান কিচ্চা (গল্প), প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া, গীত প্রায় লোকান্তরিত।

আধুনিক বৈদ্যুতিন মাধ্যমে গ্রামীণ পরিসরের ভুবনটি বিচ্ছিন্ন হতে বসেছে। ঐতিহ্য, পরম্পরার প্রতিও আস্থা কমেছে। মন্ত্রবিশ্বাস উধাও। সংস্কারাদির ক্ষেত্রেও শিথিলতা দৃশ্যমান। পূজা-পার্বণ বিবাহ, জন্ম কিংবা মৃত্যুজনিত অশৌচ পারলৌকিক ক্রিয়াদির আচার সংস্কারও অনেকক্ষেত্রে শিথিল হয়েছে। অনেক দেবদেবীর পূজা অর্চনাও লোকান্তরিত। যেমন ধরমঠাকুর, কাতি পূজার গান, হুদোম দ্যাওর গান ইত্যাদি। পূজাকেন্দ্রিক গীতগুলির অধিকাংশই হারিয়ে গেছে। আনুষ্ঠানিক গীতি সংগীতও বিশেষ শোনা যায় না। যেমন বিয়ের গীত। প্রকরণ পদ্ধতিও পরিবর্তিত। বহু দেবদেবীর সংযুক্তি ঘটেছে। যেমন - সরস্বতী পূজা, লক্ষ্মী পূজা, শারদীয়া দুর্গা পূজা। কিছু মৌলিক অনুষ্ঠান, যাত্রা পূজা, নয়া খৈ আমাতি, বিষুয়ার মত অনুষ্ঠানগুলি আজকে বেশিরভাগ পরিবার থেকে হারিয়ে গেছে। প্রথাগত জ্ঞানের (Indigenious knowledge) পরিসরটিও ছোট হয়েছে। পারস্পরিক আত্মীয়তার রীতি রেওয়াজও প্রায় লুপ্তপ্রায়। সখা-সখি, ভাদাভাদি, বিয়েতে মিস্তর ধরা, পানিছিটা বাপ-মার প্রথাও এখন প্রায় অবলুপ্তির পথে। গ্রামগঞ্জে এখনও কোথাও কোথাও প্রচলিত থাকলেও শহরাঞ্চল এলাকায় অবলুপ্ত। প্রকৃতি কেন্দ্রিকতা, প্রাকৃত ভাবনার সংকোচন ঘটেছে। সর্বোপরি ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রেও শিথিলতা এসেছে। অনেকে অনুকূল ঠাকুর, বালক ব্রহ্মচারী থেকে বৈষ্ণব ভাবনায় নিজস্ব লোকায়ত ভুবনটি বদলে নিচ্ছেন। বলা যায় রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন বিগত কয়েক দশকে দ্রুত ঘটেছে। আর্থসামাজিক কাঠামো বদলে যাওয়ায় আগের গ্রাম সমাজটি আর নেই। গ্রামের জনবিন্যাসে সংবদ্ধতা আগের মত অটুট নয়, বিভিন্ন কারণে বিচ্ছিন্ন। রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের ফলেও গ্রামের সরল সমীকরণে সমস্যা হয়েছে। গ্রাম সমাজ বিভাজিত হয়েছে। শিক্ষা, যোগাযোগ গ্রামগুলিকে স্বতন্ত্র করেছে নিজস্ব সাংস্কৃতিক ভুবনের ঐক্যবলয় থেকে। জীবনজীবিকা, পেশা-বৃত্তি বদলে যাওয়ার কারণেও সাংস্কৃতিক বলয় পরিবর্তিত হয়েছে। ধর্মভাবনারও সম্প্রসারণ ঘটেছে। বৃহত্তর হিন্দুধর্মের অংশ হয়ে অনেক কিছুর সংশ্লেষণ ও আত্তীকরণ ঘটেছে। আবার বিশ্বায়নের ঢেউ মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাবে রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতি দোলায়মান। বিগত কয়েক দশকে বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বলয় অনেকক্ষেত্রে বদলে গেছে। সত্তরের দশক থেকে এটা প্রকটভাবে ঘটেছে। এই বিবর্তমান সাংস্কৃতিক বলয়টিকে সমীক্ষণ ও বিশ্লেষণের নিরিখে তুলে ধরার প্রয়াসই এই গবেষণা প্রকল্প ‘‘উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তন : সমীক্ষণ ও বিশ্লেষণ’’। আবার

উত্তরবঙ্গকে গবেষণার ক্ষেত্র পরিসীমা নির্বাচনের কারণ এই ভূখণ্ডে সমগ্র রাজবংশী সমাজের বৃহত্তর অংশ যেমন বসবাস করে তেমনি প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গের (কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং) পরিবর্তন যেমন উল্লেখযোগ্য তেমনি গাঙ্গেয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি মালদহ এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পরিবর্তনে সরাসরি প্রভাব ফেলে। আবার কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার প্রভাব সমতল এলাকার রাজবংশী সমাজের উপর পড়ে। পার্শ্ববর্তী নিম্ন আসামের রাজবংশী সমাজও প্রভাবিত হয়। স্বাভাবিকভাবে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষিত আলোচনা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সর্বোপরি রাজবংশী নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ছবির অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। তাছাড়া কোচ-রাজবংশকে ঘিরেই রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি পাঁচশ' বছর ধরে যেমন সংগঠিত হয়েছে তেমনি বিভিন্নভাবে আবর্তিত হয়েছে। দেশভাগের আগে ও পরে বিস্তীর্ণ উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজ রাষ্ট্রনৈতিক ও প্রশাসনিক কারণেও বহুপ্রকারে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। ফলে সংস্কৃতিগত দিক থেকে বিবর্তনের শিকার হয়েছে। এই প্রকল্পের মুখ্য বিষয় এই সাংস্কৃতিক বিবর্তনের একটি ভাষ্য রচনা। যা নৃতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক এবং অবশ্যই সমাজ প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে ভবিষ্যতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমীক্ষণ ও বিশ্লেষণে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে, সময়কেই তাই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আশা বহুবিধ ত্রুটি বিচ্যুতির মধ্যেও রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের একটি ছবি এই গবেষণা প্রকল্পের মাধ্যমে সূচিত হয়েছে ভবিষ্যৎ সময়ের জন্য।

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের অন্যতম দেবতা শিব।[২৬] তবে অতীতে রাজবংশী সমাজে শিব বিভিন্ন লৌকিক রূপেই পূজিত হত। কোন মূর্তির প্রচলন ছিল না। মাটির ঢিপি কিংবা পাথরই শিবের প্রতীক হিসাবে গণ্য হত। পূজা পদ্ধতিও ভিন্ন ভিন্ন ছিল। ব্রাহ্মণ পুরোহিতের অন্তর্ভূক্তি ঘটেছে অনেক পরে। গাজা, ভাং, আটিয়া কলা (বীজ যুক্ত কলা), দই, চিড়েই ছিল মূল উপকরণ। জল বা দুধ ঢালার রীতি পদ্ধতি অনেক পরে প্রচলিত হয়। মূর্তির মধ্যেও শিব প্রথম দিকে পদ্মাসনে উপবিষ্ট ছিল না, এক হাঁটু মুড়ে বসার ভঙ্গিটি (রাজবংশী মানুষ যেভাবে মাটিতে খেতে বসে) প্রচলিত ছিল। আসলে শিবের লৌকিক রূপই ছিল মুখ্য। মহাকাল, সন্ন্যাসী, ধূমবাবা, যখাঠাকুর, মাশান, বুড়াঠাকুর[২৭] ছাড়াও আরো কিছু লৌকিক রূপে পূজিত হয়। গ্রাম ঠাকুরও শিব। গোষ্ঠী জীবনের প্রতীক। শিব পূজায় বলিও প্রচলিত ছিল। এখনও কিছু কিছু

মন্দিরে এই রীতি (যেমন বাণেশ্বর) প্রচলিত। ভুটান সংলগ্ন এলাকায় শূকর বলিও দেওয়া হত। কুমারগ্রামের মধ্য হলদিবাড়ীতে এই রীতি আজও প্রচলিত। তবে রাজবংশীরা এখন আর শূকর বলি দেয় না। বর্ণহিন্দুদের প্রভাবে শিবপূজার রীতি পদ্ধতি অনেকটাই পরিবর্তিত হয়েছে। তবে লৌকিক রূপে শিবের পূজায় এখনও প্রাচীন রীতি পদ্ধতি অনুসরণের চেষ্টা করে রাজবংশী সমাজ। অবশ্য লৌকিক রূপের পূজার ক্ষেত্রও এখন সংকুচিত। গ্রাম ঠাকুরের পূজাই এখন অনেক গ্রামে হয় না। অন্যান্য দেবদেবীরও প্রভাব কমেছে, এটা নির্দ্বিধায় বলা যায়। এখন রাজবংশী সমাজেও শিবের মাহাত্ম্য ভিন্নরূপ, বলা যায় বর্ণহিন্দুদের দ্বারাই প্রভাবিত।

শুধু শিব নয় অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীর প্রভাব রাজবংশী সমাজে কমেছে। কালী, বিষহরির প্রভাব থাকলেও অন্যান্য লৌকিক দেবদেবী সম্পর্কে আজকের প্রজন্ম অনেকটাই উদাসীন। ফলে বাৎসরিক কোন অনুষ্ঠানে সব দেবতাকে নৈবেদ্য নিবেদন করা হলেও অনেকে দেবদেবীর নামই জানেন না। অতীতে গ্রাম ঠাকুরের পাটে যে সব দেবদেবীর অবস্থান ছিল সে সংখ্যাটাও কমেছে। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার কিংবা জলপাইগুড়ি জেলায় গ্রাম ঠাকুরের পাট-ই উধাও হয়েছে। তবে শিলিগুড়ি, খড়িবাড়ি, তরাই অঞ্চলে কিংবা দিনাজপুরের দুই জেলায় কোথাও কোথাও দেখা যায়। তবে সে গৌরব নেই। দৈন্যদশা দেখে বোঝা যায় পরিবর্তনের স্রোত আছড়ে পড়েছে। শুধু আর্থ-সামাজিক কাঠামো নয় মনন, মানসিকতা বিশ্বাসেরও পরিবর্তন ঘটেছে। আরেকটি বিষয় সে সব অঞ্চলে নাগরিক সভ্যতার বিস্তার যত ঘটেছে সে সব অঞ্চল থেকে লৌকিক দেবদেবীগুলির প্রভাব কমেছে। অনেক বাড়িতেই ঠাকুরের পাট আর সেভাবে দেখা যায় না। তুলসী তলার পাশে অন্য দু-একটি দেবদেবীর অবস্থানের মধ্যেই সীমিত। আগের মত অধিকারী পুরোহিত দিয়ে বিভিন্ন পাল-পরবে নৈবেদ্য দেওয়ার রীতিও নেই। একমাত্র শুভ অশুভ কোন কারণে অধিকারী পুরোহিতের ডাক পড়ে। বলতে দ্বিধা নেই বর্ণহিন্দুদের প্রভাব এখন ঘরে বাইরে।

স্বাধীনতার পরবর্তীকাল থেকে রাজবংশী সমাজে সংস্কৃতির বিবর্তন শুরু হয়। সাত-আটের দশকে সেটা তরান্বিত হয়। সে ধারা আজও বহমান। বরং বিভিন্ন আঙ্গিকে তা তরান্বিত হয়েছে। আদপে ধাপে ধাপে রাজবংশী সমাজ সংগঠনের পরিবর্তন ঘটে। তার প্রভাব পড়ে সরাসরি সমাজ সংস্কৃতির উপর। ব্রিটিশ কলোনিয়াল সময় পর্বে রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতি যথেষ্টই সংগঠিত

ছিল। স্বাধীনতার সময় পর্বে রাজবংশী সমাজ ভাঙ্গনের সম্মুখীন হয়। দেশভাগের ফলে রাজবংশী জনগোষ্ঠী ছিন্ন ভিন্ন হয়। সমাজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয় প্রাদেশিক বিভিন্ন কারণে। ইতিমধ্যে ক্ষত্রিয় সমিতির কর্মব্যাপ্তিও সংকুচিত হয়। অভিবাসনের চাপ বাড়তে থাকে। ছয়ের দশকে জমিদার জোতদারদের অবসান ঘটে। সাতের দশকে ভূমি সংস্কার আন্দোলনে অধিকাংশ রাজবংশী পরিবার প্রান্তিক চাষিতে পরিণত হয়। অনেকে সর্বস্বান্ত হয়। আটের দশকে আবার এক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। ক্ষোভ বিক্ষোভ আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। যাটের দশকের উত্তরাখণ্ড আন্দোলন, সাতের দশকের 'উতজাআস' আন্দোলনকে ছাপিয়ে শুরু হয় কামতাপুরী আন্দোলন। নয়ের দশকে বিশ্বায়নের ঢেউও আছড়ে পড়ে। পাশাপাশি সময়ে প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গ জুড়ে শুরু হয় গ্রেটার কোচবিহার আন্দোলন। ভাষা সংস্কৃতির সঙ্গে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিভিন্ন দাবী দাওয়ার বিষয়গুলি উঠে আসে। বলতে দ্বিধা নেই এইসব আন্দোলন পর্বে ভাষা, সমাজ সংস্কৃতির বিষয়টি সম্পর্কে রাজবংশী জনগোষ্ঠী সচেতন হয়ে ওঠে। কিন্তু ততদিনে রাজবংশী সমাজ অনেকটাই বাঙালীয়ানায় সংশ্লেষিত (assimilation) হয়ে যায়। আর্থসামাজিক কাঠামো ভেঙে পরিবর্তিত হয়। ছোট হলেও একটা মধ্যবিত্ত সমাজ (চাকুরিজীবী, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে) তৈরি হয়। কিছু মানুষ জীবনজীবিকার তাড়নায় ভূমি থেকে বিচ্যুত হয়ে ভিন রাজ্যে কিংবা অন্যত্র পাড়ি দিতে বাধ্য হয়। আর অধিকাংশ রাজবংশী মানুষ প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির কিছুমাত্র বহন করে বর্ণহিন্দুদের আদব কায়দা, পোশাক পরিচ্ছদ, চাল চলন, সংস্কৃতি এমনকী মননভাবনায় গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে রাজবংশী সমাজ ভাবনাও পাল্টে যায়। আধুনিক কলা কৌশল, প্রযুক্তিকে গ্রহণ করে, শিক্ষার ব্যাপারেও আগ্রহী হয়ে ওঠে। অর্থনৈতিক দিক থেকে অগ্রসরের চেষ্টায় অবকাশ বিনোদনের মানসিকতারও পরিবর্তন হয়। নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতিও খানিকটা উদাসীনতা কার্যকরী হয়। সব মিলিয়ে পরিবর্তনের স্রোত বেগবান হয়। রাজবংশী মানুষ সম্পর্কে এমন আর বলা যায় না যে "খাওয়া আর গান পাইলে রাজবংশী মানুষ আর কিছু চায় না।" রাজবংশী সমাজ এখন এক প্রতিযোগিতার মধ্যেই আবর্তিত। স্বাভাবিকভাবে সামগ্রিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তারই প্রতিফলন ঘটছে। এতদসত্ত্বেও বলতে হয় রাজবংশী জনগোষ্ঠী কিন্তু এখনও প্রাচীন কৃষ্টি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অনুসারী। অনেক বাধা বিপত্তি সমস্যার মধ্যেও নিজস্বতা ধরে রাখার চেষ্টায় ব্যাপৃত। এখনও তাই গ্রামগঞ্জ কিংবা পরিবারে প্রাচীন কৃষ্টি সংস্কৃতি, আচার সংস্কার,

লৌকিক দেবদেবী, থান পূজা পরব কিংবা সাংস্কৃতিক পরিসরের খোঁজ মেলে। এটাই তো নৃ-গোষ্ঠীর পরিচয় কিংবা নৃতাত্ত্বিক প্রেক্ষিত যা একটি জাতি বা গোষ্ঠীকে স্বাতন্ত্র্যতা দেয়। রাজবংশী সমাজ সেটা এখনো নৃতাত্ত্বিক ভাবেই ধরে রেখেছে।

চারুচন্দ্র সান্যালের 'দি রাজবংশীজ অব নর্থবেঙ্গল' এবং গিরিজাশংকর রায়ের 'উত্তরবঙ্গে রাজবংশী জাতির পূজা-পার্বণ' গ্রন্থ দুটি রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির আকর গ্রন্থ। রাজবংশী জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে পূজা-পার্বণ, জীবনাচার, ধর্মকর্ম বিস্তৃত বিষয় সম্পর্কে আমরা এই গ্রন্থ দুটি থেকে জানতে পারি। কিন্তু সময়কালের প্রেক্ষিতে যেমন সমাজ কাঠামো বদলায় তেমনি সমাজ সংস্কৃতির যাবতীয় উপাদানগুলিও পরিবর্তিত হয়। ড. সান্যাল তার গ্রন্থে এই বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে জীবনাচার ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের বিষয়টিকে তিনি গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। সেই সূত্র ধরে এই প্রকল্পের অবতারণা। উত্তরবঙ্গের বিস্তৃত রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পরিবর্তন বিভিন্নভাবে সংগঠিত হয়েছে সেটাই প্রকল্পের মূল প্রতিপাদ্য। তথ্যানুসন্ধান পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে কারণ ও সম্ভাবনা নিয়ে বিষয়ের পরিসর বিস্তৃত হয়েছে। ক্ষেত্র হিসাবে উত্তরবঙ্গ নির্বাচনের কারণ এই সাতটি জেলার জনবিন্যাস এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের বিষয়গুলি বিভিন্নভাবে স্পষ্ট হয়। আবার কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি কিংবা দার্জিলিং-এর সমতল ক্ষেত্রের মধ্যে সমতা দেখা যায় কিন্তু মালদহ এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের ক্ষেত্রে গাঙ্গেয় প্রভাব লক্ষণীয় ভাবে বেশি। স্বাভাবিকভাবে এই বিস্তৃত উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের পরিবর্তনের ধরন প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়।

যে কোন গবেষণা প্রকল্পের নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও অভিমুখ থাকে। সেই নিরিখে গবেষণা প্রকল্পের ক্ষেত্র ও পরিধি নির্দিষ্ট হয়। আবার প্রকল্প রূপায়ণে নির্দিষ্ট কিছু রীতি পদ্ধতি এবং উপাদানকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। সেইসঙ্গে বিভিন্ন কৌশল ও অনুধাবনের বিষয়গুলিও নির্ধারিত হয়। তবে এই গবেষণা প্রকল্পে মূলত পর্যবেক্ষণ ও অংশগ্রহণমূলক (observation and participatory observation) পর্যবেক্ষণ বিষয়গুলি গুরুত্ব পেয়েছে। সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস (social classification) জাতি পরিচয়, নির্মাণ, ভাষা, সমাজ ও সংস্কৃতির নানা বস্তুগত ও অবস্থাগত বিষয়গুলি সংগ্রহের জন্য পর্যবেক্ষণ ও অংশগ্রহণমূলক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ফলপ্রসু ভূমিকা

রাখে। সেই অনুসারে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রানুসন্ধানের মাধ্যমে জীবন ধারণ পদ্ধতি, সামাজিক রীতিনীতি, আচার-সংস্কার, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় উৎসবাদি সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকারে ও আলোচনার ভিত্তিতেও বহুবিধ তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে। কিছুক্ষেত্রে চেকলিস্টও অনুসরণ করা হয়েছে।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে রাজবংশীদের সমাজ ও সংস্কৃতির গ্রহণ বর্জন ঘটতে থাকে। রাজবংশীদের সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালি সমাজ সংস্কৃতির সংশ্লেষণ (assimilation), আত্তীকরণ (acculturation) এবং অনেক ক্ষেত্রেও অনুকরণের (Imitation) বিষয়টি গুরুত্ব পায়। মেলামেশা, শিক্ষা-দীক্ষা, আদান প্রদান এবং একই ভাষায় কথা বলা ও একসাথে বসবাসের ফলে চিন্তা, বিবেক, মনন, সংস্কৃতির আদান প্রদান ঘটবে এটাই স্বাভাবিক। সহজে পার্থক্য নিরূপণ করাও সর্বক্ষেত্রে সম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও বলা যায় বাঙালি সমাজের সঙ্গে রাজবংশী সমাজ মিলেমিশে থাকলেও প্রাচীন ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এখনও অনুসরণ করে। মনন চিন্তনেও নিজস্ব ঐতিহ্য কৃষ্টিকে অস্বীকার করে না। অনেক কিছু বর্ণহিন্দু বা বাঙালি সংস্কৃতির প্রভাবে বিবর্তিত হলেও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন ব্যাপক এমনকী লোকান্তরিত হলেও একটা অংশ কিন্তু যথেষ্টই সচেতন এবং তারা নিজস্ব কৃষ্টি সংস্কৃতি ধরে রাখার বিষয়ে সংরক্ষণশীল ও উদ্যোগী। সরকারি, বেসরকারি উদ্যোগেও কিছু কিছু প্রয়াস বিভিন্ন ভাবে দেখা যায়। সেটা ভাষা আকাদেমি থেকে রাজ্যস্তরের ভাওয়াইয়া উৎসব তারই সাক্ষ্য দেয়। আবার বেসরকারি উদ্যোগেও সাংস্কৃতিক ধারাটি অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা প্রকাশ ভাষা সাহিত্যের চর্চা সংস্কৃতি চর্চারই একটি বলিষ্ঠ অংশ। এটাও রাজবংশী সমাজে বিগত কয়েক দশকে উল্লেখযোগ্যভাবে দেখা যাচ্ছে। সাংস্কৃতিক বিবর্তনকে মাথায় রেখে এই প্রয়াস ও চেষ্টা অবশ্যই উল্লেখ্য এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বিভিন্ন অধ্যায়ে এই বিবর্তনের বিষয়টিকে তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে যেমন রাজবংশী সমাজের নৃগোষ্ঠীগত ও ঐতিহাসিক পরিচয় বিষয়ে তুলে ধরা হয়েছে তেমনি দ্বিতীয় অধ্যায়ে কোচ রাজবংশের প্রেক্ষাপটে রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। রাজবংশী সমাজের হিন্দুত্বকরণ, মহারাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা, শংকরদেবের আগমন ও প্রভাব সেই সঙ্গে চৈতন্যীয় প্রভাবের বিষয়টিও আলোচনায় সংবলিত হয়েছে। মূলত ধর্ম পরিসরে

রাজবংশীদের লোকায়ত ভুবন ও ধর্মীয় সংস্কৃতির বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সময়ে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা থেকে রাজবংশী সমাজজীবন, সমাজ কাঠামো, বিশ্বাস ভাবনা ও আন্তঃগোষ্ঠী সম্পর্কের আলোচনা বিস্তারিত হয়েছে। ক্ষত্রিয় আন্দোলনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয় এই সময়কালে। চতুর্থ অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ বলা যেতে পারে এই সময়কাল থেকে রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির পরিবর্তন শুরু হয়। স্বাধীনতা, দেশভাগ এবং ধারাবাহিক অভিবাসনের ফলে জনবিন্যাসের সঙ্গে সমাজ কাঠামোর ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। জোতদার শ্রেণির অবসান, আধিয়ারদের সংকট, জীবন জীবিকায় প্রতিযোগিতা, কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার, যোগাযোগ, শিক্ষার প্রসার নানাবিধ কারণে গ্রাম সমাজ তথা রাজবংশী সমাজের পরিবর্তন ঘটে। বিশ্বায়নের প্রভাব, তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণ অতিরিক্ত কিছু সমস্যার সৃষ্টি করে। সেই সঙ্গে ক্ষোভ, দাবি-দাওয়া, আন্দোলন ইত্যাদিরও উদ্ভব হয়। সব মিলিয়ে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তন বিভিন্নভাবে পরিলক্ষিত হয়। বর্ণহিন্দুদের প্রভাব প্রতিপত্তি, রাজবংশীদের মধ্যে একটা শ্রেণির উদাসীনতা ও মধ্যবিত্ত সমাজের সৃষ্টি এই পরিবর্তনকে তরান্বিত করে। আবার একটা শ্রেণির মধ্যে সমাজ সংস্কৃতি রক্ষায় উদ্যোগী হওয়া এটাও স্বাধীনোত্তর সময়কালে দেখা যায়। স্বাভাবিকভাবে এই সময়কালটি রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ।

পঞ্চম অধ্যায়ে সাহিত্যে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির বিষয়গুলি বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে অনুধাবন করা হয়েছে। রাজবংশী সমাজের বিস্তৃত লোকসাহিত্যের ভাণ্ডার, কোচ-মহারাজাদের সাহিত্যপ্রীতি এবং অনুবাদ সাহিত্যচর্চায় পৃষ্ঠপোষকতা, বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির সমীক্ষণে সময়কাল ও বিবর্তনের বিষয়টিকে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। সেইসঙ্গে সাংস্কৃতিক সচেতনতার অনুষঙ্গ হিসাবে রাজবংশী সাহিত্যচর্চার যে পরিসরটি বিগত কয়েক দশকে বিস্তৃত হয়েছে তার ব্যাখ্যানে রাজবংশী সমাজ, সংস্কৃতি ও মনন ভাবনার বিবর্তনের বিষয়টির উপর আলোকপাত করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে সাহিত্য সৃজনের মধ্যে থেকে রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের বিষয়টিকেও এই অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে।

রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ধারাটি বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হতে থাকে। রাজবংশী সমাজের লোকায়ত সংস্কৃতি থেকে পূজা পার্বণ, আচার সংস্কার সর্বোপরি ধর্মীয়

সংস্কৃতির পরিবর্তনও সম্পাদিত হয় সমাজ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ধারায়। সেখানে গ্রহণ বর্জন যেমন আছে তেমনি বিভিন্ন বিষয় গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসাবে চিহ্নিত হয়। তা সত্ত্বেও রাজবংশী জনগোষ্ঠী তাদের চিরায়ত সাংস্কৃতিক ভুবন, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, আচারের প্রতি সংরক্ষণশীল মানসিকতাও পোষণ করে। স্বতন্ত্র গোষ্ঠী পরিচয় এবং নৃ-গোষ্ঠীগত বিভিন্ন বিষয়গুলিকে ষষ্ঠ অধ্যায়ের আলোচনার পরিসরে উত্থাপন করা হয়েছে। দলিল দস্তাবেজ, ঐতিহাসিক তথ্য গবেষণা পত্র, পুস্তক, প্রবন্ধ, ক্ষেত্র সমীক্ষা, সমীক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকল্প বিষয়টিকে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১. MacIver and Page, Society, 2004

২. Taylor, E B; Primitive Culture, 1958; John Murrey, London

৩. রায়, গিরিজাশংকর; উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জাতির পূজা-পার্বণ, এন. এল. পাবলিশার্স, ডিব্রুগড়, অসম, পৃষ্ঠা - XVII

৪. Martin, Montgomary; The History, Antiquity, Topography and Statistics of Eastern India, 1933, Page - 538

৫. বর্মা, সুখবিলাস; রাজবংশী সমাজের আত্মপরিচয়; ইছামুদ্দিন সরকার (সম্পাদিত), ঐতিহ্যে ও ইতিহাসে উত্তরবঙ্গ, এন. এল. পাবলিশার্স, ডিব্রুগড়, অসম, ২০০২ পৃষ্ঠা - ১৫৭

৬. Risley, H. H.; The Tribes and Castes of Bengal, Vol I, 1891, P - 491

৭. Risley, H. H.; The Tribes and Castes of Bengal, Vol I, Ibid P - 491

৮. Chatterjee, Sunity Kumar; Kirat Jana Krti, (1951), Page - 54

৯. Imperial Gazetteer, 1908, Vol X, Page - 383

১০. Chatterjee, S. K.; The Origin and Development of the Bengali Language (1926) Part - I, Page - 69

১১. Chatterjee, S. K.; Kirat Jana Krti (1951) Page 61

১২. রায়, গিরিজাশংকর; উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জাতির পূজা-পার্বণ, এন. এল. পাবলিশার্স, ডিব্রুগড়, অসম, পৃষ্ঠা - XXII

১৩. Barman, Binay; Research Article "Panchanan Barma's role in contemporary Rajbanshi Society of North Bengal, Shesadri Prasad Bose Regional History & their possibilities" Kol. P - 147

১৪. Chatterjee, Sunity Kumar; ODBL (1926), Part - I, P - 78-79

১৫. বর্মা, সুখবিলাস; রাজবংশী সমাজের আত্মপরিচয়, ইছামুদ্দিন সরকার (সম্পাদিত), ঐতিহ্যে ও ইতিহাসে উত্তরবঙ্গ, এন এল পাবলিশার্স, ডিব্রুগড়, অসম, ২০০২, পৃষ্ঠা - ১৭২

১৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর ও দাশগুপ্ত, অভিজিত; জাতি, বর্ণ ও বাঙালী সমাজ, দিল্লী, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা - ১৬৮

১৭. Chatterjee, S. K.; Kirat Jana Krti (1951), Kol, Page 61

১৮. বর্মন, কার্তিক চন্দ্র; দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার রাজবংশী জাতি বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, বিনয় বর্মন ও কার্তিক চন্দ্র বর্মন (সম্পা) History of Culture of North Bengal, Pragotishil Prakashak 37 A, College Street, Kol -73, 2015, Page 329

১৯. বর্মা, সুখবিলাস; রাজবংশী সমাজের আত্মপরিচয়, ইছামুদ্দিন সরকার (সম্পাদিত), ঐতিহ্যে ও ইতিহাসে উত্তরবঙ্গ, এন. এল. পাবলিশার্স, ডিব্রুগড়, অসম, ২০০২, পৃষ্ঠা - ১৬৯

২০. খান চৌধুরী, আমানত উল্লা; কোচবিহারের ইতিহাস (১ম খণ্ড), ১৯৩৬

২১. রায়, গিরিজাশংকর; উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জাতির পূজা-পার্বণ, এন. এল. পাবলিশার্স, ডিব্রুগড়, অসম, পৃষ্ঠা - XVI

২২. আহমদ, ওয়াকিল; বাংলা লোকসংগীত: ভাওয়াইয়া, (ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৯৫), পৃ. ৯, মুখবন্ধ

২৩. দেব, রণজিৎ; উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জীবন ও সংস্কৃতি, রতন বিশ্বাস সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

২৪. Sanyal, Charu Chandra; The Rajbansis of North Bengal, (Calcutta: The Asiatic Socity of Bengal, 1965), Preface

২৫. বর্মন, উপেন্দ্রনাথ; রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস, জলপাইগুড়ি, ১৯৪১, পৃষ্ঠা - ২১

২৬. রায়, গিরিজাশংকর; উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জাতির পূজা-পার্বণ, এন. এল. পাবলিশার্স, ডিব্রুগড়, অসম, পৃষ্ঠা - XXIV

২৭. ঐ, পৃষ্ঠা - ১৪

প্রথম অধ্যায়

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের নৃ-গোষ্ঠীগত ও ঐতিহাসিক পরিচয়

উত্তরবঙ্গ এবং নিম্ন অসমের অন্যতম জনগোষ্ঠী রাজবংশী জনসমাজ। অসমে এই জনগোষ্ঠী কোচ-রাজবংশী হিসাবে পরিচিত। উত্তরবঙ্গে রাজবংশীরা ক্ষত্রিয় হিসাবে সমধিক পরিচিত। বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলেও (রংপুর, দিনাজপুর, পাবনা, টাঙ্গাইল, রাজশাহী) এই জনগোষ্ঠীর বসবাস। পাশাপাশি নেপাল (ঝাপা, মোরং, ভদ্রপুর), ভুটানের বেশ কিছু অংশেও রাজবংশীদের অবস্থান। এছাড়াও বিহার, মেঘালয়, ত্রিপুরাতেও রাজবংশী জনগোষ্ঠীর মানুষ সুদীর্ঘ কাল ধরে বসবাস করছেন। সুপ্রাচীন ঐতিহ্য-পরম্পরা ও লোকায়ত ভুবনের অধিকারী এই জনগোষ্ঠী প্রাক্-ঐতিহাসিক কাল ধরেই এইসব এলাকার আদি অধিবাসী।

রাজবংশী জনগোষ্ঠীর উৎপত্তি নিয়ে বহু বিতর্ক ও মতামত আছে। অনেকের মতে রাজবংশী জনসমাজ মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠী বা বৃহত্তর বোড়ো জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্গত। খ্রিস্টপূর্ব দশম শতাব্দীর কোনও এক সময়ে ইন্দো-মঙ্গোলয়েড জনপ্রবাহ ভারতে বিস্তার লাভ করে। এই জনগোষ্ঠী অসম, উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, উত্তর বিহার এবং হিমালয়ের সানুপ্রদেশ নেপাল অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বখতিয়ার খিলজির তিব্বত আক্রমণের সময় লক্ষ্মণাবতী ও তিব্বতের মধ্যবর্তী ভূখণ্ড পর্বতময় ও জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। আর এখানে সেই সময় ইন্দো-মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর কোচ, মেচ, থারু জনজাতির বসবাস ছিল। চ্যাপ্টা নাক, অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ চোয়াল, ক্ষুদ্র চোখ ও ভ্রূ ইত্যাদির গড়ন দেখে তিনি এদের বৃহত্তর বোড়ো পরিবারের সদস্য হিসাবে আখ্যায়িত করেন।[১] ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, রাজবংশী জনগোষ্ঠী মঙ্গোলীয় নৃ-জাতির তিব্বত-ব্রহ্মদেশীয় ভাষা-শাখার অন্তর্ভুক্ত হলেও আর্যভাষা সংস্কৃতির প্রভাবে পরবর্তীকালে ভিন্ন ভাষা গ্রহণ করে।[২] ত্রয়োদশ শতকে বৃহত্তর বোড়ো গোষ্ঠী বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে অসম সহ উত্তরবঙ্গে পাকাপাকি ভাবে বসবাস করতে শুরু করে এবং বিস্তৃত অংশ জুড়ে এক বিরাট রাষ্ট্রও গড়ে তোলে। অসমের পূর্বসীমা থেকে বাংলার

উত্তর ভূ-খণ্ডের করতোয়া নদীর পূর্ব তীর অবধি এদের অবাধ বিচরণ ছিল। এদেরই একটি শাখা রাজবংশীতে আখ্যায়িত হয়।

কোচ-রাজবংশের উত্থান, তাদের আনুকূল্য-অনুগ্রহ-প্রভাব, ব্রাহ্মণদের আগমন, আর্যায়নের ঢেউ ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রক্রিয়ার ঘাত-প্রতিঘাতে রাজবংশী হিন্দু জাতিতে পর্যবসিত হয়। তবে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর উদ্ভব ও স্বতন্ত্রতা নিয়ে বিদ্বজ্জন, গবেষক, নৃতত্ত্ববিদেরা ঐক্যমতে পৌঁছতে পারেননি। অনেক বাদ-বিবাদ, যুক্তি-বিযুক্তি অতীতেও ছিল, এখনও আছে। বরং বলা যায়, রাজবংশী জনসমাজ তাদের জাতিসত্তার প্রকৃত পরিচয় উন্মোচনে যেমন উদগ্রীব, তেমনই নিজেদের এক স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে ভাবতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে ক্ষত্রিয়করণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়েও রাজবংশী সমাজের একটা অংশ বৃহত্তর বাঙালি সংস্কৃতির অংশীদারও হয়েছে। হিন্দু আচার-আচরণ, রীতিনীতিকে তারা যতই তাদের জীবনচর্যা বা সংস্কৃতিতে অঙ্গীভূত করেছে, ততই সম্পূর্ণ জাতি হিসাবে সচেতন হয়ে উঠেছে এবং নিজেদের জাতিসত্তার নৃ-তাত্ত্বিক অন্বেষণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় থেকেছে। কারণ সময়ের স্রোতে বিষয়টি আরোপিত হয়েছে। অনেকের মতে, রাজবংশী জনগোষ্ঠী ইন্দো-মঙ্গোলীয় নৃ-শাখা গোষ্ঠী নয়, দ্রাবিড় বা অষ্ট্রিক নৃ-গোষ্ঠীর শাখা। আবার কারও মতে, মিশ্র সংকর জাতি, পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় প্রভাবও রয়েছে। তবে উত্তর-পূর্ব ভারতে সুদীর্ঘকাল মঙ্গোলীয় সংস্কৃতির আধিপত্য ছিল, দ্রাবিড় গোষ্ঠীর সঙ্গে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সাদৃশ্য থাকলেও খাদ্যাভ্যাস, ভাষারীতি, আচার-বিশ্বাসে মঙ্গোলীয় বৈশিষ্ট্যেরই প্রাধান্য। আর দ্রাবিড়ীয় মিশ্রণও ঘটে অনেক পরে; কারণ আর্য, দ্রাবিড় ও অষ্ট্রিক সভ্যতার মিলন পরবর্তী কালের এক ধারাবাহিক প্রবাহ। আর্য সভ্যতার ঢেউও সিন্ধু উপত্যকা থেকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় পৌঁছতে বেশ সময় লেগেছিল।

রাজবংশী জাতির উৎপত্তি নিয়ে গবেষক, পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন মতামত উঠে আসে। ফ্রান্সিস হ্যামিলটন বুকাননই প্রথম ব্যক্তি, যিনি (১৮০৭-১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে) উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী নিয়ে তথ্যানুসন্ধান চালিয়েছেন। তাঁর মতে অধিকাংশ রাজবংশীই কোচ এবং একই বংশোদ্ভূত। আর কোচ জাতিই বর্তমান রাজবংশীর পূর্বপুরুষ।[৩] পরবর্তীকালে অধিকাংশ গবেষকই ফ্রান্সিস বুকাননের মতামত গ্রহণ করে। এইচ. এইচ. রিজলের মতে কোচ, রাজবংশী, পলিয়া, দেশিয়া সমস্ত সম্প্রদায়ই একই শাখার অন্তর্ভুক্ত।[৪] এইচ. বেভারলিও

একই মন্তব্য করেন, 'The Koch, Rajbanshi and Paliya are of the most part one the same tribes'।[৫] এ. ই. পার্টারও রিজলের মতকে সমর্থন করেছেন।[৬]

১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারির প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে উইলিয়াম হান্টারও উল্লেখ করেছেন যে —

> The semi-Hinduised aborigins of the Census report, who are considerably more consist of cognate tribes of Koch Pali and Rajbanshi whose home is in the adjoing state of Kuch Behar.[৭]

১৯০৫ ও ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত বি. সি. অ্যালেনের 'Assam District Gazetteer'-এ কোচ বা রাজবংশীদের মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর আদিবাসী উপজাতি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[৮] ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে বি. এইচ. হজসন তাঁর 'Essay on the Koch, Bodo and Dhimal Tribes' শীর্ষক প্রবন্ধে রাজবংশী এবং কোচ জনগোষ্ঠীকে একই বংশোদ্ভূত এবং মঙ্গোলীয় জাতি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।[৯] পরবর্তীকালে স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন 'Linguistic Survey of India' (1927) গ্রন্থে এই একই মত পোষণ করেন। তাঁর মতে, কোচদের মধ্যে যারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী, তারাই রাজবংশী হিসাবে সমধিক পরিচিতি লাভ করেছে।[১০] ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের 'ভারতের আদমসুমারির বিবরণ'-এ মন্তব্য করা হয়েছে, 'উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের জাতিগত অবস্থান বিতর্কযুক্ত হলেও বলা যায় যে তারা পূর্ব গিরিপথ ধরে আগত মঙ্গোলীয় জাতির তৃতীয় শাখার অংশ।'[১১] আবার বখ্‌তিয়ার খিলজির গৌড়, কামরূপ আক্রমণের বিবরণমূলক গ্রন্থ 'তবকাৎ-ই-নাসিরী'তেও 'কোচ-মেচ-থারু' সম্প্রদায়গুলিকে মঙ্গোলীয় শাখার লোক হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[১২] ও' ডোনেলও তাঁর ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারির প্রতিবেদনে বলেছেন যে রাজবংশী বা কোচদের মধ্যে মঙ্গোলীয় রক্তের প্রভাব বেশি।[১৩] রাজবংশীদের উদ্ভব সম্পর্কে ড. পিয়ের বেসাইনের মত, ''তিব্বতি ও ভারতীয়দের সংমিশ্রণের ফলে রাজবংশীদের উদ্ভব। এদের কেউ কেউ কোচ উপজাতি ত্যাগ করে নাম পালটে রাজবংশী হয়ে হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন।''[১৪] আবার, জে. এ. ভাসের মতানুযায়ী, রংপুরের

রাজবংশীরা কোচ জাতি থেকে উদ্ভূত এবং মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাদের মধ্যে দ্রাবিড়ীয় রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে, উত্তরাংশে সামান্য হলেও পশ্চিমাংশে তা যথেষ্ট; আর্য রক্ত তাদের ধমনীতে প্রায় নেই বললেই চলে।[১৫] কোচবিহারের তদানীন্তন ডেপুটি কমিশনার ক্যাপ্টেন লিউইন ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে মন্তব্য করেন যে ভুটান ডুয়ার্সের অধিবাসী মেচ উপজাতির সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় হিন্দুদের পারস্পরিক বৈবাহিক সংমিশ্রণের ফলে রাজবংশী জাতির উদ্ভব হয়েছে।[১৬] কিন্তু কোচবিহার রাজ-প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী তাঁর 'The Coochbehar State and its Land Revenue Settlement' গ্রন্থে বলেছেন, রাজবংশী কখনও দুটি জাতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত নয়।[১৭] এ প্রসঙ্গে ও' ম্যালের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, কোচ, মেচ, বোড়ো সবাই তিব্বত-বর্মী ভাষীরা একই উপজাতীয় উৎস থেকে এসেছেন।[১৮] পরবর্তীকালে রাজবংশীদের ক্ষত্রিয় আন্দোলনের প্রেক্ষিতে তিনি মন্তব্য করেন, 'কোচ হতে রাজবংশী জাতি ভিন্ন' — এ-দাবি অসঙ্কোচে মঞ্জুর করা হল। জাতির উৎপত্তি বিষয়ে যতই প্রশ্ন থাকুক, আজ থেকে কোনও সন্দেহ নেই যে রাজবংশী ও কোচ পৃথক জাতি।[১৯] র‍্যালফ ফিচ, ব্রায়ান, হজসন, বুকানন প্রমুখ পরিব্রাজকের মতে কামরূপ বা কামতার অধিবাসীরা (বর্তমান কালের অসম, কোচবিহার, রংপুর, দিনাজপুর এলাকা) মঙ্গোলীয়।[২০] এডওয়ার্ড গেইটের মতেও "প্রকৃত কোচরা হল মঙ্গোলীয় এবং রাজবংশীরা সম্পূর্ণ আলাদা জাতি। দ্রাবিড়দের সঙ্গে এদের সংস্পর্শ আছে। প্রতিবেশীরা ছিল অসংখ্য হিন্দু। মানস নদীর পশ্চিম তীরের কোচরা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করার পর রাজবংশী নাম গ্রহণ করে।"[২১] এ প্রসঙ্গে হজসন সাহেবের বক্তব্য হল — বিশ্বসিংহ হাজোর পৌত্র, কোচ-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন ও রাজবংশী নামে পরিচিত হন।[২২] ওয়াড্ডেল হজসনের বক্তব্যকে সমর্থন করে তিনি বলেছেন :

> The Koches do not belong to the Dravidian
> stock, but are distinctly Mongoloid though
> some what heterogenous.[২৩]

নৃতত্ত্ববিদ হার্বার্ট রিজলিও কোচ, পলিয়া, রাজবংশীদের একই বংশোদ্ভূত জাতি হিসাবে উল্লেখ করেন। তিনি রাজবংশীদের দ্রাবিড় জাতি হিসাবে চিহ্নিত করে মঙ্গোলীয় সংমিশ্রণ ঘটেছে বলে মত প্রকাশ করেন।[২৪] বেভারলির মতেও কোচ, রাজবংশী, পলিয়া এবং দেশি —

এরা সকলেই দ্রাবিড় জাতি থেকে উদ্ভূত।[২৫] ই. টি. ডালটন কিংবা হান্টারও রাজবংশী-ক্ষত্রিয় জাতিকে দ্রাবিড় শাখার অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন।[২৬] ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রাজবংশী জাতিকে মঙ্গোলীয় নৃ-জাতির তিব্বত-ব্রহ্মদেশীয় ভাষা শাখার গোষ্ঠী হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন এবং বলেছেন যে কোচেরা নিজেদের রাজবংশী হিসাবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেন।[২৭]

রাজবংশী জনগোষ্ঠীর উদ্ভব নিয়ে ব্রিটিশ আধিকারিক সহ নৃতত্ত্ববিদ, গবেষক ও পণ্ডিতমহল বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। অনেকের মতে এই গোষ্ঠী দ্রাবিড়-অস্ট্রিক নৃ-গোষ্ঠীর বংশধর, কারও কারও মতে মঙ্গোলীয় নৃ-শাখার অন্তর্ভুক্ত। আবার অনেকের মতে মিশ্র-সংকর জাতি। ভারতীয় গবেষক ও পণ্ডিতদের অনেকের মতে, রাজবংশীরা কোচদের বংশজাত। আবার অনেকের মন্তব্য, রাজবংশীরা মিশ্র জাতি।[২৮] স্বাভাবিকভাবেই রাজবংশী জনগোষ্ঠীর উৎপত্তি নিয়ে বিতর্ক আছে। ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার অব্ ইন্ডিয়া, ১৯০৮-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে কোচরা নিজেদের রাজবংশী হিসেবে পরিচয় দেয় কিন্তু তাদের এই পরিচয় সত্য নয়। দুটি জাতির উৎপত্তি সম্পূর্ণ দুটি পৃথক উৎস থেকে। কোচ রাজারা মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত, পক্ষান্তরে রাজবংশীরা দ্রাবিড় নরগোষ্ঠীর বংশধর এবং কোচ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার আগেই সম্ভবত তারা এই রাজবংশী নামটি গ্রহণ করে। কোচবিহারের অধিবাসী রাজবংশীরা দেহাকৃতির দিক থেকে যারা সুস্পষ্ট মঙ্গোলীয়ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তারা হয় বিশুদ্ধ কোচ অথবা ক্ষমতাসীন কোচদের সঙ্গে অন্য জাতির সংমিশ্রণে সংকর জাতি বিশেষ, যাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে মঙ্গোলীয়ান বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্য সূচিত হয়েছে। এই রিপোর্টে রাজবংশীদের একটি অংশকে দ্রাবিড় আর একটি অংশকে মঙ্গোলিয়ান গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত বলা হয়েছে। এখানে কোচবিহার এবং রাজ্যের অধিবাসীদের পৃথক নরগোষ্ঠীর বংশধর বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

সমাজ সংস্কারক মনীষী পঞ্চানন বর্মার ক্ষাত্র-আন্দোলনের ফলে পশ্চিমবঙ্গে বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠী আজকে রাজবংশী-ক্ষত্রিয় হিসাবে চিহ্নিত এবং কোচদের তুলনায় পৃথক জনগোষ্ঠী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। ব্রিটিশ সরকারের আদমসুমারির প্রতিবেদনেও (১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ) এই ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। অসমে কোচ-রাজবংশী রূপে পরিচিত হলেও উত্তরবঙ্গের বৃহত্তর রাজবংশী সমাজ রাজবংশী-ক্ষত্রিয় হিসাবে পরিচয় প্রদানেই গর্ববোধ করেন। প্রথমদিকে কোচ ও রাজবংশীদের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য উল্লিখিত হলেও কোচ-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা এবং ধর্মীয়, সামাজিক ও

সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের মধ্য দিয়ে ব্যবধান দূরীভূত হতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে কোচ ও রাজবংশী জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বৈবাহিক সূত্রে রক্তের সংমিশ্রণ, সাংস্কৃতিক ও ভাষার আদান-প্রদানের মাধ্যমে নতুন এক সমাজের সৃষ্টি হয়। বলা যায়, বর্তমানে রাজবংশী ও কোচদের মধ্যে প্রায় কোনও বিভেদ নেই। এ-প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'Kirata Jana Krti' গ্রন্থে বলেছেন যে কোচেরাও নিজেদের রাজবংশী হিসাবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেন।[২৯] ১৯৩১ সালে আদমসুমারির প্রতিবেদনে ডব্লিউ. এইচ. থমসন মন্তব্য করেছেন :

> Rajbanshis are the indigenous people of Northern Bengal and the third largest Hindu Caste in the Province. In 1901, many Koches in North Bengal were returned as Rajbanshis and many of the Rajbanshis have taken sacred thread and were prepared to use force in support of their claim to be returned as Kshatriya.[৩০]

পণ্ডিত ও গবেষক মহলের মধ্যে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর উৎপত্তি নিয়ে বিভিন্ন মতামত থাকলেও অনেকেই (জে. এ. ভাস, ই. এ. গেইট, র‍্যালফ ফিচ, ব্রায়ান, হজসন, বুকানন, বি. সি. অ্যালেন, ওয়াড্ডেল, ও' ডোনেল প্রমুখ) রাজবংশী জনগোষ্ঠীকে মঙ্গোলীয় নৃ-গোষ্ঠীর জনপ্রবাহ হিসাবেই আখ্যায়িত করেছেন। এছাড়া হিমালয়ের পাদদেশ সহ উত্তর-পূর্ব ভারত, মায়ানমার, নেপালের মঙ্গোলীয় নৃ-শাখার মানুষের সঙ্গে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর দৈহিক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্যও লক্ষণীয়। পরবর্তীতে, কালের স্রোতে এই জনগোষ্ঠীর সঙ্গে অষ্ট্রিক, প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড, দ্রাবিড় গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ ও সমন্বয় ঘটে। তা সত্ত্বেও গবেষকদের অধিকাংশের মতে রাজবংশীদের মধ্যে মঙ্গোলীয় বৈশিষ্ট্যেরই প্রাধান্য এবং বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠী ইন্দো-মঙ্গোলীয় জাতির বৃহত্তর বোড়ো গোষ্ঠীর অন্যতম একটি শাখা। এসব নানা মন্তব্যে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক উৎসগত বিষয়টিও বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। তবে আধুনিক গবেষক, পণ্ডিত ও সমাজতাত্ত্বিকদের সকলেই একমত যে রাজবংশী জনগোষ্ঠী ইন্দো-মঙ্গোলীয় জনজাতিরই একটি শক্তিশালী শাখা।

কোচ ও রাজবংশী — এই শব্দ দুটি নিয়েও বিভ্রান্তি আছে। বিশেষ করে রাজবংশী-ক্ষত্রিয় সমাজ কোচদের তুলনায় ভিন্ন এবং উন্নত হিসাবে প্রতিপন্ন করতে পছন্দ করেন। উৎপত্তি বিষয়েও তারা ভিন্ন মতের অনুসারী। তাদের মতে, রাজবংশীরা বরাবরই ক্ষত্রিয় ছিলেন। পরবর্তীকালে তাদের পদমর্যাদার হানি ঘটে এবং তারা ভঙ্গ ক্ষত্রিয় হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। অনেক গবেষক, পণ্ডিতও এই ভাবনায় সহমত পোষণ করেন। তাঁদের মতে, কোচ ও রাজবংশী জনগোষ্ঠী স্বতন্ত্র, একই জনগোষ্ঠী নয়। এ-বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে 'ক্ষত্রিয় সমিতি'। রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মার নেতৃত্বে দীর্ঘ আন্দোলন সংঘটিত হয় এবং তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার আদমসুমারির রিপোর্টে (১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ) রাজবংশী জনগোষ্ঠীকে পৃথক 'ক্ষত্রিয় জাতি' হিসাবে উল্লেখ করার পক্ষে সম্মতি প্রদান করেছিলেন। রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মা রাজবংশী ও কোচদের পৃথক জাতিগোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত করার পাশাপাশি রাজবংশীদের কোচদের থেকে উন্নত হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। রাজবংশীরা পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, সামাজিক আচার-আচরণ সহ শুচিতার ক্ষেত্রে পৃথক সত্তার পরিচয় বহন করে। সেই সঙ্গে ধর্মীয় ক্ষেত্রেও ক্ষত্রিয়ত্ব বজায় রাখে। এ-প্রসঙ্গে হরকিশোর অধিকারী তাঁর 'রাজবংশী কুল-প্রদীপ' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে বলেছেন যে —

> ... The Koches and the Rajbanshis were not the same caste and were different in many ways. The food habits, behaviour and the upper caste Hindu, including the Rajbanshis did not maintain social relations with them.

তিনি আরও বলেছেন যে রাজবংশীরা ধর্মীয় দিক থেকে ভিন্ন থাকলেও পূর্বাপর ক্ষত্রিয় ছিলেন। তাঁর মতে —

> "Koches adopted Hinduism during the reign of Maharaja Viswa Singha of Cooch Behar (in the early of 16th Century). Whereas the Rajbanshis were Hindus before the reign of

Viswa Singha and were recognized as Bhanga Kshatriya."[৩১]

পরবর্তীকালে জলপাইগুড়ির কৃতী সন্তান ও বিশিষ্ট সমাজসেবক উপেন্দ্রনাথ বর্মন তাঁর 'রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস' শীর্ষক গ্রন্থে হিন্দুশাস্ত্র ও পুরাণ থেকে তথ্য উদ্ধৃত করে বলেছেন যে অষ্টাদশ শতকের অনেক পূর্বেই রাজবংশীরা ক্ষত্রিয় মর্যাদা দাবি করেছিল।[৩২] এছাড়াও মণিরাম কাব্যভূষণ সহ আরও অনেকে রাজবংশীদের 'Mythic historical claim of Kshatriyas' বলে স্বীকার করেছেন।[৩৩] আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও 'Kirata Jana Krti' গ্রন্থে বলেছেন :

> The masses of North Bengal areas are very Bodo-origin or mixed Austric-Dravidian-Mongoloid, where groups of peoples from lower Bengal (Bhati desh) and Bihar have penetrated among them. They are mainly as koch i.e. Hindu or semi Hindu Bodo who have abandoned their original Tibeto Burman speech and have adopted the northern dialect of Bengali (which has a close affinity with Assamese) and when they are a little to concious of their Hindu religion and culture and retained at the same time some vogue memory of the glories of their people particularly during the time of Viswa Singha and Naranarayan, they are proud to themselves Rajbanshis and to claim to be called Kshatriyas. [৩৪]

কোচ ও রাজবংশীদের স্বতন্ত্র গোষ্ঠী পরিচয় এবং রাজবংশীদের ক্ষত্রিয়ত্ব নিয়ে নানাবিধ

প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে বিভিন্ন গবেষক, নৃতাত্ত্বিক ও পণ্ডিতদের মধ্যে। কোচ-রাজবংশ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে রাজবংশী শব্দটির নিবিড় যোগকে স্বীকার করে নিয়েও বৃহত্তর এই জনগোষ্ঠী কোচদের থেকে নিজেদেরকে স্বতন্ত্র ভাবেন। কিন্তু ইতিহাসবিদ, পণ্ডিত-গবেষকদের মতে কোচ ও রাজবংশী শব্দ দুটির মধ্যে কোচ নামটি আদি ও প্রকৃত। পরবর্তীকালে রাজবংশী জনগোষ্ঠী সংগঠিত হয় এবং আরও কিছু জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে বৃহত্তর রাজবংশী সমাজ তৈরি হয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে, অসমে রাজবংশী জাতির পরিচয় কোচ-রাজবংশী নামে। তারা কোচ ঐক্যসূত্র ধরে রেখেছে। পশ্চিমবঙ্গে রাজবংশীরা 'রাজবংশী ক্ষত্রিয়' হিসাবে সমধিক পরিচিত। উৎসগত কোচ নৃতত্ত্ব সূত্রকে অস্বীকার করে স্বতন্ত্র উন্নত এবং সংকর জাতি হিসাবে নিজেদের মনে করে। কিন্তু গবেষক, পণ্ডিত, ইতিহাসবিদদের মতে কোচ জাতিসত্তার বিষয়টি আদি ও প্রকৃত, রাজবংশী পরিচয়টি অর্বাচীন এবং কোচ রাজবংশ প্রতিষ্ঠার (ষোড়শ শতকে) সঙ্গে সম্পৃক্ত। কোচ-বংশের হাজো রাজার পুত্র বিশ্বসিংহ কোচ রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেই কোচ পরিচয় ত্যাগ করে 'রাজবংশী' জাতি পরিচয় গ্রহণ করেন। এছাড়া প্রাচীন শাস্ত্র, পুরাণ, উপ-পুরাণ, ধর্মীয় গ্রন্থেও রাজবংশী নামটির বিশেষ উল্লেখ নেই। একমাত্র কালিকাপুরাণ, ভ্রামরীতন্ত্রে রাজবংশী নামটি উল্লিখিত হয় প্রাথমিক ভাবে। এই গ্রন্থ থেকে জানা যায় পরশুরামের ভয়ে রাজবংশী ক্ষত্রিয়রা নিজ পরিচয় লুকিয়ে হিমালয়ের পাদদেশে এসে বসবাস শুরু করে এবং ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হয়।[৩৫] ষোড়শ শতাব্দীর পণ্ডিত রূপনারায়ণ রচিত 'কামতেশ্বর কুল কারিকা' থেকে জানা যায় :

ছিড়িয়া গলার দড়ি ক্ষত্র চিহ্ন লুপ্ত করি / প্রাণভয়ে ইতিউতি পালান্ত সকলি।
সংগ্রামক ভয় করি ভঙ্গক্ষত্রি নাম ধরি / আপনাকে মানে কেহ রাজবংশী বুলি।[৩৬]

প্রাচীন 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ', পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত দেবীবর মিশ্রের 'খেলবিধি', ধ্রুবানন্দ মিশ্রের 'কুলকারিকা' প্রভৃতি গ্রন্থে কোচ জাতির উল্লেখ আছে। সপ্তদশ শতকের 'তারিখে আসাম' ও 'আলমগীর নামা', অষ্টাদশ শতকের 'রিয়াজস সালাতিন', ঊনবিংশ শতকের 'মোরসেদ জাঁহানামা' প্রভৃতি মুসলমান ঐতিহাসিক লিখিত গ্রন্থে এতদঞ্চলের অধিবাসী হিসাবে শুধুমাত্র কোচ ও মেচ জাতির উল্লেখ আছে।[৩৭] ত্রয়োদশ শতকে লিখিত মিনহাজুস সিরাজের 'তবাকাৎ-ই-নাসিরী' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে তৎকালীন কামরূপ অঞ্চলে 'কোচ, মেচ, থারু' সম্প্রদায়গুলির বসবাস ছিল। এছাড়া বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিতে কোচ রমণীর প্রতি শিবের আসক্তির কথা বর্ণিত

হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই সময়ের কোনও গ্রন্থে রাজবংশী নামক জাতির উল্লেখ পাওয়া যায় না।[৩৮] দিনাজপুরে প্রাপ্ত কম্বোজ রাজবংশের রাজা গৌড় কর্তৃক ৮৮০ শক (৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে) স্থাপিত বাণগড়, শিলালিপিতে কোচ জাতির উল্লেখ আছে। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে কোচ শব্দটির সংস্কৃতায়িত রূপ 'কম্বোজ'[৩৯] এবং যোগিনীতন্ত্র ও পদ্মপুরাণে যা 'কুবাচ', 'কুবাচক' হয়েছে।[৪০] হজসনও বলেছেন যে বিশ্বসিংহ হাজোর পৌত্র, কোচ-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন ও রাজবংশী নামে পরিচিত হন।[৪১] পৌরাণিক আমল, এমনকী হাজার বছরেরও প্রাচীন শিলালিপি ও পৌরাণিক গ্রন্থাবলীতে 'রাজবংশী' নামক কোনও জাতির উল্লেখ পাওয়া যায় না। বুকানন হ্যামিলটনই (১৮০৭-১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে) সর্বপ্রথম কোচদের সঙ্গে একত্রিত করে 'রাজবংশী'র উল্লেখ করেন।[৪২] 'কোচবিহারের ইতিহাস' গ্রন্থে হেমন্তকুমার বর্মা 'কম্বোজ' রাজবংশ থেকে রাজবংশী নামের উদ্ভব হওয়ার কথা বলেন। মনুসংহিতায় পৌণ্ড্রক, ওড্র, দ্রাবিড়, কম্বোজ, শক জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং ধরে নেওয়া যায়, কম্বোজ রাজবংশ থেকে কোচ (কম্বোজ > কুবাচ > কোচ) শব্দ এসেছে। আর কোচ জাতিই পরবর্তীকালে রাজবংশোদ্ভূত 'রাজবংশী' নাম গ্রহণ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে। তৎকালীন কোচ জাতির যেসব লোকজন আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ছিলেন, তাঁরাই মহারাজা বিশ্বসিংহের অনুগামী হয়ে 'রাজবংশী' নাম গ্রহণ করে আলাদা হয়ে যান। আর যেসব লোকজন আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল ও রাজার সংস্পর্শ থেকে দূরে ছিলেন, রাজার সাংস্কৃতিক কার্যাবলীর স্পর্শ যাঁরা পাননি, তাঁরা আজও কোচ জাতি হিসাবে রয়ে গেছেন। এসব কারণে কোচ ও রাজবংশীদের আচার-বিশ্বাস, সংস্কার-সংস্কৃতির মধ্যে মিল থাকলেও যথেষ্ট অমিলও পরিলক্ষিত হয়।[৪৩] সাহিত্য আকাদেমির ভাষাসম্মানে ভূষিত বিশিষ্ট গবেষক গিরিজাশঙ্কর রায় তাঁর 'উত্তরবঙ্গে রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির পূজা-পার্বণ' গ্রন্থে যুক্তি বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে মত ব্যক্ত করেছেন যে কোচ ও রাজবংশী শব্দ দুটির মধ্যে কোচ নামটি আদি ও প্রকৃত।[৪৪] ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত প্রায় সব গবেষক, ইংরেজ প্রশাসক, চিকিৎসক, ঐতিহাসিক ও নৃ-বিজ্ঞানী রাজবংশীদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে কোচ-রাজবংশের হাত ধরে কোচ নাম ত্যাগ করে 'রাজবংশী' নাম গ্রহণ করে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ক্ষত্রিয় সমিতির দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে রাজবংশীরা ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারির রিপোর্টে 'ক্ষত্রিয় জাতি' হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। এই আন্দোলনের পুরোধা

পুরুষ ছিলেন রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মা। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত যে সমস্ত নৃতাত্ত্বিক গবেষক, ঔপনিবেশিক আমলের আধিকারিক, প্রশাসক, চিকিৎসক, ঐতিহাসিক ও নৃ-বিজ্ঞানী রাজবংশীদের নিয়ে গবেষণা করেছেন, তাঁরা প্রায় সকলেই মত প্রকাশ করেছেন যে কোচ শব্দটিই আদি ও প্রকৃত এবং কোচ, রাজবংশী, পলিয়া, দেশিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায় একই শাখার লোক।[৪৫]

রাজবংশী সমাজের একটা বৃহত্তর অংশই ক্ষত্রিয় মনোভাব পোষণ করে। ইতিহাসগতভাবে তারা বিভিন্ন পুরাণ, উপপুরাণ, তন্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থের তথ্য সূত্র উপস্থাপন করে তাদের এই ক্ষত্রিয় পরিচয়কে তুলে ধরে। ভ্রামরী তন্ত্রের দ্বিতীয় স্তবকে বলা হয়েছে —

নন্দীসূত ভয়াদ্ভীমে পৌন্ড্রদেশাৎ সমাগতাঃ
বর্দ্ধনস্য পঞ্চপুত্রাঃ স্বর্গনৈর্বান্ধবৈঃ সহ।
রত্নপীঠং যিতিস্ততে কালাধিপ্রসঙ্গমাৎ
ক্ষাত্রধর্মাপদপক্রান্তা রাজবংশীতি খ্যাতাঃভূবি।।

যে নন্দী সুতের ভয়ে রাজ্যবর্ধনের পাঁচ পুত্র জ্ঞাতি বন্ধুদের নিয়ে পৌন্ড্রদেশ ত্যাগ করে কামরূপের রত্নপীঠ এলাকায় এসে বসবাস শুরু করে। দীর্ঘদিন ব্রাহ্মণ সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায় ক্ষাত্রধর্ম চ্যুত হয়। পরবর্তীকালে রাজবংশী নামে পরিচিতি পায়। এই প্রেক্ষিতে রাজবংশীরা নিজেদেরকে 'ব্রাত্য ক্ষত্রিয়' যেমন প্রতিপন্ন করে তেমনি কালিকাপুরাণের বক্তব্যকেও গুরুত্ব দেয়। কালিকাপুরাণে পাওয়া যায় যে জামদগ্নের (পরশুরাম) ভয়ে ক্ষত্রিয়রা ভীত হয়ে ম্লেচ্ছের ছদ্মবেশে ভগবান জল্পেশ দেবের শরণাপন্ন হয় এবং ম্লেচ্ছাচারে নিজেদেরকে আড়াল করে মহাদেবের পূজা করতে থাকে।

জামদগ্ন্য ভয়াদ্ভীতাঃ ক্ষত্রিয়া পূর্বমেবহি
ম্লেচ্ছ ছদ্মানুপাদায় জল্পীশং শরণং গতাঃ।

(কালিকাপুরাণ ৩০, ৭৭ তম অধ্যায়)

এই দুই সূত্রের প্রেক্ষিতে রাজবংশীরা নিজেদেরকে ক্ষত্রিয় হিসাবে দাবি করে। অনেক পণ্ডিতের মতে কালিকাপুরাণ খ্যাত জামদগ্ন (পরশুরাম) এবং ভ্রামরীতন্ত্রে উল্লেখিত নন্দীসূত মহাপদ্মনন্দ একই ব্যক্তি। বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতের বক্তব্যও এই ভাবনাকে পুষ্ট করে। বিষ্ণুপুরাণ ও

শ্রীমদ্ভাগবতে ক্ষত্রিয় নিধনকারী রাজা মহাপদ্মনন্দের কথা বলা হয়েছে এবং তিনি পরশুরামের মত ক্ষত্রিয় নিধন করে শাসন ক্ষমতার অধিকারী হন।

কামরূপের প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা যায় রাজবংশীরা কামরূপের আদি বাসিন্দা এবং তৎকালীন কামরূপ চারটি ক্ষেত্রে বিভক্ত ছিল - কামপীঠ, যোনী পীঠ, মণিপীঠ ও রত্নপীঠ। কামরূপ রাজ্যের পশ্চিমে অবস্থিত জল্পেশ এলাকার বিস্তীর্ণ অংশেই রত্নপীঠের অবস্থান। যোগিনী তন্ত্রে যেমন উল্লেখ পাওয়া যায়, বুকানন হ্যামিলটনও তার রিপোর্টে উল্লেখ করেন যে রত্নপীঠ অংশে রাজবংশীরা বসবাস করত। অন্যদিকে ভ্রামরীতন্ত্রে উল্লেখ আছে যে রাজবংশীরা পৌণ্ড্রভূমি থেকে এই রত্নপীঠ অংশে এসে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বিবর্জিত হয়ে বসবাস করে। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারও তাঁর গ্রন্থে (History of Bengal Vol - I) একথা উল্লেখ করেন। মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ের ৪৪ সংখ্যক শ্লোক থেকেও জানা যায় যে পৌণ্ড্র এলাকার বসবাসকারী ক্ষত্রিয়রা বৈদিক আচার অনুষ্ঠান ত্যাগ করে শূদ্রে পরিণত হয়।

শনকৈকস্ত ক্রিয়া লোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ।।
পৌণ্ড্র কাশ্চৌড্র দ্রাবিড়াঃ কম্বোজাঃ যবনাঃ শকাঃ
পারদাঃ পহ্নবাশ্চীনাঃ কিরাদাঃ দশাঃ।।

বলা হয়েছে যে পৌণ্ড্র, ওড্র, দ্রাবিড়, কম্বোজ, যবন, শক, কিরাত ইত্যাদি ক্ষত্রিয়রা উপনয়নাদি সংস্কারের অভাবে এবং ব্রাহ্মণদের অদর্শনে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়েছে এবং মনুসংহিতার বিধান অনুযায়ী তারা স্বধর্মচ্যুত হয়। সেই প্রেক্ষিতে বলা হয় কিছু পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় মহাপদ্মনন্দের ভয়ে করতোয়া নদী পেরিয়ে জল্পেশ সন্নিকটবর্তী রত্নপীঠ এলাকায় বসবাস শুরু করে ও দীর্ঘদিন ব্রাহ্মণদের সংস্পর্শে না থাকায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয় ও ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তাদের ভাষায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বক্তব্য যুক্তি হিসাবে উঠে আসে যে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতেই সমগ্র উত্তরবঙ্গ মৌর্য সাম্রাজ্যের অধিকারে আসে এবং সমগ্র অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হয়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মবিরোধী বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে আর্যাবর্তে বর্ণাশ্রম ধর্ম লোপ পেতে থাকে। বেদে চিহ্নিত যজ্ঞবিধি বিরোধী বৌদ্ধদের সঙ্গে স্বাভাবিক কারণে দেবদেবী সেবক হিন্দু বর্ণাশ্রম, ধর্মীয় ক্ষত্রিয়দের সংঘর্ষ বাধে। নিজেদের ধর্ম ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ক্ষত্রিয়দের কেউ কেউ

আত্মগোপন করে। পরবর্তীকালে এরাই দক্ষিণবঙ্গের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বা পোদ সম্প্রদায়ভুক্ত জনগোষ্ঠী হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। অন্যেরা আদি বাসস্থান পরিত্যাগ করে উত্তরদিকের অরণ্যানী বেষ্টিত মঙ্গোলীয় উপজাতীয় অধ্যুষিত রত্নপীঠ বা জল্পেশ ও তার পার্শ্ববর্তী কামতাপুর বা কামরূপ অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে রাজবংশী নামে বাস করতে থাকে।[৪৬]

বহুবিধ প্রেক্ষাপটে রাজবংশী সমাজের নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বিচার বিশ্লেষণে স্বাভাবিকভাবে একাধিক মতামতের উত্থাপন ঘটে। কারো মতে মঙ্গোলীয়, কারো মতে দ্রাবিড়ীয় গোষ্ঠী আবার কারো মতে মিশ্র সংকর জাতি হিসাবে উল্লেখিত হয়। পরবর্তীকালে দেশীয় গবেষকগণও এই মতান্তরে আবর্তিত হয়েছেন। ইংরেজ গবেষকদের এই সংক্রান্ত বিচার বিশ্লেষণে প্রধান বিতর্কটি ছিল রাজবংশী ও কোচ একই কিনা এবং রাজবংশী জাতি হিসাবে তারা কোন ধর্মীয় শ্রেণিভাগে পড়েন। তাদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় নিয়েই তারা বেশি ব্যাপৃত ছিলেন। স্বাভাবিকভাবে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে আসে সেটি হল বিস্তীর্ণ কামরূপ সহ তথাকথিত উত্তরবঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস কথা। কারণ ইতিহাসের উপাদান থেকেই এতদঞ্চলের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর যথার্থ নৃভাষ্য রচিত হতে পারে। সঠিক অর্থে উন্মোচিত হতে পারে। রাজবংশী সমাজের ও নৃগোষ্ঠীগত ও ঐতিহাসিক পরিচয়।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রাজবংশীদের মঙ্গোলীয় নৃ-জাতির তিব্বত-ব্রহ্মদেশীয় ভাষা শাখার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি এ-ও মন্তব্য করেছেন যে খ্রিস্টাব্দ গণনার সময় থেকেই অসম, পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে তিব্বত-ব্রহ্মদেশীয় ভাষা শাখার বৃহত্তর বোড়ো জাতির মেচ-কোচ-কাছারি প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলি বসতি স্থাপন করে।[৪৭] এ-প্রসঙ্গে তিনি আরও মন্তব্য করেন যে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে মৌর্য আমলে বাংলাদেশে আর্যীকরণের সূত্রপাত এবং গুপ্ত আমলে অর্থাৎ সপ্তম শতকে তা সম্পূর্ণ হয়।[৪৮] তাঁর মতে এই সময়ে বঙ্গদেশের উত্তরাঞ্চলে আর্যভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটে এবং রাজবংশী ক্ষত্রিয়রাও পূর্বাঞ্চলের কোনও একটি আর্যভাষা গ্রহণ করে। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ভাষার যে কয়েকটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, তা ভাষাচার্য নির্দেশিত মাগধী প্রাকৃত বা অপভ্রংশ ভাষার লক্ষণ বলা যেতে পারে।[৪৯] এ-প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের বিবরণীর উল্লেখ করেন। ড. গিরিজাশংকর রায়ও মন্তব্য করেন যে, ‘মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর তিব্বতী ব্রহ্মদেশীয় ভাষার সাথে পরবর্তী কালে অষ্ট্রিক দ্রাবিড় ভাষার সংমিশ্রণ

ঘটেছে।[৫০] অনেকের মতে, সপ্তম শতকে রাজবংশী ক্ষত্রিয়গণ পূর্বাঞ্চলের কোনও একটি আর্যভাষার অন্তর্গত শাখা গ্রহণ করে।

রাজবংশীদের ভাষা নিয়েও পণ্ডিত মহলে বিতর্ক আছে। অনেক ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতের মতে রাজবংশীরা বৃহত্তর বোড়ো ভাষাগোষ্ঠীর একটি সম্প্রদায় পরবর্তীকালে তারা ভিন্ন ভাষার অনুবর্তী হয়। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'The Origin and Development of the Bengali Language' গ্রন্থে 'রাজবংশী' নামটি উল্লেখ করলেও ভাষার ক্ষেত্রে তিনি 'কামরূপী' শব্দটি ব্যবহার করেন।[৫১] স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসনই প্রথম এই ভাষার নামকরণ করেন 'রাজবংশী'। তিনি 'Linguistic Survey of India' গ্রন্থে বলেছেন :

> When we cross the river (Brahmaputra) coming from Dacca, we met a well marked form of speech in Rangpur and the districts to its North and east. It is called Rajbanshi, and while undoubtedly belonging to eastern branch has still points of difference which lead us to class it as a separate dialect.[৫২]

বিশিষ্ট সমাজ-সংস্কারক মনীষী পঞ্চানন বর্মা 'রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদ'-এর মুখপত্র 'রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা'-র সম্পাদক থাকাকালীন (১৯০৫-১৯১২) উত্তরবঙ্গের ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনায় এই ভাষাকে 'কামতা-বিহারী' ভাষা হিসাবে উল্লেখ করেন। উত্তরবঙ্গের আরেক কৃতী সন্তান মনীষী পঞ্চানন বর্মার ভাবশিষ্য উপেন্দ্রনাথ বর্মন রাজবংশী ভাষার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে রাজবংশী জাতির ভাষা সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত।[৫৩] পরবর্তীকালে ধর্মনারায়ণ বর্মা তাঁর 'কামতাপুরী ভাষা প্রসঙ্গ' গ্রন্থে রাজবংশী ভাষাকে 'কামতাপুরী' ভাষা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। রাজবংশী ভাষা নিয়ে এ-যাবৎ যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছে। অনেকে দেশী ভাষা হিসাবে উল্লেখ করতে দ্বিধা করেন নি। অনেকে ভিন্ন ভিন্ন নামকরণের পাশাপাশি উপভাষা, বি-ভাষা হিসাবেও আখ্যায়িত করেছেন। বর্তমানেও এই ভাষা-বিতর্কের সঙ্গে নানাবিধ বিষয় ইতিহাস, ঘটনা, প্রতর্ক-বিতর্ক এমনকী রাজনৈতিক বিষয় যুক্ত

হয়ে আছে। তবে সাহিত্য আকাদেমি (ভারত সরকারের সর্বোচ্চ সাহিত্য সংগঠন) ২০১০ খ্রিস্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারি রাজবংশী ভাষার বিশিষ্ট লেখক গিরিজাশঙ্কর রায়কে 'রাজবংশী ভাষা' সম্মানে ভূষিত করে। এর দু'বছর পর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০১২ খ্রিস্টাব্দে 'রাজবংশী ভাষা আকাদেমি' গঠন করে। আবার ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে 'কামতাপুরী ভাষা আকাদেমি'ও গঠন করে। ইতোমধ্যে বহু লেখক, কবি, প্রবন্ধকার রাজবংশী ভাষায় সাহিত্য চর্চা করছেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাও নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে উত্তরবঙ্গ তথা নিম্ন অসমের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে। বলা যেতে পারে রাজবংশী ভাষায় সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়ে বৃহত্তর বাংলার ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিসরটি সমৃদ্ধ হচ্ছে। সেই সঙ্গে সুদীর্ঘকাল অন্তরালে থাকা একটি ভাষা আজ নব আলোকে, নব আনন্দে ও কলেবরে জাগরিত হচ্ছে। যে ভাষার সঙ্গে বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠীর আবেগ, অস্তিত্ব, সংস্কৃতি ও নৃ-গোষ্ঠীগত পরিচয়ও যুক্ত।

তথ্যসূত্র :

১. Chatterjee, Sunity Kumar; Kirata Jana Krti, 1951, The Asiatic Society, Kol, 1951, rept. 2011 Page - 54

২. Chatterjee, Sunity Kumar; (1926), The Origin and Development of the Bengali Language, Part - I, Calcutta, 1926, Page - 78-79

৩. Martin, Robert Montogomery; The History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India, rpt. (Delhi: Cosmo Publications, 1976), p. 538

৪. Risley, Herbert Hope; The Tribes and Castes of Bengal, Vol. I, (Calcutta: Bengal Secratariat Press, 1891), p. 491

৫. Beverly, H.; Report on the Census of Bengal, (Calcutta: Bengal Secretariate Press, 1872), p. 130

৬. Porter, A. E.; Census of India, Vol. V, Part - I, (Delhi: 1931) p.473

৭. Hunter, William Wilson; A Statistical Account of Bengal, Vol. V, (London: Trubner & Co., 1872), p. 42-43

৮. B. C. Allen (ed.) Assam District Gazeteers, Vol. V, (Allahabad: The Poineer Press, 1905), p. 95-96, Assam District Gazeteers, Vol. III, (Shillong: 1906), p. 93-94

৯. Hodgson, B. H.; Essay the first on the Koch, Bodo and Dhimal Tribes, (Calcutta, Baptist Missio Press, 1887), Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. XVIII, Part II, p. 704-706

১০. Grierson, G. A.; Lingnistics Survey of India, Vol. V, part-I, p. 63

১১. Donel, O; Census Report of India, Vol-III, (1891), p. 62, 262

১২. Chatterjee, Sunity Kumar; Kirata Jana Krti, (Kolkata: The Asiatic Society of India, rpt. 2007) p. 54

১৩. Donel, O; op.cit., p. 262

১৪. Bessaignet, Pierre; (ed), Social Research of East Pakistan, (Asiatic Society of Pakistan) (54), p. 152

১৫. Vass, J. A.; Eastern Bengal and Assam District Gazzetter Rangpur, p. 155.

১৬. Choudhury, H. N.; Cooch Behar State and its Land Revenue Settlement, 1903 rept. (ed) N. Paul, p. 126

১৭. Ibid, p. 125

১৮. দাস, অশেষকুমার; মেচ জনজাতিদের কথা, রতন বিশ্বাস সম্পাদিত 'উত্তরবঙ্গের জাতি ও উপজাতি', (কলকাতা: পুনশ্চ, ২০০১) পৃ. ১৫৮

১৯. বর্মন, উপেন্দ্রনাথ; রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস, (জলপাইগুড়ি: ১৯৪১), পৃ. ২১-২২
L. S. S. O'Malley, Census Report of India, Vol. V, Part I, (Calcutta: Bengal Secratariat Press, 1911), p. 445

২০. বিশ্বাস, অশোক; বাংলাদেশের রাজবংশী: সমাজ ও সংস্কৃতি, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৫), পৃ: ১৩-১৪
চৌধুরী, ফকরুজ্জামান; রাজবংশী, (ঢাকা: পাকিস্তান পাবলিকেশন, ১৯৬৬, ২য় সংস্করণ, পৃ. ১৯)

২১. Gait, E. A.; Census of India, (Assam Volume, 1901), p. 13

২২. Hodgson, B. H.; op. cit., part II, P. VII

২৩. Laurence A. Waddell; The Tribes of the Brabmaptura Valley: A Contribution on their Physical Types and Affinities, (Nes Delhi: Logos Press, rpt. 2000), p. 48

২৪. Risley, Herbert H.; The Tribes and Caste of Bengal : Ethnographic Glossary, Vol I, (Calcutta: Bengal Secratariate Press, 1892), p. 491-92

২৫. Baverly, H.; Census of India, Vol I, Report of Bengal (1872), p. 130

২৬. Dalton, E. T.; Descriptive Ethnology of Bengal, (Delhi: rpt. 1995), p. 89-93
Hunter, W. W.; A Statistical Account of Bengal, Vol V, (1872), p. 42-43

২৭. Chatterjee, Sunity Kumar; ibid, p. 61

২৮. বর্মন, উপেন্দ্রনাথ; প্রাগুক্ত

২৯. Chatterjee, Sunity Kumar; ibid

৩০. Thomson, W. H.; Census of India, Vol V, Part I, (1931, p. 358)

৩১. অধিকারী, হরকিশোর; রাজবংশী কুল-প্রদীপ, কলিকাতা, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা - ২১-২৫

৩২. বর্মন, উপেন্দ্রনাথ; প্রাগুক্ত

৩৩. মণিরাম কাব্যভূষণ, রাজবংশী ক্ষত্রিয় দীপক, (দিনাজপুর: ১৩১৮ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১-৫৫)

৩৪. Chatterjee, Sunity Kumar; Kirata Jana Krti, ibid

৩৫. পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, কালিকাপুরাণ, (১৩৪৮, ৭৭ অধ্যায়)

৩৬. শ্রুতিধর, রূপনারায়ণ; কামতেশ্বর কুল কারিকা

৩৭. খাঁ চৌধুরী, আমানতউল্লা আহমদ; কোচবিহারের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, (কলকাতা: মডার্ণ বুক এজেন্সি, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯০), পৃ. ৪, পাদটীকা

৩৮. দত্ত রায়, বেণু; উত্তর বাংলার লোক সংগীত, (নতুন দিল্লি: সাহিত্য অকাদেমি, ২০০২), পৃ. ১১)

৩৯. Chatterjee, Sunity Kumar; ODBL, p. 69

৪০. Chatterji, Sunity Kumar; Kirata Jana Krti, p. 61

৪১. Hodgson, B. H.; Part II and VIII

৪২. বর্মা, হেমন্তকুমার; কোচবিহারের ইতিহাস, উদ্ধৃত 'রংপুর জেলার ইতিহাস', পৃ. ৮২-১০৬

৪৩. বিশ্বাস, অশোক; প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

৪৪. রায়, গিরিজাশঙ্কর; উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয়দের পূজা-পার্বণ, (শিলিগুড়ি: এন. এল. পাবলিকেশন), ডিব্রুগড়, অসম, পৃষ্ঠা - XXI

৪৫. Risley, Herbert H.; The Tribes and Caste of Bengal : Ethnographic Glossary, Vol I, (Calcutta: Bengal Secratariate Press, 1891), p. 491

Census of India, 1931, Vol - V, Part - I, Page - 473

Bukanan, Dr. F. Hamilton; Account of the District or Zilla of Rangpur, 1810, India office Library, M.S.S.E.U.R.S.; Page - 46-47

৪৬. বর্মা, সুখবিলাস; রাজবংশী সমাজের আত্মপরিচয়, ঐতিহ্যে ও ইতিহাসে উত্তরবঙ্গ, ইছামুদ্দিন সরকার (সম্পা) এন. এল. পাবলিশার্স, ডিব্রুগড়, অসম, ২০০২, পৃষ্ঠা - ১৬৩

৪৭. Chatterjee, Sunity Kumar; ODBL, Part I, (1926) p. 69

৪৮. Ibid, p. 69

৪৯. Ibid, p. 78-79

৫০. Ibid, p. 69

৫১. Chatterjee, Sunity Kumar; ibid

৫২. Grierson, A; ibid, Vol. I, Part I, (Calcutta, rpt., 1963, p. 153)

৫৩. বর্মন, উপেন্দ্রনাথ; প্রাগুক্ত, পৃ. ৮-১০

দ্বিতীয় অধ্যায়

কোচ রাজবংশের প্রেক্ষাপটে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি

ষোড়শ শতকের শুরুতে কোচ রাজবংশের সূচনা। এই রাজ্যের বিকাশ ঘটে মূলতঃ তিস্তা-ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকা (Tista-Brahmaputra Basin) অঞ্চলে অর্থাৎ উত্তরে হিমালয়ের কোলে অবস্থিত ভুটানের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে তিস্তা-ব্রহ্মপুত্রের সংগমস্থল, পূর্বে বড়োনদী ব্রহ্মপুত্র থেকে পশ্চিমে তিস্তা করতোয়া মহানন্দার বিস্তৃত ভূ-ভাগ অংশে। প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগে এই অঞ্চল কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ত্রয়োদশ শতকে বাংলায় মুসলমান শাসনের সূচনা ও উজানী অসমে অহোম শাসনের সূত্রপাত (১২১৮ খ্রি:)-এর পর কামরূপের অর্থাৎ তিস্তা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা অঞ্চল 'কামতা' নামে পরিচিতি পায়। এই কামতা অঞ্চলে পঞ্চদশ শতকে খেন বংশীয় শাসকগণ এক শক্তিশালী রাজ্যের বিকাশ ঘটায়। এই রাজ্যের নৃপতিগণ নিজেদেরকে অভিহিত করে 'কামতেশ্বর' উপাধিতে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষাংশে আনুমানিক ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গাধিপতি সুলতান হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি:) কামতা রাজ্য একপ্রকার অবরুদ্ধ করে রাখেন এবং কৌশলে কামতা অধিপতি কামতেশ্বর নীলাম্বরকে পরাজিত করে বন্দী করতে সক্ষম হন। তারপরেই বলা যায় খেন রাজবংশের পতন ঘটে এবং কামতা রাজ্য জুড়ে অরাজকতা শুরু হয়। ছোট ছোট সামন্ত রাজা, ভুঁইয়া ও উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলি পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন। এইরকম পরিপ্রেক্ষিতে খুঁটাঘাট চিকিনা পাহাড় (অধুনা কোকরাঝাড় জেলায়) মেচ দলপতি হাড়িয়া মণ্ডল (হরিদাস মণ্ডল) কোচ ও বিভিন্ন উপজাতি (১২টি পরিবারের প্রধান) গোষ্ঠীকে নিয়ে কোচ রাজ্য গঠন করতে সক্ষম হন। তারই পুত্র বিশ্বসিংহ ষোড়শ শতকের গোড়ায় (১৫১০ খ্রিস্টাব্দ) বৃহত্তর কোচ রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। বিশ্বসিংহ তার তিন সহোদরকে (মদন, চন্দন, শিশুসিংহ) নিয়ে চিকিনাঝারের তুর্ক কতোয়ালকে হত্যা করে ভাই চন্দনকে (১৫১০ খ্রিস্টাব্দ) চিকিনার সিংহাসনে বসান। বস্তুত: এই চন্দনের অভিষেকের মধ্য দিয়েই কোচ রাজবংশের সূচনা এবং চন্দনই কোচ রাজবংশের আদি রাজা এবং বিশু বা বিশ্বসিংহই কোচ রাজবংশের

আদি পুরুষ। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বেই (১৫১৫-১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ) কোচ রাজবংশ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। মহারাজা বিশ্বসিংহ 'রাজবংশী' পরিচয় গ্রহণ করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। সেই সময় কোচ, মেচ ও অন্যান্য জাতির বৃহৎ একটা অংশ মহারাজার সঙ্গে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়। মহারাজা বিশ্বসিংহের ধর্মীয় উদারতা ও মনোভাবে রাজবংশী সমাজও হিন্দুধর্মের বশবর্তী হয়। মহারাজা বিশ্বসিংহ শিব ও দুর্গার উপাসক ছিলেন। কাশীচন্দ্র ভট্টাচার্য নামক ব্রাহ্মণের কাছে শৈব ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। গন্ধর্বনারায়ণ বংশাবলীর ৫২-তম পত্রে এর প্রমাণ পাওয়া যায় — "কাশীছন্দ্র নামে ভট্টাছর্জক আনিলা/শিবর দিক্ষক তেহে আনন্দেতে দিলা।" এডওয়ার্ড গেইট-এর আদমসুমারির প্রতিবেদন, আর এইচ এস হাচিনসন-এর 'ইস্টার্ণ বেঙ্গল এন্ড আসাম ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার' ও ই টি ডাল্টনের জাতিতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কোচ জাতির রাজা হাজোর দৌহিত্র বিশুর সময়ে কোচ জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা পায় এবং মহারাজা বিশ্বসিংহ স্বকীয় কর্মচারী ও প্রধান অধিবাসীগণের সহিত হিন্দুধর্ম অবলম্বন করেন। বলা যেতে পারে কোচ রাজবংশ প্রতিষ্ঠার সময়কাল থেকে রাজবংশী জনগোষ্ঠী রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে সুসংগঠিত হতে থাকে এবং তথাকথিত অন্যান্য জনগোষ্ঠীর তুলনায় প্রাগ্রসর হয়।[১] কোচ মহারাজাদের ধর্মীয় সংস্কারের পথ ধরেই রাজবংশী জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সমাজ সংস্কৃতির পরিসরটিও ব্যাপ্ত হয়। লোকায়ত সংস্কৃতির পরিমণ্ডলটির পাশাপাশি বর্ণ হিন্দুদের সমাজ ও সংস্কৃতির বিষয়গুলিও রাজবংশী সমাজ আত্তীকরণ প্রক্রিয়ায় (assimilation) গ্রহণ করে ধর্মীয় সম্প্রসারণে প্রকৃতিবাদ, বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত, শংকরপন্থী 'এক শরণ' বৈষ্ণবীয় মতাদর্শ এবং চৈতন্যীয় ভাবধারার সম্প্রসারণ ঘটে। অবশ্যই কোচ রাজবংশের অন্যান্য মহারাজাদের ধর্মীয় ভাবনা এবং পৃষ্ঠপোষকতায় তা সম্প্রসারিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ব্যবস্থা, খাদ্যাভ্যাস, আচার সংস্কার, রীতি পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটে। বর্ণ হিন্দুদের বিভিন্ন রীতি পদ্ধতি, ধর্মীয় আচার সংস্কারও সংযোজিত হয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কৃষি নির্ভর রাজবংশী জনগোষ্ঠী নিজস্ব লোকায়ত পরিসর, ভাব ও ভঙ্গিমাকে অক্ষুণ্ণ রেখে সমাজ ও সংস্কৃতিকে লালন পালন করে। কোচ রাজবংশের অভ্যুত্থান এবং মহারাজাদের ধর্মীয় মনোভাবের প্রসারতায় আত্তীকরণ (Assimilation), সংমিশ্রণ (Acculturation), অধিগ্রহণ (Borrowal), অনুকরণ (Imitation) এবং সাংস্কৃতিক বিনিময় প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে স্বতন্ত্রতা রেখেই রাজবংশী

সমাজ একটি শক্তিশালী জনগোষ্ঠীতে পরিণত হতে থাকে।

বিশ্বসিংহের বীরত্ব ও যুদ্ধ কৌশলে সমগ্র কামতাপুর রাজ্য কোচ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তার সময়ে কোচবিহার রাজ্যের বিস্তৃতি পশ্চিমে করতোয়া নদী থেকে পূর্বে গৌহাটি পর্যন্ত ছিল। সেই সময় কোচবিহার রাজ্যে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। এমনকি ভুটান রাজ্যও আধিপত্য স্বীকার করে নেয়। মহারাজা বিশ্বসিংহের ধর্মানুরাগ ও আন্তরিক প্রয়াসে রাজবংশী সমাজে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হয়। কাশি, কনৌজ ও অন্যান্য স্থান থেকে তিনি ব্রাহ্মণ এনে বসবাসের ব্যবস্থা করেন এবং দেবালয় স্থাপন করেন। এই ব্রাহ্মণগণই তার অভিষেক কালে তাকে 'বিশ্বসিংহ' উপাধিতে ভূষিত করেন। পরবর্তীকালে তাঁর পুত্র মহারাজা নরনারায়ণও ধর্মানুরাগী ছিলেন। নরনারায়ণ সিংহাসনে আরোহণ করেই একজন ব্রাহ্মণকে নাজির পদে বসান। কালাপাহাড় কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত কামাখ্যামন্দির সংস্কার করেন এবং নিত্য পূজার ব্যবস্থা করেন। হয়গ্রীব মাধব মন্দিরের পুনর্নির্মাণও তাঁর কীর্তি। তাঁর সময়কালে রাজ্যে সাহিত্যচর্চা শুরু হয়। পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ ছিলেন সভাপণ্ডিতদের মধ্যে অন্যতম। ধর্মাচার্য শংকরদেব তাঁর সময়কালেই কোচবিহারে আশ্রয় লাভ করেন। তিনিও মিথিলা এবং গৌড় অঞ্চল থেকে স্বরাজ্যে ব্রাহ্মণদের নিয়ে আসেন তাঁদের ব্রহ্মোত্তর জমি প্রদান করেন।[২] মহারাজা নরনারায়ণের সময় কামতা-কোচবিহার রাজ্য সমগ্র উত্তরবঙ্গ, ভুটান, আসাম, কাছাড়, জয়ন্তিয়া, ত্রিপুরা এবং বঙ্গোপসাগরের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[৩] মহারাজা নরনারায়ণের সময়কালে লাঙল ব্যবহার ও কৃষি সভ্যতার বিস্তার ঘটে। বিশেষ করে উপজাতি এলাকাগুলিতে লাঙল ভিত্তিক কৃষি সভ্যতার সম্প্রসারণ ঘটে। ব্রাহ্মণগণ এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেইসঙ্গে তিথি-নক্ষত্র, বীজ-শস্য সংরক্ষণ ও গো প্রজননের পদ্ধতিও তাদের জানা ছিল, সে ধারণারও প্রসার ঘটে। বস্তুত: রাজমহিমা প্রচারের সাথে সাথে কৃষি ও বাণিজ্যের প্রসারে ব্রাহ্মণগণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।[৪] আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য আদিবাসী কৌম অবস্থা থেকে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হয়ে রাজবংশী সমাজে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়ার ফল শুধু ধর্মান্তকরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এর মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারাতে পরিবর্তন আসে । প্রবর্তন হয় কোদাল ও দা-র বদলে লাঙল অর্থাৎ কৃষিকার্যে অগ্রগতির গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আবার বাড়িতে পূর্ব প্রথায় শূকর পালন ব্যবস্থার পরিবর্তে শাক সবজি বাগান করা শুরু হয়। পরিবর্তন ঘটে বাড়িঘর

তৈরির ক্ষেত্রেও। পূর্বের লতাপাতা, গাছগাছড়া দিয়ে নড়বড়ে বাড়িঘরের জায়গায় আসে মৃত্তিকা নির্মিত ভিত যুক্ত বাড়িঘর নির্মাণের কৌশল। মদ্যপান, আড়ক জাতীয় খাদ্য গ্রহণ থেকে ধীরে ধীরে সরে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। মৃতদেহ সৎকারে আসে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। হিন্দুরীতি অনুসরণ করে মাটিতে পুঁতে সৎকারের পরিবর্তে গৃহীত হয় আগুনে দাহ করে সৎকার প্রথা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে মুখের ভাষায়। প্রচলিত কথ্য ভাষার অনুবর্তী হয়। কোচ রাজবংশের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে কোচ ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে এটা ঘটে এবং বলা যেতে পারে উপজাতীয় সত্তার রূপান্তর ঘটতে থাকে।[৫] এই সময় রাজবংশী জনগোষ্ঠী হিন্দুধর্মের আচার সংস্কারের বশবর্তী হলেও বিভিন্ন উপজাতি জনগোষ্ঠী (কোচ, মেচ, কাছারি) গুলি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম মেনে নেয়নি।[৬] ফলে মহারাজা নরনারায়ণ ১৫৪৬ খ্রিস্টাব্দে অহোম রাজ্য আক্রমণের পূর্বে এক আদেশনামার দ্বারা কোচ, মেচ, কাছারি উপজাতি গোষ্ঠীকে উপজাতি প্রথা অনুসারে পূজা করার অধিকার প্রদান করেন।

কোচবিহার রাজ্যে 'হিন্দু ধর্মের সম্প্রসারণ' বিষয়টি বিতর্কিত। ঐতিহাসিক বিবৃতি থেকে জানা যায় ষোড়শ শতাব্দীতে কোচরাজ বিশ্বসিংহ তাঁর পূর্বের আচার-আচরণ পরিত্যাগ করে বৈদিক ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং সেইসঙ্গে তার অসংখ্য অনুগামীও রাজার নতুন গৃহীত ধর্মকেই অনুসরণ করেছিল।[৭] বিষয়টি উল্লেখ্য এইজন্য যে সুদূর অতীতকালে কোচবিহার রাজ্যে যে সব জনগোষ্ঠীর লোক বসবাস করত তার সিংহভাগ ছিল অনার্য এবং প্রাকবৈদিক বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষ। এই প্রাক্ আর্য বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষগুলো অসংখ্য জনগোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। এই সকল জনগোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — কোচ, মেচ, থারু, রাভা, ধীমাল, পলিয়া, গাড়ো, কাছারি, ডিমাসা, ত্রিপুরী, চুটিয়া, মোরাং প্রভৃতি।[৮]

কোচবিহার রাজ্যের এই সব জনগোষ্ঠীর মানুষগুলো কোন ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে তীব্র বিতর্ক বর্তমান। তবে অধিকাংশ গবেষকদের মতে ষোড়শ শতাব্দীতে রাজা বিশ্বসিংহের আমলে কোচবিহার রাজ্যে হিন্দুধর্ম তথা বৈদিক ধর্মের উদয়ের পূর্বে এই অঞ্চলের অধিবাসীগণ 'লোকায়ত' ধর্মের অনুগামী সর্বপ্রাণবাদে (animism) বিশ্বাসী ছিলেন।[৯] তারা লোকায়ত ধর্মীয় বিশ্বাস তথা লৌকিক দেব-দেবীর পূজার্চ্চনার মধ্য দিয়ে মাঙ্গলিক ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করত। এই সমস্ত লৌকিক পূজা পার্বণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — সুবচনী পূজা,

হ্যাচড়া-প্যাচড়া পূজা, হুদুম দ্যাও প্রভৃতি।[১০] তবে প্রাক্ বৈদিক এইসব জনগোষ্ঠীর মানুষজন হিন্দু সংস্কৃতির বাইরে জীবনযাপন করলেও তারা অসংখ্য হিন্দুদেবীর উদ্দেশ্যে মন্ত্রোচ্চারণ করত।[১১] কোচ রাজা বিশ্বসিংহ তাঁর রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করার পর নিজের সামাজিক ও রাজকীয় মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসী হন। কথিত আছে এরই নিমিত্তে রাজা বিশ্বসিংহ কাশী, কনৌজ ও ভারতের অন্যান্য স্থান থেকে অসংখ্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এনে নিজ রাজ্যে বসবাসের ব্যবস্থা করেন।[১২] ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কোচ রাজ্যে নব্য হিন্দু সমাজ গঠনে উদ্যোগী হন এবং পরবর্তীকালে 'একমাত্র শিব অনুগৃহীত ব্যক্তিই জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য' বিষয়টি প্রাধান্য পায়।[১৩] সঙ্গত কারণে প্রচার লাভ করে যে বিশ্বসিংহের জন্মদাতা দেহধারী হাড়িয়া মণ্ডল হলেও মুখ্যত: তিনি স্বয়ং মহাদেবের (শিব) ঔরসজাত।[১৪] আবুল ফজলের 'আকবরনামা', কোচবিহার রাজের সরকারি পুঁথি দস্তাবেজ, রাজোপাখ্যান, বামাচরণ ঠাকুর প্রণিত 'শংকরচরিত' এবং দরঙ্গ রাজবংশাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে এই বৃত্তান্তের বিবরণ পাওয়া যায়। এর অনতিপরেই রাজা বিশ্বসিংহ কালী চন্দ্র (কালীচন্দ্র) ভট্টাচার্য নাম্নী ব্রাহ্মণের কাছে শৈব ধর্মে দীক্ষিত হন।[১৫] কোচ-রাজবংশ শৈব বংশ হিসাবে আখ্যায়িত হয়।[১৬] হ্যামিলটন বুকাননের বিবরণেও পাওয়া যায় যে রাজা বিশ্বসিংহ ও তাঁর অনুগামীবৃন্দ তাঁদের অসংস্কৃত আচরণ ধর্ম বর্জন করে হিন্দুধর্মের বশবর্তী হন।[১৭] এ প্রসঙ্গে গবেষক এস, রাজগুরুও মন্তব্য করেন "বিশ্বসিংহ নিজে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেন এবং শিব পার্বতীর উপাসক হন। তিনি দেবী দুর্গার পূজা সম্পন্ন করেন। সমস্ত কোচবিহারে তিনি হিন্দুদের বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই সকল মন্দিরে পূজার জন্য মিথিলা থেকে ব্রাহ্মণ নিয়ে আসেন।"[১৮] এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কোচবিহার রাজ্যে হিন্দুধর্মের যে প্রভাত রবি উদিত হয় তা মধ্যগগনে আসতে সময় লাগে। রাজা এবং কতিপয় প্রজার হিন্দুধর্ম গ্রহণের মধ্য দিয়ে সমগ্র রাজ্যে হিন্দুধর্মের সম্প্রসারণ ঘটানো সম্ভব হয়নি।[১৯] তবে দ্রুত গতিলাভ করে রাজানুকূল্যে এবং কিছু কিছু পদক্ষেপে তা তরান্বিত হয়। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় মন্দির স্থাপন, পুরোহিত নিয়োগ এবং পূজার্চ্চনার ব্যবস্থাকরণের মধ্য দিয়ে দ্রুত প্রসার লাভ করে। এই সময়ই বাণেশ্বর, জল্পেশ্বর, জটেশ্বর, সর্বেশ্বর, নীলেশ্বর, ভদ্রেশ্বর প্রভৃতি নাম্নী শিবমন্দির রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত হয়।[২০] পাশাপাশি আবার বিভিন্ন নামে শিবের আরাধনায় জনগণ অনুরক্ত হয়। যেমন মহাকাল, ধূমবাবা, জটাবাবা তেমনি আবার মাশান ঠাকুর, বুড়া ঠাকুর ইত্যাদি নামে পূজিত হতে থাকে।

বিভিন্ন স্থানে ঠাকুরের পাট ও মেলা বসে। পূজার্চ্চনায় নিজস্ব উপাচার দুধ, চিড়ে, আটিয়া কলা (বীজ যুক্ত কলা), পাঁঠা, হাঁস, টাকা, পয়সা ইত্যাদিও উৎসর্গিত হতে থাকে। এমনকী মন্ত্রোচ্চারণে লৌকিক ভাষা শব্দের সংমিশ্রণ ঘটে।[২১] যেমন —

ওম মহাকালং যজ্ঞে দেব্যা
দক্ষিণে ধ্রম্রব্য বর্ণকম।
বিশ্রুতং দণ্ড ঘট্রাঙ্গৌ দংস্ট্র
ভীম মুখ: সিনম।[২২]

রাজবংশী সমাজ সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই কৃষিতে সম্পৃক্ত। কৃষিকে ঘিরেই তাই সমাজ এবং যাবতীয় সংস্কৃতি। অতীতে প্রাচীন প্রথাগত পদ্ধতিতে চাষাবাদ হত। সেচ ব্যবস্থা ছিল না। তবে প্রথাগত জ্ঞানে প্রকৃতি নির্ভরতাকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। সেটা রাজবংশী সমাজের লোকপ্রযুক্তির ভাবনা থেকে বোঝা যায়। উত্তরবঙ্গের প্রান্তীয় অংশের বিভিন্ন জনজাতিরা ঝুম চাষ প্রথায় অভ্যস্ত থাকলেও তুলনামূলকভাবে রাজবংশীরা চাষাবাদে অনেক অগ্রসর ছিল। জঙ্গ ল ও জলাভূমিকে তারা চাষযোগ্য করে তোলে। এ প্রসঙ্গে হান্টারের উক্তি উল্লেখযোগ্য ..... in the Western Duars ..... there is still a great deal of available uncultivated jungle land and the tenure holders have to offer additional inducements to the husbandman.[২৩]

কোচ-রাজবংশের সূচনাকালে উত্তরবঙ্গের বিস্তৃত অঞ্চলে আদিম সংস্কৃতির ধারাই ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকেও এতদঞ্চলে ছিল গভীর জঙ্গল। অপরদিকে আবহাওয়া ছিল স্যাঁতস্যাঁতে। স্থায়ীভাবে বসবাস করা মানুষের সংখ্যা ছিল কম। ধীরে ধীরে মানুষের সংখ্যাও বাড়ে। আবাদি জমি বৃদ্ধি পায়, স্থায়ী মানুষের সমাগম ঘটে। জঙ্গল পরিষ্কার করেই চাষের জমি বিস্তৃত হয়। রাজবংশী সমাজের কৃষি পরিবারগুলি কয়েক ঘর মিলে একসঙ্গে জঙ্গল পরিষ্কার করত। এরাই হত পরিষ্কৃত জমির মালিক। তারপর দলগতভাবে যৌথশ্রমে চাষবাস করত। জমি খোড়াখুড়ির কাজ করত পুরুষেরা এবং মহিলারা জঙ্গল পোড়ানো ও রোপনের কাজগুলি করত।

কৃষি পদ্ধতির যন্ত্রানুষঙ্গ ছিল কুড়াল, দা ও কোদাল। এই যন্ত্রপাতির সাহায্যে তারা জঙ্গল

পরিষ্কার করে কৃষিক্ষেত্রের বিস্তার ঘটায়। শুখা মরশুমে আগাছা, ঝোপ, ঝাড় এবং ডালপালা পরিষ্কার করার পর গর্ত করে বীজ রোপন করত। বীজ বপনের কাজ ফেব্রুয়ারি-এপ্রিলের মধ্যে শেষ করত। তারপর ঢেকে রাখত আগাছা পাতা দিয়ে; যাতে করে পশু, পাখি খেয়ে না ফেলে। একই জমিতে একই সময়ে একাধিক বীজ বপন করত। এই প্রবণতা এখনও রাজবংশী কৃষকদের মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়। প্রধান ফসলগুলির মধ্যে ছিল বাঙ্গা বা তুলো, শুষ্ক ধান (শুষ্ক মরশুমের ধান) এবং কাউন। অন্যান্য ফসলের মধ্যে ছিল ভুট্টা, বিভিন্ন প্রকারের ডাল, তৈলবীজ (তিল), তিসি, তরিতরকারী, লঙ্কা আর কচু। তুলোর গুরুত্ব ছিল সবচেয়ে বেশি কারণ এর বিক্রয় অর্থেই আসত লবণ, লোহা এবং প্রয়োজনীয় আমদানি দ্রব্য, বিশেষ করে গবাদি পশু এবং এই তুলো বিক্রয়ের অর্থই এদের খাজনা দিতেও সমর্থ করে।[২৪] এখনও তাই প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গের রাজবংশী পরিবারের বাড়িতে দু-একটি হলেও বাঙ্গা বা কার্পাস তুলোর গাছ দেখা যায়।

এইভাবে পর্যায়ক্রমে গ্রাম ও স্থায়ী বাসস্থান গড়ে ওঠে। আবাসস্থল পরিবর্তন করত চাষের জমি সম্প্রসারণের সাথে সাথে। স্থায়ী ভিটা, আবাসস্থল দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার পাশাপাশি কৃষিক্ষেত্রের উপর দখলদারি, স্থায়ী ভিটার উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যক্তিগত মালিকানার বিষয়টিও আসতে থাকে। পরে লাঙল দিয়ে চাষ করা এবং স্থায়ী কৃষি ব্যবস্থার প্রচলন এই ব্যক্তিগত মালিকানার ভাবনাকে সুদৃঢ় করে। এভাবেই যৌথ ভাবনার বদলে ব্যক্তিগত পরিবার ভিত্তিক অধিকারের সূচনা হয়। পরিবার ভিত্তিক আবাদি জমির চাষবাস প্রসঙ্গে বুকানন হ্যামিলটনের বক্তব্য তুলে ধরা যেতে পারে যে তখন খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল অনিশ্চিত কারণ জমিগুলি ছিল ডাঙ্গা (উঁচু) এবং বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল। যে সমস্ত পরিবার এই অস্থায়ী চাষের উপর নির্ভরশীল ছিল তাদের জীবনও ছিল অনিশ্চিত এবং সমস্যাসঙ্কুল। জীবনধারণের স্বনির্ভরশীলতার জন্য অস্থায়ী কৃষকেরা মুরগি, শূকর, ছাগল, গবাদি পশু পালন করা ইত্যাদির সঙ্গে গৃহ সংলগ্ন বাগানে বিভিন্ন শাকসবজি - লঙ্কা, ডাল, স্বাদু গাছের গোঁড় প্রভৃতি উৎপাদন করত।[২৫] রাজবংশী সমাজে এখনও এই গৃহ সংলগ্ন বাগানের অস্তিত্ব দৃশ্যমান। পরবর্তীকালে এই বিবর্তনের সঙ্গে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত: অস্থায়ী ঝুম পদ্ধতি থেকে স্থায়ী কৃষি ব্যবস্থার প্রচলন। দ্বিতীয়ত: যে সমস্ত পুরুষ রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে শ্রমদান করত তাদের রাষ্ট্রের পক্ষ

থেকে স্থায়ী মালিকানায় চাষের জমি প্রদান। তৃতীয়ত: বিত্তশালী গোষ্ঠীর উদ্ভব এবং অর্থনৈতিক যোগাযোগ স্থাপন ও ব্যবসায়িক শ্রেণির আবির্ভাব। এসব কারণে উপজাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলির পরিবর্তন ঘটতে থাকে। অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সূত্রে সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিবর্তনও সূচিত হয়। আদিম উপজাতীয় সংস্কৃতিরও পরিবর্তন ঘটতে থাকে।[২৬] আত্তীকরণ, সংশ্লেষণ ও অনুকরণের মধ্য দিয়ে আর্যীকরণও গতিসম্পন্ন হয়ে ওঠে। ভাষা, সংস্কৃতি বদলাতে শুরু করে। আবার জাতি ব্যবস্থার সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে উপজাতীয় সমাজের সংহতি ও সংস্কৃতি ভাঙতে থাকে দ্রুতগতিতে। উন্নতমানের কৃষি পদ্ধতির উপায় গ্রহণ যেমন - আমন ধানের উৎপাদন কৌশল অর্থাৎ বীজতলা থেকে চারা তুলে রোপন এবং লাঙলের ব্যবহার আয়ত্ত্ব করে। এর ফলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটলেও পুরুষাণুক্রমিক ধর্মবিশ্বাসকে অনেকক্ষেত্রে বর্জন করেনি।

বঙ্গ বা বাংলা প্রদেশ গঠিত হবার আগে বাংলার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। বিভিন্ন জনপদ বিভিন্ন কৌম সমাজ নিয়ে নিজস্ব রীতিনীতি, আচার সংস্কার নিয়ে সমাজ সংগঠন গড়ে তুলেছিল। রাঢ়, বঙ্গ, সমতট, হরিকেন, পুণ্ড্রবর্ধন, প্রাগজ্যোতিষপুর, কামরূপ ইত্যাদি নামের প্রেক্ষাপটে তাই বহু আখ্যান ও বহু অতিক্রমের ঘটনা যুক্ত হয়েছে। এইসব জনপদগুলির মানুষও ছিল অনার্য বা প্রাক-আর্য-কৌম-সমাজ গোষ্ঠী। অঞ্চলভেদে আলাদা রীতি পদ্ধতি, সামাজিক প্রথা দৈনন্দিন জীবনযাপনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিল। তবে একথা বলা যায় এইসব রীতিনীতি প্রথা ছিল আর্য ও বৈদিক সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন। কারণ বৈদিক সংস্কৃতির প্রবেশ ঘটেছিল অনেক পরে।

তথাকথিত বৃহৎ উত্তরবঙ্গ বলতে আমরা যা বুঝি তার নির্দিষ্ট কোন প্রদেশ বা শাসন বিভাগ ছিল না। নির্দিষ্ট এলাকা ভিত্তিক বিভাজন ঘটে অনেক পরে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্ষমতা লাভের পরে, সেটাও তারা করে প্রশাসনিক স্বার্থে এবং আগে যে সব এলাকা বিভিন্ন রাজবংশের নামে চিহ্নিত ও শাসিত হত। যেমন - প্রাগজ্যোতিষপুর, কামরূপ, কামতাপুর, কোচবিহার, পুণ্ড্রবর্ধন বা পৌণ্ড্রবর্ধন, বরেন্দ্র, গৌড় প্রভৃতি নামে। তাই এসব অঞ্চলের সামগ্রিক সমাজ গঠনের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। গোষ্ঠীগত রীতিনীতি, আচার-সংস্কার, প্রথা এমনকী মননভাবনাও আলাদা আলাদা ভাবে সমাজজীবনে প্রভাব ফেলে।

এতদঞ্চলের ধর্মীয় জীবন আলোচনা করতে হলে প্রধানত দুটি ভাগে আলোচনা আসে।

প্রথমত: আর্য ধর্ম এই অঞ্চলে প্রবেশ করার আগে এই অঞ্চলের মানুষের গোষ্ঠীগত লোকায়ত ধর্ম এবং দ্বিতীয়ত: আর্য ধর্ম প্রবেশ করার পর এই অঞ্চলের ধর্মীয় অবস্থা। হিমাংশু কুমার সরকারের বক্তব্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে - এই আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার আগে উত্তরবঙ্গের আদিম অধিবাসীদের ধর্মমত সম্পর্কে জানার কোন উপায় নেই। সেই ধর্মমত যে রকমই হোক আর্যদের আগমনের ফলে তা রূপান্তরিত হয়ে ধীরে ধীরে আর্য ধর্মের সঙ্গে মিশে গেছে। এই আর্যধর্মের মূল ধারা ছিল দুটি - প্রথমটি হচ্ছে বৈদিক বা বেদ নির্ভর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে বেদ বিরোধী জৈন, আজীবক ও বৌদ্ধ ধর্ম।[২৭]

উত্তরবঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি প্রবেশ করে অনেক পরে। তার আগে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর ধর্ম কি ছিল সে নিয়ে বিতর্ক থাকাই স্বাভাবিক। তবে রাজবংশী জনগোষ্ঠী কৌম গোষ্ঠীভিত্তিক ছিল সেটা যেমন বলা যায় তেমনি নিজস্ব কৌম রীতিনীতি, নিয়ম পদ্ধতি অনুসরণ করত। জীবন ধারণের বিভিন্ন পর্যায়ে কিছু নিয়ম পদ্ধতি সামাজিক ক্ষেত্রে প্রচলিত ছিল। প্রাত্যহিক জীবনে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি, বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিভিন্ন শক্তির আরাধনা ও পূজা করত। প্রকৃতির প্রতিটি শক্তিকেই তারা ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করত। কৃষিক্ষেত্রে ফসল বোনা থেকে ফসল ঘরে তোলা এবং তা খাওয়া পর্যন্ত প্রত্যেকটি পর্যায় বিভিন্ন পূজা-পার্বণের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন করত। বস্তুত: এই রাজবংশী জনগোষ্ঠী ও আদিম অধিবাসীদের মত সর্বপ্রাণবাদে (animism) বিশ্বাসী ছিল তাই গাছ, পাথর, পাহাড়, পশু, পক্ষী সবেতেই ঠাকুর দেবতা কিংবা শক্তির আধার হিসাবে মান্য করত। আজকের সময়েও লক্ষ করলে তাই বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানে আদিম কৃষি সম্পৃক্ততা, প্রকৃতিবাদ, প্রজনন ও উর্বরাশক্তির স্মৃতি বহন করে।

রাজবংশী সমাজের রীতিনীতি, পূজা-পার্বণ প্রথার মধ্যে বৈদিক শাস্ত্রের প্রভাব ছিল না। পরবর্তীকালে সংযুক্ত হয়েছে, সেটাও অনেক পরে। আজকেও লোকায়ত বলয়ের পরিসর তাই চিহ্নিত করে। গাছগাছড়ার পূজা, বাঁশ পূজা, মাশান ঠাকুর, মহাকালের পূজা, গাবুর ঠাকুর, বুড়া ঠাকুর, তিস্তা বুড়ির পূজা, গারাম ঠাকুর ইত্যাদি আরও অনেক ঠাকুর দেবতা এবং পূজা প্রকরণের রীতি পদ্ধতির মধ্যেও ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের কিংবা বৈদিক শাস্ত্রের কোন মিল নেই। এছাড়াও ধ্বজা বা নিশান পূজা, গাছ পূজা, যাত্রা পূজা, ধর্ম ঠাকুরের পূজা, গমীরা বা গাজন-চড়কের পূজা ইত্যাদি

প্রকৃতি ভাবনারই চিহ্ন। প্রকৃতি সম্পৃক্ততাকে স্মরণ করায়, সর্বপ্রাণবাদের ভাবনাকে পরিস্ফুট করে। উত্তরবঙ্গে বৈদিক ব্রাহ্ম্য সংস্কৃতির প্রবেশ ঘটে অনেক পরে। তবে মহাভারতের যুগে প্রাগজ্যোতিষপুরের সাথে আর্য সংস্কৃতির পরিচয় ঘটে।[২৮] ভগদত্তের সময়ে এই পরিচয় ঘটলেও আর্য সংস্কৃতি বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিস্তার ঘটে আরও অনেক পরে, গুপ্ত শাসনকালেরও পরবর্তী সময়ে। বলা যেতে পারে কামতা রাজ্যের খেন বংশের সময়কালে ক্রমান্বয়ে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রসার ঘটে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক শৈলেন দেবনাথের বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে — The three kings namely Pratapdhawaj, Durlab Narayan and Tamradhawaj well before Nildhawaj patronized for the Hinduisation of the subject people of Kamrup. In continuation of the process ahead of him. Nildhawaj and his descidants Chakradwaj and Nilambar did their best for Brahmanical Hinduization of Kamtapur.[২৯] Hamilton Bukanon-এর An Account of the District or Zila of Rangpur গ্রন্থেও এই বিষয়টির উল্লেখ পাওয়া যায় "The new Raja seems to have been much guided by his minister, the Brahman assumed a hindu title, Niladhawaj and placed himself under the tuition of the secret order. For this purpose a colony of Brahmanas were introduced from Maithila and from thence we may perhaps infer the country of minister."[৩০] তারপরে কোচ রাজত্বের সূত্রপাতে আর্যীকরণের হাত ধরে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রসার। বিশ্বসিংহের সময় থেকেই কোচ রাজারা হিন্দুধর্মের সংস্পর্শে আসে এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এ প্রসঙ্গে শুভজ্যোতি রায়-এর বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে — The link between the formation of a royalty among the Koches and the replacement of the tribal belief system with that at Hindu Practices is clearly shown in the stories surrounding the origin of the now famous Kamakshya temple near Gouhati. Biswasingha is with having built this temple over a mound where the inhabitants of the nearby Nilachal hill used to sacrifice pigs, fowls and other animal and birds, and with having

imported numerous Brahmans from Kanowj and Benaras and other centres of learning to run it.[৩১] স্বাভাবিকভাবে সে সময় থেকে শুধু রাজবংশ নয় বাইরের সমাজগোষ্ঠীর মধ্যেও হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তার লাভ করে। শুভজ্যোতি রায় তাই লিখেছেন — It is claimed that during the reign of Pran Narayan (1632-1665) sanskrit was the Language of the Court and that all the royal officials conversed in that language.[৩২]

রাজবংশী সমাজে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবও পড়ে। পাল বংশের শাসনকালে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার লাভের সময়কালে বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠীও এই ধর্মের অনেক কিছু গ্রহণ করে। তন্ত্রমন্ত্র, পূজা পদ্ধতি, সাধনা এমনকী দেবদেবীর প্রকারভেদে (ভূত, প্রেত, যোগিনী) এটা আজও উপলব্ধি হয়। এ বিষয়ে শৈলেন দেবনাথের বক্তব্য — In the present context, however, it can be said that along with other places of Eastern India Kamtapur also became a seat of Buddhisam and Buddhist learning, and no wonder, for that reason the Buddhist teachers Nalanda visited often the kingdom of Kamtapur.[৩৩] সুদূর অতীতে বিস্তীর্ণ উত্তরবঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ছিল। বাংলায় ইসলাম প্রচারের অব্যবহিত পূর্ববর্তী যুগ পর্যন্ত বৌদ্ধ জাতিই ছিল বরেন্দ্রভূমির সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী। করতোয়া নদী বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচারের পৃষ্ঠভূমি ছিল, প্রাচীনতম অনেকগুলি প্রত্নচিহ্নের অধিষ্ঠান তারই সাক্ষ্য বহন করে। পালবংশীয় রাজাদের আমলেই গৌড়-বরেন্দ্রী বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রসারের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ ঘটে। গুপ্ত সম্রাটগণের শাসনকাল পর্যন্ত বরেন্দ্রীতে হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ — এই তিনটি ধর্মীয় সম্প্রদায় ছিল স্থানীয় অঞ্চলের প্রধান অধিবাসী। পাল রাজত্বের শেষার্ধ পর্যন্ত বরেন্দ্রীতে বৌদ্ধধর্মের গৌরব ও প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ছিল। পাল বংশের পতনের সঙ্গে সঙ্গে এই ধর্মের ভাগ্য ও পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক কারণ ছাড়াও কৃচ্ছ্রসাধন, জ্ঞানচর্চা, গুহ্য সাধনা বা মহাসুখবাদ ইত্যাদি নির্বাণানুগ জীবনযাত্রার পরিবর্তে উচ্ছৃঙ্খল ভোগবিলাস, যৌনক্রিয়াসক্তি ও চারিত্রিক হীনাচার বিষয়গুলিও গুরুত্বপূর্ণ। সেন বংশীয় রাজাদের ব্রাহ্মণ্যবাদী পৃষ্ঠপোষকতায় আন্তঃধর্মীয় সংঘর্ষ হয় এবং বৌদ্ধধর্মের পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে।

রাজবংশী সমাজের মধ্যে বৌদ্ধধর্মীয় প্রভাব যথেষ্টই বিস্তার লাভ করে। কিছু কিছু ধর্মীয় ও

সাংস্কৃতিক চিহ্ন তাই আজও দেখা যায়। রাজবংশী সমাজের উপর নাথ ধর্ম ও যোগীদের প্রভাব অনস্বীকার্য। নাথ যোগী গোরখনাথের প্রভাব রাজবংশী সমাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে পড়ে। তাছাড়া মহাযানীদের প্রভাব ও ভাবনাতেই শক্তিবাদী তান্ত্রিক ভাবনার সংযোজন রাজবংশী সমাজে ঘটে। উত্তরবঙ্গে প্রচলিত গোপীচন্দ্র ময়নামতির আখ্যানে সেটা ধরা পড়েছে। নাথ ও তান্ত্রিক শাক্ত সাধনার অনেক বিষয় আজও রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতিতে বিদ্যমান। বিগত কয়েক দশকে এই ভাবনার অপসারণ ঘটলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এখনও তার অস্তিত্ব বর্তমান। ময়নাগুড়ি এলাকার কিছু মন্দির যেমন চিহ্ন বহন করছে তেমনি বাণেশ্বর, সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির কিংবা আচার-সংস্কারে (বাণেশ্বরের মন্দিরে যেমন মুচড়ে পাঁঠা মেরে উৎসর্গ করা হয়) আজও দৃশ্যমান। তন্ত্রমন্ত্র, জপতপ কিংবা গুহ্য সাধনার বিষয়গুলি তারই উদাহরণ। রাজবংশী সমাজে গুহ্য সাধনার বিষয়গুলি আজকে অন্তর্হিত হলেও মন্ত্রশক্তি, তুকতাক, জাদুবিশ্বাস এখনও মুছে যায়নি। ব্রাহ্মণ্যবাদের দৌরাত্ম্যে অনেককিছুর অপসারণ ঘটলেও এখনও আছে বিশ্বাস মননের ভাবনায়।

তাই লৌকিক আচার-সংস্কার রীতি পদ্ধতির মধ্যে এখনও কিছু কিছু চিহ্ন স্পষ্ট পাওয়া যায়। লোকায়ত জীবনের আচার বিচার, রুচি প্রকৃতি, আশা আকাঙ্ক্ষা, জীবনযাত্রার রীতি পদ্ধতি, পূজা-পার্বণ এমনকী বিশ্বাস ধর্মেও এই মিশ্র ভাবনার রূপ ফুটে ওঠে। তাছাড়া বর্তমান উত্তরবঙ্গের বিস্তৃত অঞ্চলে অতীতে ভুটিয়াদের আধিপত্য ছিল। তাদের সঙ্গে সুদীর্ঘকালের সহাবস্থানে বৌদ্ধিয় আচারের বহু কিছু (তন্ত্রমন্ত্র, তুকতাক, অভিচার ক্রিয়া, তাবিজকবজ, ভূত-প্রেতে বিশ্বাস, দৈত্য-দানো ইত্যাদি) রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হয়। কোচবিহার নামের মধ্যেই তার প্রভাব বর্তমান। বৌদ্ধ ব্রাহ্মণরা এই এলাকায় ঘুরে বেড়াতেন। মদনমোহন মন্দিরে যে কালীর পূজা হয় সেটিও বৌদ্ধিয় চামুণ্ডা কালী। রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সমাজ সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের মধ্যে বৌদ্ধিয় সূত্রের বেশ কিছু অভ্যাস আজও লক্ষণীয়। শংকরদেবের বৈষ্ণবীয় ভাবনা যেমন রাজবংশী সমাজজীবনে প্রভাব বিস্তার করে তেমনি শ্রীচৈতন্যদেবের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনাও প্রসার লাভ করে। সেখানে যেমন কোন বিরোধ তৈরি হয়নি তেমনি রাজানুকূল্যে শংকরদেবের 'একশরণ' ধর্মমতের পাশাপাশি বৃহত্তর জনসমাজে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত আদর্শের সমন্বয় ঘটে। বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠীর শৈব, শাক্ত প্রভাব বরাবরই ছিল। কামরূপের বর্মন রাজবংশের ধারা অনুক্রমে এই শৈব ভাবনার প্রসার ঘটে। মহারাজা বিশ্বসিংহ তো শৈব বংশীয়

হিসাবে আখ্যা লাভ করেন। কামরূপের বর্মন রাজবংশের রাজারা পুষ্য বর্মন থেকে ভাস্কর বর্মন পর্যন্ত সকলেই ছিলেন শৈব।[৩৪] এইজন্যই প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন নামে (জল্পেশ্বর, জটিলেশ্বর, বাণেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, যণ্ডেশ্বর, মহাকাল, বটেশ্বর) শিবের প্রাদুর্ভাব। শিবের দেশ হিসাবেও আখ্যায়িত। বাড়ি বাড়ি মন্দির, থান স্থানে শিবঠাকুরের অবস্থান। আবার বিভিন্ন দেবতার মধ্যে শিবের সম্মীলন। সেটা গারাম ঠাকুর থেকে গোরখনাথ, রাখাল ঠাকুর, গাবুর, সোনা রায়, বুড়া ঠাকুর, মাশান, গমীরা প্রভৃতি দেবতার মধ্যে শিবেরই প্রতিরূপ। শৈব ধর্মের মধ্যে শাক্ত ধর্মেরও সংযুক্তি ঘটেছে। রাজবংশী সমাজে লোকায়ত ভাবনায় মাতৃকা শক্তির বহু রূপ। তন্ত্র সাধনা, গুহ্য সাধনার সঙ্গে এই শক্তি ভাবনা সমাহিত হয়েছে। কামরূপ কামাখ্যা কিংবা গোসানী, চণ্ডী দেবী তারই প্রতিভূ। আবার পীর, ফকিরদের সংস্পর্শে ইসলামীয় বিশ্বাস সংস্কারও রাজবংশী লোকায়ত ধর্মে অনায়াসে সমাহিত হয়েছে। সত্যপীর তার অন্যতম। আবার নস্য শেখ সমাজ ধর্মান্তরিত হলেও তাদের পূর্বের রীতিনীতি, আদবকায়দা, নিয়ম, অনেক প্রথা তারা ত্যাগ করতে পারেনি। চলন বলন, পোষাক পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, সংস্কারে তারা পূর্বের আদবকায়দা অনুসরণ করে। ভাষা এমনকী মনন সংস্কৃতি ভাবনাতেও তারা আগের মতই। বলা যায় বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সমাজ সংস্কৃতির অংশ হিসাবে এতদঞ্চলের নস্য শেখ মুসলিম সমাজকে বাদ দেওয়া যায় না। বিশেষ করে যদি কোচ-রাজবংশী কিংবা পূর্ববর্তী সময়ের সমাজ সংস্কৃতির বিষয়টি তুলে ধরা হয়।

শংকরদেবের প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মের দ্বারা রাজবংশী সমাজ ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। রাজানুগ্রহে সে প্রভাব বৃদ্ধি পায়। বলা যেতে পারে বৃহত্তর রাজবংশী সমাজই বৈষ্ণবভাবাপন্ন, শৈব, শাক্ত বিশ্বাসের পাশাপাশি কোচ-রাজবংশের মতই লালন করেছে। এই ভাবাপন্নতার সঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেব প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মেরও সমন্বয় ঘটেছে। মহারাজা নরনারায়ণের সময়কালে (১৫৩৩-১৫৮৭ খ্রি:) শংকরদেব যেমন নওগাঁও থেকে কোচ-রাজ্যে এসে আশ্রয় নেন ঠিক সেই সময়েই মহারাজা নরনারায়ণ রাজ্যভার গ্রহণের পরেই শ্রীচৈতন্যদেব কামরূপে ধর্ম প্রচারে এসেছিলেন। তিনি করতোয়া নদী অতিক্রম করে মণিকূটে যান, সেখানে কয়েকদিন বাস করে 'পরশুকুণ্ড'-এ যান। মণিকূটের সেই স্থান এখনও 'চৈতন্যখোলা' নামে পরিচিত। ঐ সময় শংকরদেব কামরূপে বৈষ্ণব মত প্রচারে উদ্যোগী ছিলেন। এর আগে এই এলাকা বৌদ্ধাচারে

অভ্যস্ত ছিল। এই সময় চৈতন্যদেবের সঙ্গে শংকরদেব-এর সাক্ষাৎ হয়েছিল বলে জানা যায়। কৃষ্ণ ভারতীর লেখা 'নির্ণয়' পুঁথিতে সেই উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩৫] রাজবংশী সমাজে এই ভাবাপন্নতার প্রেক্ষিতে বাড়ি বাড়ি তুলসী মঞ্চ, সন্ধ্যা প্রদীপ প্রদান, অধিকারী পুরোহিতের সূচনা, কীর্তনাদির সংযোজন ঘটে। তবে শংকরদেব প্রবর্তিত 'একশরণ' মত এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনার সমন্বয় হতে কিছুটা সময় লাগে। সর্বোপরি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবের সম্প্রসারণ ঘটে রাজবংশী সমাজজীবনে। পরবর্তীকালে মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণের সময়কালে (১৫৮৭-১৬২৭ খ্রি:) শংকরদেবের ভাবশিষ্য মাধব দেব কোচবিহারে আসেন। 'মহাপুরুষীয়া' ধর্মমতের প্রচার করেন। সমসাময়িককালে শংকরদেবের আরেক শিষ্য দামোদর দেব (তিনি ব্রাহ্মণ বলে 'বামনীয়া' হিসেবে পরিচিত ছিলেন) কোচবিহারে আসেন। মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণ এই দামোদর দেবের বিশেষ ভক্ত হয়ে ওঠেন। তার আমলেই বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে। মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণ দামোদর দেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বৈষ্ণব ধর্মকে রাজধর্মের মর্যাদা দানে তৎপর হন। তার আদেশে কিছু কালের জন্য 'রাজকীয় পূজা'য় বলি নিষিদ্ধ হয়।[৩৬]

তবে মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণ বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হলেও তিনি শিবের প্রতিও সমান অনুরক্ত ছিলেন। 'মহাপুরুষ শংকরদেব এবং মাধব দেবের জীবনচরিত' থেকে জানা যায় সে সময় বৈষ্ণব ভাবাদর্শে রাজবংশী সমাজের আচার বিচারের কিছু পরিবর্তন ঘটে।

"কোচ মেচ লোক, সবে এড়িলেক
পূর্বের যত আচার।"[৩৭]

শংকরদেবের মৃত্যুর পর তার দুই শিষ্য মাধব দেব ও দামোদর দেব রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের পৃষ্ঠপোষকতায় বিশেষভাবে প্রচারের আলোকে এসেছিলেন। ঐতিহাসিক বিবৃতি থেকে জানা যায়, রাজপুত্র বীরনারায়ণ এবং রাজ অন্তঃপুরের অসংখ্য মহিলা মাধব দেবের শিষ্যে পরিণত হয়েছিলেন। শ্রীশ্রী দামোদর চরিতের ১৩৪ পৃষ্ঠায় তারই উল্লেখ পাওয়া যায় —

লক্ষ্মীনারায়ণ পুত্র পত্নী যত যত।
লৈনেক শরণ দামোদর চরণত।।

রাজ্যে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মানুষও (কোচ, মেচ) মাধবদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার ফলে বৈষ্ণব ভাবাদর্শের প্রসার ঘটে। গ্রামে গঞ্জেও হিন্দু ধর্ম আচারের প্রসার লাভ ঘটতে থাকে।

পাশাপাশি রাজ পৃষ্ঠপোষকতায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে ঠাকুর বাড়ি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ শুরু হয়। নিষ্কর জমিদানের ফলে হিন্দুধর্মীয় মনোভাবের সম্প্রসারণ ঘটে। উল্লেখ্য ধর্মীয় নির্মাণ ও ধর্মীয় কারণে যে সকল ভূমিদান করা হয়েছিল তা ১৭৭০ খ্রি: থেকে ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।[৩৮] স্বাভাবিকভাবে এই সময়ে হিন্দুধর্মীয় আচার-সংস্কারের প্রসার ঘটে জনগণের মধ্যে। আচার ব্যবহার, খাদ্যাভ্যাস, সংস্কার, বিধি ব্যবস্থারও পরিবর্তন হয়। বলা যেতে পারে কোচবিহার রাজ্যের রাজবংশী সহ অন্যান্য উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যেও হিন্দুধর্ম প্রসারের ব্যাপ্তি ঘটে।[৩৯]

মহারাজা নরনারায়ণের সময়কালে শংকরদেব প্রবর্তিত 'একশরণ' ধর্মের প্রসার ঘটে। একমাত্র কৃষ্ণের উপাসনা রাজবংশী সমাজেও বিস্তার পায়। 'একশরণ' ধর্ম রাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করে। সেইসঙ্গে কোচবিহার রাজ্যে এবং আসামে ঝুম চাষ থেকে স্থায়ী কৃষি অর্থনীতি বিস্তারে সহায়তা করে। সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী কোচ-মেচ উপজাতিদের মধ্যে হিন্দুধর্ম বিস্তারে সহায়তা করে এবং স্তুপীকৃত গৃহ নির্মাণ পদ্ধতির পরিবর্তে ভিতযুক্ত মাটির গৃহনির্মাণ পদ্ধতির প্রচলন শুরু হয়। বৈষ্ণব সত্রগুলি কৃষি অর্থনীতি বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৪০] মহারাজা নরনারায়ণ ও পরবর্তী মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণও বৈষ্ণব ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণ বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক মাধবদেবকে সত্র নির্মাণের জন্য জমি দান করেছিলেন[৪১] ব্রাহ্মণ্যধর্ম বৈষ্ণব ধর্ম ছাড়াও কোচ রাজগণ শাক্ত ধর্ম, ইসলাম ধর্ম সহ অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। কোচবিহারের কৃষি অর্থনীতি এবং হস্তশিল্পের বিকাশে মুসলিম সম্প্রদায়ের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ।[৪২] কোচ রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় কোচবিহার রাজ্যে বহু মন্দির এবং অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। মধ্যযুগে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের মত কোচবিহার রাজ্যের মন্দির এবং অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মেলা বসত। মন্দির এবং অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাজাগণ জমি দান করতেন।[৪৩] কোচবিহার রাজ্যের উল্লেখযোগ্য মেলা হল জল্পেশ মেলা। প্রতি বছর শিব চতুর্দশীতে এই মেলা বসে। একসময় সুদূর পাটনা, গয়া, কাশী, এলাহাবাদ থেকে বণিকগণ শতরঞ্চ, কাঁসা, পিতলের বাসন, ট্রাঙ্ক প্রভৃতি বহু রকম পণ্য সম্ভার নিয়ে মেলায় আসত।[৪৪] চৈত্র মাসে গদাধরের মেলাটিও কোচবিহার রাজ্যের অন্যতম একটি বড় মেলা ছিল। কোচবিহার রাজ্যের মন্দিরগুলির উপর মুসলিম স্থাপত্য রীতির প্রভাব লক্ষ করা যায়। মুসলিম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মসজিদের অনুকরণে কোচবিহার রাজ্যের প্রায় সমস্ত

মন্দিরগুলির উপরিভাগ গম্বুজ যুক্ত।[৪৫] মহারাজা প্রাণনারায়ণ জল্পেশ মন্দির এবং কামতেশ্বরী মন্দির নির্মাণের জন্য দিল্লী থেকে মুসলিম স্থপতিদের নিয়ে এসেছিলেন।[৪৬] ষোড়শ শতক থেকেই কোচবিহার রাজ্যে মন্দির নির্মাণে ইটের ব্যবহার শুরু হয়।[৪৭] এইচ. এন. চৌধুরীর 'ল্যান্ড রেভিনিউ ও সেটেলম্যান্ট'-এর এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় কোচ রাজাগণ কর্তৃক মন্দিরগুলি পরিচালনা করত দেবোত্তর অফিস। তাছাড়াও কোচবিহার রাজ্যে বহু ব্যক্তিগত ঠাকুর এবং ঠাকুরাণী ছিল। ঐ সমস্ত ব্যক্তিগত ঠাকুর এবং ঠাকুরাণীর সেবার জন্য রাষ্ট্র থেকে দেবোত্তর সম্পত্তি দেওয়া হয়। সমগ্র কোচবিহার রাজ্যে এরকম মোট ৪৮টি ব্যক্তিগত ঠাকুর এবং ঠাকুরাণীর অস্তিত্ব ছিল।[৪৮]

রাজবংশী সমাজে শংকরদেবের বৈষ্ণব মতাদর্শ যেমন রাজানুকূল্যে প্রভাব বিস্তার লাভ করে পাশাপাশি পরবর্তী সময়ে অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে শ্রীচৈতন্যদেবের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবাদর্শেরও প্রসার ঘটে। ফলে রাজবংশী সমাজে দুই ভাবনার অদ্ভুত সমন্বয় ঘটে। আচার ধর্মের সংস্কার সাধিত হয়। ব্রাহ্মণদের আগমনে সেই ধারা আরও বেগবান হয় এবং বিস্তৃত এক আচার সংস্কারের বৃহত্তর বৈষ্ণব ভাবনা রাজবংশী সমাজ দর্শনে অন্তর্ভুক্ত হয়। পূজা-পার্বণাদি থেকে বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মের সংযোজন ঘটে। অধিকারী পুরোহিতদের অন্তর্ভুক্তি ঘটে। কৃষ্ণের সম্পৃক্তায়ন ঘটে বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীর ভাবনাতেও। যেমন রাখাল ঠাকুরের মধ্যে শিবের প্রতিরূপ হয়ে কৃষ্ণের সমন্বয় ঘটে। লোকসঙ্গীত, পালাগানের বন্দনায় কৃষ্ণের অন্তর্ভুক্তি ঘটে যায়।

তবে উল্লেখ্য কোচ-মহারাজাগণ শুধু নন বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠী কখনও কোনও ধর্মের সংকীর্ণতায় আবদ্ধ থাকেননি। যখন যে ধর্ম নিজেদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেননি কিন্তু নিজেদের লোকায়ত লৌকিক ধর্মের পরিসরকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

তৎকালীন সময়ের সমাজ ধর্ম নিয়ে কিছু তথ্য সূত্র পাওয়া যায় ১২৩১ বঙ্গাব্দে (১৮২৪ খ্রিস্টাব্দ) প্রাপ্ত রাধাকৃষ্ণদাস বৈরাগীর 'গোসানীমঙ্গল' পুঁথি থেকে। অনেকে এই পুঁথির অর্বাচীনতা কিংবা ঐতিহাসিক গুরুত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুললেও বলা যায় এই পুঁথি তৎকালীন সময়ের সমাজ চিত্রের কিছু চিহ্ন তুলে ধরে যা কোচ-রাজবংশের প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ। ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত সময়কে মঙ্গলকাব্যের যুগ হিসাবে চিহ্নিত করলে গোসানীমঙ্গল কাব্যটি নিতান্তই কোচবিহারের ইতিহাস আশ্রয়ী উনিশ শতকীয় প্রথম পাদের একটি রচনা। এই কাব্যটি যেহেতু

খেন বংশীয় রাজা কান্তেশ্বরকে নিয়ে রচিত সেহেতু আমরা সময়কালীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় একটা ছবি পেয়ে যাই। আর যেহেতু গোসানী চণ্ডীর আরাধনা এতদঞ্চলে এ-যাবৎকাল অবধি প্রচলিত। বিশেষ করে রাজবংশী সমাজে এবং কোচবিহার ঐতিহ্যধারায় আজও সরকারি নিরীক্ষায় অনুসৃত হয়। স্বাভাবিকভাবে 'গোসানীমঙ্গল' কাব্যটি উত্তরবঙ্গের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপাদান হিসাবে ভিন্ন গুরুত্ব দাবি করে।

কাব্যটিতে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যগুলির মত অলৌকিক বিষয়ের অবতারণা ঘটলেও ঐতিহাসিক কিছু তথ্যের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই কাব্যে গোসানীদেবী ছলে বলে কৌশলে নিজের মাহাত্ম্য প্রচার করেননি, ভক্তের মাধ্যমেই মাহাত্ম্য প্রকাশ পেয়েছে। গোসানীমঙ্গল কাব্যটি তাই ব্যতিক্রমী, কিন্তু জীবন ও যুদ্ধ বিগ্রহের কথার মধ্য দিয়ে অনায়াসে সময়কালীন একটা সমাজ চিত্র প্রতিভাত হয়েছে। গোসানীমঙ্গল অপ্রধান দেবতা বা দেবকল্পদের কাহিনি নয়, গোসানীদেবী আসলে 'চণ্ডী'। গোসানী অন্য মঙ্গলকাব্যের মত দেবী নন। এই কাব্যে ধর্মীয় বিশ্বাসের কথা আছে। তবে ধর্মীয় আবেদনই সর্বেসর্বা নয়। 'গোসানীমঙ্গল' কাব্যটি প্রথমে পদ্যে রচিত হয়। রচয়িতা হিসাবে রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগীর নাম পাওয়া যায়। দাস পদবিটি এই অঞ্চলের উচ্চবর্ণের প্রায় সমস্ত হিন্দু ধর্মাশ্রয়ী জনগণই ব্যবহার করেন এবং বৈরাগী উপাধি দ্বারা বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী গৃহহীন ভিক্ষাজীবী সম্প্রদায়কে বোঝায়। তৎকালীন কামতা-কোচবিহার অঞ্চলে বৈরাগী সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ গ্রামে গ্রামে ঘুরে লোকসঙ্গীতের মাধ্যমে লৌকিক কাহিনি গেয়ে বেড়াতেন। খবর-সংবাদও তারা গ্রামবাসীদের দিতেন। এ বিষয়ে মার্শে ও শৌভের কমিশনের (১৭৮৮ খ্রি:) প্রতিবেদনেও উল্লেখ পাওয়া যায়।[৪৯] বুকানন হ্যামিলটন কোচবিহার রাজ্যের মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের অনুমতি নিয়ে ১৮০৭-০৮ খ্রিস্টাব্দে গোসানীমারীর গড়ের ধ্বংসাবশেষ পর্যবেক্ষণ করেন এবং তার প্রতিবেদনে তিনি বিস্তৃতভাবে উল্লেখও করেন। এই প্রতিবেদনই প্রথম সরকারি প্রতিবেদন। খেন বংশের যে ইতিহাস বুকানন হ্যামিলটন লিখেছেন সেই কাহিনির সঙ্গে গোসানীমঙ্গল কাব্যে কাহিনির মিলও পাওয়া যায় অনেক ক্ষেত্রে। যদিও সেই প্রতিবেদনে তিনি গোসানীমঙ্গল কাব্যের উল্লেখ করেননি।[৫০]

এই গোসানীমঙ্গল কাব্য থেকে আমরা তৎকালীন সমাজচিত্রের একটা ছবি আঁকতে পারি। গোসানীমারীর (কামতাপুরের) প্রাকারের বহির্ভাগে শত্রুর জন্য পরিখা খনন এবং জলপূর্ণ করে

রাখার প্রক্রিয়ায় (জল উবার) উপলব্ধি হয় সে সময় ছুতোর মিস্ত্রির আগমন ঘটেছে। তারা ‘বাঙ্‌লা’ ঘরের ধরণ প্রবর্তন করেন। আগমন ঘটে কামার, কুমোর, মুচী, তেলী, মালী, ডাওই, ডোম, হরেক পেশা জাতির লোকজনের।[৫১] মুসলমানরা এই দেশে কাগজ ও সাবানের আমদানি করতেন । এর পূর্বে এখানে সাচী, তাল এবং ভূর্জ্জ পত্রাদির ব্যবহার ছিল। কামরূপ রাজগণের তাম্রশাসনের মুদ্রায় (শিলমোহর) হস্তিমূর্তি সম্বলিত ছিল। হাতিই ছিল পশুদের মধ্যে অন্যতম। সে সময় ধাতুপাত্রের ব্যবহার খুব কম লোককেই করতে দেখা যেত। লাউয়ের বশ, মাটির তৈরি থালা, হাঁড়ি, কলসি, ঘটি, বাঁশের থুরী বা চোঙ এসবের ব্যবহার ছিল। তবে মুদ্রা প্রস্তুত করবার জন্য লোকজন বিভিন্ন যন্ত্রপাতি যেমন ব্যবহার করত তেমনি লোহা, তামার বিভিন্ন ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি তৈরি করত। খনন কার্যে যার হদিস পাওয়া যায়। স্বর্ণালঙ্কার বিশেষ ব্যবহৃত হত না। সেই সময় নারীরা একখানা ‘বুক বান্ধনা’ বস্ত্র, কেউ কেউ ‘আগরণ’ এবং ‘ফোতা’ নামক দুই খণ্ড বস্ত্র উপরে ও নীচে পড়ত। ভাত ছিল প্রধান খাদ্য কিন্তু ভাতের অভাব ঘটলে কাউন, চিনার ভাত এবং গুড়া (যবের ছাতু), ভাজা চালের ছাতু খেত। লবণ ছিল দুষ্প্রাপ্য তার পরিবর্তে ‘ক্ষার’ ব্যবহার করত। কাঁচা দুধের দই এবং চিড়া খাবার প্রচলন ছিল। দই ছিল একাধিক প্রকার। অভাবগ্রস্থরা পুত্র কন্যা বিক্রি করে দিতেন । এমনকী আত্ম বিক্রয়ের কথাও জানা যায়। অপহরণ করে দাসী সংগ্রহ করার প্রবণতা ছিল। নরবলি দেওয়ার রীতি ছিল। ইত্যাদি সমাজ পরিবারের ভয়াবহ ছবিও পাওয়া যায় গোসানীমঙ্গল কাব্যের ছত্রে।[৫২]

এই কাব্যের মধ্যে তৎকালীন সময়ের সামাজিক অবস্থান ও অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র যেমন পাওয়া যায় তেমনি সে সময়ের আনুষঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে ধারণাও পাওয়া যায়। যেমন গৃহ নির্মাণের উপকরণ, জিনিসপত্র, নির্মাণ কলার কথা, হাট বাজার, ব্যবসা বাণিজ্য, নগর পত্তন প্রভৃতির কথা জানা যায়। জমিদারদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা বিষয়েও কাব্যে সুন্দর আলোচনা গ্রন্থিত হয়েছে। সভ্যতার অগ্রগতির কথা পরিস্ফুট হয়েছে। কবি লিখেছেন —

শ্রীরাম পোদ্দারে আনি বন কাটাইল
ধর্ম্মপাল নগর নাম বনের রাখিল
এইরূপে ধর্ম্মপাল হাট হল স্থাপন।
তথা হতে বনান্তরে রাজার গমন।।[৫৩]

এই অংশ থেকে আমরা নতুন ভাবনার ইঙ্গিত পাই। এক্ষেত্রে সম্পদ বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে জমিদারের সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও হাট গঞ্জ স্থাপনের বিষয়টি ধরা পড়ে।[৫৪]

কোচবিহারে মাড়োয়ারী সমাজে আগমন বিষয়ে সঠিক তথ্য না জানা গেলেও অনেকের মতে মোঘল সেনাপতি মানসিংহের কোচবিহার অভিযানের সময়কালে (১৫৯৬ খ্রি:) তাঁরা এখানে এসেছিলেন।[৫৫] আবার রংপুরে সেরেস্তাদার রামমোহন রায়ের অবস্থানকালে (১৮০৯-১৪ খ্রি: অবধি) তার সান্ধ্যকালীন আড্ডায় মাড়োয়ারীদের উপস্থিতি সম্পর্কেও জানা যায়। রংপুর তখন ছিল ব্যবসার কেন্দ্র। বহু জৈন ধর্মাবলম্বী মাড়োয়ারী বণিক এখানে বাস করতেন।[৫৬] এই কাব্যে 'কাইয়া' বণিকদের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৫৭] মাড়োয়ারীদের এ অঞ্চলে 'কাইয়া' বলা হত।

নানা দেশ হ'তে সব লোকজন আইল।
শাকারী কাঁসারী কাঙারী দোকান খুলিল।।

কোচবিহারের ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মাড়োয়ারীদের বিরাট ভূমিকা প্রাচীনকাল থেকেই উল্লেখযোগ্য। রাজার সঙ্গেও অর্থনৈতিক লেনদেন ছিল। দেখা যায় গোসানীমঙ্গল কাব্যে কবি লিখেছেন যে অন্যান্যদের সঙ্গে কাইয়া অর্থাৎ মাড়োয়ারীরাও এখানে এসে ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করে এবং প্রভাব বিস্তার করে।[৫৮] ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারিতে জানা যায় সে সময় কোচবিহারে ১৮০ জন মাড়োয়ারী এবং ৩ জন ওশোয়ান গোষ্ঠীভুক্ত মাড়োয়ারী ছিল।[৫৯]

এই গোসানীমঙ্গল কাব্য থেকে তৎকালীন সমাজ চিত্রের সঙ্গে পারিবারিক দৈনন্দিন জীবনের অনেক কিছুই উপস্থাপিত হয়েছে ঘটনার বিন্যাসে। যেমন অঙ্গনার গর্ভে কান্তেশ্বরের জন্ম বৃত্তান্তের বর্ণনায় প্রতিটি নারীর কথনই বর্ণনা করেছেন। কবি লেখক সমাজের প্রতিটি নারীর গর্ভ বিবরণই আসলে তুলে ধরেছেন। গর্ভবতী নারীর তৃতীয় মাসে গর্ভচিহ্নের কথা, চতুর্থ মাসে দেহভার, পঞ্চমাসে পারিবারিক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের কথা, পঞ্চগব্য ভক্ষণের বিবরণ তুলে ধরেছেন সুন্দরভাবে। ষষ্ঠ মাসে নানাবিধ বস্তু খাওয়ার ইচ্ছার কথা তুলে ধরেছেন। পোড়ামাটি, সোন্ধ্যাদ্রব্য, দধি, অম্ল, ঘোল, টক জাতীয় ফলাদি খাওয়ার ইচ্ছার পাশাপাশি অষ্টম মাসের কিছু পারিবারিক আচার-অনুষ্ঠানের কথা যেমন বলেছেন, তেমনি কলা, চিনি খাওয়ানোর কথা এবং নবম মাসে শরীর দুর্বলতার সাথে আলস্য ভাব, স্বপ্ন দেখার কথাও বলেছেন। দশম মাসে মন শুদ্ধ পবিত্র

ভাবের জন্য গঙ্গা জল পান ইত্যাদি বর্ণনা করে গর্ভবতী নারী ও সংস্কারের বিষয়গুলি তুলে ধরেছেন। যেমন পুত্র হওয়ার জাতকর্ম, নিয়মাদি নিষ্ঠা সহ পালনের সাথে সাথে সামাজিক অনুষ্ঠান চূড়াকরণ, অন্নপ্রাশন এবং নামকরণের কথাও বর্ণনা করেছেন।

পঞ্চমাসে পঞ্চগব্য করিল ভক্ষণ।
পোড়ামাটি সোন্ধ্যা দ্রব্য খায় অনুক্ষণ।
দধি অম্ল ঘোল আদি খাইতে যতন।।
দাড়িম্ব কেশুর খায় আর পানিফল
অষ্টমাসে কলা চিনি খাইতে মনন।[৬০]

বিবিধ সমাজ আচারের কথাও জানতে পারি কাব্য বিন্যাসে। শিশুর নাড়ীচ্ছেদে বিন্নাপাতার ব্যবহারের উল্লেখ যেমন পাই তেমনি জন্মবিধি আচার, সূতিকা ঘর, আনুষ্ঠানিক বিষয়গুলির কথাও জানতে পারি।

জাত কর্ম্ম আদি যত সকলি করিল।
চূড়াকর্ম করি তবে মুখে ভাত দিল।।[৬১]

আবার ক্ষার জাতীয় পদার্থ এবং খৈল দিয়ে শরীর মার্জন ও ধৌত কার্য করার কথাও জানতে পারি। 'মজা গুয়া' (মাটিতে পুঁতে রেখে নরম করা সুপুরি) খাওয়ার কথা যেমন প্রবাদ-প্রবচনে উল্লেখ করেছেন তেমনি শিশু কৈশোরের কিছু লোক ক্রিড়ার (চিলাচিলা, লুকোচুরি, গুটুগুটু, চেঙ্গপাইট, হাটুকডুগ, ভেটাপাইট, ডাণ্ডা পাইট, তেলাইতা, মোগল পাইট প্রভৃতি) কথাও জানতে পারি। মূলত তৎকালীন রাজবংশী সমাজের চিরায়ত নিয়মরীতি সহ সমাজজীবনের সংবাদগুলি উত্থাপিত হয়েছে। বিয়েতে কন্যাপণ প্রচলনের কথাও জানা যায় — ''পঞ্চ কন্যায় পঞ্চশত রত্ন দেহ মোরে''[৬২] বিনন্দের উক্তিতে বোঝা যায় সে সময় কন্যাপণ প্রচলিত ছিল। অলংকারের বিষয়েও ধারণা পাওয়া যায়। বাদ্যযন্ত্র হিসাবে ঢোল, কাঁসি, ভেউর ইত্যাদির প্রচলন ছিল। ব্রাহ্মণ কর্তৃক বেদান্ত মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে কন্যা সম্প্রদান করা হত। গো সম্পদের কথা বলা হয়েছে। ভূত, প্রেত, ডাইনি বিভিন্ন অপদেবতার প্রসঙ্গ এসেছে। তন্ত্র মন্ত্র ঝাড়ফুঁক, ওঝা, কবিরাজ দেশীয় বৈদ্যদের কথাও উল্লেখিত হয়েছে। 'দেও ধরা' বিশ্বাসও তখন ছিল। জ্যোতিষীদের মতামত নেওয়া হত, আস্থা, বিশ্বাস ছিল তাদের প্রতি। যম, চিত্রগুপ্ত বিষয়ে যাবতীয় ধারণার

কথাও কবি উল্লেখ করেছেন। যে-কোন শুভ কার্যে তাদের ডাকা হত। তাদের সিদ্ধান্ত মানাও হত।

জ্যোতিষে কহেন শুন রাজা কান্তেশ্বর।
উক্ত আছে এই মৎস্যের উপর।[৬৩]

কিংবা

আইল গণকাচার্য্য করিতে গণনা।
রাজারে শিকারে যেতে করিলেন মানা।।[৬৪]

তাঁতি বা জোলাদের বিষয়েও উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন প্রকার গীত যেমন যোগী গীত, বিষহরির গীত, সত্যপীরের গীত, গাজী পীরের গীত প্রভৃতি গীতের উল্লেখ করেছেন। বোঝা যায় তখনও লৌকিক দেবদেবী সহ বিভিন্ন লোকায়ত বিষয়ের প্রতি জনগণের বিশ্বাস ও ঐতিহ্য বর্তমান ছিল। কাব্যের বিভিন্ন পর্যায়ের বর্ণনের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার আচার-সংস্কার, ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। সেইসঙ্গে তদানীন্তন সমাজজীবনের ব্যথা-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভাগ্যবিড়ম্বনা, হাসি-ঠাট্টা, উৎসব-অনুষ্ঠান, নারীর প্রেমচিত্র, পুত্র স্নেহ, লোক চরিত্র, লোকজীবন ইত্যাদি সামগ্রিক বিষয়গুলি ধরা পড়েছে।

পূজা-পার্বণ, দেবদেবীর প্রতি ভক্তি বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আচার সংস্কারের বিভিন্ন বিষয়গুলিও জানা যায়। মহেশ্বরের পূজার্চ্চনার মধ্য দিয়ে শৈব ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে।

শুষ্ক বস্ত্র পরিধান রহে সদাচারে।
কায়মনোবাক্যে সদা পূজে মহেশ্বরে।।[৬৫]

আবার পূজার্চ্চনায় হোমযজ্ঞের যেমন প্রচলন ছিল তেমনি ছিল ছাগ, মহিষ বলি দেওয়ার প্রথাও।

ছাগাদি মহিষ কাটি করিল পূজন।
হোম মহোৎসবে পূজা করে সমাপন।।
চারিদিকে নানা বাদ্য বাজিতে লাগিল।
মহারবে কর্ণ যেন বধির হইল।।[৬৬]

বাদ্যযন্ত্র বিষয়েও জানতে পারি —

ঢোল বাজে কাঁশী বাজে বাজিছে ভেউর।

বাদ্যের শব্দতে কম্প হয় তিনপুর।।[৬৭]

বিয়ের যাবতীয় আচার বিধিরও ধারণা পাওয়া যায়। বিভিন্ন পর্যায়ে কৃত্যাদির মধ্যে দধি, চিড়া, গুড়, চিনি, গুয়া, পান এমনকী নারদের ভার মাছেরও উল্লেখ পাই।

দধি চিড়া গুড় চিনি গুয়া পান আর।

ভারীর স্কন্ধেতে মাছ নিল শত ভার।।[৬৮]

শ্রাদ্ধ শান্তি বিষয়ে ক্ষত্রিয় বিধানের পিণ্ডদানের কথা, শবদাহে আম কাঠের ব্যবহার, পিণ্ড দান কৃত্যাদি ইত্যাদি বিষয়গুলি আজকের দিনের আচার সংস্কারকে স্মরণ করায়। আবার ভাগ্যের বিষয়টিকেও উত্থাপন করেছেন।

জাতিবর্গ ডাকাইয়া করিল অন্ত্যোষ্টি ক্রিয়া

পিণ্ড দিল ক্ষত্রিয় বিধানে।[৬৯]

বোঝা যায় ক্ষত্রিয় ভাবনা তখনও কার্যকরী ছিল। ভাগ্যের বিধি ভাবনায় কান্তেশ্বরের পিতা ভক্তীশ্বরের মৃত্যুতে বিধবা মাতা অঙ্গনার বিলাপ —

অঙ্গনা কহেন এই ললাট লিখন।

অদৃষ্টের দুঃখ কভু না যায় খণ্ডন।।[৭০]

ঘরবাড়ি নির্মাণের বিষয়েও সুন্দর উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে সে সময়কার উপাদান, নির্মাণ কৌশলের বর্ণনা পাওয়া যায়। নান্দনিক ভাববোধের পরিচয়ও স্পষ্ট হয়।

শালখুটার শিড়ি গাড়ি লোহার খিল দিল।

বেতের ছাটিনী দিয়া বাঙালা বান্ধিলা।।

খেড়ি ঘর বার গোটা করিল নির্ম্মান।

নানা চিত্ত করে তাহে অতি সুশোভন।।

দেখিলে সুন্দর পুরী মনে হয়।

যমের ভুবন কিম্বা ইন্দ্রের আলোয়।।[৭১]

বাঙালা ঘর ধনুরাকৃতি টুয়াযুক্ত দোচালা, চারচালা এমনকি আটচালাও হয়। সে সময়কার নির্মাণকর্মীদের দক্ষতার পরিচয় ছত্রে ছত্রে ধরা পড়েছে। প্রাসাদ নির্মাণের ক্ষেত্রেও উন্নতমানের

শৈলীর পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করার নিদর্শন বহন করে। স্থাপত্যের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সংস্কৃতি তুলে ধরে। স্বাভাবিকভাবে বলা যায় সে সময় উন্নতমানের কারিগরী দক্ষতাসম্পন্ন নির্মাণশিল্পীর আগমন ঘটেছিল গোসানীমারীর ভূখণ্ডে। বেত, ছন দিয়ে ঘরের নির্মাণের সঙ্গে আজকের ঘরবাড়ির নির্মাণের ধারা খুঁজে পাওয়া যায়। এটা বলা যায় সে সময়ই এতদঞ্চলে ছুতোর এবং ঘরামিদের আগমন ঘটে। ছনের ঘরের সৌন্দর্য ও প্রাচুর্য এই সেদিনও ছিল। এক কথায় এই গোসানীমঙ্গল কাব্য থেকে আমরা সেই সময়কার সামগ্রিক সমাজজীবনের ছবি পেয়ে যাই। কাব্যের মধ্যেই জীবনযাপনের আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি যেমন গ্রন্থিত হয়েছে ঘটনার বিন্যাসে আবার ধরা পড়েছে সে সময়কার দৈনন্দিন কাজকর্ম, উপাদান, জীবনযাপন ও সংস্কার ভাবনার বিষয়গুলি। সে সময়ের মানুষ যেমন বৈদ্য, কবিরাজ, ওঝার উপর নির্ভর করত তেমনি বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মন্ত্র, তুকতাক, ঝাড়ফুঁক এমনকী জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি আস্থার পরিচয় পাই। অবশ্য এই অঞ্চলটি যেহেতু সুদূর অতীতে প্রাগজ্যোতিষপুরের অংশ ছিল স্বাভাবিকভাবে সেই ধারারও খোঁজ মেলে। ভূত, প্রেত, অপদেবতা থেকে দৈব নির্ভরতার বিষয়টিও মানুষের জীবনযাপনে অঙ্গীভূত ছিল। এই দৈব নির্ভরতা থেকে বিভিন্ন দেবদেবীর (মহেশ্বর, চণ্ডী) কিংবা মনসার স্মরণাপন্ন হওয়া লৌকিক জীবনের আভাসও ফুটে ওঠে। সে সময়কার মানুষজন ধর্মভীরু, প্রকৃতিবাদী এবং সহজ সরল জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিল। সর্বোপরি হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রবেশ ও বিস্তার ঘটে ধারাবাহিকভাবে।

গোসানীর পূজা বন্ধ পূজারী বিহনে।
হেনমতে অরাজক হৈল কত দিনে।।
হইল আকাশবাণী শুন সর্ব্ব নর।
এই রাজ্যে হবে রাজা নাহি কোন ডর।।
শিবের ঔরসে রাজা হইবে বেহারে।
পূজা হবে এই স্থানে জানিবা আমাকে।। [৭২]

কাব্যের মধ্যে কোচ-রাজবংশের সূচনার ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে। অবশ্যই এখানে ইতিহাস পরিক্রমার ধারাকে স্মরণ করায় এবং বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠীকে রাজার অংশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে। এটাও বলা যায় বৃহত্তর রাজবংশী সমাজ মহারাজা বিশ্বসিংহের কোচ-রাজবংশ

প্রতিষ্ঠার বহুপূর্বেই হিন্দুধর্মের অংশ ছিল। আবার বলা যেতে পারে মহারাজা বিশ্বসিংহের আমলে বৃহত্তর রাজবংশী সমাজ সংগঠিত হয়, সুদৃঢ় হয় এবং হিন্দুধর্মের আচার সংস্কারকে আত্মস্থ করতে শুরু করে। লোকায়ত অংশটিকে বজায় রেখেই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ধারার অংশ হয়ে উঠতে থাকে। তাই কোচ-রাজবংশের বড়ো দেবী পূজায় এখনো শুকরের মাংস এবং মদ উৎসর্গ করা হয়। বস্তুত এর মধ্য দিয়েই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধারাকে গ্রহণ করেও অতীতের ঐতিহ্য ও ধারাকে অনুসরণ করে। সেই ধারাই আজও অব্যাহত। তাই দেখা যায় এখনো মদনমোহন বাড়িতে কামদেবের পূজা থেকে দোলসওয়ারী অনুষ্ঠান কিংবা বিষহরা গানের আসর বসে। এই ঐক্য সূত্রের মধ্য দিয়েই রাজবংশী সমাজ সংগঠিত হয়েছে। গোসানীমঙ্গল কাব্যে তারই সূত্র আমরা পেয়ে যাই। কাব্যটিকে ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে গুরুত্ব না দিলেও তৎকালীন রাজবংশী সমাজের সমাজজীবনের পরিষ্কার একটা ছবি তুলে ধরে। যা সমীক্ষণ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

তথ্যসূত্র :

১. Gait, E A; Census of India (Vol Assam) 1901
Hutchinson, RHS; Eastern Bengal and Assam District Gazetteer (Chittagong Hill Tracts) Allahabad 1908

২. খা চৌধুরী, আমানতউল্লা আহমদ; কোচবিহারের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, কলি, পুনর্মুদ্রণ ১৯৬০, পৃষ্ঠা - ১৩০

৩. নাথ, ডি; হিস্ট্রি অব দি কোচ কিংডোম, ১৫১৫-১৬১৫, দিল্লী, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা - ১৬৬

৪. দামোদর, ধর্মানন্দ কোমাদি; ভারত ইতিহাস চর্চার ভূমিকা, কলকাতা ২০০২ পৃষ্ঠা - ২৬১-২৬২

৫. বর্মা, সুখবিলাস; রাজবংশী সমাজের আত্মপরিচয়, ঐতিহ্যে ও ইতিহাসে উত্তরবঙ্গ, ইছামুদ্দিন সরকার (সম্পা), এন. এল. পাবলিশার্স, ডিব্রুগড়, আসাম, ২০০২, পৃষ্ঠা - ১৬০

৬. Barua, S. L.; A Comprehensive History of Assam, New Delhi, 1985, Page - 443

৭. সুর, অতুল; ভারতের নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়; সাহিত্য লোক, কলকাতা - ২০০১ পৃষ্ঠা ১৯৮
৮. শিন্‌কিচি তানিগুচি; প্রবন্ধ - উত্তরবঙ্গ ও অসমের রাজবংশী সম্প্রদায় এবং ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তনশীল কাঠামো, বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর ও দাশগুপ্ত, অভিজিৎ; (সম্পাদিত) জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ আই সি বি এস দিল্লী, ১৯৯৮ পৃষ্ঠা - ১৫৫
৯. বিশ্বাস, অশোক; বাংলাদেশের রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি; বাংলা আকাদেমি ঢাকা, ২০০৫ পৃষ্ঠা ৬০-৬১
১০. ঐ, পৃষ্ঠা ৬০-৬১
১১. Bukanan, Dr. F. Hamilton; Account of the District of Zila of Rangpur, India office Library, M.S.S.E.U.R.S.; Page - 133-34. এবং শিন্‌কিচি তানিগুচি, প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা - ১৬৬
১২. Chowdhury H. N.; The CoochBehar State and its land Revenue Settlement, CoochBehar - 1903 (Edited), Dr. N. N. Pal; Siliguri 2010 এবং চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ খাঁ পৃষ্ঠা - ৯৫
১৩. ভট্টাচার্য, প্রণবকুমার; প্রবন্ধ : কোচ মানসিকতার শিব চেতনা। ইছামুদ্দিন সরকার (সম্পাদিত), ঐতিহ্য ও ইতিহাসে উত্তরবঙ্গ, ধুবরী - ২০০২ পৃষ্ঠা - ১৯৪-১৯৫
১৪. Fazal Abul; The Akbarnama (Tr. H. Beveridge) : The Asiatic Society, Kol, 2010, Page - 1067
১৫. ভট্টাচার্য, প্রণবকুমার; প্রবন্ধ : কোচ মানসিকতায় শৈব চেতনা। ইছামুদ্দিন সরকার (সম্পা), ঐতিহ্য ও ইতিহাসে উত্তরবঙ্গ, ধুবরী, ২০০২, পৃষ্ঠা - ১৯৫ এবং Bukanan, Hamilton; General view of the History and manners of Kamrup; India Office Library, Page - 23-24
১৬. ভট্টাচার্য প্রণবকুমার, প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা - ১৯৫
১৭. Bukanan, Dr. F. Hamilton; General view of the History and manners of Kamrup; India office library, MSSEURD Page - 23-24
১৮. Rajguru, S.; Medieval Assamese Society 1228-1826. Nao Gaon 1988 Page - 94 and Nath, D.; History of Koach Kingdom 1515-1615; Delhi 1989; P - 166
১৯. Nath, D; History of Koach Kindom 1515-1615 Delhi 1989 Page - 165
২০. ভট্টাচার্য, প্রণব কুমার; প্রাগুক্ত পৃ: ১৯৫
২১. ভট্টাচার্য, প্রণব কুমার; প্রাগুক্ত পৃ: ১৯৫
২২. ভট্টাচার্য, প্রণব কুমার; প্রাগুক্ত পৃ: ১৯৭

২৩. A Statistical Account of Bengal, Vol - 1 to 10, London Turbner and Co. 1876 and 1877, P - 124

২৪. শিনকিচি তানিগুচি; (প্রবন্ধ) উত্তরবঙ্গ ও আসামের রাজবংশী সম্প্রদায় এবং ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তনশীল কাঠামো; শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিজিৎ দাশগুপ্ত; সম্পাদিত গ্রন্থ; জাতি, বর্ণ ও বাঙ্গালী সমাজ; দিল্লী আই সি বি এস, ১৯১৮, পৃষ্ঠা - ১৬৫-১৬৬

২৫. শিনকিচি তানিগুচি; (প্রবন্ধ) উত্তরবঙ্গ ও আসামের রাজবংশী সম্প্রদায় এবং ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তনশীল কাঠামো; শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিজিৎ দাশগুপ্ত; সম্পাদিত গ্রন্থ; জাতি, বর্ণ ও বাঙ্গালী সমাজ; দিল্লী আই সি বি এস, ১৯১৮, পৃষ্ঠা - ১৬৬

২৬. শিনকিচি তানিগুচি; (প্রবন্ধ) উত্তরবঙ্গ ও আসামের রাজবংশী সম্প্রদায় এবং ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তনশীল কাঠামো; শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিজিৎ দাশগুপ্ত; সম্পাদিত গ্রন্থ; জাতি, বর্ণ ও বাঙ্গালী সমাজ; দিল্লী আই সি বি এস, ১৯১৮, পৃষ্ঠা - ১৫৪

২৭. সরকার, হিমাংশু কুমার; প্রাকগুপ্ত ও গুপ্ত যুগে উত্তরবঙ্গের ধর্ম কর্ম উত্তরবঙ্গের পুরাতত্ত্ব ইতিহাস, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৫, পৃষ্ঠা - ৮৯

২৮. দেবনাথ, শৈলেন; প্রাচীন জলপাইগুড়ি জেলার ধর্মীয় বিবর্তনের ধারা, কিরাতভূমি, জলপাইগুড়ি জেলা সংকলন (২য় খণ্ড), জলপাইগুড়ি, ২০০৪, পৃষ্ঠা - ১৮৭

২৯. Debnath, Sailen; Essays on Cultural History of NorthBengal, N L Publication, Siliguri, 2008, Page - 52

৩০. Bukanan, Fanchis Hamilton; An account of the District of Rangpur. 1808-1809

৩১. Ray, Subhajyoti; Transformations of the Bengal Frontier, Japaiguri, 1765-1948

৩২. Ibid

৩৩. Ibid op cit P - 52

৩৪. দেবনাথ, শৈলেন; প্রাচীন জলপাইগুড়ি জেলার ধর্মীয় বিবর্তনের ধারা, প্রবন্ধ কিরাতভূমি (২য় খণ্ড) জলপাইগুড়ি ২০০৪, পৃষ্ঠা - ১৮৭

৩৫. দেব, রণজিৎ, কোচবিহার জেলার সমগ্র ইতিহাস (১ম খণ্ড) এস এস পাবলিকেশন কল - ১২ ২০১৭, পৃষ্ঠা - ৪৮

৩৬. খা চৌধুরী, আমানতউল্লা আহমদ; কোচবিহারের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, (কলকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সি, পুনমুর্দ্রণ), ১৯৯০, পৃষ্ঠা - ১৫২

৩৭. খা চৌধুরী, আমানতউল্লা আহমদ; কোচবিহারের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, কলি, পুনর্মুদ্রণ ১৯৬০, পৃষ্ঠা - ৬৪

৩৮. তানিগুচি শিনকিচি, প্রাগুক্ত পৃ: ১৭৬

৩৯. সরকার, ইছামুদ্দিন; প্রবন্ধ : উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের সংকট, প্রতিক্রিয়া ও উত্তরণের প্রয়াস। ইছামুদ্দিন সরকার (সম্পা) ঐতিহ্য ও ইতিহাসে উত্তরবঙ্গ, ধুবরী, ২০০২, পৃ: ১৪৭

৪০. গুহ, অমলেন্দু; দি অহোম সিস্টেম, এন ইনকুয়ারী, ইন স্ট্রেট ফর্মেশন ইন মিডিয়াভেল আসাম

৪১. নিয়োগী, ড. মহেশ্বর; (সম্পাদিত) গুরুচরিত কথা, গৌহাটি ১৯৯৯ ভূমিকা পৃষ্ঠা - ১৫৮

৪২. সেন, পার্থকুমার; স্টাডি অব সাম এসপেক্টস অব দি হিস্ট্রি অব কামতা-কোচবিহার, সিনস ১৭৭২ টু দি ডেট অব এক্সেশন অব শৈলেন্দ্র নারায়ণ (অপ্রকাশিত)

৪৩. শর্মা, আর. এল; আর্লি মিডিয়াভেল ইন্ডিয়ান সোসাইটি এ স্টাডি ইন ফিউডাইনেশন', কলকাতা ২০০১, পৃষ্ঠা - ৪০

৪৪. বর্মন, অজিত কুমার; জল্পেশ মহাপীঠ, জলপাইগুড়ি, ১৯৮৯ পৃষ্ঠা - ৪৮

৪৫. সেন, পার্থকুমার; স্টাডি অব সাম এসপেক্টস অব দি হিস্ট্রি অব কামতা-কোচবিহার সিনস ১৭৭২ টু দি ডেট অব এক্সেশন অব শৈলেন্দ্র নারায়ণ (অপ্রকাশিত)

৪৬. মুখোপাধ্যায়, ড. শ্যামাচাঁদ; কোচবিহার জেলার পুরাকীর্তি, প: ব: সরকার, ১৯৭৪, পৃষ্ঠা - ২১

৪৭. ঐ পৃষ্ঠা - ১৪

৪৮. Chowdhury H. N.; The CoochBehar State and its land Revenue Settlement, CoochBehar - 1903 (Edited, Dr. N. N. Pal; Siliguri 2010), Page - 68

৪৯. দাস বৈরাগী, রাধাকৃষ্ণ; গোসানীমঙ্গল ড. নৃপেন্দ্রনাথ পাল (সম্পাদিত)। গোসানীমঙ্গল কাণ্ডের ঐতিহাসিক উপাদান। শিবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, অনিমা প্রকাশনী, কলকাতা - ৯, ২০১৬ (পঞ্চম সংস্করণ), পৃষ্ঠা - ৩৬

৫০. ঐ, পৃষ্ঠা - ৩৭

৫১. ঐ, পৃষ্ঠা - ৯৬

৫২. দেব, রণজিৎ; কোচবিহার জেলার সমগ্র ইতিহাস (১ম খণ্ড) এস এস পাবলিকেশন কল - ১২ ২০১৭, পৃষ্ঠা - ৯৩

৫৩. দাস বৈরাগী, রাধাকৃষ্ণ; গোসানীমঙ্গল, বিরচিত নৃপেন্দ্রনাথ পাল (সম্পাদিত), ২০১৬ (৫ম সংস্করণ), কলকাতা - ৯, পৃষ্ঠা - ২৭

৫৪. ভদ্র, গৌতম; মুঘল যুগের কৃষি অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা - ২৬৪

৫৫. সাহা, নারায়ণ; জলপাইগুড়ির মাড়োয়ারী সমাজ কিরাতভূমি, জলপাইগুড়ি জেলা সংকলন (১ম খণ্ড), জলপাইগুড়ি, পৃষ্ঠা - ১৭৪

৫৬. Miss Collet; Life and letters of Rammohan Roy, 1900, Page - 344

৫৭. দাস বৈরাগী, রাধাকৃষ্ণ; গোসানীমঙ্গল, সম্পাদনা নৃপেন্দ্রনাথ পাল, কল, ১৯৭৮, পৃষ্ঠা - ৯৮

৫৮. সাহা, নারায়ণ চন্দ্র; কোচবিহার জেলার মাড়োয়ারী সমাজ, মধুপর্ণী, বিশেষ কোচবিহার সংখ্যা ১৩৯৬, পৃষ্ঠা - ১৪৪

৫৯. Hunter, W W; A Statistical Account of Bengal, Vol X 1974. Page - 341

৬০. দাস বৈরাগী, রাধাকৃষ্ণ; গোসানীমঙ্গল, ড. নৃপেন্দ্রনাথ পাল, কল - ১৯৭৮ পৃষ্ঠা - ৭৬

৬১. ঐ, পৃষ্ঠা - ৭৬

৬২. ঐ, পৃষ্ঠা - ১০২

৬৩. ঐ, পৃষ্ঠা - ৭৭

৬৪. ঐ, পৃষ্ঠা - ৭১

৬৫. ঐ, পৃষ্ঠা - ১০৭

৬৬. ঐ, পৃষ্ঠা - ১০০

৬৭. ঐ, পৃষ্ঠা - ১০৩

৬৮. ঐ, পৃষ্ঠা - ১০২

৬৯. ঐ, পৃষ্ঠা - ৮০

৭০. ঐ, পৃষ্ঠা - ৮০

৭১. ঐ, পৃষ্ঠা - ৯১

৭২. ঐ, পৃষ্ঠা - ১৪৭

তৃতীয় অধ্যায়
ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতা এবং রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি

ভুটানের সঙ্গে কোচ রাজ্যের প্রথম যুদ্ধের মধ্য দিয়েই কোচ রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনা হয়। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথম কোচ-ভুটান যুদ্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়, বিনিময়ে কোচ রাজ্য হয়ে পড়ে করদমিত্র রাজ্য। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের ৫ এপ্রিল চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় আর কোচ রাজ্য তার স্বাতন্ত্রতা হারায়। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা প্রসারের উদ্দেশ্যও সফল হয়। যুদ্ধের খরচ সহ রাজ্যের অর্ধেক কর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির খাতে জমা পড়ার চুক্তি সাক্ষরিত হয় কোম্পানির শর্ত অনুসারেই। বলা যেতে পারে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির দেওয়ানি লাভের পর স্বাধীন কোচবিহার রাজ্যে ব্রিটিশ ক্ষমতা সম্প্রসারণের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল এই চুক্তি। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের এই চুক্তি ছিল এক রাজনৈতিক সংকটের ফসল। ভুটান যেমন মহারাজা দেবেন্দ্র নারায়ণের (১৭৬৩-১৭৬৫ খ্রি:) আমল থেকে কোচবিহার রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে তেমনি বৈকুণ্ঠপুরের রায়কত বংশও কোচ রাজ্যের অধীনতা অস্বীকার করতে থাকে। ইতিমধ্যে ভুটান কৌশলে ভোজসভার আমন্ত্রণ জানিয়ে মহারাজা ধৈর্যেন্দ্র নারায়ণ ও দেওয়ান দেওকে বন্দী করে নিয়ে যায়। এমতাবস্থায় রাজ্যের নাজির দেও খগেন্দ্রনাথ মহারাজাকে উদ্ধারের উদ্দেশ্যে কোম্পানির সাহায্য প্রার্থনা করে এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শর্ত সাপেক্ষে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে রাজি হয়। চুক্তি অনুযায়ী কোচ রাজ্য অর্ধেক কর দিতে সম্মত হয়। জোন্সের নেতৃত্বে ভুটান রাজের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধে এবং জিম্পে নিহত হন। সে সময় ওয়ারেন হেস্টিংস ছিলেন গভর্ণর জেনারেল। মহারাজা ধৈর্যেন্দ্র নারায়ণও মুক্তি পান। কোচ রাজ্যের শেষ স্বাধীন রাজা ছিলেন কুমার রাজেন্দ্র নারায়ণ। চুক্তি বলে রাজনৈতিক রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গ্রহণ করে। যদিও অভ্যন্তরীণ, প্রশাসনিক বিষয়ে কিছু স্বাধীনতা রাজাকে দেওয়া হয়। কিন্তু কোম্পানি ধীরে ধীরে রাজস্ব আদায়ের হাত ধরে প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও ক্ষমতা বিস্তার করে এবং

বলা যায় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক উভয়ক্ষেত্রেই কোচ রাজবংশ স্বাধীনতা হারায়।

ইঙ্গ-কোচ চুক্তির শর্তগুলি কোচ রাজ্যের স্বাধীনতার পরিপন্থী ছিল। স্বাধীন কোচবিহার রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোম্পানীর 'প্যারামাউন্ট পাওয়ার' প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজ্যের এবং রাজার মুক্তি এসেছিল কোচবিহার রাজ্যের স্বাধীনতার মূল্যে।[১] চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে কোচবিহার কোম্পানির করদমিত্র রাজ্যে পরিণত হয়। মহারাজা ধরেন্দ্র নারায়ণই ছিলেন প্রথম করদ রাজা।[২] ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করেই সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। তবে তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থসিদ্ধিই ছিল মুখ্য। ভুটানকে করিডোর করে তিব্বতে বাণিজ্যের প্রসার ঘটানোই ছিল তাদের মূল অভিপ্রায়। আবার কোম্পানি অধিকৃত এলাকার নিরাপত্তার বিষয়েও চিন্তা করে। কোচবিহার রাজ্যে ভুটানের আধিপত্য বিস্তারের পর থেকেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রংপুরের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়। কোচবিহার রাজ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা বাংলার উত্তর সীমান্তে কোম্পানির নিরাপত্তায় সমস্যা তৈরি করতে পারে এই আশঙ্কায় ওয়ারেন হেস্টিংস সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে সম্মত হন।[৩] কোম্পানির কোচবিহার চুক্তির আরেকটি কারণ হল সন্ন্যাসী আতঙ্ক। রংপুর, দিনাজপুর, পূর্ণিয়া জেলার সীমান্তে তখন সন্ন্যাসীদের তাণ্ডব অসহনীয় ভাবে বেড়ে গিয়েছিল। চুক্তি করে কোচ সেনাবাহিনীতে এবং রাজকীয় রক্ষী বাহিনীতে সন্ন্যাসীদের নিয়োগ কোম্পানি বন্ধ করতে চেয়েছিল।[৪] সন্ধিপত্রে যে শর্তগুলি ছিল তার মধ্যে অন্যতম হল কোচবিহার রাজ্য শত্রুমুক্ত হলে রাজা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বশ্যতা স্বীকার করবেন এবং তার রাজ্যকে বঙ্গদেশের সহিত সংযোজিত হতে দেবেন। শর্তে লেখা ছিল "That the Rajah will acknowledge subjection to the English East India Company upon his country being cleared of his enemies and will allow the Coochbehar Country to be annexed to the province of Bengal.[৫]

ব্রিটিশ কমিশনার নিযুক্ত হওয়ার আগে কোচবিহার রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা তেমন কঠোর ছিল না। প্রকৃতপক্ষে মিশ্র শাসন ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। রাজার ভাবনা ছিল আইনের উর্দ্ধে। এক সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার আদল লোকজনের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ভুটিয়া এবং কোচ ভাবনার মিশ্রণে তৈরি একটা শাসনব্যবস্থা, সবকিছুই রাজার হিসাবে পরিগণিত হত। তবে স্ট্যাম্প আইন সম্পর্কে ধারণা ও আপিল সংক্রান্ত বিশেষ ব্যবস্থা এখানে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত

ছিল। রাজকর্মচারীদের মধ্যেও উদাসীনতা ও ঢিলেঢালা মনোভাব ছিল। রাজ্যের প্রশাসনের উপর থেকে নীচ পর্যন্ত অন্যের অধীনে সঠিকভাবে কাজ করার মানসিকতা ছিল না। রাজা ছাড়া কোন কর্তৃপক্ষকেই স্বীকার করতেন না।[৬]

ব্রিটিশ সরকার সূচনা পর্ব থেকেই বিস্তীর্ণ উত্তরবঙ্গের প্রশাসনিক কাঠামো নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করে। কোচবিহার দেশীয় রাজ্যের আংশিক আধিপত্য কায়েম করার পর অন্যান্য এলাকা নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করে। বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সম্পদ সম্ভাবনা ও বাণিজ্য বিস্তারকে সামনে রেখেই ব্রিটিশ সরকারের পরিকল্পনা সূচিত হয়। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির দেওয়ানির পদ প্রাপ্তির পর থেকেই ব্রিটিশ আধিপত্যের সূত্রপাত ধরা যায়। বস্তুত ১৭৬৫ থেকে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ অবধি অর্ধশতাব্দীকাল বাংলায় মাৎস্যন্যায় চলছিল।[৭] এই সময় বাংলাদেশ জুড়ে এক নতুন জমিদার শ্রেণির সৃষ্টি হয়। এদের অধিকাংশই ছিল বেনিয়ান ও কোম্পানির উপর মহলের প্রিয়পাত্র। দেবী সিংহ ছিলেন এই সময়ের একজন নির্মম ও অত্যাচারী ইজারাদার ও ওয়ারেন হেস্টিংস-এর প্রিয় পাত্র। বৈকুণ্ঠপুর ও জলপাইগুড়ি অঞ্চল সহ রংপুরের ইজারাদার হয়ে তিনি অতিমাত্রায় রাজস্ব আদায়ে প্রজা নিগ্রহ শুরু করেন। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র রংপুর, জলপাইগুড়ি অঞ্চলে প্রজা বিদ্রোহ শুরু হয়। বস্তুত বাংলার এই প্রান্তদেশে খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটে কোম্পানির নির্মম রাজস্ব ব্যবস্থার প্রতিবাদস্বরূপ।[৮] এই রংপুর বিদ্রোহ ছিল কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, রংপুর অঞ্চলের অধিবাসীদের (কোচ, রাজবংশী প্রভৃতি) ক্ষাত্রবীর্যের ও সংগঠন শক্তির শেষ পরিচয়।[৯] বাংলার অভ্যন্তরস্থ সমতলবাসীগণ বহুদিন যাবৎ মুসলমানদের পদানত ছিল, কিন্তু মেদিনীপুর জেলার চুয়ারগণ এবং কোচবিহার, রংপুর, জলপাইগুড়ি অঞ্চলের রাজবংশী, মেচ ও কোচরা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত স্বাধীন ছিল। তাই তারা অতি বিক্রমে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত সিপাহীদের সঙ্গে সমানে লড়তে পেরেছিল।[১০] অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত রংপুর, বৈকুণ্ঠপুর ও কোচবিহার ভূখণ্ড জুড়ে বিভিন্ন হাঙ্গামার ঘটনা ঘটে। সন্ন্যাসী ফকিরদের অত্যাচার, নেপালের গোর্খাদের অত্যাচার সেই সঙ্গে ভুটিয়াদের সমতলে আগমন, আক্রমণ ও লুঠতরাজ। সর্বোপরি কোচবিহার, ভুটান এবং বৈকুণ্ঠপুরের মধ্যে বিবাদ, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আগমন সব মিলিয়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের প্রজাবৃন্দের সমাজ জীবনকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। ইঙ্গ-কোচবিহার

সন্ধির শর্তানুসারে সংকোশ নদী থেকে তিস্তা পর্যন্ত বিস্তৃত বিস্তীর্ণ অঞ্চল (পশ্চিম দুয়ার) যা কোচবিহার রাজ্যের অংশ যে অংশটি ভুটান দখল করে রেখেছিল সেই অংশটি ভুটানকে দিয়ে দেওয়া হয়। আদপে ওয়ারেন হেস্টিংসের ভুটান সরকারের প্রতি এই তোষণ নীতি এক গুরুতর রাজনৈতিক অভিসন্ধি ছিল। তিব্বতের সম্ভাব্য স্বর্ণখনি ও বিপুল বাণিজ্য সম্ভাবনাই ছিল ওয়ারেন হেস্টিংস এর আসল লক্ষ্য। এই তোষণ নীতি ব্রিটিশ সরকার বহুদিন বজায় রেখেছিল।

ঔপনিবেশিক যুগে উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের অর্থনৈতিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে ব্রিটিশ সরকারের কিছু নীতি আয়োগের ফলে। ব্রিটিশ সরকার ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে জমি জরিপের ব্যবস্থা করে এবং রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করে। মূলত: সরকারের উদ্দেশ্য ছিল সর্বাধিক কর আদায়ের ব্যবস্থা করা। ফলে কৃষকদের মধ্যে অস্থিরতা তৈরি হয়। নিজের জোতের আয়তন বৃদ্ধির জন্য অন্য কারো জমি আত্মসাৎ থেকে পতিত, অনাবাদী জমিকে চাষযোগ্য করে তোলবার প্রয়াস শুরু হয়। অনেকে এইভাবে বড় বড় জোতের মালিক হয়ে ওঠে। অনেকে গ্রামের বাইরে নিজস্ব জোত বা খারিজ মহলের মালিক হয়ে ওঠে, আবার ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদার শ্রেণির উদ্ভব হয়। উত্তরবঙ্গের বিস্তৃত অঞ্চলে জমিদার না হলেও বড় বড় জোতদারির সূচনা হয়। নির্দিষ্ট রাজস্ব নির্ধারিত সময়ে জমা দিয়ে বংশ পরম্পরায় ভোগ দখলের অধিকার পায়। এই জোতদারদের নিয়ন্ত্রণে চুকানিদার, দার চুকানিদার, প্রজা, আধিয়ারদের নিয়ে গ্রাম সমাজের পত্তন ঘটে। এই পরিবর্তিত ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের মধ্যে পরিবর্তনের সূচনা হয় এবং বলা যেতে পারে শ্রেণি বিভক্ত বর্ণ হিন্দু ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হয়। অনাবাদি জঙ্গলময় পতিত জমিও স্থায়ী কৃষিকার্যের জন্য উদ্ধার হয়। বৃহত্তর কৃষক সমাজের সূচনাও হয় বলা যেতে পারে। বিবর্তনের হাত ধরে ধীরে ধীরে সম্প্রদায় ভিত্তিক ভূমি মালিকানা থেকে গুরুভার খাজনার বিনিময়ে ব্যক্তিগত মালিকানা স্থানলাভ করে। ভূমি মালিকানা ব্যবস্থার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কৃষি ব্যবস্থা আধুনিকতার দিকে যেমন এগোয় কৃষিকে ঘিরে অর্থনীতির বিভিন্ন শ্রেণির উদ্ভবও হয়। আর রাজবংশী সমাজও আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হয়। বাস্তুভিটা, ব্যক্তি মালিকানা, লাঙল দিয়ে স্থায়ী কৃষি ব্যবস্থার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। পারিবারিক শ্রম দান ও প্রয়াসের মধ্য দিয়ে পরিবারের স্থায়ী ঠিকানা, কৃষিভিত্তিক আচার সংস্কারের ব্যাপ্তি পায়। সেইসঙ্গে

পারিবারিক বৃত্ত তৈরি হয়। ফসলের বৈচিত্র্যও আসতে থাকে। অন্যান্য শ্রেণির সঙ্গেও সমন্বয় ঘটে। বিবর্তন পরিবর্তনের ধারাও চলতে থাকে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সময়কালে রাজবংশী সমাজ এই কৃষি সংস্কারকে ভিত্তি করেই একপ্রকার সংগঠিত হয়।

প্রথম কোচ ভুটান যুদ্ধের পরও উত্তর সীমান্তের বিস্তৃত অঞ্চলে শান্তি কিন্তু ফিরে আসে না। উপরন্তু ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের (১২ নভেম্বর) দ্বিতীয় কোচ-ভুটান যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। স্বাভাবিকভাবে বিস্তৃত ডুয়ার্স (পশ্চিম) এলাকা সহ জলপাইগুড়ি অঞ্চলে সমাজ সংস্কৃতি এক অস্থির বিপন্নতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। বলা যেতে পারে ঔপনিবেশিক শাসনের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য এই অঞ্চলকে সুদীর্ঘকাল ক্ষতবিক্ষত করে। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে ২য় ভুটান-কোচ যুদ্ধের পর সমগ্র বাংলা দুয়ার ব্রিটিশ সরকারের অধিকারভুক্ত হলে 'পশ্চিমদুয়ার' অঞ্চল গঠিত হয়।[১১] তিনটি মহকুমা —সদর মহকুমা ময়নাগুড়ি, দ্বিতীয় মহকুমা প্রধান শহর আলিপুরদুয়ার এবং তৃতীয় মহকুমা ছিল ডালিমকোট। এই ডালিমকোট মহকুমা তিন বছর বাদে দার্জিলিং জেলার সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি এই আলিপুরদুয়ার এবং ময়নাগুড়ি মহকুমার সঙ্গে জেলার অধীন জলপাইগুড়ি মহকুমা এবং তিস্তার পূর্ব ও পশ্চিমপার অঞ্চল যুক্ত করে জলপাইগুড়ি জেলা গঠন করে ব্রিটিশ সরকার।[১২]

কোম্পানি প্রথমদিকে সাধারণ প্রশাসন ও রাজস্ব প্রশাসন আলাদাই রাখে। কিন্তু তাতে জটিলতা বৃদ্ধি পায়। জনসাধারণও নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হতে থাকে। এই সময়ই গভর্ণর জেনারেল হয়ে আসেন উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক। বেন্টিঙ্ক গর্ভণর জেনারেলের দায়িত্বভার গ্রহণ করেই প্রশাসন ব্যবস্থা সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। তিনি ওয়ারেন হেস্টিংস ও কর্ণওয়ালিসের প্রবর্তিত কাঠামো নতুন করে ঢেলে সাজান। প্রথমেই যে সংস্কারের কাজটি তিনি করেন সেটি হল District Magistrate এবং Collector-এর পদ দুটিকে সমন্বিত করে নাম দেন District Magistrate and the Collector। ফলে এই পদের ক্ষমতা ও গুরুত্ব বেড়ে যায়। আর এদের কাজকর্ম দেখভালের জন্য কমিশনারের পদ তৈরি করেন। এই কমিশনের জন্য তিনি আবার Division বা বিভাগ তৈরি করেন। এই বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয় কমিশনারকে। তিনি নিয়ন্ত্রণ করতেন আইন বহির্ভূত কাজকর্ম। সেই সূত্রেই তৈরি হয় প্রেসিডেন্সি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিভাগ, ঢাকা বিভাগ, রাজশাহী বিভাগ ও বর্ধমান বিভাগ। এই বিভাগ সৃষ্টি সম্পর্কে

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক মাহবুব রহমানের মন্তব্য সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন "১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের শাসনকালে কয়েকটি জেলার সমন্বয়ে একটি বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। প্রতিটি বিভাগের শাসনভার একজন বিভাগীয় কমিশনারের ওপর অর্পিত হয়। বিভাগীয় কমিশনার ছিলেন জেলা কর্তৃপক্ষ ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনকারী। ১৮২৯ সালের আইনে কমিশনারকে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়। তার হাতে রাজস্ব, বিচার ও পুলিশের সর্বময় ক্ষমতা অর্পিত হয়।"[১৩]

ঔপনিবেশিক শাসন শুরুর সঙ্গে সঙ্গে এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন শুরু হয়। ব্রিটিশ সরকারের নানাবিধ পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের সামগ্রিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে ব্রিটিশ সরকারের বাণিজ্য ও প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে। পরিবর্তন হয় জনবিন্যাসের। সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক অবস্থা ও ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র ছাড়াও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ঔপনিবেশিক পর্বে বাংলা তথা ভারতবর্ষের ব্যাপক পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছিল। ইংরেজদের দ্বারা প্রবর্তিত ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার ফলে নতুন নতুন শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। উত্তরবঙ্গেও এর প্রভাব পড়েছিল। ভূমি রাজস্ব বা জমি থেকে উদ্বৃত্ত আয় লাভ করার জন্য ইংরেজরা কোথাও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে, কোথাও বা রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত এবং মহলওয়ারি বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে। উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স এলাকা এবং দার্জিলিং জেলার পার্বত্য এলাকায় non-regulatory ব্যবস্থা প্রবর্তন করে, এর বাইরে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এলাকায় জমিদাররা ছিল জমির মালিক। আবার non-regulated এলাকায় সরকার নিজেই ছিল জমির মালিক। এখানে জোতদারদের জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হত জমি চাষ করার জন্য। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এলাকা এবং non-regulatory এলাকা সব জায়গাতেই জমিকে কেন্দ্র করে জমির উদ্বৃত্ত লাভের জন্য একাধিক 'মধ্যস্বত্ত্ব ভোগী' শ্রেণির সৃষ্টি হয়। যেমন — জোতদার, মুলনদার, চুকানিদার, দর-চুকানিদার, দর-দরচুকানিদার ইত্যাদি। এইসব মধ্যস্বত্ত্ব ভোগীরা নতুনভাবে সক্রিয় হয়ে উঠলে প্রকৃত কৃষক — যারা জমি চাষ করত এবং আধিয়াদের উপর শোষণ ও অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যায়।[১৪]

ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় নতুন নতুন শহর গড়ে ওঠার ফলে নতুন করে ব্যবসা বাণিজ্যের সম্ভাবনা তৈরি হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য উত্তরবঙ্গের দেশীয় বা স্থানীয়রা ব্যবসা বাণিজ্যে খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না। ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাদের উপস্থিতি বিশেষ লক্ষ করা যায় না। স্বাভাবিকভাবে উত্তরবঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল বহিরাগত বণিক গোষ্ঠী। এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করেছিল মাড়োয়ারীরা। এই মাড়োয়ারীরাই ঔপনিবেশিক পর্বে বাংলার অন্যান্য প্রান্তের মত উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করে। মাড়োয়ারীরা ছাড়াও পার্সিরা ব্যবসা বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করেছিল। এছাড়া পূর্ববঙ্গ থেকে সাহা, কুণ্ডু, বণিক প্রভৃতি পদবিধারী বাঙালীরা উত্তরবঙ্গে হাজির হয়।[১৫]

ঔপনিবেশিক পর্বে উত্তরবঙ্গের সমাজ ও অর্থনীতিতে চা-চাষ এক বিরাট প্রভাব ফেলে। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি সিকিমের কাছ থেকে দার্জিলিং লাভ করে এবং ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে ডুয়ার্স এলাকা ব্রিটিশ সরকার ভুটানের কাছ থেকে উদ্ধার করে নিজেদের দখলে নেয়। উল্লেখ্য দার্জিলিং নামের শহর ও জেলাটি ইংরেজ শাসকদের তৈরি। সিকিম রাজ্যের নিকট দার্জিলিং পাহাড় ও তরাই সমতল এবং ভুটানের কাছ থেকে কালিম্পং পাহাড় নিয়ে কোম্পানি দার্জিলিং জেলা তৈরি করে।[১৬] দার্জিলিং তাই সম্পূর্ণভাবে ঔপনিবেশিক শহর। এই দার্জিলিং এবং ডুয়ার্স এলাকা ইংরেজরা লাভ করার পর এখানকার জমিকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় সে বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করে। তারা সার্ভে এবং সেটেলমেন্টের কাজ শুরু করে কিছু জমিতে চুক্তির ভিত্তিতে 'জোতদারি'র ব্যবস্থা করেন। এই জমি লাভ করার জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রচুর মানুষ আসতে শুরু করে। তারা জমি লাভ করে জোতদারে পরিণত হয়। কৃষি কাজের উপযোগী জমি ছাড়া ডুয়ার্সে এবং দার্জিলিং জেলায় পার্বত্য এলাকায় প্রচুর মালিকানাবিহীন জমি ছিল, যার বেশিরভাগটাই ছিল জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এই এলাকার সরকারই ছিল জমির মালিক এবং সরকার নিজেই জমি দিতে শুরু করে চা-চাষ করার জন্য। এরপরে ডুয়ার্স অঞ্চলে দ্রুত চা বাগান গড়ে উঠতে থাকে। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম গাজোলডোবায় চা-বাগান স্থাপিত হওয়ার মধ্য দিয়েই যার সূত্রপাত ঘটে বলা যায়। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সেখানে চা বাগানের সংখ্যা দু'শো ছাড়িয়ে যায়।[১৭] আগমন ঘটে হাজার হাজার বহিরাগত মানুষের। চা বাগানে কাজ করার জন্য ম্যানেজার, করণিক, অফিসার শ্রেণির মানুষের আগমন ঘটে। শ্রমিক বা কুলি হিসাবে প্রচুর

আদিবাসী মানুষকে ধরে আনা হয়। এদের বেশিরভাগই ছিল ওঁরাও, সাঁওতাল, মুন্ডা, হোঁ, নাগেশিয়া বিভিন্ন উপজাতি জনগোষ্ঠীর মানুষ। এইসব আদিবাসী মানুষদের বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে সর্দাররা কমিশনের বিনিময়ে সাঁওতাল পরগণা, রাজমহল, ছোটনাগপুর, রাঁচি থেকে ধরে নিয়ে আসে। আর তরাই ডুয়ার্সে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের তরল বাণিজ্য বিস্তারের দীর্ঘপথ রচিত হয়।

ঔপনিবেশ ও উত্তর-ঔপনিবেশ পর্বে উত্তরবঙ্গের উত্তরাংশ কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং যেভাবে গুরুত্ব পেয়েছিল, দক্ষিণাংশের মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর সেভাবে পায়নি। এটা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সময় থেকে অব্যাহত ছিল। পরবর্তীকালে এটা তারা ঘটায় মূলত: ভূমি রাজস্ব নীতি এবং সেটা সম্পদ সম্ভাবনাকে মাথায় রেখে। উত্তরবঙ্গের তথাকথিত দক্ষিণাংশের গৌরবময় সময় ছিল প্রাচীন ও মধ্যযুগ। বঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের মতো উত্তরবঙ্গের সমস্ত এলাকায় একইরকম ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা প্রয়োগ করেনি ব্রিটিশ সরকার। দিনাজপুর, রংপুর, পাবনা, মালদহ, জলপাইগুড়ি জেলার তিস্তার পশ্চিমাঞ্চল জমিদারি ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে। আবার জলপাইগুড়ি এলাকার ডুয়ার্স এলাকায় এবং দার্জিলিং জেলায় non-regulatory ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। সরকার নিজেই সেখানে সরাসরি জমির মালিক। এই জমির লিজ দিত অর্থনৈতিক স্বার্থে। কোথাও জোতদারি ব্যবস্থা কায়েম করা হয়েছিল আবার কোথাও চা-বাগান গড়ে উঠেছিল লিজের মাধ্যমে। ঔপনিবেশিক শাসনের এই ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় অনেক নতুন নতুন শ্রেণির উদ্ভব ঘটেছিল। এদের মধ্যে হাজার হাজার একর জমির মালিক যেমন ছিল তেমনি কয়েকশ' বিঘার মালিক হিসাবে ধনীক শ্রেণির জোতদার বা মধ্যস্বত্ত্বভোগীরও সৃষ্টি হয়। অনেকে আবার জমিদার, জোতদারদের কাছে জমি নিয়ে আধিয়ার দিয়ে জমি সত্ত্বের ভোগ দখল করতেন। অনেকের কৃষির সঙ্গে কোন সম্পর্কই ছিল না। এরা মূলত: কমিশনের মাধ্যমেই জমি চাষের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। ডাক্তার, উকিল, ব্যবসায়ী, মহাজন বিভিন্ন পেশায় যুক্ত থেকে আধিয়ার মারফতই জোতদারি চালিয়ে যেতেন। জোত কেনাবেচায় এরাই মূল ভূমিকা পালন করতেন। এই অনুপস্থিত জোতদাররা একসময় বেশ ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। দিনাজপুর জেলাতেও এরকম মধ্যস্বত্ত্বভোগী শ্রেণির উদ্ভব হয়। এফ. ডব্লিউ. স্ট্রং লিখেছেন, "Owing to the trouble and expense involved in realising rents, the loss

suffered owing to cultivators deserting their holdings, the large area over which the tands included in a estate are sometimes scatered and other causes, it frequently happens that a zaminder keeps only a small portion of his estate in his own management, and lets out the rest either in parces on lease or in farm sometimes the whole estate is so let out.”[১৮] এভাবেই সৃষ্টি হয় মুকারারি তালুকদার, পাটানি, তালুকদার, ইজারাদার ইত্যাদি মধ্যস্বত্ত্বভোগীর।

প্রাক ঔপনিবেশিক যুগে উত্তরবঙ্গের অর্থনীতির প্রধান উপাদান ছিল কৃষি। এখানকার জনসমাজের এক বৃহৎ অংশই ছিল রাজবংশী এবং স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ। এদের বেশিরভাগই ছিলেন কৃষির সঙ্গে জড়িত। কেউবা ছিলেন জোতদার-জমিদার, কেউবা ছিলেন মধ্যস্বত্ত্বভোগী কৃষক, আবার কেউবা ছিলেন আধিয়ার বা সাধারণ কৃষক।[১৯] আবার উত্তরবঙ্গের স্থানীয় জমিদার বা জোতদার বা মধ্যস্বত্ত্বভোগী এবং তাদের অধঃস্তন কৃষক বা আধিয়াররা ছিলেন একই সম্প্রদায়ভুক্ত। যেমন রাজবংশী, স্থানীয় মুসলিম বা আদিবাসী জোতদার বা মধ্যস্বত্ত্বভোগীদের প্রজা বা আধিয়াররাও ছিলেন রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্ত।[২০] এছাড়া দক্ষিণবঙ্গের মত এই এলাকার স্থানীয় জোতদাররা অন্যান্য পেশায় বা ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। শুভজ্যোতি রায় তার ‘Transformation on the Bengal Frontier, Jalpaiguri’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষরা কৃষি ছাড়া অন্যান্য পেশার সঙ্গে সেভাবে যুক্ত ছিলেন না।[২১] এমনকী সমাজের প্রয়োজনীয় কাজ বা পেশা যেমন দোকানদার, ধোপা, নাপিত, খেয়া পারাপার প্রভৃতি কাজও তারা করতেন না। বিহার বা অন্যান্য প্রান্তের লোকেরা এসে এসব কাজ করতেন।[২২] সে সময়ে রাস্তাঘাট নির্মাণ, সেতু, রেললাইন, বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি কাজেও বাইরে থেকে লোক আনতে হয়।

পশ্চিম ডুয়ার্স ছিল বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ। লোক সংখ্যা ছিল খুবই কম। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারিতে এইচ. বেভারলি লিখেছিলেন “In the recently acquired Doors the population is 67 to the squire mile.” ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারির প্রতিবেদনেও ও’ ডোনেল লিখেছেন যে ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে আলিপুরদুয়ার মহকুমার প্রতি বর্গ মাইলে লোকসংখ্যা ছিল ৫৭ জন এবং ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৮৯ জন।[২৩] আসলে রাজনৈতিক

ক্ষমতার পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জনবিন্যাসের চরিত্র পাল্টাতে থাকে। বিশেষ করে ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন পর্বে। এই বিস্তৃত অঞ্চলে সুদীর্ঘকাল রাজনৈতিক টানাপোড়েন ছিল। কোচ রাজ্যের অংশ হলেও ভুটান জোর করে একশ বছরের বেশি সময় ধরে তা ভোগ দখল করে। এইসব অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসন বলবৎ হওয়ার পর বহু রাজবংশী কৃষক এখানে এসে বসতি স্থাপন করে। প্রতিবেশী কোচবিহার দেশীয় রাজ্য ও রংপুর থেকেও ভালো সংখ্যক রাজবংশী কৃষক ডুয়ার্সের এলাকায় চলে আসে। এর কারণ হিসাবে জলপাইগুড়ির ডেপুটি কমিশনারের ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে .... in the Western Doors portion of the District the area under rice cultivation was very considerably extended, owing to the influx of new settlers from CoochBehar and Ranpur District."[২৪] আবার ডুয়ার্সের জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষ আবাদের উদ্দেশ্যেও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অংশ থেকে লোকজন আনার চেষ্টা করে সর্দার মারফত। আসলে ব্রিটিশ সরকারের লক্ষ্য ছিল রাজস্ব বৃদ্ধি। কিন্তু ডুয়ার্সের অনাবাদি জমি থেকে কিছু রাজস্ব পাচ্ছিলেন না। ঔপনিবেশিক চিন্তায় তাই লোকবসতি বৃদ্ধি করে জঙ্গল পরিষ্কার ও চাষাবাদ বৃদ্ধি করে রাজস্ব আদায়ের প্রয়াস। এই সূত্রেই ডুয়ার্স এলাকায় জনবসতি বৃদ্ধি পায়। সেইসঙ্গে চা বাগান, ব্যবসা বাণিজ্যের স্বার্থেও বহু মানুষের আগমন ঘটে। আবার ঔপনিবেশিক মানসিকতায় প্রশাসনিক কারণেও তারা বিভিন্ন শ্রেণির লোকজনকে নিয়ে আসেন। এভাবেই ব্রিটিশ সরকার তাদের উদ্দেশ্য সফল করেন। সেই শাসনকার্যের সুবিধার জন্য তারা বিভিন্ন সময়ে রাজশাহী, মালদহ, দিনাজপুর প্রভৃতি জেলাগুলির একাধিকবার সীমানা পরিবর্তন করেন। ব্রিটিশ সরকারের রাজস্ব সংগ্রাহক হিসাবে পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গের বাঙালিদের আগমন ঘটে। আবার চা-বাগান, কাঠের ব্যবসা, পাটের ব্যবসা ও রেলপথ বিস্তারের হাত ধরে বহু মানুষের আগমন ঘটে এবং বসবাসের জায়গা হয়ে ওঠে। শিলিগুড়ি ও তরাই অঞ্চলের সঙ্গে বিহারের যোগাযোগ তো ছিলই, রেললাইন স্থাপনের পর সেই যোগাযোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।

১৮৯১-১৯২১ সালের অভিবাসনের চিত্র (কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর) [২৫]

সাল	সন্নিহিত জেলা থেকে অভিবাসন		অন্যান্য জেলা থেকে অভিবাসন	
	পুং	মহিলা	পুং	মহিলা
		কোচবিহার জেলা		
১৮৯১	১২৯৯৭	১৫১৯১	৩২৬২	১২০১
১৯০১	৯১৬১	১২৫৩১	১২৬৬৮	২২৫৫
১৯১১	১১০০০	১৩০০০	৫০০০	২০০০
১৯২১	৯০০০	১২০০০	১০০০	৬০০০
		জলপাইগুড়ি		
১৮৯১	৩০৯২০	২৭৮৩৫	১২৪৬১	৭৬৪১
১৯০১	২৪৩৫৪	২৩৮৫৬	৬৫২৭২	৪৮৬৩৬
১৯১১	১৮০০০	১৫০০০	১৫০০০	১০০০০
১৯২১	২১০০০	১৯০০০	৫০০০	৪০০০
		দিনাজপুর		
১৮৯১	২২৬৭০	১৮৮১৯	৯৩০৮	৫৮৯৪
১৯০১	১৩৯০১	১৩৩১৯	৬০১৪৩	৩৪৮৭১
১৯১১	১৯০০০	১৬০০০	১২০০০	৬০০০
১৯২১	১২০০০	১৩০০০	১০০০০	৭০০০

সূত্র : A. Mitra, West Bengal District Hand Book, Calcutta 1851, Cooch Behar, Page - xxxvi; Jalpaiguri, Page - xii; West Dinajpur, Page - xii.

ঔপনিবেশিক শাসনকালে সামাজিক ক্ষেত্রেও নানা পরিবর্তন ঘটে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্র পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রও প্রসারিত হয়। একাধিক Settlers townও তৈরি হয়। জলপাইগুড়ি জেলা সৃষ্টির পর ইংরেজদের দ্বারা সৃষ্ট নতুন অর্থনৈতিক সংস্কার, চা-বাগান স্থাপিত হওয়ার ফলে চাকুরি এবং ব্যবসা সূত্রে বিভিন্ন ধর্মের, বর্ণের ও শ্রেণির মানুষের সমাগম ঘটে এই জেলায়; ফলে এক নতুন সংস্কৃতির জন্ম হয় ঔপনিবেশিক যুগে। ১৮৮১ খ্রি. থেকে ১৮৯১ খ্রি. আদমসুমারি রিপোর্টের তুলনামূলক সূচক থেকে লক্ষ্য করা যায় ডুয়ার্সে এই দশকে ১,১৪,২৭৭ জন অভিবাসিত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। টেবিলে তা দেখানো হল। [২৬] উত্তর ঔপনিবেশিক যুগেও এই ধারা বজায় ছিল।

জায়গা	বৃদ্ধির পরিমাণ	জায়গা	বৃদ্ধির পরিমাণ
দার্জিলিং	১৫৮৮	বিহারের জেলা	৮৪৯১
দিনাজপুর	৫০৫	উড়িষ্যা	২৯২
রংপুর	১০১০১	ছোটনাগপুর	২০৩৪১
কুচবিহার	৩২২২৪	অন্যান্য রাজ্য	২৯৩৭১
অন্যান্য জেলা	১১৩৬৪		
		মোট	১১৪২৭৭

সূত্র : Sunder's Report; Gruning, Jalpaiguri District Gazetteers; Census Statistics, 1881 and 1891.

উত্তরবঙ্গে শিক্ষার বিস্তার ঘটেছিল অনেক দেরিতে। এখানকার দেশীয় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে শিক্ষার সচেতনতাও ঘটেছিল অনেক পরে। তবে পূর্ববঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গ থেকে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে আগত শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের হাত ধরেই শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জগৎ বেশি প্রভাবিত হয়েছিল। তবে এই ক্ষেত্রে স্থানীয় জোতদাররা অর্থ, শ্রম, জমিদান এবং উদ্যোগ গ্রহণ করে শিক্ষার প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা নেন। এখনও খোঁজ নিলে তাই দেখা যায় যে অধিকাংশ বিদ্যালয় স্থাপনে রাজবংশী জোতদার কিংবা অবস্থাপন্ন পরিবারই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। অনেক বিদ্যালয়ের নামের মধ্যেও সেটা বোঝা যায়। এ বিষয়ে মুসলিম জোতদার ব্যক্তিরাও পিছিয়ে ছিলেন না। আসলে উত্তরবঙ্গে শিক্ষা বিস্তারের কাজ শুরু হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। একদিকে দেশীয় বিদ্যালয়ে দেশীয় শিক্ষা (সংস্কৃত টোল, পাঠশালা) এবং মুসলমানদের মক্তব ও মাদ্রাসা অপরদিকে ইংলিশ স্কুলগুলিতে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তন শুরু হয়েছিল। ফলে উত্তরবঙ্গের মাটিতে একটি শিক্ষিত শ্রেণির উদ্ভব হয়। শিক্ষক, উকিল, অধ্যাপক, ডাক্তার, কবি, লেখক প্রমুখ মধ্যবিত্ত শ্রেণির এই অংশটি যারা সমাজের এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক বিরাট ভূমিকা পালন করে।[২৭] বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়। মনন, চিন্তনের ক্ষেত্রের পরিবর্তনের ঢেউ আঁচড়ে পড়ে। তবে শিক্ষার বিষয়ে রাজবংশী সমাজের সচেতনতা জাগ্রত হয় তারও অনেক পরে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় শিক্ষা বিষয়ে ভাবনার পরিবর্তন স্পষ্ট হয়। কৃষি নির্ভর মানসিকতার বদল ঘটতে থাকে। অন্যান্য পেশায় যুক্ত হবার প্রবণতা ও মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে। জমিদারী মানসিকতার ফলে অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়ে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার কারণে অনেকের জোতদারি

সংকটাপন্ন হয়। এক প্রতিযোগিতারও সম্মুখীন হয়। পাশাপাশি বড় পরিবারগুলোও ভাঙতে থাকে। সাংস্কৃতিক দিক থেকেও প্রভাবিত হয়। আত্তীকরণ, হীনমন্যতাবোধ ইত্যাদি নানাবিধ কারণে সংস্কৃতির বিন্যাসে পার্থক্য চোখে পড়তে থাকে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এখানে শিক্ষার বিস্তার ঘটেনি। প্রথম দিকে কোম্পানি শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী ছিল না, কারণ তারা মূলত: এসেছিল ব্যবসা বাণিজ্য করতে। তাই শিক্ষা খাতে অর্থব্যয় করা তাদের কাছে ছিল অপচয়। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনিক দায়িত্বও এসে পড়ে, আর প্রশাসনিক কাজ চালাতে গিয়ে তাদের ইংরেজি জানা লোকের প্রয়োজন হয়। কাজেই ইচ্ছে না থাকলেও প্রয়োজনের তাগিদেই তারা শিক্ষা বিস্তার ঘটাতে বাধ্য হয়। তবে এ প্রসঙ্গে বলা ভালো যে সরকারিভাবে দেরিতে শিক্ষা প্রবর্তিত হলেও বেসরকারি উদ্যোগে বিশেষ করে মিশনারীদের উদ্যোগে এদেশে শিক্ষার বিস্তার ঘটতে থাকে।[২৮] বলা যেতেই পারে ঔপনিবেশিক শাসনের সূত্র ধরেই মিশনারীদের আগমন ঘটে এবং তারাই শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে একপ্রকার বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। একটা বিশেষ শিক্ষিত শ্রেণির উদ্ভব ঘটে, তবে বলা ভাল রাজবংশী জনগোষ্ঠী অনেক দেরিতে এই শিক্ষা চেতনার অংশীদার হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদেও রাজবংশী সমাজে শিক্ষার হার শূন্যর কাছাকাছি। প্রকৃতপক্ষে বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় মনীষী পঞ্চানন বর্মা ও কতিপয় বুদ্ধিজীবী মানুষের ক্ষাত্র আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে রাজবংশী সমাজে শিক্ষা সচেতনা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে।

দেশীয় রাজ্য কোচবিহারে শিক্ষার প্রসারে মহারাজারা বিভিন্ন সময়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তবে ব্রিটিশের করদরাজ্যে পরিণত হওয়ার পরই কমিশনারদের উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে ভিক্টোরিয়া কলেজ স্থাপিত হয়। জেনকিন্স স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে এবং সুনীতি একাডেমী স্থাপিত হয় ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে। শিক্ষার প্রসারে দেশীয় রাজ্য কোচবিহার বরাবরই অগ্রসর ছিল। সেটাও কিছুটা ঔপনিবেশিকতার বাহ্যিক প্রভাব বলা যায়।[২৯]

১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে জলপাইগুড়ি জেলা গঠনের পর শিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে। এই জেলার প্রাচীন ও মধ্যযুগে শিক্ষার অবস্থান সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট

গেজেটিয়ার-এ এ বিষয়ে বর্ণনা পাওয়া যায় — The cencus of 1872, which is the earliest, recorded 19 primary schools having 283 students and 22 teachers. The first High English School of the District namely the Jalpaiguri Zilla School was established in 1876. In 1875-76 there were 153 schools with 3263 students on the rolls. The everage number of square miles to each school was 18,992 and the percentage of school to population was[৩০] এরপরে জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন প্রান্তে প্রাইমারী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ও হাইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। প্রথম কলেজ স্থাপিত হয় ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে। The college named Ananda Chandra College started functioning from 1942 with a roll strength of 91 which figures of 211 next year and 582 in 1947. B.A. classes were opened in 1948.[৩১]

অন্যান্য জেলার মত দিনাজপুর জেলাতেও ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে সরকারি উদ্যোগে শিক্ষার বিস্তার ঘটেনি। শিক্ষা বলতে সাধারণত পাঠশালায় শিক্ষাই বহাল ছিল। মুসলমান শিক্ষার জন্য ছিল মক্তব। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সরকারি উদ্যোগে শিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে। এ বিষয়ে F. A. Strong র বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। In 1860-61 only 10 schools in the Dinajpur District were in receipt of aid from the state. Between that year and 1870-71, the number to 247, of which one was a Government English school, 8 were Government Vernecular Schools, 18 were aided girls schools and one an aided training school.[৩২] এরপর থেকে সরকারি উদ্যোগে দিনাজপুর জেলাতে আরও স্কুল প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।

মালদহ জেলাতে দেশীয় শিক্ষাই বহাল ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত। হিন্দুদের টোল ও মুসলমানদের জন্য ছিল মক্তব। ধর্মভিত্তিক শিক্ষাই প্রাধান্য পেত। টোল এবং পাঠশালাগুলিতে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি সংস্কৃত শেখানো হত। মক্তবগুলিতে শেখানো হত পার্শী ভাষা। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সরকারি উদ্যোগে শিক্ষা বিস্তারের কাজ শুরু হয়। G. E. Lambourn লিখেছেন, In 1836-57 there were two Government

aided vernacular school with 117 scholar and in 1860 one of these schools was converted into a middle English school, the total number of scholars being 169. In 1870 there were four English schools and 14 vernacular schools either maintained or aided by Government. In 1872 when sir George compbell's scheme for Education was introduced, 179 schools were brought under Government supervision with 4207 pupils.[৩৩] কোচবিহারের ক্ষেত্রেও বিষয়টি তদনুরূপ। কোচবিহারে জেনকিন্স স্কুল স্থাপিত হয় মহারাজা নরেন্দ্র নারায়ণের আমলে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে এবং ভিক্টোরিয়া কলেজ স্থাপিত হয় ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে। বিস্তীর্ণ উত্তরবঙ্গের প্রথম কলেজ বলা যায়। স্বাধীনতার পূর্বে কোন বিশ্ববিদ্যালয় তো উত্তরবঙ্গে ছিল না। সুদূর কলকাতাতেই উচ্চশিক্ষার জন্য ছুটতে হত। রাজবংশী সমাজের শিক্ষা সচেতনতা দেখা যায় অপেক্ষাকৃত জোতদারদের মধ্যে। দরিদ্র কৃষক আধিয়ারদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটে অনেক পরে। সেটাও স্বাধীনোত্তর সময়ে। তবে এ বিষয়ে মনীষী পঞ্চানন বর্মার ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় তার নেতৃত্বে ক্ষাত্র আন্দোলন ও সমাজ সংস্কারে বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষা সচেতনতার প্রসার ঘটে। শুধুমাত্র শিক্ষা নয় এই সময়েই বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠীর মনন ভাবনা, খাদ্য, পোষাক পরিচ্ছদ এমনকী সংস্কৃতি চেতনার মধ্যেও পরিবর্তন দৃশ্যমান হয়। তবে এ বিষয়ে 'ক্ষত্রিয় সমিতি' ও পঞ্চানন বর্মার ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। আত্মসচেতনতার মধ্য দিয়ে আত্মানুসন্ধান ও আধুনিক জীবনের পথ ও অনুসন্ধানের প্রয়াস গতি লাভ করে এবং একটা প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয়ে উত্তরণের পথ খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করে। বলা যায় ঔপনিবেশিক সময়ের শেষ দিকেই রাজবংশী জনগোষ্ঠী আত্মসচেতন ও সংঘবদ্ধ হতে শুরু করে।

ঔপনিবেশিক সময়ের পূর্বে বিস্তীর্ণ উত্তরবঙ্গ ভৌগোলিক দিক থেকে যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল তেমনি বিভিন্ন জনজাতির সমষ্টি ছিল। বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত এইসব জনজাতি যথা - মেচ, কোচ, রাভা, গারো, পুলিন্দ, টোটো প্রভৃতি যারা ব্রিটিশ আসার বহু পূর্ব থেকেই এখানে বসবাস করত। পরবর্তীকালে অভিবাসী জনজাতির বিভিন্ন গোষ্ঠী (মুণ্ডা, ওঁরাও, সাঁওতাল, রাই, লিম্বু, শেরপা প্রভৃতি) ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার হাত ধরে আসে। এছাড়া পূর্ববঙ্গ থেকে কিছু বাঙালি,

বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত বিভিন্ন শ্রেণির ব্যবসায়ী এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করত। এছাড়া ছিল মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন। তবে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন জনজাতির মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হিসাবে বসবাস করত। এর ফলে তাদের সামাজিক রীতিনীতি, ধর্মীয় সংস্কার, চিন্তাভাবনায় মিশ্রণ বিশেষ ঘটে না। আবার বহিরাগত কোন গোষ্ঠী বা জাতির দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার প্রবণতাও ছিল না। এছাড়া যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব, শিক্ষার সুযোগ না থাকা ইত্যাদি কারণে সামাজিক রীতিনীতির বিশেষ পরিবর্তন হয় না। কিন্তু ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তন হওয়ার পরই রাজনৈতিক ক্ষমতা বদল, নতুন অর্থনীতি, ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা এবং যোগাযোগ ও শিক্ষার আগমনের ফলে সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা হয়।

সবাই প্রায় গ্রামেই বসবাস করত এবং বেশিরভাগ অঞ্চলই ছিল জঙ্গলে আবৃত। কোন কোন এলাকা ছিল বন্য জন্তু জানোয়ারদের অভয়ারণ্য। দিনের বেলাতেই সেইসব হিংস্র পশুদের লোকালয়ে আগমন ঘটত। বিভিন্ন জনজাতি পাহাড় জল-জঙ্গল আবৃত এলাকায় বসবাস করলেও রাজবংশী জনগোষ্ঠী অপেক্ষাকৃত সমতল এলাকাতেই পাড়া-টারী তৈরি করে বসবাস করত। কৃষিজমিকে ঘিরে কোন বাড়িকে কেন্দ্র করে (জোতদার) পাড়া-পড়শি, আধিয়ার-প্রজাদের বসবাসই ছিল স্বাভাবিক বিষয়। ব্রিটিশ সময়ের বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে জনবসতি সম্পর্কে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে, সে সময় এক একজন জোতদারকে কেন্দ্র করেই গ্রামের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা দীক্ষা এবং সংস্কৃতি প্রভৃতি আবর্তিত হত।[৩৪] আবার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জোতদার এবং আধিয়াররা একই সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় বিশেষ শ্রেণিভেদ যেমন ছিল না তেমনি আত্মীয়তার বন্ধনও তৈরি হত। ফলে সমাজ ব্যবস্থায় সমবায় ভিত্তিক মানসিকতার প্রকাশ ঘটত।

রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ নিজেদেরকে ক্ষত্রিয় জাতির লোক বলে মনে করেন।[৩৫] তবে তাদের আত্মপরিচয় যাই হোক না কেন তাদের মধ্যে কোন জাতিভেদ প্রথা ছিল না। তবে জীবিকার ভিত্তিতে সমাজে কয়েকটি শ্রেণিবিভাগ ছিল। এদের মধ্যে সব চাইতে প্রভাবশালী ছিল জোতদার শ্রেণি।[৩৬] এরাই ছিল জমির মালিক এবং এরাই রাজবংশী সমাজের অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সংস্কৃতি, বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতেন।[৩৭] এই জোতদাররা অন্যান্য শ্রেণির লোক যেমন ছোট কৃষক, আধিয়ার, পুরোহিত এবং তাদের গৃহে কর্মরত কোন

মানুষকে ছোট চোখে দেখতেন না। এমনকী পরবর্তীকালে দক্ষিণবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গ থেকে আগত মানুষজনের সঙ্গেও সহৃদয় ব্যবহার করতেন এবং সদ্‌ভাব বজায় রাখতেন । অন্য একটা শ্রেণি যারা রাজবংশী সমাজে পূজা পার্বণের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাদেরকে 'অধিকারী' বলা হত। সমাজের লোক এদেরকে 'কুলগুরু' হিসাবে সম্মান করতেন। তারা যজমানীও করতেন। শিষ্যত্বও প্রদান করতেন। আবার এদের মধ্যে যারা শ্রাদ্ধের কাজ করতেন তাদেরকে বলা হত 'দেওসী'। এছাড়া ছিল 'দেওধা' নামে আরেক ধরনের পুরোহিত শ্রেণি। এদের পদবির বিশেষ কোন পরিবর্তন হত না, এরাও পূজা অর্চ্চনার সঙ্গে যুক্ত ছিল।[৩৮]

রাজবংশী সমাজে বর্ণভেদ ছিল না। কৃষি সম্পৃক্ত সবাই মিলমিশের মধ্যেই লোকায়ত সমাজ গঠন করতেন । এমনকী ধর্মান্তরিত নস্য শেখ মুসলিমদের সঙ্গে সামাজিকতার ক্ষেত্রে কোন ধর্মান্ধতা ছিল না। মুসলিমদের কিছু জীবিকা ভিত্তিক কাজকর্ম নির্দিষ্ট (যেমন মাংস বিক্রয়, গবাদি পশুর ব্যবসা বাণিজ্য) থাকলেও সামাজিকতার ক্ষেত্রে বিশেষ বিভেদ ছিল না। গ্রাম সমাজের কোন সমস্যার সমাধানে একযোগে সবাই যেমন অংশগ্রহণ করত তেমনি গান বাজনা (বিশেষ করে দোতরা, কুশান, পালাটিয়ায়) কিংবা সংস্কৃতি উৎসবে সবাই সমানভাবে অংশগ্রহণ করতেন । এমনকী পূজা-পার্বণেও কোন বিধিনিষেধ কাজ করত না। মুসলিমদের গান বাজনা ধর্মের শরিয়ত বিরোধী হিসাবে চিহ্নিত হলেও আব্বাসউদ্দিন, নায়েব আলির মত প্রখ্যাত গায়করা এই প্রতিবন্ধকতার বেড়াজাল উপেক্ষা করেই ভাওয়াইয়া গান করতেন এবং বলা যেতে পারে তাঁদের উদ্যোগেই ভাওয়াইয়া গান বিশ্বের দরবারে সমাদৃত হয়। পরবর্তীকালে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে অন্যান্য পেশার লোকজন যেমন ব্রাহ্মণ, ধোপা, নাপিত, কামার প্রভৃতি শ্রেণির আগমন ঘটলে তাদের সঙ্গেও একটা পারস্পরিক মেলবন্ধন তৈরি হয়। ভাষার ক্ষেত্রেও তারা সবাই শরিক হয়ে ওঠে। আচার বিচার সংস্কারেও কাছাকাছি আসে। নগদ বিনিময়ের বদলে কিছু কিছু বাড়িতে বাৎসরিক ধান শস্যের বরাদ্দ হত কাজের নিরিখে। স্বাভাবিকভাবে তারা সবাই রাজবংশী সমাজের অংশ হয়ে ওঠে। প্রথমদিকে রাজবংশী সমাজের মন্দির, থানে বর্ণহিন্দু ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা বিশেষ অংশ নিতেন না। কারণ যে সকল ব্রাহ্মণ রাজবংশী সমাজের পূজা-পার্বণ কিংবা শ্রাদ্ধাদির কাজ করতেন বর্ণ হিন্দুদের চোখে তারা নিম্ন শ্রেণি হিসাবে পরিগণিত হত। এই সুযোগে অসমীয়া ব্রাহ্মণদের আগমন ঘটে। তাঁদের বংশধররাই

এখনও রাজবংশী সমাজের পূজা-পার্বণ কিংবা বিয়ে, শ্রাদ্ধের মত অনুষ্ঠানগুলিতে অংশ নেয়। ব্রিটিশ সরকার আসার পর সেই বিধিনিষেধ অনেকটাই শিথিল হয়ে পড়ে। ঔপনিবেশিক পর্বে এক একটি গ্রামে লোকসংখ্যা বিশেষ ছিল না।[৩৯] গ্রামগুলি গ্রাম প্রধানের দ্বারা শাসিত হত এবং এক্ষেত্রে পঞ্চ (পঞ্চায়েত) নামে একপ্রকার গ্রাম্য সংস্থার ব্যবস্থা ছিল। গ্রাম প্রধান এবং পঞ্চ উভয়েই পরোক্ষভাবে জমিদারের অধীনে থাকত। এরা নির্বাচিত হতেন না, হতেন মনোনীত।[৪০] গ্রামের বাড়িগুলি সারিবদ্ধভাবে অথবা একত্রে ছিল না, ছিল ছড়িয়ে ছিটিয়ে। কারণ হিসাবে বলা যায় গ্রামের বেশিরভাগ ভূ-সম্পত্তির মালিকানা ছিল জোতদার শ্রেণির হাতে। এই সকল জোতদারদের জমিগুলি বেশিরভাগ একস্থানে হত আর জোত-এর মাঝখানে বাড়ি তৈরি হত। সুতরাং প্রায় দেখা যেত এক জোতদারের বাড়ি থেকে অন্য জোতদারের বাড়ির দূরত্ব ছিল কমপক্ষে আধমাইল থেকে একমাইল।[৪১]

জনবসতি কম থাকায় রাত্রি বেলা গ্রামের রাস্তা নিরাপদ ছিল না। নিরাপত্তার কারণে লোকজনও বিশেষ বের হত না। বেশিরভাগ এলাকা ছিল জঙ্গলে আবৃত এবং হিংস্র জন্তু জানোয়ারদের উপদ্রবে পূর্ণ। তাছাড়া চোর ডাকাতেরও ভয় ছিল। হাট বাজার গুলিও দিনের বেলায় বসত। সন্ধ্যার আগেই শেষ হত। হাট বাজারগুলি শুধু ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনেই নয় সামাজিক মেলবন্ধন, খবরাখবর আদান প্রদানেরও কেন্দ্র ছিল। গ্রামের হাটগুলিতে প্রচুর চায়ের দোকান এবং খাদ্যদ্রব্যের দোকান থাকত। হাট থেকেই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গ্রামবাসী সংগ্রহ করত। হাটবাজারের বাইরে বিশেষ দোকানপাট ছিল না। রাজবংশী সমাজের মানুষেরা বাঙ্কুয়া (ভারবাহী বাঁশের তৈরি ভার বিশেষ) নিয়ে জিনিসপত্র হাটে আনা নেওয়া করতেন । অনেকে অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্নরা গরু বা মোষের গাড়িতে হাটে জিনিসপত্র নিয়ে যেতেন । বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবের অঙ্গ ‘হাটঘুরানী’ রীতি ছিল। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বাজার করার সঙ্গে সঙ্গে প্রচার বা জানানোর কাজটি হাটেই শেষ হত। বাঁশ খেলার দল, তিস্তা বুড়ির পূজা, ভক্তিয়ার খেলা, চড়ক মাগনের দল বাজারে যেত। দলবদ্ধ হয়ে হাট বাজার যাওয়ার বিষয়টি উৎসবের মত ছিল। বয়স্কা মহিলারাও হাটে দলবেঁধে যেতেন।[৪২] মহিলারা ‘আলোয়া’ (দেশী তামাক) সিলিমে করে খেতেন । রাজবংশী সমাজে যৌথ পরিবার লক্ষ করা যেত। জোতদার শ্রেণির মধ্যে বিরোধ ছিল না। গ্রামগুলির নামকরণও হত সেই গ্রামে বসবাসকারীদের প্রকৃতি অনুযায়ী।[৪৩] ১৮৮৫-

৮৯ খ্রিস্টাব্দের সান্ডার্স-এর রিপোর্টে দেখা যায় যে গ্রাম এলাকার নামে নামে স্থানিক বৈশিষ্ট্য, বিশেষ কোন ব্যক্তির নামে জনপদগুলির নাম স্থিরীকৃত হয়েছে। এটা জলপাইগুড়ি, বিস্তীর্ণ তরাই ডুয়ার্স এমনকী দিনাজপুর, মালদহ এলাকাতেও দেখা গেছে।[৪৪] সে সময় এভাবেই স্থানের নাম স্থির হত। রাজবংশী মানুষজন নদীর কিংবা মাছের, গাছের নামে, অনেক সময় উৎপাদিত ফসলের নামেও জায়গার নাম ঠিক করতেন। যেমন - মরিচবাড়ী, তল্লিগুড়ি, চ্যাংমারী, হলদিবাড়ি কিংবা চাপরের পার। জয়দেবপুর, কুমারগ্রাম, ভোলার ডাবুরী কিংবা আমগুড়ি এই নামগুলি থেকে সেটা স্পষ্ট হয়।[৪৫] শিক্ষার বিষয়ে রাজবংশী মানুষজন বিশেষ সচেতন ছিলেন না। সুযোগও ছিল না বলা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে কিছু এলাকায় দেশীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয় কিন্তু সেখানেও শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল নিতান্তই কম। প্রাথমিক অক্ষর জ্ঞানের পরই বিদ্যালয় ছেড়ে দিত। আসলে ভূমিজ রাজবংশী সমাজে চাকরিবাকরি বা অন্য পেশার প্রতি কোন আগ্রহই ছিল না। জমিই ছিল সামাজিক মর্যাদার প্রতীক। সরকারি চাকুরিকে তারা দাসত্ব হিসাবেই ভাবতেন। প্রচলিত প্রবাদ ছিল "চাকরির ভাত মাথাত হাত।" সেটারই প্রতিফলন ঘটে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ এলাকায় চা বাগানের পত্তন হলে। বাইরে থেকে বিভিন্ন শ্রেণির লোকজন আসেন, তারা ব্রিটিশ কোম্পানির চা বাগানে নাম লেখান। কিন্তু বৃহত্তর রাজবংশী সম্প্রদায় বিমুখ হয়ে থাকে। এছাড়া সে সময় সরকারি চাকুরিতে বেতন ছিল সামান্য, বাড়ির বাইরে গিয়ে না থাকার মানসিকতা ইত্যাদি কারণে স্বাভাবিকভাবে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ গড়ে ওঠেনি।[৪৬]

ঔপনিবেশিক পর্বে সরকারি বেসরকারি ক্ষেত্রে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াস শুরু হলেও চিকিৎসার বিষয়ে রাজবংশী মানুষজন সহ অন্যান্য জনগোষ্ঠীরা সম্পূর্ণভাবে থেকে লোক চিকিৎসার উপরই নির্ভরশীল ছিলেন। ওঝা, কবিরাজ, দাই, বৈদ্য এরাই বিভিন্ন গাছগাছড়ার শেকড়-বাকর, পাতা, ছাল দিয়ে চিকিৎসার কাজ করতেন। কখনও কখনও মন্ত্র, ঝাড়ফুঁক, তুকতাক করে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার প্রচলন ছিল। ভূত, প্রেত, ঠাকুর, দ্যাওর প্রকোপ থেকে বাঁচার জন্য 'ভৌরিয়া' শ্রেণির লোকজনের দ্বারস্থ হতেন। পূজা-পার্বণ, মানতের বিষয়টি তো ছিলই।[৪৭]

রাজবংশী সমাজ কৃষিকাজের সঙ্গে শুধু যুক্ত ছিল না সমস্ত লোকায়ত ভাবনার মধ্যেই কৃষি সম্পৃক্ততাকে লালন পালন করত। কৃষিকৃত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের মধ্যে তো বটেই অন্যান্য ধর্ম

কর্মাদি, দেবদেবীর আধার সবেতেই কৃষি, উর্বরা ভাবনা জড়িয়ে আছে। দেবদেবীর প্রকারভেদেও জীবনাচরণের সুখ শান্তি তথা যৌথ সমাজভাবনা প্রকাশ পায়। সংসার, পরিবারে মহিলাদের প্রতি গুরুত্ব মাতৃতান্ত্রিকতা ভাবনাকে স্মরণ করায়। মহিলাদের প্রতি অনেক ক্ষেত্রে শিথিলতা ছিল। পর্দা প্রথা ছিল না, বিধবা বিবাহও প্রচলিত ছিল, সতীদাহ প্রথা ছিল না। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সংস্কার উদ্যোগের আগেই বিধবা মহিলা পছন্দ করে স্বামী নির্বাচন করে বিবাহ করতে পারতেন। যা 'ডাঙ্গুয়া' হিসাবে পরিচিত ছিল। মেয়ের মাকে পণ দিয়েই বিয়ে করতে হত। ঘর জামাই হিসাবে থেকে বিয়ে ('ঘর জেয়া') করার রীতি ছিল। আবার পছন্দের স্বামী নির্বাচন করে তার সংসারে থাকার রীতিও প্রচলিত ছিল। এই ঘর সোন্ধানী বিয়েতে সমাজ স্বীকৃতিও দিত। 'ফুল বিয়া' ঘটা করে সম্পন্ন হওয়ার পাশাপাশি এই ধরনের বিয়েগুলিকেও সমাজ মেনে নিত। সমাজে কিছু বিধিনিষেধ থাকলেও নারীদের স্বাধীন মতামত নেওয়ার সুযোগ ছিল বইকি। যদিও পুরুষদের মধ্যে একাধিক বিয়ের প্রচলন ছিল। মেয়েদের বিয়ে হত কম বয়সে ১০-১২ বছর বয়সে। কিন্তু বাপের বাড়িতে আরো কিছুটা সময় (ঋতুমতী হওয়া অবধি) থাকার রীতি প্রচলিত ছিল। মহিলারা বাড়ির কাজের পাশাপাশি জমির কাজকর্মেও (রোয়া লাগানো, ধান কাটা, নিড়ানী ইত্যাদি) অংশ নিতেন। নিজের পরিবারের কাপড় নিজেরাই তৈরি করে নিত। মেয়েদের পোষাক ছিল পিরান, গোঞ্জি, মহিলাদের ফোতা, অগান, বুকুনী, পাটানি ইত্যাদি। ব্লাউজ পড়ার প্রচলন ছিল না। ফতা পাটানী হিসাবেই পরিচিত। স্থানভেদে নাম পরিবর্তন হয়েছে জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং জেলায় 'ফোতা' হিসাবে পরিচিত হলেও কোচবিহার, নিম্ন অসমে 'পাটানী' নামটিই বেশি ব্যবহৃত হয়। বিবাহিত মহিলারা এবং বয়স্করা এই পাটানী পড়তেন। হাঁটুর উপর থেকে বুক পর্যন্ত আড়াই হাত চওড়া, চার হাত লম্বা হত এই পাটানী। অসমের রাজবংশীরা এখনও এই পাটানী বেশি ব্যবহার করে। পাটানী নিয়ে চারুচন্দ্র সান্যালের বক্তব্য উল্লেখ্য — "A Rajbanshi women is happy with 'Phota'. This is coloured cloth of five cubits long and 2½ cubits wide. This she ties just above the breast and it hang down up to the knees. The two ends of the 'Phota' are not seen together. It is an open cloth. Withen the last ten years 'phota' is going out of the market." [৪৮] স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত এই ফোতার বহুল ব্যবহার ছিল।

তারপরেই আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের সাথে সাথে এই ফোতার ব্যবহার কমে যায়। ততদিনে বাইরের মিলের কাপড়ও হাটে বাজার আসতে থাকে। এই ফোতারও বহুপ্রকার ভেদ ছিল। প্রায় ১৫ প্রকারের ফোতার খোঁজ পাওয়া যায়। তবে সব উজ্জ্বল রঙের হত। আদতে ইন্দোমঙ্গোলয়ের গ্রুপের প্রায় সব জনজাতিই উজ্জ্বল রঙিন কাপড়-চোপড়ই পছন্দ করে। ১) ঘুনি বা ভুনি, ঢালা, ঢালাকালা, বুলুকঢালা, মালদৈ তেরোইফুলি, চিকনপাইর, ডোরাডুরি, সাদা, ঘুঘুপারী, ছটাপারী, সূর্যাপুরী, চারকানা (চেক) নাইবা চোতারী, গুটাওঠা।[৪৯] সৈস্যাফুলি ফোতার বিশেষ কদর ছিল। বিশেষ করে বিয়ের সময়। ঘুনি ফোতা ঘন সবুজ রঙের নীল পাড়। মালদৈ ফোতা মালদহ নামের সঙ্গে যুক্ত। বড় পাটানীও (৬ হাত লম্বা, সাড়ে তিন হাত চওড়া) অনেকে ব্যবহার করতেন । বিশেষ করে আসামে। প্রত্যেক বাড়িতে 'তানশালা' (তাঁত) ছিল।[৫০] প্রত্যেক মহিলাই তাঁত চালিয়ে কাপড় বানাতে জানতেন। পরবর্তীকালে বসাক পদবির তাঁতিরা ফোতা হাটে বাজারে নিয়ে আসতেন এবং মিলের ফোতাও বাজারে এসে যায়। রাজবংশী সমাজের এই কাপড় চোপড় ব্যবহারের মধ্যে নৃ-গোষ্ঠীগত আদিম কৌম ভাবনার পরিচয় নিহিত আছে। এই ফোতা গোঞ্জি কাপড় নিয়ে বহু গানও রাজবংশী সমাজে প্রচলিত।

ছাওয়ার বাদে জেজেংগা গোঞ্জি
মাইয়ার বাদে কিনেক মন তুই
মালদই পাটানী।

তেমনি

চ্যাড়া বান্দার বুনি ফতা মইধ্যে আঙা ডোর
ক্যানেরে চেঙেরা পাক পাড়েছিস ভাতার আছে মোর।

আবার গানে পাওয়া যায় —

মৈস্যাফুলি জাঙিয়া
ডেডেংকালী কালো
দেখিবার বড় ভালো
মইধ্যখানে ঠক্ ঠক্।

গ্রাম এলাকায় পুরুষরা গতানুগতিক পোষাক-আশাকই পড়তেন কিন্তু বাইরে গেলে ধুতি পাঞ্জাবি

ব্যবহার করতেন। মাঠে-ঘাটে কাজে কর্মের সময় ছোট কাপড় কোমরে গুঁজে পড়তেন যা 'নেংটি' হিসাবে পরিচিত। উল্লেখ্য এই 'নেংটি' কিন্তু সবসময়ের পোষাক নয়। এই নেংটি নিয়ে বিভ্রান্তিকর কিছু বক্তব্য অনেক ক্ষেত্রে উঠে এসেছে। যা প্রকৃতপক্ষে ভুল ভাবনা কিংবা না বোঝার জন্যই হয়েছে। জুতার কোন ব্যাপার ছিল না তবে অনেকে খড়ম ব্যবহার করতেন এবং মহিলারা 'চোপর' (স্যান্ডেল মত কাঠের) পড়তেন।

রাজবংশী সমাজের বাড়িঘর সাধারণত খড়, ছন, বাঁশ দিয়েই তৈরি হত। বন্য জন্তুদের হাত থেকে বাঁচার জন্য অনেকে কাঠের দোতলা বাড়ি করত। বাঁশের প্ল্যাঙ্কিং করা ঘরের প্রচলন বেশি ছিল। বাঁশের মাচা তৈরি করেই শোয়ার বসার ব্যবস্থা হত। ছুতোরের অভাব ছিল বলে আস্ত শাল গাছ ব্যবহার করতে দেখা যেত। বিশেষ করে ঘরের খুঁটি, ধর্নার ক্ষেত্রে, বড় জোর একফালি দুইফালি করে নেওয়া হত হস্তচালিত করাত দিয়ে। তবে সেটা শুধুমাত্র তক্তার ক্ষেত্রেই দেখা যেত বেশি। বাঁশের ব্যবহারটাই মুখ্য ছিল। বাঁশ দিয়েই প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য জিনিসপত্র বানিয়ে নিত ।এটা অবশ্য ইন্দোমঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যও বটে। কারণ এই গোষ্ঠীর মানুষজন প্রথমেই বাঁশের ব্যবহার আয়ত্ত করে। মহিলারা তাঁত চালাতে জানতেন । প্রবাদ আছে 'হাজার টাকার কুচুনী তাও বান্দে বুকুনী'। অর্থাৎ মহিলাদের অন্যতম পোষাক ছিল বুকুনী। বিয়েতে উজ্জ্বল (লাল, হলুদ) রঙের পাটানী পড়ার রীতি ছিল। বিশেষ করে সইয্যাফুলি। বিয়ের সময় নিয়ম রীতি অনুসরণ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত 'বৈরাতী'। প্রতি গ্রামেই এক দু'জন এরকম মহিলা থাকতেন। এদের কাছ থেকেই পরবর্তী কেউ শিখে নিতেন । গ্রামের বয়স্কা মহিলাদের ছিল বিশেষ সম্মান। তারা গ্রামের মহিলাদের বিষয়-আশয়, ভালমন্দের খোঁজ রাখতেন । হাটে বাজারে কিংবা বিচার সালিশীতেও (বিশেষ মহিলা কেন্দ্রিক বিষয়ে) যেতেন। তারা মতামতও দিতেন। গহনাগাটির বহুল প্রকারভেদ ছিল। বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন ধরনের গহনা পড়ার প্রচলন ছিল। সোনা-রূপার গহনা বানানোর লোক বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াত । দোকান পাট না থাকলেও এক শ্রেণির (বিহার থেকে) লোক এই কাজগুলি করতেন। রাজবংশী সমাজেরও অনেকে এই কাজ করতেন। তারা পরবর্তীকালে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান। এরা 'বানিয়া' নাকে পরিচিতি পায়। তামার গহনাও প্রচলিত ছিল। নাক, কান, গলা, কোমর, হাত, পা-এর গহনার অজস্র প্রকারভেদ ছিল। গহনার কাজ করা 'বানিয়া', শাখারিয়ারা (যারা শাখার কাজও করতেন) তারাও রাজবংশী

সংস্কৃতির অংশ হয়ে উঠেছিল। এই গহনাগাটির মধ্যে রাজবংশী সমাজের নৃতাত্ত্বিক চিহ্ন কিংবা নন্দন তত্ত্বের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃতি থেকে পোকামাকড়ও বিভিন্ন নকশায় ধরা পড়ে। গান প্রবাদেও সেই গহনার কথা ধরা পড়েছে।[৫১]

না নাগে মোক জলটোপা নখ
না নাগে মোক কানের দুল
বৌদির বাদে আইনছে দাদা
কি সুন্দর ঝুমকা নাগা দুল।

গহনা নিয়ে এরকম অজস্র গান 'চোর চুরনি' গানেও গাওয়া হত —

চোরা আসছে পূজার বাজার
নাগে এই মন মোর চন্দ্রহার
দিনে দিনে দিন যাছে মোর, করেক তুই বিচার
ও নারীর উজানী বাহার।[৫২]

রাজবংশী সমাজের এই গহনা ও কাপড়-চোপড়ের সঙ্গে ইন্দোমঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর (কোচ, হাজং, রাভা, বোড়ো) কাপড়-চোপড় ও অলংকারের মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। যা নৃতত্ত্বের বিচারে গুরুত্বপূর্ণ।

কোচ-রাজবংশ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠী সংগঠিত হয় এটা যেমন ঠিক তেমনি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে এই রাজবংশী জনগোষ্ঠী দ্বিতীয়বার জাতি সত্ত্বার প্রশ্নে সংঘবদ্ধ হয়। এই সময়েই নেতৃত্বে উঠে আসেন মনীষী পঞ্চানন বর্মা। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে এই জনগোষ্ঠী জাতিসত্তা ও সমাজ সংস্কার বিষয়ে আবারও ঐক্যবদ্ধ হয়। রাজবংশী জনগোষ্ঠীর ক্ষত্রিয় হিসাবে পরিচয় প্রদানকে ঘিরে বিতর্ক দেখা দেয় এবং রাজবংশী ক্ষত্রিয় ও বর্ণহিন্দুদের মধ্যে সামাজিক মর্যাদাগত ব্যবধান সৃষ্টি হয়। রাজবংশীর সমাজের ক্ষত্রিয় দাবিকে বর্ণহিন্দুরা বিশেষত জমিদার ও উকিল, মোক্তারেরা প্রবল বিরোধিতা করে। বর্ণহিন্দুদের রক্ষণশীলতা ও গোঁড়ামিই এই সমস্যার মূলে কাজ করে এবং রাজবংশী সমাজ তথা নব্য হিন্দুদের উপযুক্ত সম্মান প্রাপ্তি নিয়ে বিরোধ তৈরি হয়। তথাকথিত বর্ণহিন্দুরা রাজবংশীদের নিম্নবর্গীয় হিন্দু এমনকী ম্লেচ্ছ বলেও প্রতিপন্ন করেন। তাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন

কিংবা মেলামেশায় অনীহা প্রকাশ করেন। এর মধ্যে বিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্বে প্রকাশিত 'বিশ্বকোষ' গ্রন্থে শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসু রাজবংশী হিন্দুদের 'বর্বর' ও 'ম্লেচ্ছ' বলে উল্লেখ করেন।[৫৩] ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ক্ষত্রিয়ত্বের আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে; এবং এই আন্দোলন গতি লাভ করে ঐ শতকের শেষ দশকে। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারিতে রাজবংশীদের কোচ হিসাবে গণনা করা হলে রাজবংশীদের মধ্যে ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী আন্দোলনের রূপ নেয়। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের গণনায় কর্তৃপক্ষ পুনরায় রাজবংশীদের কোচ হিসাবে গণনার নির্দেশ দিলে রাজবংশীদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং আন্দোলন আরও গতিপ্রাপ্ত হয়। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারি রাজবংশী নেতৃবর্গ সরকারি নির্দেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা করেন। ১০ ফেব্রুয়ারি জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেন। সেখানে রাজবংশীদের ক্ষত্রিয়ত্বের স্বীকৃতি আদায়সহ কোচদের থেকে তাদের আলাদাভাবে রাজবংশী হিসাবে গণনার দাবী ওঠে। এই দাবীর প্রেক্ষিতে রংপুরের জেলা প্রশাসক ধর্মসভার মতামত আহ্বান করলে রংপুর ইটাকুমারীর পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্নকে ধর্মসভার পক্ষ থেকে মতামত জানানোর ক্ষমতা দেওয়া হয়। তর্করত্ন মহাশয় এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে উত্তরবাংলার রাজবংশীগণ বুৎপত্তিগত দিক থেকে ক্ষত্রিয় এবং তারা অবশ্যই ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হিসাবে স্বীকৃতযোগ্য। কিন্তু এই দাবির সপক্ষে কোনো বৈদিক, পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে ১৭ ফেব্রুয়ারি জেলা প্রশাসক এক আদেশের মাধ্যমে রাজবংশীদের ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হিসাবে ফিরিয়ে এনে আদমসুমারিতে স্থান দেবেন বলে আদেশ জারি করলেও ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারির প্রতিবেদনে রাজবংশী ক্ষত্রিয় মর্যাদা পাননি। পাশাপাশি সে সময় ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনার প্রাথমিক অবস্থায় সেন্সাস আদেশ সূত্রে রাজবংশী ক্ষত্রিয়দের 'রাজবংশী' বলে উল্লেখ করা হয়। রাজবংশী ক্ষত্রিয় নেতৃবর্গ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দরবারে তীব্র আপত্তি জানানোর পরেও ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারির চূড়ান্ত রিপোর্টে রাজবংশী ও কোচ অভিন্ন জাতি হিসাবে উল্লেখ করা হয় না। এর ফলে রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং ক্ষাত্র আন্দোলনের প্রসার ঘটতে থাকে। নেতৃত্বে উঠে আসেন পঞ্চানন বর্মা। তিনি উপলব্ধি করেন রাজবংশীদের সমাজ সংস্কারের প্রয়োজন আছে। তার আগেই জাতির উন্নতিকল্পে বাংলাদেশের জমিদার হরিমোহন রায় খাজাঞ্চীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে 'ব্রাত্য রংপুর ক্ষত্রিয় জাতির উন্নতি

বিধায়সী সভা'। তিনি রাজবংশী সমাজের ক্ষত্রিয় পরিচয় বিষয়ে কামরূপ ও রংপুরের পণ্ডিত সমাজের স্বীকৃতি আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৫৪] পরবর্তীকালে রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মার নেতৃত্বে রংপুরে 'ক্ষত্রিয় সমিতি' গঠিত হয় ১৯১০ সালে। ক্ষত্রিয় সমিতির মাধ্যমে ক্ষত্রিয় আন্দোলন সমগ্র উত্তরবঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে (রংপুর, জলপাইগুড়ি, ময়মনসিংহ)। এই সময়ে রাজবংশীদের ভাষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য,[৫৫] ঐতিহ্য উদ্ধারের জোয়ার আসে। ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ২৭ মাঘ পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জে করতোয়া নদীর তীরে রাজবংশী নেতৃবর্গ 'ক্ষত্রিয়' হিসাবে উপবীত ধারণ করেন। 'উপবীত' গ্রহণ রাজবংশীদের কাছে ক্ষত্রিয় ধর্মের প্রতীক স্বরূপ গৃহীত হয়। উপবীত গ্রহণ করে রাজবংশীরা দাস, সরকার ইত্যাদি পদবি ত্যাগ করে বর্মন, বর্মা, রায়, সিংহ পদবি গ্রহণ করতে থাকে। বলা যায় এই পদবি গ্রহণের মধ্য দিয়ে কোচ, খেন, পলিয়ারাও রাজবংশী সমাজের সঙ্গে সামিল হয়। এছাড়াও বর্ণহিন্দুদের মত কিছু সংস্কার যেমন বাল্যবিবাহ, পর্দা প্রথা ইত্যাদির প্রচলন করেন। ব্রাহ্মণ পুরোহিত দ্বারা বিভিন্ন শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার রীতি শুরু হয়।[৫৬] সেই সঙ্গে মৃতের সৎকারের অশৌচ পালনের ক্ষেত্রে ৩০ দিনের পরিবর্তে ১২ দিনের বিধান তৈরি করে।[৫৭] সমাজে নিত্য পূজা, সন্ধ্যা আহ্নিক, গায়ত্রী মন্ত্রোচ্চারণ, গীতাপাঠ ইত্যাদি শুরু হয়। এই উদ্দেশ্যে ক্ষত্রিয় সমিতি প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ করে ঘরে ঘরে বিতরণ করে। ধর্মীয় সংস্কারের অঙ্গ হিসাবে পঞ্চানন বর্মার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শক্তির প্রতীক হিসাবে 'চণ্ডী পূজার' প্রচলন শুরু হয়।[৫৮] ক্ষত্রিয়ত্বের আন্দোলনের ফলে রাজবংশী সমাজে ব্যাপক সংখ্যায় উপবীত ধারণ শুরু হয় এবং সবাই 'কাশ্যপ' গোত্র ধারণ করে। কিন্তু বর্ণহিন্দু আইন অনুযায়ী রাজবংশীদের ক্ষত্রিয়ত্ব নিয়ে আবারও বিতর্ক ওঠে, বলা হয় রাজবংশীদের বিয়ে হিন্দু আইন অনুযায়ী ক্ষত্রিয় বিয়ে নয়। কারণ হিসাবে বলা হয় রাজবংশীদের মধ্যে গোত্র বিভাজন নেই। ক্ষত্রিয় হিসেবে বিয়ের ক্ষেত্রে এই গোত্র বিভাজন জরুরি। তখন কলকাতা হাইকোর্টের এক রুল জারির মধ্যে দিয়ে শাণ্ডিল্য, পরাশর, গৌতম, কপিল, ভরদ্বাজ, কৌশিক প্রভৃতি বারোটি গোত্র নির্ধারণ করে দেওয়া হয়।[৫৯] যদিও রাজবংশী সমাজ এ যাবৎ কাল একটিমাত্র গোত্র 'কাশ্যপ' হিসাবেই পরিচয় দেয় এবং স্বগোত্রেও বিয়ে প্রচলিত। গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই বিয়ের বিষয়টি সম্পন্ন হয়।[৬০]

ক্ষত্রিয় সমিতির ক্ষাত্র আন্দোলন ও ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি বর্ণ হিন্দু সমাজ মেনে নিতে পারেননি।

তারা প্রথম থেকে বিরোধিতায় নামেন। কারণ তাদের মতে রাজবংশী সমাজ 'ম্লেচ্ছ' ও 'অন্তজ'। তার ফলে পঞ্চানন বর্মার ক্ষত্রিয় আন্দোলনকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বহু বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। লক্ষ করা যায় জমিদার, উকিল, মোক্তার, পণ্ডিত ছাড়াও কোচবিহার রাজদরবারের উচ্চপদস্থ আমলা ও অনেক সরকারি কর্মকর্তাগণও বিরোধিতা করতে থাকেন। উপবীত ধারণের মহামিলনকে পণ্ড করার চেষ্টাও হয়েছে। এমনকী কোথাও কোথাও ক্ষত্রিয় মহামিলনের কেন্দ্র থেকে আদায়ীকৃত অর্থ জোর করে সরকারি কোষাগারে জমা করার নির্দেশ জারি হয়।[৬১] রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতি রাজবংশীদের পঞ্চানন বর্মার নেতৃত্বে ক্ষত্রিয় মর্যাদা স্বীকৃতির জন্য প্রতিটি জেলায় জেলা শাসকের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করেন এবং আদমসুমারি কমিশনের নিকটও স্মারকলিপি প্রদান করেন। অনেক টালবাহানার পর ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারির রিপোর্টে রাজবংশীর পৃথক জাতি ও রাজবংশী ক্ষত্রিয় লেখার অনুমতি পায়।[৬২] কিন্তু রাজবংশীদের পৃথক ক্ষত্রিয় জাতি হিসাবে পরিচয় লাভের জন্য ক্ষত্রিয় সমিতি ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ও ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারি অবধি আন্দোলন আরো তীব্রতর করে তোলে।[৬৩] তবে একথা বলা যায় তৎকালীন কোচবিহার দেশীয় রাজ্য ছাড়াও অন্যত্র পঞ্চানন বর্মার ক্ষত্রিয় আন্দোলন বেশ সাড়া জাগায়। অবশেষে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারি রিপোর্টে রাজবংশীদের রাজবংশী ক্ষত্রিয়র পরিবর্তে কেবলমাত্র ক্ষত্রিয় বলে লিপিবদ্ধ করা হয়। উল্লেখ্য একসময় উত্তরবঙ্গের রাজবংশীরা হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করে অন্যান্য ধর্মের প্রতি ঝুঁকেছিলেন। সেই সময় পঞ্চানন বর্মার ক্ষত্রিয় আন্দোলন রাজবংশীদের হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়। এখানেই পঞ্চানন বর্মার কৃতিত্ব।[৬৪] তিনি নতুন করে রাজবংশী সমাজকে সংঘবদ্ধ করে জাতি সত্ত্বার প্রশ্নে, সমাজ ধর্মের ক্ষেত্রে রাজবংশী সমাজকে নতুন করে দ্বিতীয় বার প্রতিষ্ঠা করেন।

পঞ্চানন বর্মার ক্ষাত্র আন্দোলনের অভিমুখ একমুখী ছিল না। সমাজ সংস্কারের পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সুরক্ষা, জীবন-জীবিকার প্রসার ও উন্নতি, নারীর সম্মান রক্ষা, শিক্ষার প্রসার সর্বোপরি সম্প্রীতি রক্ষা করা এবংবিধ বিষয়গুলি ক্ষাত্র আন্দোলনে প্রাধান্য পায়। পঞ্চানন বর্মা রাজবংশী সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন। 'ক্ষত্রিয় ব্যাঙ্ক' প্রতিষ্ঠা করে যেমন তিনি গরিব চাষিদের স্বল্প সুদে ঋণ দানের ব্যবস্থা করে সুদখোর মহাজনদের হাত থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। আবার আর্থ-সামাজিক অবস্থানকে সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রেও তিনি বিশেষ

সচেতন ছিলেন। তাই ক্ষত্রিয় মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করেও অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রাগ্রসর এবং সুরক্ষিত করার স্বার্থে রাজবংশী সমাজকে 'সংরক্ষণ' তালিকাভুক্ত করার জন্য সচেষ্ট হন। অনেক বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও (বঙ্গীয় ব্রাহ্ম সমাজ, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, দি বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল হিন্দু সভা প্রভৃতি সংগঠন তীব্র বিরোধিতার নামে) তিনি চেষ্টা চালিয়ে যান। অবশেষে তিনি সফল হন। বলা যেতে পারে একমাত্র তাঁর চেষ্টাতেই অবশেষে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে তপশিলী জাতির তালিকা প্রকাশিত হলে রাজবংশীরা এই তালিকা অন্তর্ভুক্ত হয়।[৬৫] স্বাধীনতার পর ভারতীয় সংবিধানের ৩৪১ নং ধারায় এবং ১৯৫১ ও ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের আদেশনামায় রাজবংশীরা পশ্চিমবাংলায় 'Scheduled Caste' তালিকায় থেকে যায়।[৬৬] এর ফলে রাজবংশী সমাজের ক্ষত্রিয় জাতির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হলেও রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মা রাজবংশী জাতির আর্থসামাজিক উন্নতিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ভেবেছিলেন। জাতির মর্যাদার থেকে তাঁর কাছে জাতির আর্থ-সামাজিক উন্নতিই ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই তালিকার অন্তর্ভুক্তির ফলে পিছিয়ে পড়া রাজবংশীরা সংরক্ষিত তালিকার সুযোগ সুবিধা লাভ করেন। এর জন্য রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মা রাজবংশী সমাজের মধ্যেই তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হন। রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মার যুক্তি ছিল — "Without protection and reservation in politics, education and administration, a backward caste could not improve its social position." এই তালিকা থেকে রাজবংশীরা বাদ পড়লে এই সম্প্রদায়ের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। অবশেষে তিনি রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতির সদস্যদের নিজ সমর্থনে আনতে পেরেছিলেন।[৬৭]

রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মা রাজবংশী জাতিকে সংস্কারমুখী করার উদ্দেশ্যে ক্ষত্রিয় সমিতির সংগঠনকে ঢেলে সাজান এবং সংগঠনকে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পৌঁছে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেন। সমিতির কাজকর্ম ও বিধিব্যবস্থা প্রত্যন্ত গ্রামে পৌঁছে দিতে 'প্রচারক' নিয়োগ করা হয়।[৬৮] পরামর্শ দেওয়ার জন্য ক্ষত্রিয় সমিতি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। রাজবংশী কৃষকদের সাহায্যের জন্য রংপুরে একটি 'ক্ষত্রিয় ব্যাঙ্ক' প্রতিষ্ঠা করা হয়। এভাবে ক্ষত্রিয় সমিতি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে সংস্কার আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়।[৬৯] কৃষকদের সাথে সাথে ছাত্র সমাজকেও সংস্কার আন্দোলনে সামিল করতে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে 'ক্ষত্রিয় ছাত্র সমিতি' প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৭০] রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মার সমাজ চিন্তার দূরদর্শিতার দৃষ্টান্ত মেলে তার কর্মধারায়। তিনি শিক্ষার

বিস্তারে যেমন সচেতন ছিলেন তেমনি দুঃস্থ ছাত্রদের সাহায্য প্রকল্পে একটি 'সাধারণ অর্থভাণ্ডার' ও 'অর্থনৈতিক কোম্পানি' যা বর্মা কোম্পানি নামে পরিচিত ছিল। দুঃস্থ ছাত্রদের সাহায্য করাই ছিল এই অর্থভাণ্ডার ও কোম্পানির মূল লক্ষ্য।[৭১] শিক্ষার প্রতি রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মার ছিল গভীর অনুরাগ, তাঁর কর্মভাবনার মধ্যে তা প্রকাশ পেয়েছে। ক্ষত্রিয় সমিতির পঞ্চম বার্ষিক সম্মিলনীয় কার্যবিবরণীতে দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তিদানের উদ্দেশ্যে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তা ছিল পঞ্চানন বর্মার দূরদৃষ্টি এবং সুদূরপ্রসারী ভাবনা। শিক্ষার প্রসারে তিনি যেমন ক্ষত্রিয় সমিতিকে উদ্যোগী করেন তেমনি সাহায্যের জন্য জমিদার বর্গ ও সরকারি প্রতিনিধিদের কাছেও সাহায্যের জন্য ছুটে যান। ছাত্রাবাস নির্মাণের পাশাপাশি সামাজিক শিক্ষা, নীতি শিক্ষা, ধর্ম শিক্ষা ইত্যাদির উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে একমাত্র শিক্ষার মধ্য দিয়ে রাজবংশী জাতির সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব। অন্যথায় নয়। তাই শিক্ষা বিষয়ে প্রেরণা ও উৎসাহ প্রদানের জন্য তিনি ক্ষত্রিয় সভায় বলেন — ‘‘আপাতত দেখা যাইতেছে যে আমাদের সমাজ অশিক্ষিত। আমাদের পূর্বপুরুষগণ বিদ্যাশিক্ষার স্থান ও ব্যক্তির আপন আপন সন্তান-সন্ততিদিগের উপযুক্ত বিদ্যাশিক্ষা করাইতে পারেন নাই। উপযুক্ত বিদ্যা শিক্ষা না হইলে মানুষের মনুষত্ব জন্মে না।’’[৭২] সমাজকে সুশিক্ষিত করে উন্নত সমাজ প্রতিষ্ঠা ও সার্বিক বিকাশই ছিল পঞ্চানন বর্মার মূল লক্ষ্য। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন একমাত্র শিক্ষার প্রসারের মধ্য দিয়েই সমাজ ও জাতির উন্নতি সম্ভব।

পঞ্চানন বর্মা শুধু শিক্ষার প্রসারের মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন না নারীর নিরাপত্তা, নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি তাদেরকে স্বাবলম্বী করে তোলবার বিষয়েও সচেতন ছিলেন। সে জন্য তিনি ক্ষত্রিয় সমিতির পক্ষ থেকে 'নারী রক্ষা বিভাগ' প্রতিষ্ঠা করেন।[৭৩] দুঃস্থ নির্যাতিতা মহিলাদের উদ্ধার করে তাদের স্বাবলম্বী করে তোলার পাশাপাশি নিরাপত্তার জন্য লাঠিখেলা, ছোরা খেলা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। নারীর আত্মসম্মানবোধ ও চেতনা জাগরণের জন্য তিনি 'ডাংধরী মাও' কবিতা রচনা করেন ও সমাজের সকলের কাছে বিতরণ করেন।[৭৪] এভাবে পঞ্চানন বর্মার প্রচেষ্টায় কেবলমাত্র রাজবংশী সম্প্রদায়ের মহিলারাই অপমান থেকে রক্ষা পান নাই অন্য সম্প্রদায়ের মহিলারাও রক্ষা পেয়েছিলেন।[৭৫] এ প্রসঙ্গে মনীষী পঞ্চানন বর্মার বাণী[৭৬] সম্প্রীতিরও বার্তা দিয়েছেন —

হিন্দু মুসলমান বিচার নাইরে —
মানুষজন তো নয় ভিন,
উলসি ধায়া আর্তের উদ্ধার
এই ক্ষত্রিয়ের চিন।

পঞ্চানন বর্মা তার 'ডাংধরী মাও' কবিতার মাধ্যমে ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে জাগরণের চেষ্টাই করেছিলেন।

১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পঞ্চানন বর্মা ইংরেজ সরকারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ক্ষত্রিয় রেজিমেন্ট গঠন করে রাজবংশীদের সৈন্য বাহিনিতে যোগদানে উৎসাহিত করেন। সরকারের কাছেও 'ক্ষত্রিয় রেজিমেন্ট' গঠনের আর্জি জানান।[৭৭] সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের সুযোগ আসলে পঞ্চানন বর্মার আহ্বানে সাড়া দিয়ে জলপাইগুড়ি, রংপুর, আসাম, কোচবিহার প্রভৃতি অঞ্চলের ৪০০ জন রাজবংশী যুবক সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেন।[৭৮] আসলে পঞ্চানন বর্মা সেদিন ক্ষত্রিয় শৌর্যকে কাজে লাগিয়ে একটি বাস্তব সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন ও জাতিগত পেশার স্বীকৃতি দানের চেষ্টায় ছিলেন। প্রথমটি হল রাজবংশীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ গ্রহণ করা, অন্যটি হল ক্ষত্রিয় শৌর্য বা ক্ষত্রিয় ধর্ম পালন। দেশরক্ষা করা বা যুদ্ধ করা ক্ষাত্র ধর্মের পরিচয় এই ঐতিহাসিক সত্যদ্বয়কে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এইখানেই ছিল রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মার দূরদর্শিতা।[৭৯]

কৃষক সমাজ নিয়েও তাঁর চিন্তা ও কর্মভাবনা ছিল সুদূরপ্রসারী। কৃষক ও জমি সম্পর্কিত বিষয়টিকে তিনি শুধু দায়বদ্ধতার বিষয় হিসাবে ভাবেননি তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে রাজবংশী সমাজজীবনকে উন্নত করতে হলে প্রথমেই কৃষি অর্থনীতির উন্নতি আবশ্যক শুধু জরুরি নয়, কৃষক সমাজের সমস্যা, ভূমির স্বত্ত্ব, চাষবাস, উন্নতি ইত্যাদি বিষয়গুলিও জরুরি। তাই তাঁর পরবর্তী কর্মজীবনে বিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়ে কর্মধারায় সেটা বাস্তবায়নে সচেষ্ট হন। কাউন্সিলের সদস্য (১৯২০ খ্রি:) নির্বাচিত হয়েই তিনি দরিদ্র ও শোষিত কৃষক কূলের দারিদ্র্য, দুঃখ কষ্ট দূরীকরণে আত্মনিয়োগ করেন। ভূমি সংস্কারের উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় প্রজাসত্ত্ব আইন সংশোধন করতে উদ্যোগী হন। পূর্বে ভূমিতে প্রজাগণের কোনো স্বত্ত্ব ছিল না। জমিদারগণ খুশিমত জমি থেকে প্রজাদের উচ্ছেদ করতেন, প্রজাদের জমির হস্তান্তর, জমির উপর পাকা

গৃহনির্মাণ, ইদারা খনন, বৃক্ষচ্ছেদন প্রভৃতির অধিকার ছিল না। প্রজাদের এই সমস্ত অসুবিধা দূরীকরণের জন্য তিনি সর্বাগ্রে বিশেষভাবে উদ্যোগী হন।[৮০] কারণ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে রাজবংশী ক্ষত্রিয়ের সিংহভাগই কৃষক। সমাজ সংস্কৃতির উন্নতির সোপান হিসাবে কৃষির উন্নতি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে তিনি মনে করতেন। তিনি কৃষকদের পাশে থেকে তাঁর কর্মজীবনকে ব্যাপ্ত করেছিলেন। তিনি কৃষক সমাজকে সংগঠিত করার প্রয়াস নিয়েছিলেন। তাঁর আগে কৃষকদের স্বার্থে ব্যক্তিগত কিংবা সাংগঠনিকভাবে কেউ তাঁর মত করে এগিয়ে আসেননি। সেক্ষেত্রে তাকে কৃষক নেতা হিসাবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে এবং বলা যেতে পারে তিনিই ছিলেন বাংলার কৃষক আন্দোলনের আদিপুরুষ।

স্বাভাবিকভাবে বলা যায় তিনি সমগ্র রাজবংশী সমাজকে নতুনভাবে সংগঠিত করেন ক্ষত্রিয় সমিতির মাধ্যমে। রাজবংশী সমাজের সমাজ সংস্কৃতি এই সময়ে নতুনভাবে আবর্তিত হয়। রাজবংশী সমাজের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করেন তিনি। জাতি সত্তার পরিচয় লাভের সঙ্গে সঙ্গে আচরিত ধর্মবিশ্বাস, সংস্কারের প্রয়াসে তিনি আজীবন লড়াই চালিয়ে গেছেন। রাজবংশী সমাজ পরিবারের ভেতর থেকে উপলব্ধি করে ভবিষ্যতের সোপানকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। আজকের রাজবংশী সমাজের কাঠামো তার ভাবনার উপরই প্রতিষ্ঠিত। উত্তরবঙ্গের সমাজ সংস্কৃতি চর্চা তথা রাজবংশী সমাজজীবন নিয়ে আলোচনায় পঞ্চানন বর্মা তাই শুধু একটি নাম নয় বলা যেতে পারে প্রাণপুরুষ। তিনিই সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একজন সমাজ সংস্কারক হিসাবে চিহ্নিত। তিনিই প্রথম উত্তরবঙ্গের ভাষা, সংস্কৃতি, প্রত্নতত্ত্ব তথা ঐতিহ্য নিয়ে উদ্যোগী হন। রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতি তো বটেই তাঁর সুদূরপ্রসারী চিন্তা চেতনায় অন্যান্য জনগোষ্ঠীও সমৃদ্ধ হয়েছে, সংগঠিত হয়েছে। সেখানে ক্ষত্রিয় সমিতি একটি নাম এবং পঞ্চানন বর্মা তার ফলক। পঞ্চানন বর্মা এই নামকে ছাপিয়ে আজও একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে।

তথ্যসূত্র :

১. মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণুপদ; কোচবিহার রাজ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কমিশনারদের ভূমিকা ও কার্যাবলী (১৭৮৯-১৮৬১) ইতিহাস অনুসন্ধান ১১, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেট, কলকাতা, ১৯৯৬ পৃষ্ঠা - ৪৯৩

২. পাল, নৃপেন্দ্রনাথ; কোচবিহার রাজ্যের ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার জেলা সংখ্যা ২০০৬, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ প: ব: পৃষ্ঠা - ১১

৩. সেন, পার্থ; কোচবিহার ভুটান সম্পর্ক (১৭৯২-১৮০১) এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভূমিকা একটি পর্যালোচনা, ইতিহাস অনুসন্ধান ১৬, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ২০০২ পৃষ্ঠা - ৪১৫

৪. Ghosh, J. M.; Sanyasi and Fakir Raiders in Bengal, Calcutta, 1930 Page - 70-82

৫. খান চৌধুরী, আমানতউল্লা আহমেদ; কোচবিহারের ইতিহাস (১ম খণ্ড), রবীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য (প্রকাশক), মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কল - ৭৩, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯০, পৃষ্ঠা - ৩৭৪-৩৭৬

৬. চৌধুরী, হরেন্দ্রনারায়ণ; অনুবাদক পাল, ড. নৃপেন্দ্রনাথ, রাজ্য কোচবিহারের রাজকাহিনী (দ্বিতীয় খণ্ড), অণিমা প্রকাশনী, কল - ৯, ২০১৪, পৃষ্ঠা - ১৩৫

৭. লাহিড়ী, রেবতী মোহন; জলপাইগুড়ি জেলা শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ-1869-1968, ১৯৭০ জলপাইগুড়ি। জলপাইগুড়ি জেলার ইতিহাস (প্রবন্ধ) পৃষ্ঠা - ৭

৮. ঐ, পৃষ্ঠা - ১০

৯. ঐ, পৃষ্ঠা - ১১

১০. ঐ, পৃষ্ঠা - ১১

১১. ঐ, পৃষ্ঠা - ১৮

১২. ঐ, পৃষ্ঠা - ১৮

১৩. ঘোষ, আনন্দ গোপাল; নির্মল চন্দ্র রায় (সম্পাদিত) ১৯৪৭ - পরবর্তী উত্তরবঙ্গ, উত্তরবঙ্গে বিভাগীয় প্রশাসনিক কাঠামোর সূচনা ও বিকাশ : প্রসঙ্গ রাজশাহী থেকে প্রেসিডেন্সি, জলপাইগুড়ি বিভাগ (১৮২৯-১৯২৩) আনন্দগোপাল ঘোষ। সংবেদন, মালদা, ২০১৪ পৃষ্ঠা - ১৪

১৪. সূত্রধর, কার্তিক চন্দ্র; সমাজ ধর্ম অর্থনীতি, সংবেদন, বি এস রোড, মালদহ, ২০১৩

১৫. ঐ, পৃষ্ঠা - ২৪

১৬. ঘোষ, আনন্দগোপাল; ভারততীর্থ উত্তরবঙ্গ (প্রবন্ধ সংকলন) সরকার, অসীম কুমার; সংবেদন, বি এস রোড, মালদহ, ২০১১, পৃষ্ঠা - ১৪

১৭. রায় চৌধুরী, তাপস; ডুয়ার্সে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার বিবর্তন, মধুপর্ণী, বিশেষ জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ।
সূত্রধর, কার্তিক চন্দ্র; সমাজ ধর্ম অর্থনীতি, সংবেদন, বি এস রোড, মালদহ, পৃষ্ঠা - ২৫
১৮. সূত্রধর, কার্তিক চন্দ্র; মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান ও তাদের ভূমিকা (উপনিবেশ পর্ব) : প্রসঙ্গ উত্তরবঙ্গ, সংবেদন, বি এস রোড, মালদহ, ২০১৩, পৃষ্ঠা - ১১৮
১৯. ঐ, পৃষ্ঠা - ১১৫
২০. সাক্ষাৎকার - আনন্দগোপাল ঘোষ। ১৩.৩.২০১৬
২১. Ray, Subhajyoti; Transformation on the Bengal Frontier, Jalpaiguri, London, 2002.
২২. সূত্রধর, কার্তিক চন্দ্র; ঐ, পৃষ্ঠা - ১১৬
২৩. ঘোষ, আনন্দগোপাল; ভারততীর্থ উত্তরবঙ্গ, সংবেদন, মালদহ, ২০১১, পৃষ্ঠা - ১৬
২৪. ঐ, পৃষ্ঠা - ১৮
২৫. অধিকারী, মাধব চন্দ্র; রাজবংশী সমাজ ও মনীষী পঞ্চানন বর্মা, ১ম খণ্ড, রিডার্স সার্ভিস, কল - ৭৫, ২০১৪, পৃষ্ঠা - ৬৬
২৬. অধিকারী, মাধব চন্দ্র; রাজবংশী সমাজ ও মনীষী পঞ্চানন বর্মা, ১ম খণ্ড, রিডার্স সার্ভিস, কল - ৭৫, ২০১৪, পৃষ্ঠা - ৩৯
২৭. সূত্রধর, কার্তিক চন্দ্র; সমাজ, ধর্ম ও অর্থনীতি : প্রসঙ্গ উত্তরবঙ্গ, সংবেদন, মালদহ, ২০১৩, পৃষ্ঠা - ১৩৩
২৮. ঐ, পৃষ্ঠা - ১৪৫
২৯. Chowdhury, N.; CoochBehar State and its Land Revenue settlements, P - 317
৩০. Kushari, Abani Mohan; el, West Bengal District Gazetteers, Jalpaiguri, July 1981. P - 254
৩১. Ibid, Page - 261
৩২. Strong, F. W.; Eastern Bengal District Gazetteers, Dinajpur First Published 1912, Page - 152
৩৩. Lambourn, G E; Bengal District Gazetteers Malda, First Published 1819, P - 89
৩৪. গ্রুনিং, জে এফ; ইস্টার্ন বেঙ্গল অ্যান্ড আসাম ডিস্ট্রিক্ট গ্যাজেটিয়ারস, জলপাইগুড়ি, পৃষ্ঠা - ২০০৮
৩৫. ঐ, পৃষ্ঠা - ৪২
৩৬. হান্টার, ডব্লিউ. ডব্লিউ.; স্ট্যাটিস্টিক্যাল একাউন্ট অব ওয়েস্ট বেঙ্গল, ভলিউম - X, দিল্লী, ১৮৭৪, ২৫২-২৬১, পৃষ্ঠা - ৪২-৪৩
৩৭. Sanyal, Charuchandra; The Rajbanshis of North Bengal, Kol - 1965, Page - 20

৩৮. ঘোষ, আনন্দগোপাল; সরকার, অসীম কুমার; ভারততীর্থ উত্তরবঙ্গ (সম্পাদনা), উপনিবেশিক শাসনপর্বে জলপাইগুড়ি জেলার গ্রাম সমাজ, সংবেদন, মালদহ, ২০১১, পৃষ্ঠা - ৬১
৩৯. Hunter, W. W.; Statistical Accounts of West Bengal, Vol X, Delhi - 1874 Page - 257
৪০. Sanyal, Charuchandra; The Rajbanshis of North Bengal, Kolkata, 1965, Page 22-22
৪১. Gruning, G. F; Eastern Bengal and Assam District Gazetteers, Jalpaiguri, Alahabad 1911, rept. 2008, Page - 43
৪২. ঘোষ, আনন্দগোপাল; সরকার, অসীম কুমার; ভারততীর্থ উত্তরবঙ্গ (সম্পাদনা), উপনিবেশিক শাসনপর্বে জলপাইগুড়ি জেলার গ্রাম সমাজ (১৮৬৯-১৯৪৭), গৌরাঙ্গ চন্দ্র রায়, পৃষ্ঠা - ৬২
৪৩. Gruning, G F; Eastern Bengal and Assam District Gazetteers, Jalpaiguri, Alahabad, 1911
৪৪. Sunder's D. H. E.; Survey and Settlement of the Western Duars in the District Jalpaiguri, 1889-95
৪৫. সাক্ষাৎকার শ্রী রাজেন্দ্র নাথ দাস (৮০) বারবিশা, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ১৪.৪.২০০৫
৪৬. ঘোষ, আনন্দগোপাল; সরকার, অসীম কুমার; ভারততীর্থ উত্তরবঙ্গ, সংবেদন, মালদহ, ২০১১, পৃষ্ঠা - ৬৭
৪৭. মণ্ডল, তনয়; রাজবংশী লোক চিকিৎসা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, প: ব: সরকার, ২০১১
৪৮. Sanyal, Charuchandra; The Rajbanshis of North Bengal, Page - 28
৪৯. রায়, দীপক কুমার; রাজবংশী সমাজ আরো সংস্কৃতির কাথা, সোপান, কল, ২০১২, পৃষ্ঠা - ৭১
৫০. ঐ, পৃষ্ঠা - ৮৩
৫১. সান্যাল, চারুচন্দ্র; ঐ, পৃষ্ঠা - ৮৩
৫২. রায়, দীপক কুমার; ঐ, পৃষ্ঠা - ৭৪
৫৩. বর্মন, উপেন্দ্রনাথ; রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস, জলপাইগুড়ি, ১৯৪১ পৃষ্ঠা - ৮
৫৪. বর্মন, উপেন্দ্রনাথ; রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস, জলপাইগুড়ি, ১৯৪১ পৃষ্ঠা - ৮
৫৫. তদেব পৃষ্ঠা - ১৬
৫৬. ক্ষত্রিয় সমিতির বিত্ত বিবরণী, তৃতীয় বর্ষ, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা - ৩৬
৫৭. পাল, সমর; 'জেলার আদিবাসী : নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়', রঙপুর জেলার ইতিহাস (সম্পাদনা), জেলা প্রশাসন, রঙপুর, ২০০, পৃষ্ঠা - ১০০
৫৮. বর্মন, উপেন্দ্রনাথ; ক্ষত্রিয় সমিতির বিত্ত বিবরণী, অষ্টম বর্ষ, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ, ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবন চরিত, জলপাইগুড়ি, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ, ১ম বর্ষ, সংবেদন, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৭৩-৮১

৫৯. ঘোষ, সুবোধ; ভারতের আদিবাসী (কলকাতা ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রা. লি. ২০০০), পৃষ্ঠা - ২৩৬-২৩৭
৬০. বিশ্বাস, অশোক; বাংলাদেশের রাজবংশী : সমাজ ও সংস্কৃতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০০৫, পৃষ্ঠা - ৩৬
৬১. ঐ, তৃতীয় বর্ষ বিত্ত বিবরণী, পৃষ্ঠা - ৩৬
৬২. বর্মন, উপেন্দ্রনাথ; 'ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবন চরিত' জলপাইগুড়ি, ১ম প্রকাশ, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ, চতুর্থ সংস্করণ, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা - ৮১০
৬৩. জি বি পলিটিক্যাল ফাইল নং 8A - 8B, ডিসেম্বর, ১৯৩১
৬৪. সান্যাল, চারুচন্দ্র; দি রাজবংশীজ অব নর্থবেঙ্গল, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৪, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, পৃষ্ঠা - ১৯
৬৫. জি বি এ্যাপোট (রিফর্মস) ফাইল নং 1R - 2 অফ ১৯৩৩, এপ্রিল, ১৯৩৪, প্রসেডিংস নং ৯-৬১, সিরিয়াল নং ৫০
৬৬. অধিকারী, মাধব; রাজবংশী সমাজ ও মনীষী পঞ্চানন বর্মা, (১ম খণ্ড), রিডার্স সার্ভিস, কলকাতা, ২০১৪, পৃষ্ঠা - ১০০
৬৭. বর্মন, উপেন্দ্রনাথ; 'ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবন চরিত' জলপাইগুড়ি, প্রথম প্রকাশ, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ, চতুর্থ সংস্করণ, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা - ৬৩
৬৮. বসু, স্বরাজ; অষ্টম বর্ষ কার্যবিবরণী, ক্ষত্রিয় সমিতি রংপুর, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ, ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবন চরিত, পৃষ্ঠা ২৬-২৯, Dynamics of a caste movement (The Rajbanshis of North Bengal) 1910-1947, New Delhi, 2003, Page - 72-73
৬৯. Bandhopadhaya, Shekhar; Caste Politics and the Raj Bengal, 1872-1937, Kol - 1990 Page - 144-145
৭০. ক্ষত্রিয় সমিতি পত্রিকা, 'ক্ষত্রিয়' বৈশাখ, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ, পৃ: ২১-২২
৭১. ক্ষত্রিয় সমিতির ত্রয়োদশ রিপোর্ট, রংপুর, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ, পৃ: ১৫-১৬
৭২. চতুর্থ সম্মিলনীয় কার্য বিবরণী ক্ষত্রিয় সমিতি, মনোহর বর্মা, ১৩২০
৭৩. বর্মন, উপেন্দ্রনাথ; 'ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবন চরিত', জলপাইগুড়ি, প্রথম প্রকাশ, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ, চতুর্থ সংস্করণ, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা - ৪২
৭৪. তদেব পৃষ্ঠা - ৫০-৫৪
৭৫. দ্য বেঙ্গল লেজিসনেটিভ কাউন্সিল প্রসেডিংস, ১৩ তম সেসন, খণ্ড নং ৮, ১৯২৩, পৃষ্ঠা - ৩৭২-৭৩
৭৬. বর্মন, উপেন্দ্রনাথ; 'ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবন চরিত', জলপাইগুড়ি, প্রথম প্রকাশ, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ, চতুর্থ সংস্করণ, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা - ৫২

৭৭. ক্ষত্রিয়, আষাঢ়, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ শ্রাবণ, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ

৭৮. ক্ষত্রিয় সমিতির ১০ম বার্ষিক রিপোর্ট, রংপুর, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৩৭-৩৯

৭৯. অধিকারী, মাধব চন্দ্র; রাজবংশী সমাজ ও মনীষী পঞ্চানন বর্মা (১ম খণ্ড), রিডার্স ফোরাম, কল - ৭৫, ২০১৪ পৃষ্ঠা - ৯৮

৮০. তদেব পৃষ্ঠা - ১০৭

চতুর্থ অধ্যায়

স্বাধীনোত্তর সময়ে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি

তথাকথিত 'উত্তরবঙ্গ' পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অন্তর্ভূর্ক্ত হলেও নানাবিধ স্বাতন্ত্র্যে ভিন্নতর। বহু জনগোষ্ঠীর যেমন সমাবেশ এই উত্তরবঙ্গে তেমনি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও আলাদা। আচার সংস্কার থেকে লৌকিক দেবদেবী বিশ্বাসেও স্বতন্ত্র। ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক কারণে এই ভূ-খণ্ড বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে আলোড়িত হয়েছে। উত্তরবঙ্গের স্বাতন্ত্র্য ব্রিটিশ শাসনকাল থেকেই নানাভাবে প্রশাসনিক প্রয়োজনেই স্বীকৃতি লাভ করে। সুদীর্ঘ ইতিহাসের সাক্ষী এই উত্তরবঙ্গ, বিশেষ করে প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলা। আবার মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাও কিছুটা স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও ভৌগোলিকতা নিয়ে বিরাজমান। এই জেলাগুলিতে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গাঙ্গেয় সভ্যতার প্রভাব সরাসরি পরিদৃশ্য হয় এবং যে অংশটি অনেক সময় মধ্যবঙ্গ বা গৌড়বঙ্গ হিসাবে পরিচিতি পায়। প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলা জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দার্জিলিং এবং নতুন জেলা আলিপুরদুয়ার ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের চিহ্ন আজও বহন করছে। আবার ব্রিটিশ আধিপত্য বিস্তারের আগে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার অস্তিত্বই ছিল না। ব্রিটিশ সরকার তার সুবিধামতো ডুয়ার্সকে যেমন ব্যবহার করেছে তেমনি নিজেদের প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গি মাথায় রেখে জেলা, বিভাগ হিসাবে চিহ্নিত করেছে। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল আধিপত্য কায়েম এবং বাণিজ্য বিস্তার। তরাই ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ চা বাগানগুলি আজও তারই সাক্ষ্য বহন করছে। ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই তারা ক্ষমতার বিস্তার ঘটায় এবং সমাবেশ ঘটিয়েছে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষদের। এইভাবেই উত্তরবঙ্গের জনবৈচিত্র্য পাল্টে যায়। বস্তুত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নানা জাতি এবং জনজাতির স্রোত প্রবাহিত হয়েছে এই উত্তরবঙ্গে। জনজীবনে আর্য, দ্রাবিড়, অস্ট্রিক, মঙ্গোলীয় বহু শাখার আগমন ঘটে, স্থায়ী হয় এবং বিস্তৃত অঞ্চল চিহ্নিত হয় নৃ-তত্ত্বের জাদুঘর হিসাবে। পরবর্তীকালে স্বাধীনোত্তর সময়ে বহু মানুষের আগমন ঘটে জীবন ও জীবিকার তাগিদে। দেশবিভাগ, দাঙ্গা ইত্যাদির কারণে বহু পূর্ববঙ্গীয়

মানুষের আগমন যেমন ঘটে তেমনি ভাগ্যান্বেষী বহু মানুষেরও আগমন ঘটে পার্শ্ববর্তী প্রদেশ ও দেশ থেকে। ফলত: আজকের উত্তরবঙ্গ অনিবার্যভাবে মিশ্র ভাষাভাষী ও মিশ্র সংস্কৃতির এক উর্বর অঞ্চল। লোক সাংস্কৃতিক চেতনায় বহু জনগোষ্ঠীর লোকায়ত চিহ্নের অভিব্যক্তি সহজেই চোখে পড়ে। জনবৈচিত্র্যের বহুবিধ চিহ্ন এবং বহু জনগোষ্ঠীর আদিম ও কৌম ছবির সন্ধান যেমন পাওয়া যায় তেমনি সমাজ বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ছবিও ধরা পড়ে। তার মধ্যে অন্যতম বৃহৎ এই রাজবংশী জনগোষ্ঠী বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীতে উপনীত হয়েছে এবং সাংস্কৃতিক বিবর্তনের অন্যতম পথিক হয়ে উঠেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজবংশী সমাজ নতুনভাবে আলোড়িত হয়। সমাজ ও সংস্কৃতির পরিসরটিও উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত হয়। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধে সহায়তার বিনিময়ে কোচ-রাজ্যকে (১৭৭৩ খ্রি:) করদমিত্র রাজ্যে পরিণত করে। রাজ্যের শাসন প্রণালী ও ভূমি রাজস্বের ক্ষেত্রেও তাদের নিজস্ব রীতিনীতির প্রচলন শুরু করে। প্রসঙ্গত ১৮৬৪-৬৫ খ্রিস্টাব্দের দ্বিতীয় ইঙ্গ-ভুটান যুদ্ধের তাৎপর্য ছিল সুদূর প্রসারী। এই যুদ্ধের ফলে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলের মানচিত্র পাল্টে যায় ব্রিটিশের ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। বিস্তীর্ণ ডুয়ার্স এলাকাকে তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে চা-বাগিচার পত্তন শুরু করে এবং প্রশাসনিক স্বার্থে জলপাইগুড়ি জেলা (১৮৬৯ খ্রি:) গঠন করে। দার্জিলিং তথা কালিম্পং, ডালিমকোট সহ তরাই অঞ্চলকেও তারা নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়। সামগ্রিকভাবে বলা যেতে পারে আজকের উত্তরবঙ্গের অবয়ব এই সময়েই গঠিত হয়। স্বাভাবিকভাবে এই সময়েই তারা সুবিধে মতো প্রশাসনিক সংস্কারের কাজটিতেও হাত দেয়। এই সময়েই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জাতিতত্ত্ব নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের প্রশাসনিক আধিকারিক, গবেষক, নৃ-তত্ত্ববিদদের বিভিন্ন মতামত রাজবংশী জনগোষ্ঠীর মানুষদের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। হ্যামিলটন বুকাননের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর পরিসংখ্যানের (১৮০৭-১৮১৭ খ্রি:) উপর ভিত্তি করে মন্টেগোমারী মার্টিন, ই. টি. ডালটন, জেমস ওয়াইস, ডব্লিউ. ডব্লিউ হান্টার, এইচ, এইচ. রিজলে, বি. এইচ. হজসন প্রমুখরা যখন বলেন যে নৃতত্ত্বের বিচারে কোচ, পলিয়া, রাজবংশী মূলত একই উপজাতীয় গোষ্ঠীর মানুষ।[১] ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারি প্রতিবেদন পর্যালোচনায় ডব্লিউ. ডব্লিউ হান্টারও বলেন যে "আদমসুমারি প্রতিবেদনে অর্ধ-হিন্দু আদিবাসী হিসাবে উল্লিখিত কোচ, পালিয়া ও রাজবংশী জনগোষ্ঠীর লোকজন যারা কুচবিহার

রাজ্যেও রাজ্য সংলগ্ন আদিবাসী, তারা মূলত: একই বংশোদ্ভূত উপজাতি।[২] ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের লোক গণনার প্রাক্কালে জাতির ঘরে 'কোচ' লেখার সরকারি নির্দেশ জারি হলে বিতর্ক আরও দানা বাঁধে। এই বছরই শ্যামপুকুরের জমিদার হরিমোহন রায় খাজাঞ্চির নেতৃত্বে গঠিত হয় 'রংপুর ব্রাত্য ক্ষত্রিয় জাতির উন্নতি বিধায়নী সভা'। এই সভার মাধ্যমে রংপুরের প্রভাবশালী জমিদার ও মোক্তাররা এই আদেশের বিরোধিতা করেন। এবং জাতির ঘরে 'ব্রাত্য ক্ষত্রিয়' লেখার দাবি জানাতে থাকেন। কিন্তু ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের লোকগণনা এবং ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের লোকগণনাতেও 'ব্রাত্য ক্ষত্রিয়' উল্লেখ না হওয়ায় আন্দোলন তীব্রতর হয়। এটা ইতিহাসগত সত্য যে রাজবংশী সম্প্রদায় সামাজিকভাবে সংগঠিত হওয়ার সূচনা হয় ঔপনিবেশিক সময়কালে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে। বস্তুতপক্ষে, সে সময় থেকেই তাঁদের মধ্যে ভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীগত সত্তা প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। তাঁদের এই সামাজিক (Social mobility) গতিশীলতা আন্দোলনের প্রক্রিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে উপস্থিত হয়েছিল ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে রংপুর নাট্য মন্দিরে আয়োজিত এক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে।[৩] যার ফলশ্রুতি ক্ষত্রিয় সমিতির আবির্ভাব। সম্মেলনে উপস্থিত হন রংপুর সহ জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দিনাজপুর, ধুবরী, বগুরা, ময়মনসিংহের প্রায় ৪০০ জন প্রতিনিধি। সম্মেলনে ক্ষত্রিয় সমিতির উদ্দেশ্য ও কার্যবিধি ঘোষণা করেন সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে মধুসূদন রায় ও পঞ্চানন সরকার।[৪] এই সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনায় আধিকারিকের নিকট 'রাজবংশী' জাতিকে ক্ষত্রিয় সমাজ ভুক্তির দাবি পেশ করা এবং রাজবংশী ও কোচকে পৃথক পৃথকভাবে নথিভুক্ত করে রাজবংশীকে ক্ষত্রিয় হিসাবে গণনার দাবি জানানো। ইতিমধ্যে রংপুর ক্ষত্রিয় সমিতি নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারা প্রস্তুত একটি ব্যবস্থাপত্রে রাজবংশীদের ক্ষত্রিয় স্বীকার করে স্বীকৃতি পত্রও লাভ করে।[৫] রংপুর ক্ষত্রিয় সমিতির লক্ষ্য হল ১) রাজবংশী ও কোচরা পৃথক জাতি এবং কোচরা রাজবংশী ক্ষত্রিয়দের চেয়ে নিকৃষ্ট তা প্রচার করা এবং রাজবংশীদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী বৈধ প্রমাণ করা ২) রাজবংশীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ সুলভ আচরণের (Sanskritisation) বিকাশ ঘটানো। সাধারণ রাজবংশীদের ঐক্যবদ্ধ করতে এবং তাদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি বৈধকরণ করতে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের সংস্কার সুলভ আন্দোলনের (Sanskritisation) পদক্ষেপ নেয় রংপুর ক্ষত্রিয় সমিতি। এই আন্দোলনের পরিস্থিতিতে ক্ষত্রিয়

সমিতির কর্ণধার হিসাবে উঠে আসেন মাথাভাঙ্গা কোচবিহারের খলিসামারীর সন্তান পঞ্চানন বর্মা (সরকার)। তিনি রাজবংশী হিন্দুদের মধ্যে প্রথম উচ্চশিক্ষিত (এম. এ এবং বি. এল) ব্যক্তি। কোচবিহারে জন্মগ্রহণ করলেও আইন ব্যবসার সূত্রে এই মহান ব্যক্তিত্ব রংপুর শহরে বসবাস শুরু করেন।[৬] তিনি দীর্ঘ ক্ষাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে বিভিন্ন শাস্ত্র ঘেঁটে একথা প্রমাণ করতে সমর্থ হন যে রাজবংশীরা ম্লেচ্ছ নয়, বরং এরা ব্রাত্য ক্ষত্রিয় (ক্ষত্রিয়চ্যুত)[৭] অবশেষে আন্দোলন এবং নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারা প্রাপ্ত ব্যবস্থাপত্রের উপর ভিত্তি করে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের লোকগণনার আলোকে রাজবংশী ক্ষত্রিয় হিসাবে উল্লেখ করা হয় যদিও রাজবংশীদের 'ক্ষত্রিয়' হিসাবে চিহ্নিত করা হয় না।[৮] রাজবংশী পৃথক ক্ষত্রিয় হিসাবে পরিচয় লাভের জন্য ক্ষত্রিয় সমিতি ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ও ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারি চলাকালে আন্দোলন আরও তীব্র করে তোলে।[৯] মনীষী পঞ্চানন বর্মা বরাবরই রাজবংশী ও কোচদের পৃথক জাতিগোষ্ঠী বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি রাজবংশীদের কোচ জনগোষ্ঠী থেকে Superior Caste বলে মনে করতেন। তাঁর দীর্ঘ আন্দোলন ও প্রচেষ্টায় অবশেষে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারিতে রাজবংশীদের ক্ষত্রিয় বলে উল্লেখ করা হয়।[১০] পরবর্তীকালে তার মন্ত্রশিষ্য উপেন্দ্রনাথ বর্মন তার 'রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস' শীর্ষক গ্রন্থে লিখেছেন "The Rajbanshis were Kshatriya and lived in the land called 'Poundra Desh' between the river Karotoya and Ganga." আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য 'বিংশ শতাব্দীর সূচনা লগ্ন থেকে রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের মধ্যে বিশেষ করে রংপুরে অত্যন্ত ক্ষীণাকারে একটি জমিভিত্তিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির সূত্রপাত হয়।'[১১] তারাই ছিলেন ক্ষত্রিয় সমিতির ব্যক্তিবর্গ। তাদের মাধ্যমেই প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে রাজবংশী সম্প্রদায় 'রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতির মাধ্যমে' তত্ত্বগত ভাবে (Theoretically) বা বাস্তবে (Practically) বঙ্গের অন্যান্য বিশেষ করে উচ্চবর্ণ বাঙালি হিন্দু জাতি থেকে সরাসরি বিভাজিত এবং স্বজাত্যের আত্মপরিচয় ও আত্ম উন্মোচনের জন্য সংঘবদ্ধ হয়। ১৯০১ সালে বাংলার গভর্ণর রাজবংশীদের কোচদের সঙ্গে একত্রিত করে গণনা করেই এই অভিমানকে আঘাত করেন। বলা যায় এই সময়েই রাজবংশীদের ভাষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, ঐতিহ্য উদ্ধারের সূত্রপাত ঘটে এবং পরবর্তী ধাপে 'রংপুর ক্ষত্রিয় সমিতি' গঠন (১৯১০ খ্রি:) এবং ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ২৭ মাঘ (১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ৯ ফেব্রুয়ারি) উপনয়ন গ্রহণের সংস্কার এই ব্রাত্যত্ব মোচনের

একটি প্রয়াস এবং এই দিনটিকে পবিত্র দিবস হিসাবে উদ্‌যাপন রাজবংশী সংস্কৃতির একটি অবশ্য কর্তব্য হয়ে ওঠে। রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মা স্বাধীনতার পূর্বসময়গুলিতে রাজবংশী জাতিকে সংঘবদ্ধ শুধু নয় আত্মপরিচয়ে বলীয়ান এবং দশমবিধ সংস্কার ইত্যাদির মধ্য দিয়ে আত্মশুদ্ধি ও জাতির উন্নয়নের জন্য সম্পূর্ণ জীবন উৎসর্গ করেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও পরবর্তী সময়কালে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন। কারণ তিনি উপলব্ধি করেন শুধুমাত্র রাজবংশীদের সামাজিক পরিচিতির দিক থেকে ক্ষত্রিয় হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করলেই হবে না যথার্থ পরিচয় লাভের জন্য অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত অগ্রগতি দরকার। তার জন্য তিনি রাজবংশী জাতিকে তপশীলভুক্ত জাতি হিসাবে স্বীকৃতি লাভের জন্য দাবি জানাতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। বলা যেতে পারে একমাত্র তারই প্রচেষ্টায় ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে তপশিলী জাতির তালিকা প্রকাশিত হলে রাজবংশীরা এই তালিকাভুক্ত হয়।[১২] স্বাধীনতার পর ভারতীয় সংবিধানের ৩৪১ নং ধারায় এবং ১৯৫০ ও ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের আদেশনামায় রাজবংশীরা পশ্চিমবাংলায় 'Scheduled Caste' তালিকায় থেকে যায়।[১৩]

দীর্ঘ ক্ষত্রিয় আন্দোলন ও পঞ্চানন বর্মার নেতৃত্বে রাজবংশী সমাজ সংগঠিত হয়। সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও কিছু সংস্কার এবং রীতি প্রচলিত হয় রাজবংশী সমাজে। স্বাধীনোত্তর সময়ে সেই ধারায় এই সমাজ ও সংস্কৃতির পরিসর ব্যাপ্তি লাভ করে। বিংশ শতাব্দীর আটের দশক অবধি বলা যায় সেই ধারা অব্যাহত থাকে। তার পরবর্তী সময়ে রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতি সংকটাপন্ন হয়। গ্রাম সমাজের পরিবর্তন, অর্থনৈতিক কাঠামোর দুর্বলতা সরাসরি রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতিকে আঘাত করে। ইতিমধ্যে রাজবংশী সমাজের মধ্যেও নব্য মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে ওঠে। শহরে বসবাসকারী চাকুরে বুদ্ধিজীবী, অবস্থাপন্ন কিছু মানুষ বৃহত্তর সমাজ সংস্কৃতির ঘেরাটোপে আবদ্ধ হয়। গ্রাম ও শহুরে জীবনের মধ্যে ব্যবধান রচিত হয়। গ্রামগুলি তখন মিশ্র সংস্কৃতির আবর্তে বিভ্রান্ত এবং বিশ্বায়নের স্রোতেও ধাবমান। সব মিলিয়ে একটা পরিবর্তনের স্রোত সামগ্রিক ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। রাজবংশী সমাজের মধ্যেও তখন বিভিন্ন বিষয়, ভাবনা, আন্দোলন, সংঘবদ্ধতা, দাবী দাওয়ার বিষয়গুলি উত্থাপিত হয়। ফলত: এক অস্থির অবস্থার সৃষ্টি হয়। আবার এইসবের মধ্যে রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতি, আত্মানুসন্ধান এবং সচেতনতা বৃদ্ধির একটা প্রয়াস দেখা যায়। মনীষী পঞ্চানন বর্মার নেতৃত্বে রাজবংশী সমাজ প্রথমবার সংগঠিত হওয়ার পর সমাজ সংস্কৃতি নিয়ে পর্যালোচনার একটি পরিসর তৈরি হয় এই পর্যায়ে।

ক্ষত্রিয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাজবংশী জনগোষ্ঠী মানুষ যেমন দাস, সরকার পদবি পরিত্যাগ করে বর্মা, রায়, বর্মন, পদবি গ্রহণ করে। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় সিংহ, সরকার, দেবশর্মা পদবি গ্রহণের প্রবণতা দেখা যায়। ক্ষাত্র পরিচয়ের জন্য উপবীত ধারণ ও পদবির মধ্য দিয়ে সংস্কার বিধির নানা প্রক্রিয়া চালু হয়। 'অশুচ' (অশৌচ) পালন ৩০ দিনের পরিবর্তে ১২ দিনে শেষ করা, ধর্মীয় পূজা অর্চনা গায়ত্রী মন্ত্রোচ্চারণ, সন্ধ্যা পূজা, গীতা পাঠ প্রভৃতি নিয়মাবলীর সূচনা ঘটে। ধর্মীয় সংস্কারের অঙ্গ হিসাবে শক্তির প্রতীক চণ্ডী পূজার প্রচলন হয়। উত্তরবঙ্গের সর্বত্র এই সংস্কার বিধি প্রচলিত না হলেও কোচবিহার, জলপাইগুড়ি উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায় শুরু হয়। তরাই-ডুয়ার্স এলাকায় পঞ্চানন বর্মার ক্ষত্রিয়করণের প্রভাব পড়তে একটু সময় লাগে। স্বাধীনতার পরেও এক-দুই দশক অবধি এরা পদবি পরিবর্তন কিংবা উপবীত ধারণের বাইরেই থাকে। যার জন্য আজও দাস পদবি রাজবংশী সমাজে দেখা যায়। বর্তমান আলিপুরদুয়ার জেলার ভাটিবাড়ী, কুমারগ্রাম থানা, তপসীখাতা এলাকায় দাস পদবিধারী রাজবংশীরা যেমন আছেন তেমনি দার্জিলিং জেলার নেপাল সংলগ্ন নকশালবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া এলাকায় সিং পদবিধারী রাজবংশীদের বসবাস। দুই দিনাজপুর এলাকাতেও সিংহ পদবিধারী রাজবংশী পরিবারের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়েও ক্ষত্রিয়ত্বের ভাবনায় বিশ্বাসী হয়েও পদবির ক্ষেত্রে তারা পূর্ব ধারাই বজায় রেখেছেন। আবার মালদহ ও দিনাজপুর জেলায় অনেক রাজবংশী পরিবার আজও পলিয়া বা পালিয়া নামেই পরিচিত। কোচবিহার জেলায় বেশকিছু রাজবংশী মানুষ 'সরকার', 'সেন' পদবি গ্রহণ করেছেন। খেন বংশীয় হিসাবে তারা আখ্যায়িত। এটা বলা যায় বিভিন্ন পদবি থাকা সত্ত্বেও 'ক্ষত্রিয়' রাজবংশীরা এই পরিচয় দীর্ঘ আন্দোলনে রাজবংশী সমাজ লাভ করেছে। আবার সব রাজবংশী মানুষই কাশ্যপ গোত্রের এবং একই গোত্রে বিয়ে সিদ্ধ। রাজবংশী সমাজে গোত্র বিভাগ না থাকলেও গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা বর্তমান। এক এক গ্রামে কয়েকটি গোষ্ঠীর লোক বসবাস করেন। এই গোষ্ঠী বিচারেই বিয়ে সম্পন্ন হত। সাত-আট দশক অবধি এই ছবিটি ছিল স্বাভাবিক। বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণে দূরবর্তী এলাকাতেও বিয়ের সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে। বস্তুতঃ রাজবংশী সমাজ একটি সমগোত্রীয় জনসমষ্টি। তাদের মধ্যে একটিমাত্র গোত্র, সেটা হল কাশ্যপ গোত্র এবং তারা সমগোত্রের মধ্যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতেন।[১৪] পরিবার ভিত্তিক সমাজ, পিতৃতান্ত্রিক এবং

যৌথ পরিবার ভিত্তিক গ্রাম সমাজ। গ্রাম সমাজে বয়োজ্যেষ্ঠদেরই বিশেষ গুরুত্ব। তাদের মতামত ও সম্মীলনে সমাজ সংস্কৃতি আবর্তিত হত। আত্মীয় পরিজন, বৃহৎ জোতদার পরিবার, আধিয়ার সবাই মিলে পাশাপাশি অবস্থান করতেন। আর যেহেতু সবাই কৃষিজীবী ফলত: বিশেষ শ্রেণিভেদ ছিল না। প্রত্যেকটি মানুষ গ্রাম সমাজের আবদ্ধ থাকত নানারকম সামাজিক কিংবা আত্মীয়তার বন্ধনে। কৃষিকার্যে নারীরাও সমানভাবে অংশ নিতেন। পর্দাপ্রথার কঠোরতা ছিল না। তাই রাজবংশী মহিলাগণ সমাজের অন্যান্য মহিলাদের তুলনায় অধিক স্বাধীনতা ভোগ করতেন। স্বাধীনোত্তর সময়েও কৃষিকাজের বাইরে রাজবংশী সমাজের আগ্রহ বিশেষ ছিল না। এমনকী শিক্ষার বিষয়েও। এই ছবিটা সাতের দশক অবধি অব্যাহত ছিল। পরবর্তীকালে এই ভাবনার পরিবর্তন ঘটে। এমনকী ব্যবসা বাণিজ্য কিংবা অন্যান্য সেক্টরেও রাজবংশী সমাজের উদাসীনতা লক্ষ করার মত বিষয় গুলি আর্থসামাজিক পরিসংখ্যানে উঠে আসে। রাজবংশী লোকেরা সহজ, সরল, পরিশ্রমী এবং সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিল। বাড়তি কোন চাপ কিংবা ভবিষ্যতের কথা না ভেবেই নিশ্চিন্তে বিলাস ব্যসন, ন্যূনতম চাহিদা, গান বাজনায় দিন কাটানোর ছবি পাঁচ-ছয়ের দশকেও অব্যাহত ছিল।

রাজবংশীদের বিবাহ প্রথা ও অভ্যাসের মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ ছিল। পেশাদারী অপেশাদারী ভাটাইত, কারোয়া (ঘটক) নামক ব্যক্তির মাধ্যমেই বিবাহের সম্পর্ক স্থাপিত হত। কামরূপী ব্রাহ্মণ দ্বারাই বিবাহ কার্য সম্পন্ন হত।[১৫] নিয়মিত ও অনিয়মিত দু'ধরনের বিবাহের প্রচলন ছিল। নিয়মিত বিবাহের মধ্যে 'ফুল বিয়া' যেখানে একজন ছেলে ঋতুমতী মেয়েকে বিবাহ করেন। এ ধরনের বিবাহে পাত্র ও পাত্রী উভয়কেই মুকুট (শোলার) পরানো হয়।[১৬] এখানে একজন ব্রাহ্মণ বা অধিকারী অতি আবশ্যক। নিয়মিত বিবাহের মধ্যে 'ঘর জেয়া বিহা' (Ghor-dzia biha) অন্যতম। পাঁচের দশকেও তা প্রচলিত ছিল। এই ধরনের বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র তার প্রস্তাবিত শ্বশুরবাড়িতে জামাই হিসাবে থাকত এবং সংসারের যাবতীয় কার্যে সহায়তা করত। বিশেষ করে কৃষিকার্যে। এর নিহিতে লুকিয়ে আছে কন্যাপণের প্রথা। আগে পাত্রীর বাবাকে কন্যাপণ দিয়ে বিয়ে করতে হত। পাঁচের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত রাজবংশী সমাজে এই রীতি প্রচলিত ছিল। বিধিসম্মত নয় অর্থাৎ অনিয়মিত বিবাহের মধ্যে ছিল পানিছিটা, ছত্রদানি, লিভারেট বিবাহ (নিঃসন্তান ভাতৃজায়াকে বিবাহ), ঘর সোন্দানি, ডাংগুয়ানি, পরক্ষেত্রি, পাছুয়া,

গাওগছ এবং কইনাপাত্র। রাজবংশী সমাজে বিধবা বিবাহ বহুপূর্ব থেকেই প্রচলিত। পানিছিটা বাপ-মাও, মিস্তর ধরা রীতি সংস্কারের অঙ্গ। বৈরাতী বিয়ের যাবতীয় নিয়মরীতি অনুসরণ করার কাজটি করত। বউভাতে গ্রামের বয়স্কদের বিশেষ সম্মান দিয়ে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা থাকে। আটের দশক পর্যন্ত নিয়মরীতির রক্ষণশীলতা থাকলেও ধীরে ধীরে তা হ্রাস পায়। একজন মহিলা তার পূর্ব স্বামী জীবিত থাকা সত্ত্বেও যখন অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তখন সেই বিবাহ ছত্রদানী বিবাহ হিসাবে আখ্যায়িত হয়। কোন পুরুষের বাড়িতে কোন মহিলা স্ত্রী অধিকার নিয়ে হাজির হয়ে বাড়ির কাজকর্ম করতে থাকলে কয়েকদিন পরে সে মহিলাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে সমাজকে 'ঘর সোন্দানি' বিবাহ সম্পন্ন করে। এক্ষেত্রে মহিলাটি 'পাছুয়া' এবং পুরুষটি 'সাংনা' নামে পরিচিতি পায়। আবার কোন পুরুষ যদি কোন বিধবা মহিলাকে স্ত্রী মর্যাদা দিয়ে বাড়িতে রাখেন তখন বলা হয় 'গাও গছ'। আবার উল্টে যদি কোন সম্পদশালী মহিলা কোন পুরুষকে তার কাছে থাকতে দেন এবং বাড়ির কাজকর্ম করান সেই সম্পর্ক বিবাহকে বলা হয় 'ডাংগুয়া'। এক্ষেত্রে সামাজিক স্বীকৃতির পরেই সন্তান-সন্ততিরা সম্পত্তির অধিকারী হন। আবার যখন কোন বিধবা মহিলার কোন অভিভাবক থাকে না তখন কোন পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক করে তার বাড়িতে চলে যায়, তখন সেই মহিলা 'পরক্ষেত্রি পাচুয়া' নামে পরিচিতি পায়। এই সমস্ত ধরনের বিবাহকেও সমাজ একপ্রকার রীতি সংস্কারে স্বীকৃতি দিত। এই শিথিলতা ছিল রাজবংশী সমাজে। একাধিক বিয়েরও প্রচলন ঘটে এই ধরনের অনিয়মিত বিবাহের মধ্য দিয়ে। যদিও এক বিবাহই রাজবংশী সমাজে স্বীকৃত। তথাপি সম্ভ্রান্ত রাজবংশী পরিবারে প্রথাগত ও প্রথা বহির্ভূত স্ত্রীর উদাহরণ স্বাধীনতার সময়কালেও দেখা গেছে। সামাজিক ব্যাভিচারের বিষয়টিকে প্রতিরোধ করার একটি প্রয়াস ছিল বলা যায়। তবে স্বাধীনতার কয়েক দশকের মধ্যে এই বিবাহগুলির প্রচলন কমে যায়। বিবাহ বিচ্ছেদ রাজবংশী সমাজে প্রচলিত ছিল তবে এক্ষেত্রে কোন ক্ষতিপূরণের রেওয়াজ ছিল না।[১৭] উল্লেখ্য রাজবংশী সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদের মত ঘটনা সংখ্যায় নগণ্য।[১৮] বাল্যবিবাহ রাজবংশী সমাজে এক পুরনো ঐতিহ্য। সাতের দশক অবধি এটা দেখা যেত। কিন্তু স্বাধীনোত্তর সময়ে রাজবংশী সমাজ বর্ণহিন্দুদের সংস্পর্শে আসায় মহিলাদের অধিকার, আইন, সমাজচেতনা ও সামাজিক কর্তব্য ভাবনায় অনেক কিছুই বর্জন করে। 'কন্যাপণে'র পরিবর্তে চালু হয় 'বর পণ', অপেক্ষাকৃত সাবালক অবস্থায়

বিবাহ, নিয়ম সংস্কারেও শিথিলতা আসে।

রাজবংশী সমাজ জীবন সংস্কৃতি নির্ভর এবং লৌকিক ধর্মকেন্দ্রিক ছিল। স্বাধীনোত্তর সময়কালে সে ছবিটি অক্ষতই ছিল। আটের দশকের শেষদিকে সমাজ সংস্কৃতির সংকট ঘনীভূত হয় আর্থসামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনের ফলে। পূজা-পার্বণকেন্দ্রিক সংস্কৃতি আবার কৃষিকে ঘিরেও সংস্কৃতির পরিমণ্ডলটি ছিল বিস্তৃত। তবে এটা বলা যায় বর্ণ-হিন্দুদের অনেকাংশে প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও লৌকিক পরিসরটি কোনভাবে বর্জিত হয়নি। আজও সেটা দৃশ্যমান হয়, অবশ্য আয়োজন কিংবা নিয়মনীতির ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটেছে। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের পূজার্চ্চনায় একদিকে যেমন পরিলক্ষিত হয় গোষ্ঠী জীবনাচারণের পূর্বপুরুষ, দেবতার পূজার্চ্চনা অন্যদিকে লক্ষ্য করা যায় আর্থসামাজিক অবস্থান থেকে উঠে আসা রাজা, জোতদার, তহশীলদার, (কোষাধ্যক্ষ) দেওয়ান অবধি। তেমনি নদী জলাশয়ও দেবতা হিসাবে স্থান পেয়েছে বাড়ির ঠাকুর পাটে। শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মেরও অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে। শক্তির দেবী হিসাবে কালীও বহুপ্রকারে স্থান পেয়েছে। মাশান (কোচবিহার জেলার অন্যতম লৌকিক দেবতা), বুড়াঠাকুর, মহাকাল, বিষহরি যেমন অন্যতম হিসাবে গ্রহণযোগ্য হয়েছে তেমনি গাবুর ঠাকুর, গারাম ঠাকুর, ডাংধরা, সন্ন্যাসী, রাখাল এমনকী পীর দেবতাও স্থান পায় অনায়াসে। সেইসঙ্গে প্রাকৃতিক দেবতা হিসাবে হুদুম দ্যাও, তিস্তাবুড়িও পূজিত হয়। সবার বাড়িতে ঠাকুরের পাটে ছোট ছোট ঘরে ঠাকুরের আসনে মাটির ঢিপি কিংবা পাথরই প্রতীকী হিসাবে দেখা যায়। সাতের দশকের আগে মূর্তির বিশেষ প্রচলন ছিল না। মন্দিরে পাশে থাকত সাদা, লাল কাপড়ের নিশান এবং চাঁদোয়া। এই সমস্ত দেবতার অবস্থান স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন দেখা যায়। আজও সেই দেবতাগুলির পাট দেখা গেলেও পূজার্চ্চনায় সংক্ষিপ্ততা এসেছে। মানত, উৎসর্গ রাজবংশী সমাজের অন্যতম অনুষঙ্গ। হাঁস, পায়রা, পাঠা উৎসর্গ বেশিরভাগ দেবতার ক্ষেত্রেই দেখা যায়। সহজলভ্য লৌকিক উপাচার দুধ, দই, চিড়ে, কলা, (বীজযুক্ত আটিয়া কলা) ব্যবহারও রাজবংশী সমাজে প্রচলিত। রাজবংশী সমাজের অধিকারী, দেওসী, দেওধারাই পুরোহিতের কাজ করেন। অনেকক্ষেত্রে বাড়ির বয়স্ক পুরুষরাই পূজার কাজ সম্পন্ন করেন। এই ব্যাপারে বিশেষ বাধানিষেধ নেই। স্বাধীনোত্তর সময়ের পরও কিছুকাল এই ছবিটাই ছিল স্বাভাবিক এবং বাড়ি বাড়ি পূজার্চ্চনার একটি পরিসর ছিল, বর্তমানে থাকলেও পরিস্থিতি বদলেছে আর্থ সামাজিক অবস্থার দুর্বলতা এবং পার্শ্ববর্তী সমাজ

সংস্কৃতির আগ্রাসনে। আবার দোল সওয়ারী, চৈত্র সংক্রান্তিকে ঘিরে বিষুয়া, গমীরা ঠাকুরের মাগন ও পূজা, গোরখনাথের মাগনে রাখাল বালকদের উন্মাদনা কয়েক দশক আগেও ছিল। বর্তমানে খুব অল্প কিছু জায়গায় সম্পন্ন হয়। হুদুম দ্যাওর মাগন ও পূজা প্রায় উঠে যাবার মতই। তিস্তাবুড়ির পূজাকে ঘিরে জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকে কিংবা কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ ব্লকে বহুল প্রচলিত, বৈশাখ মাস জুড়ে বিভিন্ন দলকে পথে প্রান্তরে দেখা যায়। অনেক লৌকিক দেবদেবীর সংখ্যাও কিন্তু কয়েক দশকে কমে গেছে। বর্ণ হিন্দুদের সংশ্রব আর্থসামাজিক কাঠামো পরিবর্তন সর্বোপরি বিশ্বাস ভাবনার পরিবর্তনে শূন্য দশকে অনেক দেবদেবী লোকান্তরিত হয়। সেইসঙ্গে প্রজন্মগত বিচ্ছিন্নতাও অনেকাংশে দায়ী। উল্লেখ্য রাজবংশী সম্প্রদায় সুদীর্ঘকাল বিভিন্ন জনজাতির সঙ্গে পাশাপাশি বসবাস এবং বর্ণহিন্দুদের ধর্ম সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও পুরোপুরিভাবে হিন্দুধর্মের যাবতীয় সংস্কার গ্রহণ করেননি বরং অতীতকালের ধর্মীয় বিশ্বাস যেমন — পূজা উপলক্ষে গ্রামে মাঙ্গলিক থানে পশুবলি, নদনদীকে দেবতাজ্ঞানে পূজার্চ্চনা, বড় বৃক্ষকে দেবতাজ্ঞানে তেল সিঁদুর মাখিয়ে প্রণাম ও প্রার্থনা জানানো প্রভৃতি ত্যাগ করেনি। রাজবংশী জীবনে মঙ্গলবোধ, শ্রেয়োবোধ অতীত ধর্মবিশ্বাসে তাদের মধ্যে সদা জাগ্রত।[১৯] সেটা স্বাধীনোত্তর সময়ের কয়েক দশকেও ক্ষুণ্ণ হয়নি। রাজবংশীদের আরাধ্যদেবতা মহাদেব, কালী ও মনসা দেবী। সামাজিক মঙ্গলসাধন, ফসল বৃদ্ধিকেন্দ্রিক বেশ কিছু লৌকিক পূজা উত্তরবঙ্গের ও অন্যান্য এলাকার রাজবংশী সমাজ করে থাকেন। রাজবংশী সমাজে কৃষিকেন্দ্রিক যে সমস্ত পূজা উৎসব প্রচলিত আছে সেগুলি হল — তিস্তাবুড়ি, গছিবোনা, ডাক-লক্ষ্মী, বুড়াবুড়ি, বৈশাখী, আষাঢ়ী, সেবা, আমাতি, ধানের ফুল আনা, যাত্রাপূজা, ভাণ্ডানী, শিয়াল ঠাকুর, ব্যাঙের বিয়াও, নয়া খৈ, পুষুনা, গোরখনাথ, গমীরা ঠাকুর, হুদুম দ্যাও প্রভৃতি[২০] জীবজন্তুর হাত থেকে রক্ষার জন্য যেসব পূজা আরাধনা রাজবংশী সমাজের বিভিন্ন এলাকায় প্রচলন আছে সেগুলি হল মহাকাল ঠাকুর, ভাণ্ডানী, শালেশ্বরী, বিষহরি, শিয়াল ঠাকুর প্রভৃতি।[২১] উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের মুখ্য দেবতা হল শিব। শিব প্রকৃতপক্ষে কৃষিদেবতা। কোচ রাজবংশও শৈবভাবাপন্ন ছিলেন, মহারাজা বিশ্বসিংহ সিংহাসনে আরোহন করেই শৈবধর্মে দীক্ষিত হন। শিবের অলংকার বৃষ, ষাঁড়, লিঙ্গ প্রকৃত অর্থে উর্বরা ভাবনার প্রতীক। উত্তরবঙ্গে শিব নানা নামে পরিচিত। বাণেশ্বর, জটিলেশ্বর, সর্বেশ্বর, মটেশ্বর, জল্পেশ্বর ইত্যাদি। আবার অনেক দেবতাই

শিবের প্রতিভূ যা বলা ভালো ভিন্নতর রূপ। যেমন মহাকাল, বুড়াঠাকুর, গোরখনাথ, সোনা রায়, মাশান প্রভৃতি। এই শিব উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় গারাম ঠাকুর হিসাবে পূজা পায়। গ্রাম থানে শিব মধ্যমণি হিসেবে অবস্থান করে। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে কালী দেবতারও বহুল প্রচলন এবং বহু প্রকারভেদ। বিভিন্ন নামের কালীর সন্ধান পাওয়া যায় উত্তরবঙ্গের বিস্তৃত অঞ্চলে। রাজবংশী সমাজের শাক্তভাবের প্রকাশ পাওয়া যায় এই কালী আরাধনায়। তারা কালী, শ্মশান কালী, রক্ষা কালী, বুড়ি কালী, শ্যামা কালী, পাঁচ কালী, পেটকাটি কালী, কাঁচা কালী প্রভৃতি। রাজবংশী সমাজে আরেক অন্যতম দেবতা মাশান। কোচবিহার জেলার অন্যতম লৌকিক দেবতা। বিভিন্ন নামে (১৮ প্রকার) পূজিত। উপাচারেরও বহু ব্যতিক্রমী প্রকারভেদ। দিনহাটা ঢিলমাশানকে ঢিল পাটকেল ছুঁড়তে হয়। সাধারণত কোন জলাশয়ের নিকটবর্তী স্থানেই মাশানের পাট নির্মিত হয়। অন্যতম ব্যতিক্রমী উপাচার — চালভাজা, মাছ পোড়া বিশেষ করে চ্যাং মাছ (ল্যাটা মাছ) পোড়া ইত্যাদি।

পূজা পার্বণের তালিকা [২২]

ক্রমিক নং	পূজা/উৎসব	কাল	অংশগ্রহণকারী	সঙ্গীত ও নাম	মন্তব্য
১	বিশুয়া	চৈত্র সংক্রান্তি	পুরুষ		কৃষি, জাদুবিশ্বাস, বন্যজন্তু আক্রমণ প্রতিরোধ
২	বৈশাখী আষাঢ়ী সেবা	বৈশাখ হইতে আষাঢ় মাস পর্যন্ত	পুরুষ	—	কৃষি
৩	গ্রামঠাকুর	জ্যৈষ্ঠ হইতে আষাঢ় মাস	পুরুষ	—	কৃষি
৪	তিস্তাবুড়ী	বৈশাখের যে কোন দিন	নারী	—	কৃষি ও নদীপূজা
৫	গচিবুনা	জ্যৈষ্ঠ হইতে আষাঢ়ের যে কোন দিন	পুরুষ	মেচিনী খেলার গান	কৃষি
৬	আমাতি	আষাঢ়	সাধারণ, ১টি অংশ শিশু নিয়ন্ত্রিত	—	কৃষি

৭	ডাকলক্ষ্মী	আশ্বিন-সংক্রান্তি	পুরুষ	ছড়াযুক্ত	কৃষি
৮	ধানের ফুল আনা	কার্ত্তিক	নারী	—	কৃষি
৯	বুড়াবুড়ী	অগ্রহায়ণ	শিশু	—	কৃষি
১০	বিষহরী	নাগ পঞ্চমী	সাধারণ	ভাসান	সর্পপূজা, সর্বমঙ্গল কামনা, প্রজনন, মানস বা বিবাহকালে পূজার ব্যবস্থা
১১	যাত্রাপূজা	শারদীয়া নবমী বা দশমী	সাধারণ	—	কৃষি, গোসেবা, বিদ্যার দেবী আরাধনা
১২	ভান্ডানী	শারদীয়া একাদশী হইতে পূর্ণিমা	সাধারণ	—	ভল্লুক ভীতি, কৃষি, সর্ব্বমঙ্গল কামনা
১৩	হুদুমদেও ও ব্যাঙের বিবাহ	জ্যৈষ্ঠ মাস	নারী	হুদুমদেও খেলার গান	অনাবৃষ্টিজনিত বরুণদেবতার পূজা, কৃষি
১৪	কালীঠাকুরাণী, গছা দেওয়া, বাখর খাওয়ানো	দীপান্বিতার অমাবস্যা	সাধারণ	চোর খেলা, চোর চুন্নীর গান	সর্ব্বমঙ্গল কামনা। মন্দিরে নিত্য পূজা বা শনি ও মঙ্গলবার নির্দিষ্ট পূজা। তরাই অঞ্চলে গ্রামঠাকুর পূজার কালীপূজা
১৫	সত্যপীর	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	পুরুষ	সত্যপীর	হিন্দু মুসলমান সংস্কৃতি সমন্বয়
১৬	বোড়াভাসা	ভাদ্র মাসের যে কোনো বৃহস্পতিবার	নারী	—	ঐ
১৭	পাগেলাপীর	ফাল্গুনের ১৩ তারিখ	বালক	ছড়া	ঐ
১৮	রাখালঠাকুর	ঐ	ঐ	—	—
১৯	ভ্যাড়ার ঘর ছুবা	দোল পূর্ণিমার পূর্ব দিবস	ঐ	ভ্যাড়ার ঘর ছুবার গান	শবরোৎসবের ক্ষীণ স্মৃতি
২০	মদনকাম	বৈশাখ	পুরুষ	বাঁশ খেলার গান	বৃক্ষ পূজা, প্রজনন
২১	শিব ও তাঁহাব অনুষঙ্গী সমূহ	শিবচতুর্দশী	সাধারণ	—	কৃষি। অনুষঙ্গীদের বেলায় শিবচতুর্দশী ছাড়াও পূজা হইতে পারে
২২	জিগাঠাকুর	অনির্ধারিত	নারী	—	বৃক্ষ পূজা ও প্রজনন কৃষি

২৩	নয়াখৈ	অগ্রহায়ণের প্রথম দিবস বা পঞ্জিকানুসারে	সাধারণ	—	কৃষি
২৪	পুযুনা	পৌষ সংক্রান্তি	সাধারণ	—	কৃষি
২৫	শিয়ালঠাকুর	পুযুনার দিন	সাধারণ	—	কৃষি, পশুপূজা
২৬	শালশিরি	ফাল্গুন-চৈত্র	সাধারণ	—	বনদেবতা ও বৃক্ষ পূজা
২৭	গোরখনাথ	ফাল্গুন-বৈশাখ	পুরুষ	গোরখনাথের গান	কৃষি, গো পূজা
২৮	তুলসীঠাকুরাণী	প্রায়শঃ/দৈনন্দিন	সাধারণ	—	সর্বমঙ্গল দেবতা
২৯	জগন্নাথ ও বলরাম ঠাকুর	বৈশাখ	পুরুষ	কীর্ত্তন	বৈষ্ণব দেবতা
৩০	জন্মাষ্টমী ও দদিকাদো	শ্রাবণ	পুরুষ	—	কৃষি, কৃষ্ণপূজা
৩১	হনুমানঠাকুর	বৈশাখ	পুরুষ	—	ধ্বজাপূজা, পশু পূজা (?)
৩২	মাশান, জকা ইত্যাদি	শিবচতুর্দশী	সাধারণ	—	শিব অনুষঙ্গী
৩৩	ধরমঠাকুর	বৈশাখ	সাধারণ	ধরম ঠাকুরের গান	মিশ্রদেবতা
৩৪	গমীরাঠাকুর ও চড়ক	বিষুব সংক্রান্তি	পুরুষ	গমীরা ঠাকুরের গান বা গমীরা বা ভক্তিয়ার	শিব, কৃষি পূজা

রাজবংশী সমাজে অধিকারী, দেওসী, দেওধারাই পুরোহিত হিসাবে মান্য, তারাই ধর্মীয় আচার সংস্কারের কাজকর্ম সম্পন্ন করেন। অধিকারীরা দুই শ্রেণির — চক্রধারী এবং পত্রধারি। চক্রধারী অধিকারীরা তামার চক্র ধারণ করেন। তারা চক্র তৈরির অধিকারী, বিবাহ শ্রাদ্ধ শান্তি পূজার পাশাপাশি শিষ্যত্ব প্রদানের অধিকারী। পত্রধারীরা চক্রধারীর নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে পারেন ও বংশানুক্রমিক পূজার অধিকারী নন। পত্রধারীরা মাত্র এক পুরুষ পূজার অধিকারী হয়। রাজবংশী সমাজে ওঝা, দেওসী, ভৌরিয়াগণ রোগ নিরাময় করেন বলে তাদের শ্রদ্ধা সম্মান করা হয়।[২৩] অন্যদিকে 'দেওধা'-রা যজ্ঞ এবং অন্যান্য তান্ত্রিক কার্যাবলী সম্পন্ন করেন। কখনও কখনও তিনি ভগবান ও মানুষের মধ্যে মাধ্যম হিসাবে কাজ করে বিভিন্ন সমস্যার উপায় বলে

দিতে পারেন। 'ভৌরিয়া'গণ দেওধার মত কাজকর্ম সম্পন্ন করতেন। আজও রাজবংশী সমাজের মধ্যে 'ভওরিয়া'-র প্রতি বিশ্বাস রয়েছে। অন্যদিকে কীর্তিনীয়ারা রাজবংশীদের মৃত্যুর পর চিতা থেকে শ্রাদ্ধ পর্যন্ত যে সমস্ত ধর্মীয় আচরণ সম্পন্ন করে তাতে কীর্তন করেন। আর এইজন্য তাদের কীর্তিনিয়া বলা হয়।[২৪] তবে উল্লেখ্য দেওধার কিংবা ভওরিয়া সংখ্যা একেবারে নগণ্য। তান্ত্রিক ভাবনার প্রভাব থাকলেও স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে এদের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয় এবং এদের সংখ্যাও কমে যায়। সেইসঙ্গে সময়ের তালে তালে রাজবংশীদের ধর্মীয় আচরণ, দেবদেবী, ধর্মীয় বিশ্বাস প্রভৃতির মধ্যে বর্ণহিন্দুদের প্রভাব পড়েছে একথা বলা যায়। রাজবংশী সমাজের বর্ণহিন্দুদের প্রভাবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল — মাটির মূর্তির প্রচলন ও ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের দ্বারা পূজা অর্চনার রীতির প্রচলন। একথা স্বীকার করতেই হবে রাজবংশী সমাজে সাংস্কৃতিকীকরণ (Sanskritisation)-এর প্রভাব লক্ষণীয়।[২৫] স্বাধীনতার পরবর্তী কয়েক দশকে এই প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে পড়ে। রাজবংশী সমাজে বন্য হিংস্র জন্তুও দেবতা হিসাবে পূজিত। বস্তুত উত্তরবঙ্গের বিস্তৃত অঞ্চল ছিল অরণ্যবেষ্টিত। হিংস্র জন্তুর অত্যাচার প্রতিহত করার প্রার্থনায় মহাকাল ঠাকুর রাজবংশী সমাজে পূজিত। তাই হাতি মহাকাল হিসাবেই রাজবংশী সমাজে পূজা পায়। আবার বিশুয়া পরবে (চৈত্র সংক্রান্তির দিন) কৃষিকৃত্যাদির পাশাপাশি শিকার করার মধ্যে ক্ষত্রিয় আচার এবং পশু শিকার বৃত্তির যৌথ প্রয়াসকে সূচিত করে। যদিও বিশুয়া পরবে বর্তমানে অন্যান্য আচার সংস্কার পালন করলেও শিকারের পর্বটি ক্বচিৎ দেখা যায়। কারণ বন্য প্রাণ সংরক্ষণ আইন এবং বর্তমান প্রজন্মের প্রথাগত বিশ্বাসের ভাঙন। বনের জ্বালানী কাঠ সংগ্রহকারীরা শালেশ্বরী ঠাকুরাণীর পূজায় ব্রতী হয়। আবার সর্পভীতির কারণে মনসা দেবী বিষহরা নামে পূজার প্রচলন রাজবংশী সমাজে আজও বহুল প্রচলিত। বলা যেতে পারে বিষহরি অন্যতম গৃহ দেবতা। ভাণ্ডানী দেবীর পূজাও রাজবংশী সমাজে প্রচলিত। কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা, জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি এলাকা এবং আলিপুরদুয়ার এলাকায় এখনও প্রতিবছর এই পূজার ও মেলার আয়োজন করা হয়। শারদীয়া দশমীর দিন ভাণ্ডানী দেবীর পূজা বলা যেতে পারে রাজবংশী সমাজের শারদীয়া উৎসবের নামান্তর। রাজবংশী সমাজে সরস্বতী পূজা হাল আমলের। দশমীর দিন 'যাত্রা পূজা'-ই মূলত রাজবংশী সমাজের সরস্বতী পূজা। দশমীর দিন যাত্রা পূজার আয়োজন করে রাজবংশী সমাজ। কৃষিকৃত্যাদির যাবতীয় যন্ত্রপাতি, গৃহস্থালীর

সরঞ্জাম বাড়িঘর লেপে মুছে উঠোনে তুলসী তলায় যাত্রা পূজার আয়োজন হয়। সেদিন গবাদি পশুরও পরিচর্যা করা হয়। অধিকারী পুরোহিত কিংবা বাড়ির বয়স্ক ব্যক্তিই পূজা করে থাকে। সেদিন হাল যাত্রা অর্থাৎ আড়াই পাক লাঙলে চাষ করে রবিশস্য চাষের সূচনা করে রাজবংশী সমাজ। আবার আমাতি অর্থাৎ অম্বুবাচীতে কৃষিকর্ম বন্ধ রেখে রজঃস্বলা বসুধাকে পূজা করা হয়। কামাখ্যা দেবীর ভাবনা রাজবংশী সমাজের মধ্যে লক্ষণীয়। রাজবংশী সমাজ উর্বরা সংস্কৃতির (Fertility culture) ধারক। অধিকাংশ দেবদেবী ও পূজা-পার্বণের মধ্যে এই ভাবনাই অন্তরালে থাকে; কৃষিকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানে তো বটেই। অন্যান্য দেবদেবীর ক্ষেত্রেও এই ভাবনাই সক্রিয়। আবার কৃষিকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে জাদু বিশ্বাসের উপস্থিতিও লক্ষণীয়। আদিম মানসিকতা ও প্রাকৃতিক বিরূপতার নিরাময় ভাবনার জাদু নিয়ন্ত্রিত কৃত্যাদির সংযোজন ঘটেছে। অলৌকিক বিশ্বাস, ভয়, ভাবনার প্রেক্ষিতেও বহু দেবদেবীর সংযুক্তি ঘটেছে রাজবংশী সমাজে। যেমন হুদুম দ্যাও কিংবা তিস্তাবুড়ির পূজা।

অংশগ্রহণের দিক থেকে রাজবংশী সমাজে প্রচলিত পূজা উৎসব সমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। ১) বালকদের উদ্‌যাপিত পূজা উৎসব। যেমন - পাগলাপীর, চোরখেলা, ভ্যাড়ার ঘর ছুবা (পোড়ানো), বুড়া বুড়ি, হকাহকি, গোরখনাথ এবং আমাতির শেষ পর্যায়টি একান্তভাবে বালকদের মধ্যে সীমিত। ২) নারীদের উদ্‌যাপিত পূজা উৎসব। যেমন - ধানের ফুল আনা, মেচেনী খেলা, হুদুম দ্যাও পূজা, ভ্যাড়া ভাসান প্রভৃতি অনুষ্ঠান কেবল নারীদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। ৩) পুরুষদের উদ্‌যাপিত পূজা উৎসব এবং অন্যান্য প্রায় সব উৎসবগুলিই বয়স্ক পুরুষ দ্বারা পরিচালিত হয়।[২৬] রাজবংশী লোকচারণার বিভিন্ন প্রকার কৃষিকেন্দ্রিক তথা নারীকেন্দ্রিক পূজানুষ্ঠান নৃ-সাংস্কৃতিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। আসলে কৃষি সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমিতে অবস্থিত উর্বরাতন্ত্রের কৌমভাবনা এবং লোকায়ত জীবনের সহজ সরল অভিব্যক্তিতে পরিপূর্ণ এক লোকশৈলী। আবার বিভিন্ন প্রকার পূজানুষ্ঠানে 'মাড়েয়ানী'-র অধিকার নারীর প্রাধান্য তথা মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ইঙ্গিত দেয়।[২৭] সমাজে নারীরা ছিল পরিবারের একজন সদস্যা। সাধারণত গৃহকাজের বাইরেও তারা কৃষিকাজের যেমন - বিছন (ধানের চারা) তোলা, নিড়ানো, ধান কাটাই-মাড়াই-ঝাড়াই ইত্যাদি কাজে অংশ নিত। তবে অবস্থাপন্নদের ক্ষেত্রে ছবিটা আলাদা ছিল। সম্পন্ন পরিবারের বাইরে অন্য পরিবারের নারীদের অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না। মহিলারা

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের কৃষিকেন্দ্রিক পূজা-পার্বণের তালিকা [২৯]

ক্রমিক নং	পূজা/উৎসব	কাল	অংশগ্রহণকারী	সঙ্গীত ও নাম	মন্তব্য
১	বিশুয়া	চৈত্র সংক্রান্তি	পুরুষ	—	কৃষি, জাদুবিশ্বাস বন্যজন্তু আক্রমণ প্রতিরোধ
২	বৈশাখী ও আষাঢ়ী সেবা	বৈশাখ হতে আষাঢ় পর্যন্ত	পুরুষ	—	কৃষি
৩	গ্রামঠাকুর	জ্যৈষ্ঠ হতে আষাঢ়	পুরুষ	—	কৃষি
৪	তিস্তাবুড়ি	বৈশাখের যেকোনো দিন	নারী	মেচেনী	কৃষি ও নদী পূজা
৫	গচিবুনা	জ্যৈষ্ঠ হতে আষাঢ় যেকোনো দিন	পুরুষ	—	কৃষি
৬	আমাতি	আষাঢ়	শিশু	—	কৃষি
৭	ডাকলক্ষ্মী	লক্ষ্মীপূজা	পুরুষ	ছড়াযুক্ত	কৃষি
৮	ধানের ফুল আনা	কার্ত্তিক	নারী	—	কৃষি
৯	বুড়াবুড়ি	অগ্রহায়ণ	শিশু	—	কৃষি
১০	যাত্রাপূজা	শারদীয়া নবমী বা দশমী	সাধারণ	—	কৃষি, দেবী বিদ্যার আরাধনা
১১	ভান্ডানী	শারদীয়া একাদশী হতে পূর্ণিমা	সাধারণ	—	কৃষি, ভল্লুক ভীতি, সর্বমঙ্গল কামনা
১২	হুদুম দ্যাও ও ব্যাঙের বিয়াও	জ্যৈষ্ঠ মাস	নারী	হুদুম দ্যাও খেলার গান	কৃষি, অনাবৃষ্টি জনিত পূজা
১৩	শিব ও তাহার অনুষঙ্গ সমূহ	শিব চতুর্দশী	সাধারণ	—	কৃষি, অনুষঙ্গীদের বেলায় শিব চতুর্দশী ছাড়াও পূজা হতে পারে
১৪	নয়া খৈ	অগ্রহায়ণের প্রথম দিন বা পুঞ্জিকানু সারে পরে	সাধারণ	—	কৃষি
১৫	পুষণা	পৌষ সংক্রান্তি	সাধারণ	—	কৃষি
১৬	শিয়াল ঠাকুর	নয়া খৈ	সাধারণ	—	কৃষি, পশুপূজা
১৭	গোরখনাথ	ফাল্গুন-বৈশাখ	পুরুষ	গোরখনাথের গান	কৃষি, গো-পূজা
১৮	জন্মাষ্টমী ও দধিকোদো	শ্রাবণ	পুরুষ	—	কৃষি, কৃষ্ণপূজা
১৯	গরীমাঠাকুর ও চড়কপূজা	বিষুব সংক্রান্তি	পুরুষ	গরীমাঠাকুরের গান বা গমীরা বা ভক্তিয়ার	শিব, কৃষিপূজা

পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারীও হতে পারতেন না। কিন্তু ঘর জামাইয়ের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ছিল। পণপ্রথা এবং বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল। নারীদের বহুবিবাহ প্রথা প্রচলন ছিল না।[২৮]

রাজবংশী সমাজে প্রাচীনকাল থেকেই ব্রত কথার প্রচলন ছিল। আশা আকাঙ্ক্ষানিষ্ঠ বিশেষ ধর্মচারণে নাম ব্রত। এইসব ব্রতের প্রত্যেকটির সাথে সাথে ভিন্ন ভিন্ন কাম্য ফলদাতা দেবতার সম্পর্ক থাকে। মহিলারা মনোবৃত্তির তাড়নায়, সন্তান লাভ ও পারিবারিক সুখ সমৃদ্ধি কামনায় ব্রত পালন করে। অতীতে প্রকৃতির উপর মানুষের কোন ধরনের নিয়ন্ত্রণ ছিল না, দৈব নির্ভর ছিল পুরোমাত্রায়। সে কারণে দৈবশক্তির কোপ থেকে রক্ষা পেতে ও কৃপা লাভের আশায় রমণীগণ লৌকিক দেবদেবীর কাছে মানত করতেন ও আরাধনা করতেন। গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলে বর্তমান কিছু ব্রত লোপ পেয়ে থাকলেও এখনো রাজবংশী সমাজে ষাইটোল পূজা, সুবচনী পূজা, ধরম ঠাকুর, ষাট পূজা, কাতি পূজা প্রভৃতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন।[৩০] একথা বলা যায় রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতি স্বাধীনতার পরবর্তী সময়েও অনেকটাই ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত ছিল। সত্তর-আশির দশকে সমাজ সংস্কৃতির বিবর্তন লক্ষ করা যায়। তথাপি রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির ব্যাপ্তি অতীতের মত না হলেও এখনও গ্রামীণ সমাজজীবনে সাধ্যের মধ্যে পালিত হয়। মূলত: আর্থসামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন এবং অভিবাসনের চাপে রাজবংশী গ্রাম সমাজের চরিত্র পাল্টে যায়। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে আদমসুমারি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র পুরুলিয়া ছাড়া সব জেলাতেই রাজবংশী মানুষের বসবাস যদিও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির রাজবংশী মানুষরা পেশাগত দিক থেকে কৃষি নয় মাছ ধরার পেশাতেই যুক্ত। স্বাভাবিকভাবে উত্তরবঙ্গের রাজবংশীরা দক্ষিণবঙ্গের রাজবংশীদের স্বগোত্রে ধরেন না। তাছাড়া রাজবংশী সমাজে মাছ বিক্রয় করা জাতি বিরুদ্ধ কাজ। তথাপি পরিসংখ্যানে তাদের সংখ্যা যুক্ত হয়েছে একমাত্র রাজবংশী পরিচয়ে। কিন্তু পেশাগত দিক দিয়ে শুধু নয় চেহারাগত দিক থেকেও তাদের গঠন প্রকৃতি আলাদা।[৩১]

উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের অনেক ক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্য লক্ষণীয়। স্বাধীনতার সময়কাল অবধি নিজেদের মধ্যে স্থানভেদে রাজবংশীগণ উত্তরবঙ্গের জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ জুড়ে আধিপত্য বজায় রেখেছিলেন। এই আধিপত্যের জোরে রাজবংশী জনগণ উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ জমির মালিকানা ভোগ করতেন। নিজ জমিতে তারা বিরাজ করতেন রাজার হালে। কিন্তু স্বাধীনতার

বিভিন্ন আদমসুমারীতে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের সংখ্যার পরিবর্তনের নমুনা
এবং শতকরা হার

জেলা	১৯৫১	%	১৯৬১	%	১৯৭১	%	১৯৮১	%	১৯৯১	%
দার্জিলিং	১৫৮৯৪	৩.০০	৩১৮৮৭	৩.৫০	৩১৫০৫	৩.০৬	৬২৭৭০	৩.৬০	৯৬৭৪৫	৭.৪৪
জলপাইগুড়ি	১৭২৭১০	৩২.৬৮	৩১৬০২০	৩৫.১৯	৩২৯১৯১	৩২.০৩	৫১৪১৭৪	২৯.৪৯	৬৫৬০৭৩	২৩.৪২
কোচবিহার	২৫২০৬৯	৪৭.৭	৪১৮৮৩৯	৪৬.৬৩	৪৮১৩০৪	৪৬.৮৪	৭১৪২২১	৪০.৯৬	৮৬৫৬২২	৩৯.৮৬
পশ্চিম দিনাজপুর	৬৭৪৬৯	১২.৭৮	৯৩৩৭১	১০.৪০	১৩৪৯৭৬	১৩.১৩	৩৬৯০১৫	২১.১৬	৪৮৯৬৪২	১৫.৬৫
মালদা	২০২৯৪	৩.৮৪	৩৮৪৪৩	৪.২৮	৫০৬৯৩	৪.৯৪	৮৩৪৬৩	৪.৭৯	১১৪৬৯৭	৪.২৯

সূত্র : ভারতের আদমসুমারি ১৯৫১, ১৯৬১, ১৯৭১, ১৯৮১, ১৯৯১

পরে উত্তরবঙ্গের জনসংখ্যার আমূল পরিবর্তন ঘটে ফলে রাজবংশী সহ অ-রাজবংশী জনগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ফলে একাধিক সমস্যার সৃষ্টি হয় যা রাজবংশী জনগণের আর্থসামাজিক জীবনধারায় প্রতিফলিত হয়।[৩২] স্বাধীনতার উত্তরকালে বহু রাজবংশী সহ অ-রাজবংশী মানুষ ওপার বাংলা থেকে উত্তরবঙ্গের উদ্বাস্তু (Refugee) হয়ে আসতে থাকে। এর ফলে উত্তরবাংলার স্থানীয় তথাকথিত রাজবংশী মানুষের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এমনকী সামাজিক জাত্যাভিমানের (ethnocentric) প্রবণতা বাড়তে থাকে। উদ্বৃত্ত মানুষের উপস্থিতিতে এই অঞ্চলে জমির উপর চাপ বাড়তে থাকে। ফলে রাজবংশী জোতদার ও কৃষকদের (আধিয়ার) মধ্যে মালিকানা সত্ত্বের পার্থক্য, শ্রেণি পার্থক্যের বৈশিষ্ট্যে প্রতীয়মান হয়।[৩৪] জোতদার-আধিয়ারী ব্যবস্থা ছিল উত্তরবঙ্গের কৃষি ব্যবস্থার মূল মৌলিক কাঠামো। অনেক এলাকা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায় ছিল — দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ির কিছু অংশ জমিদারি প্রথার আওতায় ছিল। জলপাইগুড়ি জেলার পশ্চিম ডুয়ার্স ও কোচবিহারে জমিদারি প্রথা ছিল না। বাৎসরিক কিছু খাজনার ভিত্তিতে সরকার এখানে ধনী কৃষক জোতদারদের জমি বিতরণ করেন।[৩৫] এই এলাকায় ভাগচাষি ব্যবস্থা বিশেষভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করে কারণ জমির প্রাচুর্যের তুলনায় শ্রমিক শ্রেণির পরিমাণ কম ছিল। ফলস্বরূপ শ্রমিকের তুলনায় জমির মূল্য নগণ্য ছিল।[৩৬] বিশাল সংখ্যার অভিবাসন জনসংখ্যা কেবলমাত্র জমির চাহিদার ক্ষেত্রেই সমস্যার সৃষ্টি করল না, জমির মূল্যকেও বৃদ্ধি করল। জমির এই অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধিতে স্থানীয় জনগণ প্রলুব্ধ হয়ে জমি বিক্রির প্রবণতায় পা বাড়ায় এবং ছোট জোতদার ও মধ্যবিত্ত জোতদাররা শীঘ্রই অভিবাসিত নতুন Landed Gentry শ্রেণির অধীনে চলে আসে। রংপুর ও দিনাজপুরে বড় বড় জোতদার ও অ-কৃষিজীবী লোকেরা বেশিরভাগ জোত দখল করে। জলপাইগুড়ি জেলায় যে সমস্ত জোত রাজবংশীরা অধিকার করেছিল, তাদের সংখ্যা ক্রমাগত কমতে থাকে। অন্যদিকে বর্ণহিন্দু বাঙালি, মাড়োয়ারী এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোকদের জোতের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে কোচবিহার জেলার ৫৪ শতাংশ খাজনা বহিরাগতদের কাছে থেকে আসত।[৩৭] প্রকৃতপক্ষে সে-সময় সমগ্র উত্তরবঙ্গ জুড়ে রাজবংশীদের হাত থেকে অ-রাজবংশীদের হাতে জমির হস্তান্তরের ঘটনা একটি সাধারণ চিত্রে পরিণত হয়।[৩৮] অ-রাজবংশীদের হাতে জমির স্থানান্তকরণের পশ্চাতে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো উত্তরবঙ্গে বিশাল পরিমাণ অভিবাসন। প্রথম দিকে এই অঞ্চলের

প্রতি আকর্ষণের কারণ ছিল জমির প্রাচুর্য, ব্যবসার সম্ভাবনা, সরকারি চাকুরির সম্ভাবনা। চা বাগান গড়ে ওঠার জন্য বাবু সম্প্রদায়ের ও শ্রমিক শ্রেণির কাজের সুযোগের সম্ভাবনাও ছিল। অন্যদিকে স্থানীয় রাজবংশীরা কৃষি ছাড়া অন্য পেশায় আগ্রহী ছিল না। ফলে অভিবাসী লোকের সেই স্থান দখল করে নেয়। অভিবাসিত লোকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠেনি এখানকার ভূমিপুত্ররা।[৩৯] অভিবাসন উত্তরবঙ্গের জনসংখ্যার ধরনকে পরিবর্তন করে দেয়। একথা উল্লেখ্য যে বিংশ শতকে ব্রিটিশ শাসনকালে অভিবাসনের ঘটনা বিশেষত আসাম, উত্তরবঙ্গ ও ত্রিপুরায় ঘটেছে তাতে সম্ভবত ৩০ শতাংশ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালেও অভিবাসনের ধারা অব্যাহত এবং এই উদ্বাস্তু লোকগুলো ২/৩ অংশই ছিল পূর্ব বাংলার (বর্তমান বাংলাদেশের)।[৪০] তাদের অধিকাংশই পুরোনো জায়গায় পরিস্থিতির কারণে আর ফিরে যেতে পারেননি। ১৯৫১-১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারি থেকে জানা যায় প্রতি দশকে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির জনসংখ্যা বৃদ্ধি পশ্চিমবঙ্গের থেকে সবসময় বেশি ছিল।

পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনামূলক হার (শতাংশ) [৪১]

আদমসুমারি	পশ্চিমবঙ্গ	উত্তরবঙ্গ
১৯৫১-৬১	৩২.৮০	৪০.৪৯
১৯৬১-৭১	২৬.৪৭	৩৩.০১
১৯৭১-৮১	২২.৯৬	২৭.৬৩
১৯৮১-৯১	২৪.৫৫	২৭.৬১
১৯৯১-২০০১	১৭.৮৪	২২.৪৩

সূত্র : পশ্চিমবঙ্গ আদমসুমারি রিপোর্ট (পশ্চিমবঙ্গ) ১৯৫১, ১৯৬১, ১৯৭১, ১৯৮১, ১৯৯১ ও ২০০১।

অবশ্য উত্তরবঙ্গের জনসংখ্যা বৃদ্ধির পশ্চাতে একাধিক কারণের অবতারণা করা যেতে পারে। প্রথমত: উত্তরবঙ্গের অবস্থান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সীমারেখার মধ্যে এবং এই ভূখণ্ড পূর্ব ভারতের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। এতদ্‌অঞ্চলের অনুকূল ভৌগোলিক অবস্থান ও অভিবাসন ঘটাতে সাহায্য করেছিল। অভিবাসনের সবচেয়ে চরম পরিস্থিতি ঘটে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইন্দো-পাক যুদ্ধের সময় এবং তার অব্যবহিত পরবর্তীকালে। অভিবাসন ও উদ্বাস্তুর অনুপ্রবেশের

প্রবাহ উত্তরবঙ্গের অত্যধিক চাপ সৃষ্টি করে ও উত্তরবঙ্গের আর্থ সামাজিক কাঠামোর ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করে।[৪২] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য পূর্ব পাকিস্তান ছাড়াও উত্তরবঙ্গে অভিবাসনের জন্য নেপাল, ভুটান এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের জাতি দাঙ্গাও অনেকটা দায়ী ছিল। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে উত্তরবঙ্গে উদ্বাস্তুর অনুপ্রবেশ, ১৯৬০-৬১ খ্রিস্টাব্দে আসামের 'বাঙ্গাল খেদা' আন্দোলনের ফলে বাঙালি অনুপ্রবেশ, মেঘালয়, ভুটান থেকে নেপালিদেরও অনুপ্রবেশ ঘটে।

বিমান দাশগুপ্ত তাঁর 'A Note on the Rajbanshi of Eastern India with Special Reference to Social Movement' শীর্ষক প্রবন্ধে দাবি করেছেন উত্তরবঙ্গ হল রাজবংশীদের স্বভূমি (Home Land) এবং তারা এতদঞ্চলের জমির উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তিনি একথাও স্বীকার করেছেন যে তপশিলী জাতির মোট ৫০ শতাংশ জনগণ রাজবংশী জাতিভুক্ত। এই বৃহত্তর জনগোষ্ঠী শিক্ষা, অর্থনীতি, সামাজিক; পেশাগত ক্ষেত্র এমনকী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী থেকে বহুগুণে পশ্চাৎপদ। এই পশ্চাৎপদ অবস্থা ও চেতনাবোধের অভাব রাজবংশী জাতিকে অনেকটাই পশ্চাতে রেখেছে। তাছাড়া রাজবংশী জনগণ গতানুগতিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে তারা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে অসমর্থ হয়ে পড়ে ও বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়। এ প্রসঙ্গে বলা বাহুল্য এই রাজবংশী সমাজ প্রথমদিকে কোন সামাজিক সমস্যার মুখোমুখি হয়নি। বিশাল জমির মালিকানায় নিরুদ্বিগ্ন জীবন কাটাত। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে রাজবংশী সহ বহু অরাজবংশী উদ্বাস্তুর অনুপ্রবেশ ও স্থায়ীভাবে বসবাসের ফলে যেমন জমির উপর চাপ সৃষ্টি হয় তেমনি জনবিন্যাসের পরিবর্তন ঘটে এবং তাদের গতানুগতিক আর্থ-সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনে রাজবংশী সমাজ নিজেদের সামলে নিতে সামর্থ হয়নি। ফলে তারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনেকটাই পশ্চাৎপদ থেকে যায়; অবজ্ঞা ও অবহেলার পাত্রে পরিণত হয়। এ অবস্থায় রাজবংশীরা আত্মপরিচয়ের সংকটেও ভুগতে শুরু করে।[৪৩]

জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ, ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের জমিদার-জোতদার প্রথার অবসান এবং ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের ভূমি সংস্কার আইন ভূমি নির্ভর এই রাজবংশী সমাজকে দিশেহারা করে দেয়। জমি অধিগ্রহণ আইনে বলা হয় ৭২ বিঘার বেশি জমি কারো নামে থাকবে না ফলে উত্তরবাংলার এক বিশাল সংখ্যক জোতদার তাদের জমি হারায়। জমিহীন কৃষকদের খাস জমি বিতরণ করা হয়।

রাজবংশী জোতদাররা এর ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হলেও রাজবংশী সমাজের ভূমিহীন কৃষকরা তেমন লাভবান হয়নি।[৪৪] ভূমি সংলগ্ন আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে যুক্ত ফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের আমলে ১৯৬৭-৭০ খ্রিস্টাব্দে এক মিলিয়ন একর জমি বিতরণ করা হয় যার ফলে পশ্চিমবঙ্গে জমিদার শ্রেণির মেরুদণ্ড ভেঙে যায়।[৪৫] উত্তরবঙ্গের জোতদার শ্রেণিও এর মধ্যে পড়ে। রাজবংশী সমাজের তথা উত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রথম ধাক্কা জমিদারি ব্যবস্থার বিলোপ আইন ১৯৫৩ সালে প্রবর্তিত হওয়ার পর। যদিও জমিদারি প্রথা বিলোপের সাথে সাথে উত্তরবঙ্গের কৃষিক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটে। কিন্তু এই আইনে রাজবংশী সমাজের তথাকথিত জোতদাররা বিপুল পরিমাণ জমি হারায়। ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের ভূমি সংস্কার আন্দোলনের প্রথম পর্যায় শুরু হয়। ’৬৭র ভূমি সংস্কার আন্দোলন Landed Gentry সমাজের আর্থ-সামাজিক প্রভুত্বের মেরুদণ্ড ভেঙে ফেলে।[৪৬] ’৬৭র পর ১৯৭৭ সালে ‘অপারেশন বর্গা’ আইনে উত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক তথা পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক চিত্র আবার পাল্টে যায়। ভাগচাষিদের ‘নথিভুক্তিকরণ’ ও ‘ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্বৃত্ত জমির খাসকরণ’ জোতদার, জমিদার শ্রেণির আর্থ সামাজিক অবস্থাকে দুর্বল করে দেয়; অপারেশন বর্গার পর তা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়।[৪৭] সামগ্রিকভাবে কৃষিনির্ভর রাজবংশী সমাজের মানুষজন অসহায় হয়ে পড়ে। কারণ রাজবংশী ভাগচাষিরা সম্পূর্ণভাবে জোতদারদের উপরই নির্ভরশীল ছিল এবং তারা বর্ণহিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠে নি। রাজবংশী ভাগচাষিদের একটি অন্যতম প্রবণতা ছিল তারা রাজবংশী জোতদারদের অধীনেই জমি চাষ করবেন; ফলে জোতদার যখন জমি হারালেন তখন রাজবংশী ভাগচাষিরা সংকটাপন্ন হলেন। আধুনিক প্রযুক্তিতে চাষবাসেও তারা অভ্যস্ত কিংবা আগ্রহী ছিলেন না। ফলত তারা পাট্টা বন্টনে পাওয়া জমিও ধরে রাখতে পারলেন না। জমি হস্তান্তরিত হল দ্রুত।

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই তেভাগা থেকে অপারেশন বর্গার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে উত্তরবঙ্গের ভূমিহীন কৃষকরা প্রান্তিক কৃষক হয়েছেন, প্রান্তিক কৃষকরা সম্পন্ন কৃষক হয়েছেন। অন্যদিকে রাজবংশী জোতদারদের অবস্থা করুণ হয়েছে, রাজবংশী সমাজ জীবনের সম্পর্ক খারাপ হয়েছে। আগে বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের জোতদার ও আধিয়ারের সম্পর্ক অনেকাংশে মধুর ছিল। রাজবংশী সমাজে জোতদার দেউনীয়া হিসাবে পরিচিত ছিল। দেউনীয়া বা গারস্ত

আধিয়ারের ছেলের বা মেয়ের বিয়ে, অন্নপ্রাশন, পূজা পার্বণ এমনকী চাষবাসের সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতেন। বিয়ের সময় মঙ্গলঘটের জল ছিটিয়ে দেউনীয়া কিংবা গিগ্ধানী পানিছিটা বাবা-মাও হতেন। বস্তুত: জোতদার ও আধিয়ার সমাজ আত্মীয়তার বন্ধনে পরস্পরের নিকটতম ছিলেন। তেভাগা আন্দোলন কিংবা বর্গা অপারেশনে রাজবংশী ভাগচাষি আধিয়ার সমাজের উপকারের চেয়ে ক্ষতিই হয়েছে বেশি। কারণ আধিয়ার ছিল সম্পূর্ণভাবে জোতদারের উপর নির্ভরশীল। সেই সম্পর্কের অবনতি ঘটে এই আন্দোলনের ফলে। স্বাভাবিকভাবে রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যার প্রভাব পড়ে।

আবার আধুনিক প্রযুক্তিগত উন্নতিকে সহজে গ্রহণ করেনি। ফলত: রাজবংশী কৃষকসমাজ দ্রুত পিছিয়ে পড়ে এবং বর্ণহিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠে না। সুদীর্ঘকালের লালিত কৃষি সমাজ ভেঙে পড়ে, আর্থ সামাজিক কাঠামো দুর্বল হয় এবং তার প্রভাব সরাসরি পরে পরিবার, সমাজ থেকে সংস্কৃতির পরিসরে। স্বাভাবিকভাবে রাজবংশী সমাজ-সংস্কৃতি শূন্য দশকের আগে আবার নতুনভাবে গড়ে উঠতে থাকে। ইতিমধ্যে রাজবংশী সমাজের চিরায়ত ভাবনারও পরিবর্তন শুরু হয়। রাজবংশী মানুষেরা ধীরে ধীরে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনগ্রসর শ্রেণিতে পরিণত হয় এবং তাদের মধ্যে অনেকে বাসস্থান ছেড়ে পার্শ্ববর্তী রাজ্যে বা শহরে জীবিকার তাগিদে অসংগঠিত শ্রমিক রিক্সাচালক এমনকি domestic servant হিসাবে কাজ করতে বাধ্য হয়। সমীক্ষায় দেখা গেছে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিংয়ের একদা জোতদারের বংশধররা এখন কেউ দিনমজুর, কেউবা শহরে গ্রামে রিক্সা, ভ্যান চালিয়ে দিন গুজরান করছে আর তাদের বাড়ির মহিলারা শহরে বাবুদের বাড়িতে ঝিয়ের চাকরানীর কাজ করছেন। এইভাবে রাজবংশীরা তাদের পিতৃভূমির অধিকার থেকে বিচ্যুত হয়ে কৃষিজীবী থেকে দিনমজুরে পরিণত হয়েছে।[৪৮] আবার এই সময় আর্থিক দিক থেকে অগ্রসর রাজবংশী শ্রেণির মধ্যে নগরাভিমুখী প্রবণতা, ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠানো, কৃষির সাথে অন্যান্য পেশা গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ফলে কিছু কিছু রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আচার আচরণে গতি (Dynamics) লক্ষ করা যায়। বর্ণহিন্দুদের প্রভাবে রাজবংশী Landed Gentry শ্রেণির পোশাক, জীবনশৈলী, বিবাহ রীতি, ধর্মীয় আচরণে কিছুটা পরিবর্তন দেখা যায়।[৪৯] ধর্মীয় ক্ষেত্রে মূর্তি পূজায়ও চিরাচরিত রাজবংশী পুরোহিত

অধিকারীর পরিবর্তে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের আহ্বান রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির সামাজিক রীতি পরিবর্তনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক বলা যায়।[৫০] রাজবংশী জাতির এই Elite শ্রেণির মধ্যে জাত্যাভিমানের চরিত্র ফুটে উঠে। তারা অনগ্রসর রাজবংশী মানুষজন থেকে নিজেদের কিছুটা দূরে সরে রাখার প্রবণতা দেখায় তাদের সামাজিক আচার আচরণের মধ্যে। এইভাবে গোত্রহীন রাজবংশী সমাজে উচ্চ-নীচ বিভেদের সৃষ্টি হয়।[৫১] সেইসঙ্গে রাজবংশী সমাজে মৌলিক পরিবারের (Nuclear Family) সংখ্যা বাড়তে থাকে। যৌথ পরিবারগুলির দ্রুত ভাঙন শুরু হয়। ফলত নৃ-গোষ্ঠীগতভাবে যৌথ পরিবার ব্যবস্থার সঙ্গে কৃষিজীবী সমাজব্যবস্থার যে নিবিড় সম্পর্ক প্রচলিত ছিল সেক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটতে থাকে। আবার বৈবাহিক সম্পর্ক (Conjugal relationship) ও আত্মীয়তার সম্পর্কেও (Consanguineal relationship) মৌলিক পরিবারের ভাবনা চিরায়ত যৌথ পরিবার ভাবনায় ভিন্ন প্রভাব ফেলে। স্বাভাবিকভাবে সূক্ষ্ম বিভাজন ধীরে ধীরে কার্যকরী হয়ে ওঠে। যা পরিবর্তনের সপক্ষেই কাজ করে।

এই পরিবর্তনের প্রবণতা নয়ের দশকের গোড়া থেকে আরও বৃদ্ধি পায়। আত্মসচেতনতাও বৃদ্ধি পায় কিন্তু ততদিনে অনেক দেরি হয়ে যায়। রাজবংশী মানুষজন শহরমুখী হয়, অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজের সন্ধানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পুরুষ মহিলা কার্যক্ষেত্রে একযোগে জীবন-জীবিকার স্বার্থে যে কোন ধরনের কাজে যুক্ত হয়। যুব সম্প্রদায়ের একটা অংশ ভিন রাজ্যে কাজের সন্ধানে পাড়ি দেয়। স্বাভাবিকভাবে চিরায়ত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বড়সড় পরিবর্তন দেখা যায়। গ্রামীণ জীবনের সংস্কৃতিচর্চার পরিসরটি সঙ্কুচিত হয়। অনেক লৌকিক আচার-সংস্কারও লোকান্তরিত হতে থাকে। গ্রামীণ মানুষের ঐকান্তিক চেষ্টা এবং ধর্মীয় বৃত্তের। আর যারা বাইরে গিয়ে ভাগ্যানুসন্ধানে ব্যস্ত তারাও নিজস্ব সংস্কৃতির পরিসর থেকে বিচ্যুত হয়ে ভিন্ন সংস্কৃতির বৃত্তে আবর্তিত হয়। ফলত: সমাজ ও সংস্কৃতির সংকট রাজবংশী সমাজকে আক্রান্ত করে। সবশেষে উল্লেখ্য এবম্বিধ সমস্যার মাঝেও শূন্য দশকে নিজস্ব সংস্কৃতি ভাষার ক্ষেত্রে কিছু রাজবংশী মানুষ সচেতন হয় এবং পরবর্তী সময়ে ধীরে এবং দেরিতে হলেও নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতির পক্ষে সংঘবদ্ধ হয় এবং প্রয়াস চালিয়ে যায় সমাজ সংগঠন ও ঐতিহ্য রক্ষার তাগিদে।

তথ্যসূত্র :

১. Hamilton, Dr. Bukanan; Account of the District or Zilla of Rangpur, 1810, India Office Library, Appendix - III of the District Cencus Hand Book Jalpaiguri and Cooch Behar, WB, 1915 The Koch and Rajbanshis both being part of the larger Bodo Slock belong to the same caste.

২. Hunter, W W; A Statistical Account of Bengal Vol V (London : Turbner & Co 1872) Page - 43

৩. রায়, নির্মল চন্দ্র; স্বাধীনতা উত্তরপর্বে রাজনৈতিক চালচিত্র : প্রসঙ্গ রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতি, ১৯৪৭ - পরবর্তী উত্তরবঙ্গ - আনন্দগোপাল ঘোষ; নির্মল চন্দ্র রায় (সম্পাদিত), সংবেদন, বি এস রোড, মালদা পৃষ্ঠা - ১৫৯

৪. বর্মন, উপেন্দ্র নাথ; 'ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবন চরিত', জলপাইগুড়ি, প্রথম প্রকাশ, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ, চতুর্থ সংস্করণ, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা - ১৬

৫. সরকার, ইছামুদ্দিন; (সংকলিত) ঐতিহ্যে ও ইতিহাসে উত্তরবঙ্গ রাজবংশী সমাজের আত্মপরিচয়, বর্মা, সুখবিলাস; এন. এল. পাবলিকেশন, ডিব্রুগড়, অসম, ২০০২, পৃষ্ঠা - ১৭৩

৬. নাগ, হিতেন; কামতাপুর থেকে কোচবিহার, মিত্র এন্ড ঘোষ পাবলিশার্স, ১ম খণ্ড, ২০১০, কল, পৃষ্ঠা - ৭২-৭৩

৭. বিশ্বাস, অশোক; বাংলাদেশের রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতি, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ২০০৫, পৃষ্ঠা - ৩৬

৮. বর্মা, সুখবিলাস; প্রবন্ধ : রাজবংশী সমাজের আত্মপরিচয়, পৃষ্ঠা - ১৭৩

৯. জি বি পলিটিকান (পলিটিক্যাল) ফাইল নং 8A-8B, ডিসেম্বর ১৯৩১, প্রসেডিংস নং ৩৯৪-৪০৬ অধিকারী, মাধব চন্দ্র; রাজবংশী সমাজ ও মনীষী পঞ্চানন বর্মা, ১ম খণ্ড, রিডার্স সার্ভিস, কলকাতা - ৭৫, ২০১৪, পৃষ্ঠা - ৯৪

১০. অধিকারী, মাধব চন্দ্র; রাজবংশী সমাজ ও মনীষী পঞ্চানন বর্মা, ১ম খণ্ড, রিডার্স সার্ভিস, কল - ৭৫, ২০১৪, পৃষ্ঠা - ৮

১১. ঘোষ, আনন্দগোপাল ও দাস, নীলাংশু শেখর; 'উত্তরবঙ্গের ইতিহাস ও সমাজ', দীপালি পাবলিশার্স, শিলিগুড়ি, ২০০৯, পৃষ্ঠা - ১৩৫

১২. জি বি ফাইল নং 1R - 2 অব ১৯৩৩, এপ্রিল ১৯৩৪ প্রসেডিংস নং ৯-৩১ সিরিয়াল নং - ৫০

১৩. অধিকারী, মাধব চন্দ্র; রাজবংশী সমাজ ও মনীষী পঞ্চানন বর্মা, ১ম খণ্ড, রিডার্স সার্ভিস, কল - ৭৫, ২০১৪, পৃষ্ঠা -

১৪. Risley, H. H.; The Tribes and Castes of Bengal Vol -I, rpt. Calcutta 1981. Page - 494

১৫. Gruning, J F; 'Eastern Bengal and Assam District Gazetteers' Jalpaiguri, Allahabad 1911, Page 32-33

Strong, F. W.; 'Bengal District Gazetteers' Dinajpur Allahabad 1912 Page 34-43

Risley, H. H.; The Tribes and Castes of Bengal Vol I rpt Calcutta 1981 Pp 497-7

১৬. Sanyal, Charuchandra; The Rajbanshis of North Bengal, The Assiatic Society Calcutta 1965 Page - 91

Hunter, W W; 'A Statistical Accounts of Bengal' Vol - X 1876 rpt 1984 Page - 34

১৭. Basu, Swaraj; 'Dynamics of Caste Movement : The Rajbanshis of North Bengal (1910-1947) New Delhi 2005 Page - 41

১৮. হুসাইন, আমজাদ; (সম্পাদিত) কামরূপ থেকে কোচবিহার (প্রবন্ধ), রায়, ড. জীতেশ চন্দ্র; উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট, সুহৃদ পাবলিকেশন কল - ৭৩ পৃষ্ঠা - ১৪৩

১৯. GOB, District Gazetteer, Rangpur 1977.

২০. দেব, রণজিৎ; উত্তরবঙ্গের জনজীবন ও সংস্কৃতি রতন বিশ্বাস (সম্পাদিত) উত্তরবঙ্গের জাতি ও উপজাতি, কল - পুনশ্চ, ২০০১, পৃষ্ঠা - ৭১

বিশ্বাস, অশোক; বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৫, পৃষ্ঠা - ৬০

২১. বিশ্বাস, অশোক; ঐ, পৃষ্ঠা - ৬০

২২. রায়, গিরিজাশংকর; উত্তরবঙ্গের রাজবংশী পূজা-পার্বণ, এন. এল. পাবলিকেশন, ডিব্রুগড়, পৃষ্ঠা - ৮-১০

২৩. বিশ্বাস, অশোক; ঐ, পৃষ্ঠা - ৬১

২৪. অধিকারী, মাধব চন্দ্র; রাজবংশী সমাজ ও মনীষী পঞ্চানন বর্মা, ১ম খণ্ড, রিডার্স সার্ভিস, ২০১৪ কল - ৭৫, পৃষ্ঠা - ২৯

২৫. ঐ, পৃষ্ঠা - ২৯

২৬. রায়, জীতেশ চন্দ্র; উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট (প্রবন্ধ), আমজাদ হুসাইন (সম্পা), কামরূপ থেকে কোচবিহার, সুহৃদ পাবলিকেশন, কল - ৭৩, পৃষ্ঠা - ১৪৫

২৭. ঐ, পৃষ্ঠা - ১৪৫

২৮. রায়, গৌরাঙ্গ চন্দ্র; কোচবিহারের রাজবংশী সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক রূপান্তরের রূপরেখা (প্রবন্ধ) পৃষ্ঠা - ১৫৫

২৯. রায়, জীতেশ চন্দ্র; উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট (প্রবন্ধ), আমজাদ হুসাইন (সম্পা), কামরূপ থেকে কোচবিহার, সুহৃদ পাবলিকেশন, কল - ৭৩, ২০১৪, পৃষ্ঠা - ১৪৫

৩০. বিশ্বাস, অশোক; বাংলাদেশের রাজবংশী : সমাজ ও সংস্কৃতি, বাংলা একাডেমী ঢাকা, পৃষ্ঠা - ৬১

৩১. রায়, গিরিজাশংকর; উত্তরবঙ্গের রাজবংশী পূজা-পার্বণ, এন. এল. পাবলিকেশন, ডিব্রুগড়, পৃষ্ঠা - XVII

(১৯৬১ সালের আদমসুমারী অনুসারে একমাত্র পুরুলিয়া জেলা ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গের অন্য সব জেলাতেই রাজবংশীদের অবস্থানের কথা জানা যায়। পরিসংখ্যানটি নিম্নরূপ :-

কোচবিহার	—	৪১৮৮৯৩
জলপাইগুড়ি	—	৩১৬০২০
দার্জিলিং	—	৩১৪৭২
পশ্চিম দিনাজপুর	—	৯৩৩৭১
মালদহ	—	৩৮৪৪৩
বর্ধমান	—	১১১৯৭
বীরভূম	—	৫৫৭৫
বাঁকুড়া	—	৩৯৮
কলিকাতা	—	২৭২৯
হাওড়া	—	৩৬২৪৬
হুগলী	—	২০১৬৫
মেদিনীপুর	—	৬৪৬১২
মুর্শিদাবাদ	—	২৯৭৪২
নদীয়া	—	১২৭৩৯
২৪ পরগণা	—	১২০১২৪
		১২০১৭০৬

পরিসংখ্যানটিতে ধৃত পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলার রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজকে উদ্ভবের ক্ষেত্রে একই শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে না। অন্যান্য জেলার রাজবংশীরা কৃষিজীবী হইলেও মূলত: মৎস্যজীবী, কিন্তু উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের একমাত্র জীবিকা কৃষিকর্ম। উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের দেহ গঠন, ভাষা-সভ্যতা-সংস্কৃতির সহিত তাহার সামান্য সাদৃশ্য নাই বলিয়াই মনে হয়।)

৩২. অধিকারী, মাধব চন্দ্র; রাজবংশী সমাজ ও মনীষী পঞ্চানন বর্মা, রিডার্স সার্ভিস, পৃষ্ঠা - ৩৩

৩৩. মুখোপাধ্যায়, শিবশংকর; জলপাইগুড়ি জেলার সামাজিক কাঠামো, মধুপর্ণী, জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা - ১৫২, কোচবিহার জেলার সামাজিক কাঠামো, মধুপর্ণী, কোচবিহার জেলা সংখ্যা, ১৯৯০, পৃষ্ঠা - ১১০

৩৪. অধিকারী, মাধব চন্দ্র; রাজবংশী সমাজ ও মনীষী পঞ্চানন বর্মা, ১ম খণ্ড, রিডার্স সার্ভিস, কল - ৭৫, ২০১৪, পৃষ্ঠা - ৬৬

৩৫. Roy, R; Change in Bengal Society, 1760-1850, Delhi 19, P - 203
৩৬. Taniguchi Shinkichi, Structure of Agrian Society in Northeren Bengal, 1765-1800. (অপ্রকাশিত গবেষণা সন্দর্ভ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা ২০৫-২০৬)
৩৭. Sarkar, Sekhar; Land Settlement and Revenue Administration and Taxation under the Maharajas of CoochBehar, Unpublished Ph. D. Thesis, NBU, 1990 pp VIII 32
৩৮. অধিকারী, মাধব চন্দ্র; রাজবংশী সমাজ ও মনীষী পঞ্চানন বর্মা, ১ম খণ্ড, রিডার্স সার্ভিস, কল - ৭৫, ২০১৪, পৃষ্ঠা - ৪০
৩৯. Dasgupta, Ranjit; Economy Society and Politics in Bengal, Jalpaiguri 1809-1947 Calcutta Page - 31-32
৪০. অধিকারী, মাধব চন্দ্র; রাজবংশী সমাজ ও মনীষী পঞ্চানন বর্মা, ১ম খণ্ড, রিডার্স সার্ভিস, কল - ৭৫, ২০১৪, পৃষ্ঠা - ৪০
৪১. অধিকারী, মাধব চন্দ্র; রাজবংশী সমাজ ও মনীষী পঞ্চানন বর্মা, ১ম খণ্ড, রিডার্স সার্ভিস, কল - ৭৫, ২০১৪, পৃষ্ঠা - ৬৪-৬৫
৪২. ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় সম্মেলন, উতজাআস, দিনহাটা, ১৯৯১, পৃ: - ১০, ইতিহাস অনুসন্ধান ১৯, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০০৫, পৃ: ৩৩৯-৪০
৪৩. অধিকারী, ড. মাধব চন্দ্র; ঐ, পৃষ্ঠা - ৬৩
৪৪. ঐ, পৃষ্ঠা - ৪১
৪৫. Banerjee, D.; Land Reform in West Bengal, Remembering Harekrishna Kongar and Benoy Chowdhury, E P W, Vol XXXVI no 21 and 22 P - 1797
৪৬. D. Banerjee; Land Reform in West Bengal, E P W, Vol 36 and 37 Page - 179
৪৭. Ibid Page 179
৪৮. Ray Chowdhury, T. K.; 'Land Control : class structure and class Relations in Western Duars, June, 1987 Page - 27
৪৯. মুখোপাধ্যায়, শিবশংকর; জলপাইগুড়ি জেলার সামাজিক কাঠামো, মধুপর্ণী, জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা ১৯৮৭, পৃষ্ঠা - ১৫৩-১৫৪, ঐ, কোচবিহার জেলার সামাজিক কাঠামো, মধুপর্ণী, কোচবিহার জেলা সংখ্যা, ১৯৯০ পৃষ্ঠা - ১১০
৫০. অধিকারী, মাধব চন্দ্র; রাজবংশী সমাজ ও মনীষী পঞ্চানন বর্মা, ১ম খণ্ড, রিডার্স সার্ভিস, কল - ৭৫, ২০১৪, পৃষ্ঠা - ৫২
৫১. এম, কাব্যভূষণ; রাজবংশী ক্ষত্রিয় দীপক, দিনাজপুর, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৪৮-৪৯

পঞ্চম অধ্যায়

সাহিত্যে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি

ষোড়শ শতকে পশ্চিম কামরূপে কোচ শক্তির অভ্যুত্থানের আগে থেকেই সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত। সমগ্র কামরূপ সহ প্রান্ত উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অংশ কোচ শাসনাধীন হয় — যদিও সে শাসন দীর্ঘদিন বলবৎ ছিল না। রাজন্য শাসিত কোচবিহারে সাহিত্য সৃষ্টির ধারাবাহিকতা সুদীর্ঘকাল অব্যাহত ছিল। ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিও ছিল বিস্তীর্ণ কামরূপের সঙ্গে অন্বিত। গৌড়ের পাল ও সেন রাজাদের মত কামরূপের রাজারাও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। রাজসভাতে কবিরত্নের পোষণ ছিল আভিজাত্যের পরিচয়। 'তাম্রশাসন' গুলো তারই প্রমাণ যা থেকে কবিদের বাক্-চাতুর্য, সৃজন ক্ষমতা, অলংকার প্রয়োগ ও নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। পাশাপাশি রাজন্যবর্গের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য প্রীতির বিষয়টি স্পষ্ট হয়। কামরূপের ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত জনপদগুলোতে সংস্কৃত শাস্ত্র, পুরাণ, মহাকাব্য প্রভৃতির চর্চা হত। উত্তরকালে আঞ্চলিক ভাষায় সাহিত্য চর্চার বিষয়টি প্রাধান্য পায়। সেক্ষেত্রে অনেকে সাহিত্যচর্চায় ব্রতী হন। কোচ-রাজবংশও তার ব্যতিক্রম নয় বরং বলা যায় ধারাবাহিকতায় উত্তরসূরী হিসাবে সভাকবি সহ সৃজনশীলতার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। 'উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার', 'কোচবিহার সাহিত্যসভা গ্রন্থাগার'-এ সংরক্ষিত পুঁথির সংখ্যায় তা অনুমিত হয়। ধারাবাহিকভাবে চারশ' বছর ধরে কোচ-মহারাজারা পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। মূলত: পুরাণ শাস্ত্রাদির অনুবাদ কর্মে সভাকবিরা নিমগ্ন থাকলেও ভিন্ন ধারার মৌলিক কিছু সাহিত্য সৃজন কর্মও সম্পন্ন হয়। যে সব সৃজনে আঞ্চলিক ভাষার উপস্থিতিও লক্ষণীয় এবং এতদঞ্চলের সাহিত্য-ভাষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কোচ-রাজবংশের সারস্বত সাধনার সম্ভার পরিমাণগত প্রাচুর্যে যা বিপুল হলেও দুঃখের বিষয় সৃষ্টির তুলনায় সংগৃহীত এবং সংরক্ষিত পুঁথিপত্র বা মুদ্রিত গ্রন্থের সংখ্যা সন্তোষজনক নয়। রাজন্যবর্গের সাহিত্য সাধনার আগ্রহ যতটা ছিল, গ্রন্থাদির উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ, তালিকা প্রণয়ন বা উত্তরকালে মুদ্রণের এবং প্রচারের অভাব ছিল। ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতা, দক্ষ ব্যক্তির অভাবও একটি কারণ। অনেক

রচনাই হারিয়ে গেছে কিংবা ব্যক্তিগত সংগ্রহে অন্তরালে থেকে গেছে। কিছু বিভিন্ন গ্রন্থাগারে বিক্ষিপ্তভাবে সংরক্ষিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রাজন্যশাসিত কোচবিহারে মূলত অনুবাদ সাহিত্য কর্মই রাজপৃষ্ঠপোষকতায় সম্পন্ন হলেও মৌলিক রচনার ক্ষেত্রটিও নিভৃতে রচিত হয়। অনেকেই ব্যক্তিগত পরিসরে নিরলস সাহিত্য সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। তারই ফলশ্রুতি অজস্র পুঁথি পরবর্তীকালে উদ্ধার হয়। যদিও ধরে নেওয়া যায় যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে কিংবা ভৌগোলিক কারণে অনেক পুঁথি কালের স্রোতে হারিয়ে গেছে। পরবর্তীকালে সংগৃহীত পুঁথিগুলির যথাযথ মূল্যায়ন কিংবা সাহিত্য গুণের মূল্যায়ন, বিচার বিশ্লেষণ হয়নি। মূল ধারার সাহিত্য কৃতিতেও যথাযথ গুরুত্ব বা স্থান পায়নি। কোথাও কোথাও শুধু উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র। তবে বলা যায় মধ্যযুগের কামতা-কোচ রাজ্যে সাহিত্যচর্চা রাজন্যবর্গের যে গৌরবময় ভূমিকা ছিল তা অনস্বীকার্য। যা উত্তর-পূর্ব ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি ধর্মীয় ক্ষেত্রেও অপরিহার্য ছিল।

মহারাজা বিশ্বসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেই শিবমন্ত্রে দীক্ষা নেন। তৎকালীন কোচ রাজ্যে তখন ছিল আদি কৌম বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বসবাস। মহারাজা বিশ্বসিংহ ছিলেন হরিদাস মন্ডল নামক 'মেচ' দলপতির সন্তান। সিংহাসনে আরোহন করেই মহারাজা বিশ্বসিংহ নিজেকে 'রাজবংশী' হিসাবে ঘোষণা করেন। বহু জনগোষ্ঠীর সমাবেশে এই 'রাজবংশী' হিসাবে ঘোষণার মধ্যে ছিল রাষ্ট্রনৈতিক দূরদর্শিতা। কোচ, মেচ, কাছারি, গারো, টোটো, রাভা প্রভৃতি কৌম জনগোষ্ঠীর মাঝে অপেক্ষাকৃত প্রাগসর 'রাজবংশী' জনগোষ্ঠী হিসাবে ঘোষণা মহারাজা বিশ্বসিংহের সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। সেইসঙ্গে কামতা রাজ্যের 'খেন' বংশীয় নীলাম্বরের পতন সেখানে সদ্য ঘটেছে। ধর্মীয় ভাবনাও সক্রিয় ছিল মহারাজা বিশ্বসিংহের ভাবনায়। কারণ ততদিনে আর্য ভাষা ও সংস্কৃতির স্রোত এই ভূখণ্ডে সম্পূর্ণ মাত্রায় প্রবেশ করেছে। বিভিন্ন মত ধর্মের প্রভাবে ধর্মবিশ্বাস, কর্মানুষ্ঠান, ভাষা ও সংস্কৃতি বিবর্তিত হতে শুরু করেছে। আর্য ভাষা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসার কামরূপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ঘটেছে। স্বাভাবিকভাবে সঙ্গতি রেখে মহারাজা বিশ্বসিংহ সমস্ত প্রজাকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াসে নতুন পরিচয় গ্রহণ করেন। বলা যায় শৈবধর্মে দীক্ষা নিয়ে হিন্দুধর্মের ধারা সম্পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করতে দ্বিধা করেননি। মহারাজা বিশ্বসিংহের কোচ-রাজবংশ প্রতিষ্ঠার আগেই কামরূপে বাংলার এবং উত্তর ভারতের বিভিন্ন অংশ থেকে উচ্চবর্ণের এবং

অভিজাত জনের আগমন শুরু হয়েছিল। তাদের সঙ্গে আদি কৌম জনগোষ্ঠীর ভাষা সংস্কৃতির অন্বয় ঘটে ধর্মচেতনা ও ধর্মাচরণেও সংশ্লেষণ ঘটে। উদ্ভব হয় মিশ্র সংস্কৃতির। দরঙ্গ রাজবংশাবলীর বিবরণে জানা যায় যে রাজ্যলাভের আগে এবং পরে তিনি স্বয়ং একাধিকবার দুর্গাপূজা করেছিলেন। সে পূজাতে তিনি 'বলি'ও দিয়েছিলেন। রাজ্যে বেদ ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পুরোহিত থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজে কৌম সংস্কার মতে দেবীর পূজা করেন।[১]

কৌম জীবন থেকে আগত কোচ-রাজবংশের মহারাজারা প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। দেবালয় প্রতিষ্ঠা বা সংস্কার, তীর্থক্ষেত্র, ভূমিদান, শিক্ষাবিস্তার, সুকুমার শিল্পকলার চর্চা প্রায় উদ্ভব কাল থেকেই শুরু হয় এবং অব্যাহত থাকে। মহারাজা নরনারায়ণ দশভূজার পূজা প্রবর্তন, সুপ্রসিদ্ধ কামাখ্যা মন্দির পুনর্নির্মাণ, বাণেশ্বর শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা, হাজোর হয়গ্রীব মাধবের প্রাচীন মন্দিরের সংস্কার সাধন এবং পূজার্চ্চনার জন্য দেবোত্তর জমি প্রদান করেন। শংকরদেবের প্রভাবে রাজ্যে বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারে উদ্যোগী হন। বিষ্ণুরূপী 'শ্রীশ্রী মদনমোহন' প্রতিষ্ঠা হয়। আবার তিনি নিজস্ব কৌম রীতিনীতিও অনুসরণ করেন। বস্তুত সেই ধারাই কোচবিহারে অক্ষুণ্ণ থাকে। যে-সব কৌমের সমন্বয়ে 'রাজবংশী' সমাজের উদ্ভব সে-সব কৌম গোষ্ঠীগুলির অস্তিত্ব কখনই পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়নি। বরং বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির পাশাপাশি বসবাসের ফলে এবং অভিবাসিত উচ্চবর্ণের প্রভাবে রাজবংশীদের ধর্ম-কর্ম-ধ্যান-ধারণা এক ভিন্ন রূপ পরিগ্রহণ করে যা পুরোপুরি 'আদিম'ও নয়, আবার 'স্মৃতি শাসিত'ও নয়। এই 'রাজবংশী' সমাজ বস্তুত বহুলাংশে রক্ষণশীল হলেও পরিবর্তন প্রবণতা থেকে মুক্ত নয়। সাম্প্রতিককালে এই প্রবণতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। সেটা ধর্মাচরণে শুধু নয় সংস্কৃতি, সমাজ জীবনের ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

কোচ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা বিশ্বসিংহ এবং তার পুত্র মহারাজা নরনারায়ণ এক বিশেষ ধর্মীয় ভাবনায় রাজবংশী সমাজের সমন্বয় সাধন করেন। কোচ-মহারাজারা কামতা রাজ্য ও পার্শ্ববর্তী কামরূপ এলাকার ধর্মীয় চেতনা ও প্রভাবকে গুরুত্ব দিয়েছেন। আবার কৌম জনগোষ্ঠীর আদিম কৌম রীতিনীতিকেও অস্বীকার করেননি। বরং রাজ্যের বিস্তৃত এলাকার কৌম জনগোষ্ঠীগুলিকে এক সমন্বয় ভাবনায় সমন্বিত করার প্রয়াসেই 'রাজবংশী' জাতি নাম পরিগ্রহণ করেন। যা রাজ্যের পক্ষে সহায়ক হয়ে উঠে। ধর্মীয় ভাবনাতেও তাই এক সমন্বয়ের

ভাবনাই সক্রিয় থেকেছে। আর্য, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেও আদি কৌম রীতিনীতিকেও অনুসরণ করা হয়েছে ঐতিহ্য পরম্পরায়। যা আজও কোচবিহারে অনুসৃত হতে দেখা যায়, বিশেষ করে রাজবংশী সমাজ ও ধর্মীয় জীবনে। কোচ রাজন্যবর্গের ধর্মাচরণ তাই নিছক প্রথানুসৃতি ছিল না। এর মধ্যে মনন ভাবনা বিধৃত হয়ে আছে। বর্ণহিন্দুর সমস্ত আচার নিয়মকে তাঁরা অন্ধভাবে কিংবা নির্বিচারে গ্রহণ করেননি। পুরোহিত তন্ত্রের প্রতি আনুগত্য ছিল। তা বলে প্রজানুপুঞ্জের ধর্ম, সংস্কারকে সমূলে এবং সবলে উৎখাত করার জন্য কখনই কোন মহারাজা অতিমাত্রায় উৎসাহী হয়ে ওঠেননি। বরং বরাবর সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। শংকরদেবের আগমন এভাবেই ঘটে। আবার প্রজানুপুঞ্জের ধর্মাচরণের প্রতি তারা সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন — এমন কথাও বলা যাবে না। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে - সহিষ্ণুতা এবং উদারতা।[২] বিভিন্ন ধর্মমতের সমন্বয়। যা কোচবিহার রাজ্যের প্রাচীন ঐতিহ্য। সেটা মদনমোহন মন্দিরে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব ধর্মের বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানের (ভেড়াঘর পোড়ানো, দোলসওয়ারী, বিষহরি, মাড়েয়া গান, রাস, মদনকামের অনুষ্ঠান, জন্মাষ্টমী পালন, দধি কাদো খেলা) রীতি সংস্কারে প্রতীয়মান। স্বাভাবিকভাবে এই ধর্মীয় সংস্কৃতি ভাবনা রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতিতে সরাসরি পড়ে। যার প্রতিফলন আমরা আজও দেখতে পাই। রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতি ধীরে হলেও ধাপে ধাপে আজকের সময়ে এসে পৌঁছেছে নিজস্ব কৌম পরিচয় অক্ষুণ্ণ রেখেই।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে 'দরঙ্গ রাজবংশাবলী'তে উল্লেখিত অহোম রাজ্যের বিরুদ্ধে মহারাজা নরনারায়ণের যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দ্বারা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করানো হয় কিন্তু যাত্রা শুরু হওয়ার পর —[৩]

"প্রথম নিশাত দেখা দিলা সদাশিব।
বোলে আপোনার নীতি এবিলিহি কিয়।।
কছারীর মতে এভা করিও নাচন।
তোর জয় হৈব কৈলো স্বরূপ বচন।।
এহি বলি মহাদেব অন্তধান ভৈলা।
চেতন লভিয়া রাজা সম্ভার ছুপাইলা।।
সোনকোষ নদীর তীরত থানা গারি।

পাতিলা নাচন যত আনিয়া কছারী।।
হংস পার পদ ভাত মহিষ শূকর।
কুকুরা ছাগল উপহার নিরন্তর।।
পাতিলা নাচন তথা মাদল বজাই।
সবারে মাজত তুলিলন্ত দেওধাই।।
পূজা পাই তুষ্ট ভৈলা যত দেবগণ।
দেওধাই বুলিলন্ত স্বরূপ বচন।।

পূজার পুরোহিত দেওধা অর্থাৎ দেউসী রাজবংশী সমাজের পুরোহিত। দেবতার সন্তুষ্টির কথা তিনিই রাজাকে জানিয়েছিলেন। এখনও জলপাইগুড়ি, কোচবিহারের রাজবংশী সমাজে এবং কোনো কোনো মন্দিরে এঁরাই পূজার্চনা করে থাকেন। বর্তমানে জল্পেশ্বর শিবমন্দিরে ব্রাহ্মণ পূজারী নিযুক্ত হলেও অতীতে এরাই পূজা করতেন। পূজার উপকরণ বা উপচারে একেবারে আদিম সমাজের হাঁস, পায়রা, কুক্কুট বা কুঁকড়া। 'ভাত' এবং 'মদ্য' দেওয়া হয়েছিল ভোগ্য রূপে। পূজার সময় দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য মাদলের তালে তালে চলেছিল কছারীদের নৃত্য। তারপর যোড়শোপাচারে দেবী চণ্ডিকার পূজাও করা হয়। পূজা শেষে মহারাজ সাত দুয়ারের ভোট কছারীদের ডেকে নির্দেশ দিলেন — [৪]

"গোঁহাই কমল আলী মধ্যে সীমা করি।
উত্তরের ফালে আছে যতেক কছারী।।
সেহি ফালে দেবালয় আছে যত যত।
কোচে-মেচে পূজিবেক মোহর-বাক্যত।।
দক্ষিণর ফালে পূজা ব্রাহ্মণে করিব।
এহি নিবন্ধনে সবে ধর্ম প্রবর্তিত।।"

'গোঁহাই কমল আলী'র উত্তরে প্রাচীন কামতা রাজ্যের কিছু অংশ অর্থাৎ ভুটানের সন্নিহিত অঞ্চল। কোচ-মেচ অধ্যুষিত এই অঞ্চলে পূজার অধিকার লাভ করে কৌম জনগোষ্ঠীর লোকেরাই এবং দক্ষিণ অংশে দেবার্চ্চনায় ব্রাহ্মণদের পূজার অধিকার দেওয়া হয়। 'আদিম' এবং 'পৌরাণিক' রীতিনীতি পূজা পদ্ধতির সঙ্গে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের পূজার্চ্চনাকে স্বীকৃতি দিয়ে সমন্বয়ের পথকে

উন্মুক্ত করেছিলেন। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রজাপুঞ্জের কিংবা কৌম জনগোষ্ঠীর ধর্মাচরণের প্রতি কোন ঔদাসীন্য দেখাননি।[৫] রাজার ধর্ম কিংবা প্রজার ধর্মের মধ্যে কোনও বিরোধ তৈরি হয়নি। এইভাবে মহারাজা বিশ্বসিংহ মহারাজা নরনারায়ণ দূরদৃষ্টি নিয়ে হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা যেমন করেন তেমনি সমাজ ও সংস্কৃতির সংস্কার করেন। মহারাজা বিশ্বসিংহের রাজবংশী পরিচয় গ্রহণের মধ্য দিয়ে এই সমন্বয়কামী যাত্রার সূচনা হয় এবং কোচ মহারাজগণ সবাই ভিন্ন ভিন্ন ধর্মবিশ্বাসকে (শংকরীয় বৈষ্ণব ভাবনা, ব্রাহ্মধর্ম) পৃষ্ঠপোষণ করলেও মূল সমন্বয়কামী ভাবনা থেকে সরে আসেননি। ফলশ্রুতিতে রাজবংশী জনগোষ্ঠী বিভিন্ন কৌম জনগোষ্ঠীর সমন্বিত হয়ে সুসংগঠিত হয়ে ওঠে এটা যেমন বলা যায় তেমনি সমাজ সংস্কৃতি ও ধর্মীয় চেতনাতেও সুসংবদ্ধ হয়ে প্রাগসর হয়।

কোচ শাসনাধীন সময়কালে দুইটি ধারায় সাহিত্য সৃজন কর্ম সম্পন্ন হয় ধরা যেতে পারে। প্রথর্ম পর্বটি ষোড়শ শতাব্দীর সূচনা কাল থেকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত আর দ্বিতীয় পর্বের সূচনা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়কালে। প্রথম পর্বের সাহিত্য সৃজন কর্ম আবার তিনটি ধারায় সম্পন্ন হয়। ক) সংস্কৃত মহাকাব্য, পুরাণ প্রভৃতি অনুবাদ খ) আঞ্চলিক ভাষায় এবং সংস্কৃতে বিভিন্ন আখ্যান কাব্য ও অন্যান্য গ্রন্থাদি রচনা গ) রাজ্যের বাইরে রচিত গ্রন্থাদির পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের ও উৎকর্ষের প্রয়াস।

দ্বিতীয় পর্বে মূলত: মৌলিক রচনাকার্যই সম্পাদিত হয়। যেমন মঙ্গলকাব্য, পুরাণ ও মহাকাব্য অবলম্বনে রচিত বিবিধ আখ্যান কাব্য, লীলা ও ভজন পদ, কৃত্রিম গদ্যে রচিত কয়েকটি নাটক, ব্রতকথা, পাঁচালী, উপকথা। শতাব্দীতে সাহিত্য সাধনা বহুমুখী হয়ে ওঠে। এ যুগে বেশ কয়েকটি মৌলিক রচনার উল্লেখ পাওয়া যায় — মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ নিজে একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত মানুষ ছিলেন। মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গীত সংগ্রহ, মহারাণী বৃন্দেশ্বরীর ‘বেহারোদন্ত’ উল্লেখযোগ্য। এই সময়ের অপর দুটি উল্লেখযোগ্য রচনা হল —

ক) গোসানীমঙ্গল - রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী (এটি বর্তমানে মুদ্রিত)

খ) কালিকাপুরাণ - শ্রী ব্রজসুন্দর (সাহিত্য সভায় সংরক্ষিত পুঁথি নং - ১৬)

বিংশ শতাব্দীতে কোচ রাজ্যের সাহিত্য সংস্কৃতির ধারাটি ভিন্নখাতে প্রবাহিত হয়। বলা যেতে পারে বাংলা সাহিত্য ধারায় মিশে যায়।

প্রথম পর্বের সাহিত্য সৃজনে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতার মধ্য দিয়ে ধর্মীয় সংস্কৃতির সম্প্রসারণ ঘটে বলা যায়। এই প্রয়াস রাজ পৃষ্ঠপোষকতায় বেগবান হয়। কিন্তু কখনও এতদঞ্চলের আদিম কৌম জনগোষ্ঠীগুলি বিরোধের জায়গা তৈরি হয়নি। ধীরে হলেও আর্যীকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে একথা অনস্বীকার্য।

উত্তর-পূর্ব ভারতে 'অহোম'দের রাজত্ব শুরু হয় ত্রয়োদশ শতকে। অহোমদের আগমনে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিন্যাসের যুগান্তর পরিবর্তন সূচিত হয়। পাশাপাশি প্রান্ত উত্তরবঙ্গ সহ কামতা-কামরূপের জনজীবনও আলোড়িত হয়। প্রভাবিত হয় আর্য ভাষাভাষী জনস্রোতে। উল্লেখ্য গুপ্ত অধিকারের সময় থেকে পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের আগমন শুরু হয়। উত্তরবঙ্গও এই ধারার বাইরে ছিল না। অহোম রাজন্যবর্গের সৌজন্যে শুধু ব্রাহ্মণ নয়, কায়স্থ সহ বিভিন্ন বৃত্তিধারী সম্প্রদায়েরও আগমন ঘটে কামতা রাজ্যে। ফলে সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কৃতির মধ্যে পরিবর্তন সূচিত হয়।[৬] সেটা হল —

১) পূর্বতন জাতিভেদ জ্ঞানমুক্ত সমভূমিতে উচ্চ-নীচতা পরিস্ফুট হতে থাকে।

২) লোকায়ত জীবনের দিক হইতে অধিকতর অর্থবহ পৌরাণিক ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটে।[৭]

তার ফলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও গ্রহণ বর্জন, আত্তীকরণ, অনুকরণ, আরোপণ, সংমিশ্রণ ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় এতদঞ্চলের কৌম জনগোষ্ঠীগুলির জীবনচর্যা সহ সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবন অন্যভাবে আবর্তিত ও প্রসারিত হতে শুরু করে। ষোড়শ শতকে কোচ শক্তির অভ্যুত্থানে সেই ধারা প্রক্রিয়া বেগবান হয়। বলা যেতে পারে মহারাজা বিশ্বসিংহ এই সুদূরপ্রসারী ভাবনাকে মাথায় রেখে 'রাজবংশী পরিচয়' গ্রহণ করে হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

কোচ-মহারাজাদের ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় 'হিন্দুধর্ম' তথা বৈদিক সংস্কৃতির প্রসারে বিশেষ সহায়ক হয়। পার্শ্ববর্তী অহম রাজন্যবর্গের সৌজন্যে বহু ব্রাহ্মণ, কায়স্থদের যেমন আগমন ঘটে তেমনি কোচ মহারাজারাও বিশেষ করে বিশ্বসিংহ ও নরনারায়ণও বহু ব্রাহ্মণকে গৌড়, কনৌজ, মিথিলা থেকে নিয়ে আসেন। ব্রহ্মোত্তর জমি প্রদান সহ বিভিন্ন মন্দিরে পূজা অর্চনার দায়িত্বও অর্পণ করেন। পাশাপাশি রাজসভাতে পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের সভাকবি হিসাবেও স্থান দেন। মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণ কবিন্দ্র পাত্রকে মন্ত্রী অবধি করেছিলেন। রাজ্যে সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল। পণ্ডিত পুরুষোত্তম সিদ্ধান্ত বাগীশ, পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশ, কবিরাম সরস্বতী, বিপ্র বিশারদ,

শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ, অনন্ত কন্দলী, সভাকবি রাম রায় প্রমুখ পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ সাহিত্য সৃজন কর্মে ব্যাপৃত ছিলেন। মহাপুরুষ, শংকরদেব তো ছিলেন অভিভাবক স্বরূপ। পণ্ডিতবর্গ রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, শাস্ত্রাদি অনুবাদ করে ব্রাহ্মণ্য ও বৈদিক সংস্কৃতির প্রসার ঘটান। সাহিত্য, সৃজনের গুরুত্বপূর্ণ এই কাজের সমান্তরালে হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটে। কোচ রাজ্যে হিন্দুধর্মের রীতিনীতি, বিশ্বাস, মননভাবনা বিস্তার লাভ করে। আদি কৌম জনজাতিদের আদিম প্রাকৃত ভাবনার সঙ্গে আর্যীয় সংস্কৃতির আত্তীকরণ, সংমিশ্রণ, গ্রহণ বর্জন প্রক্রিয়া তরান্বিত হয়। রাজ্যে ধর্মীয় চেতনায় সমন্বয় ভাবনার সম্প্রসারণ ঘটে। কোচ মহারাজারা যেমন কৌম জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করার ভাবনা রেখেছিলেন তেমনি প্রজাবৃন্দের মধ্যে পার্শ্ববর্তী রাজ্যের ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে পণ্ডিতবর্গের শাস্ত্র, পুরাণাদি অনুবাদ কর্মে অধিক পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। যে কারণে কোচবিহারের সাহিত্য সাধনার প্রথম পর্বে (ষোড়শ শতাব্দী ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত) সংস্কৃত পুরাণ শাস্ত্র ও মহাকাব্যগুলিকে আঞ্চলিক সাহিত্যের ভাষায় অনুবাদ কর্মই বেশি সম্পন্ন হয়। মৌলিক সাহিত্য ধারাটিও ছিল দেব মাহাত্ম্যকেন্দ্রিক। অবশ্য প্রাচীন ও মধ্যযুগে সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য সম্পূর্ণতই ধর্মাশ্রিত ছিল। সেখানে মৌলিক সৃজনও ছিল ধর্মরীতিকে আশ্রয় করে। কিন্তু কোচবিহারের সাহিত্য চর্চার প্রথম পর্বে ধর্মাশ্রয়ী অনুবাদ কর্মের মধ্যে মহারাজা তথা পারিষদ বর্গের সুদূরপ্রসারী ভাবনা ছিল। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি তথা হিন্দুধর্মের বিস্তার ঘটিয়ে প্রজা সকলকে ধর্মীয় মনোভাবে রাজার অনুকূলে একাত্ম করে সুদৃঢ় করে তোলা।

এই সমন্বয় ভাবনা আজও রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতিতে দৃশ্যমান। শৈব, শাক্ত, ধর্মবিশ্বাসের পাশাপাশি বৈষ্ণবীয় ভাবনার প্রতি অনুরাগ কিংবা পীর দেবতার উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য প্রদানের মধ্যে সেই সমন্বয় ভাবনারই প্রকাশ ঘটে। আবার কোচবিহারের 'বড়োদেবী' পূজায় দশমীর দিন শূকরের মাংস ও হাড়িয়া নিবেদনের মধ্যেও সমন্বয়ের সেই ভাবনাই আজও প্রবহমান। এই ভাবনাকে মাথায় রেখে মহারাজা বিশ্বসিংহের শৈবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ ও 'রাজবংশী' হিসেবে নতুন পরিচয় ঘোষণার তাৎপর্য। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সাহিত্য রচনায় পুরাণ, শাস্ত্রাদি অনুবাদ কর্মে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান তারই অনুষঙ্গ।

দ্বিতীয় পর্বে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত

কোচবিহারের সাহিত্য সাধনার ধারা ভিন্নখাতে প্রবাহিত হয়। মৌলিক সাহিত্য ধারার সূচনা হয় বলা যায়। পুরাণ ও ক্লাসিক্যাল চর্চার পরিবর্তে ইতিহাসধর্মী রচনা, আখ্যান, গীতিকাব্য রচনার সঙ্গে লীলা ও ভজন পদ, কৃত্রিম গদ্যে রচিত নাটক, ব্রতকথা, পাঁচালী, উপকথা ও মঙ্গলকাব্যের অনুকরণে আখ্যান কাব্য। এই ধারার রচনাগুলিতে তৎকালীন সময়কালের সমাজ ধারা পদ্ধতির বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে আসে। এক্ষেত্রেও মহারাজাদের সাগ্রহ লাভ করে। মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণ তো বিশেষ পণ্ডিত মানুষ ছিলেন। রাজন্য শাসিত কোচবিহারের সাহিত্য সাধনার ইতিহাসে মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ এক বিরাট এবং বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব। মহারাজা স্বয়ং শিক্ষিত, বিদ্যোৎসাহী এবং সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। সঙ্গীত-নৃত্য চারুকলা প্রভৃতিতে তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণের বিশিষ্ট রচনা 'গীতাবলী'। স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র্যে ও মৌলিক চেতনায় সমুজ্জ্বল 'গীতাবলী'র রচনা। তিনি একাধিক অনুবাদ কর্মও সম্পন্ন করেন। তাঁর লিখিত উপকথায় কাহিনিগত চমৎকারীত্ব ততটা না থাকলেও ধর্ম সম্পর্কহীন মানব রসসিক্ত আখ্যান রূপে উল্লেখের দাবি রাখে। এই পর্বে রাজ অন্তঃপুরিকার অনেকে সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হন। এ প্রসঙ্গে মহারাণী বিন্দেশ্বরী দেবীর নাম যেমন উল্লেখ করতে হয় তেমনি পরবর্তীকালে সুনীতি দেবী এবং নিরুপমা দেবীর নামও আসে। এই পর্বের সাহিত্যধারায় মৌলিক আন্তর চেতনার প্রকাশ যেমন ঘটে তেমনি প্রচলিত চলমান ভাষা, শব্দের সংযোজনও ঘটে।

• লোকসাহিত্যে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি

ভাষাবিদদের মতে ‘চর্যাপদ’-এর পর বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ প্রাচীন নিদর্শন ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যগ্রন্থ। কবি মালাধর বসু ১৪৭৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। তিনি গৌড় রাজসভার সভাকবি ছিলেন। ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক আখ্যান কাব্য। উত্তরবঙ্গের ‘জাগ গান’-এর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সাদৃশ্য লক্ষ করার মত। উত্তরের গ্রাম্য লোক কবি রতিরাম দাসের ‘জাগ গান’, ‘মদনকামের গান’ হিসাবেও সমধিক পরিচিতি। এখনও কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ, মাথাভাঙ্গা এলাকায় মদনকাম গানের আসর বসে। বাংলা লোকসাহিত্য গবেষণায় এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধার। জাগ গান আজকে লুপ্তপ্রায়। আর্থসামাজিক কাঠামোয় উত্তরবঙ্গের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় সম্পদ বাঁশকে ঘিরে জাগ গান, মদনকাম পূজার প্রসার। রাধাকৃষ্ণের প্রেম জাগ গানে নিতান্ত সাধারণ মানুষের প্রেম, জৈবিক প্রেমে অন্বিত হয়েছে। এখানে রাধা শাক তোলে। কানাই বঁড়শিতে মাছ ধরে ‘বোল্লার চাক’ দিয়ে। আবার ইংরেজ সরকারের ইজারাদার দেবীসিংহের কৃষক নির্যাতনের কাহিনিকেও তুলে ধরে। রতিরাম দাসের ‘জাগ গান’ বস্তুত কামনা বাসনা জাগরণের আদি রসাত্মক গান নয়, অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে অত্যাচারিত ও শোষিত শ্রেণির জেগে ওঠার ও জেগে থাকার গানও বটে। একে জাগরী সঙ্গীত বলা যায়। সেইসঙ্গে সমাজ সংস্কৃতিরও দলিল বটে।

জাগ গান বা মদনকামের গান রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির অংশ। বাঁশ পূজার সঙ্গে অন্বিত। চৈত্র মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে মদনকামের পূজা রাজবংশী সমাজে এখনও প্রচলিত। অতীতে জাগ গান ও মদনকামের পূজা রঙ্গপুর, ধুবরী, কোচবিহার, জলপাইগুড়ির বিস্তৃত অঞ্চলে হত। বিভিন্ন আচার সংস্কারের মধ্যে দিয়ে একাধিক দেবতার নামে (৭টি - শালশিরি মহারাজা, গারাম, সন্ন্যাসী, কালি, তিস্তাবুড়ি, বিষহরি, মাদারপীর স্থানভেদে অন্য দেবতা সংযুক্ত হয়) উৎসর্গীকৃত বাঁশের প্রতীককে দেবতা হিসাবে পূজা করে রাজবংশী সমাজের পুরোহিত। মদনকাম তথা বাঁশপূজা বিশ্বব্যাপ্ত ধারারই একটি আঞ্চলিক রূপভেদ। জাগ গান এই মদনকাম পূজা সম্পর্কিত নৈবেদ্য সূচক গান। গানের বর্ণনে বাঁশের জন্মকথা, মৃত্তিকা সৃজন, কার্পাস খেতি, কাপড় তৈরির আদি কথা সুর করে গাওয়া হয়। সঙ্গে বাজনা ঢাক, ঢোল, কড়কা, সানাই ও কাঁসি

সহযোগে বাজনা ও নাচ। বাঁশ হাতে নিয়ে ভক্ত্যারা নাচ করে। মদনকামের গানে ভয়ভক্তির চেয়ে মানবিক প্রেমের প্রকাশ বেশি করে ঘটেছে।

ভাওয়াইয়া গানের সংগ্রহ ও সংকলনে প্রথম স্থান পেয়েছে জাগ গান। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে (১৩১৫ বঙ্গাব্দ) পণ্ডিত যাদবরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন রংপুরের জাগ গান সংগ্রহ করে রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশ করেন। সংগৃহীত ও সংকলিত গানগুলির রচয়িতা ছিলেন ইটাকুমারী গ্রামের রতিরাম দাস।

জাগের গান আবার কথা-ভাষ্য অনুযায়ী দুই শ্রেণি পর্যায়ে বিভক্ত। মোটা জাগের গান খানিকটা অশালীন হিসাবে চিহ্নিত আর সরু জাগের গান লীলা জাগ, কানাই ধামালী (কৃষ্ণ ধামালী) হিসাবেও পরিচিত। কানাই ধামালী বা লীলা জাগ আবার কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত — ১) রাধার শাক তোলা ২) কৃষ্ণের ধোরে মাছ মারা ৩) কৃষ্ণের বড়শীতে মাছ ধরা এবং ৪) রাস। এই রাস পর্যায়ে তৎকালীন সময়ের সমাজ ও অর্থনীতির ছবি সহ সংস্কৃতির বিষয়ও ধরা পড়েছে। সেইসঙ্গে কৃষি সমাজের অবস্থা, অর্থনৈতিক পীড়ন, শোষণের বিষয়গুলি সংযোজিত হয়েছে। কানাই ধামালী বা জাগ গান রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির অংশ এবং রাজবংশী সমাজের সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম, সংস্কৃতির বিষয়গুলি পরিস্ফুট হয়।

ড. দীনেশ চন্দ্র সেন মন্তব্য করেছেন যে "সেই সময় হইতে আগত এক শ্রেণির গান আমরা রঙ্গপুর, কোচবিহার, দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে পাইতেছি — তাহার নাম কৃষ্ণ ধামালী। ... প্রাচীন রাজবংশী জাতি ও যোগীরা বাংলাদেশের নানা স্থানে সেই প্রাচীন গীতিকাগুলি এখনও রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। শুল্কা কৃষ্ণ ধামালীকে সুন্দর করিয়া সাধুভাষায় প্রবর্তিত করিয়া কবিতা মণ্ডিত করিয়া চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তন লিখিয়াছিলেন। যদি কৃষ্ণকীর্তন না পাইতাম তবে বুঝিতাম গীতগোবিন্দ ও কৃষ্ণ ধামালীর পরেই হঠাৎ চণ্ডীদাসের অভ্যুদয় কি করিয়া হইয়াছিল।"[৮]

জাগ গানের সঙ্গে মদনকাম তথা বাঁশ পূজার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট। ইন্দো-মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর জনজাতির কাছে বাঁশ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বাঁশ শিবের প্রতীকে পূজা পায়, যা বৃক্ষ পূজার নামান্তর। জাগ গানের আখ্যানে মৃত্তিকা সৃষ্টি, বাঁশের উদ্ভব, কার্পাস খেতি, সুতা কেটে কাপড় তৈরি রাজবংশী সমাজের প্রাচীন রীতি। দেবতার বিন্যাসেও পরিবার তন্ত্র কিংবা অন্য দেবতাকে গ্রহণ (পীর দেবতা) করার মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ভাবনাকে প্রতিপন্ন করে। আজও

আমরা রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্রিয়াক্ষেত্রে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলার নস্য শেখ মুলসিম সমাজের অংশগ্রহণ দেখি। আবার পীর দেবতার প্রতি অনুরক্ত রাজবংশীদের মধ্যে বিদ্যমান। দেবতাকে মানবরূপে পরিবারের একজন ভাবা রাজবংশী সমাজের সুপ্রাচীন প্রথা। শিব যেমন কৃষক দেবতা থেকে গ্রাম দেবতা হয়েছেন তেমনি জাগ গানের আখ্যানে রাধা লাফা শাক তোলে ঘরের মেয়ের মত, কৃষ্ণও বড়শিতে মাছ ধরতে বসে। রাধাকৃষ্ণের কথোপকথন হয়ে ওঠে মানবিক গ্রাম্য যুবক-যুবতীর প্রেম আখ্যান। যা ভাওয়াইয়া সংগীতের সুরে কথায় বহুভাবে উচ্চারিত হয়ে আসছে সুপ্রাচীন কাল থেকে। আবার ধর্মীয় ভাবনায় শৈব, শাক্ত ,তান্ত্রিকতার আভাসও পূজায় বিদ্যমান। সেখানে শব্দ ব্যঞ্জনে (অশ্লীল) তান্ত্রিকতা কিংবা উগ্রতার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। এই জাগ গান, মদনকামের পূজা রাজবংশী সমাজের উর্বরা সংস্কৃতির পরিচায়কও বটে। সমকালীন সমাজ ব্যবস্থার পাশাপাশি অর্থনৈতিক অবস্থার ছবিও প্রতিফলিত হয়েছে জাগ গানের আখ্যানে। কৃষক সমাজের উপর দেবী সিংহের অত্যাচার, শাসন শোষণের বিষয়গুলি সহ কৃষকদের দুঃখ দুর্দশার বর্ণনাও পাওয়া যায়। স্বাভাবিকভাবে ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে জাগ গানের গুরুত্ব সমাজবিজ্ঞানের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ।

জাগ গান কিংবা কৃষ্ণধামালী গানগুলি প্রাচীন কামরূপ কোচ-কামতা এলাকার আদি জনগোষ্ঠী রাজবংশী সমাজের গান। এতদঞ্চলের ভৌগোলিক প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, রাজবংশী জনগোষ্ঠীর জীবনদর্শন, আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস, আচার সংস্কার সমস্ত কিছুর প্রতিফলন ঘটেছে গানের কথায়। আঞ্চলিক ভাষা শব্দের সংযোজন ঘটেছে। নাচের ভঙ্গি, যাদুক্রিয়া, উপকরণ (মুখোশ, বাঁশ) ব্যবহারের মধ্যে আদিম উর্বরা সংস্কৃতি ও প্রাকৃত বিশ্বাসকে সূচিত করে। পাশাপাশি প্রাগসর সমাজের ভাবনা, লোকধর্ম, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, সমমাজদর্শন সবকিছুই কৃত্যাদির মধ্যে নিহিত আছে। আবার প্রতিবাদী চেতনার ভাবনাও 'রাস' পর্বে ধরা পড়েছে। অর্থনৈতিক সামাজিক অবস্থাও বর্ণিত হয়েছে দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতায়। তাই জাগ গান নিছক কামনা বাসনার গান নয়, জাগরণের গান। তদুপরি লোকশিক্ষার বাহনও বটে। সাহিত্যের বিচারে মোটেই উপেক্ষার নয়। লোকসাহিত্যের উপাদানে সময়কালকে চিহ্নিত করে সমাজ ও সংস্কৃতির বিষয়গুলিকে অনুধাবন করা যায়। জাগ গানেও তাই —

পারে না ঘাঁটায় চল্‌তে ঝিউরী বউরী।
দেবীসিংহের লোকে নেয় তাকে জোর করি।।

পূর্ণ কলি অবতার দেবীসিংহ রাজা।
দেবীসিংহ-এর উপদ্রবে প্রজা ভাজা ভাজা।।

পেটে নাই অন্ন তাদের পৈরানে নাই বাস।
চামে ঢাকা হাড় কয়খান করি উপবাস।।[৯]

রাজার পাপে প্রজা নষ্ট দেওয়ার নাই জল।
মাঠে ধান জ্বলিয়া গেল ঘরে নাই সম্বল।
বচ্ছরে বচ্ছরে এলা হইতেছে আকাল।
চালে নাই খ্যাড় কারো ঘরে নাই চা'ল।।
মাও ছাড়ে বাপ ছাড়ে ছাড়ে নিজের মাইয়া।
বেটা ছাড়ে বেটি ছাড়ে নাই কারো মায়া।[১০]

জাগ গান, কৃষ্ণধামালী গানগুলি প্রাচীন কামরূপ-কামতা অঞ্চলের গান। এ অঞ্চলে অতীতে উৎকৃষ্ট বাঙ্গা অর্থাৎ কার্পাস তুলার চাষ হত। তারই প্রকাশ ঘটেছে গানে —

কি কারণে হে কিশান নিশ্চিন্তে বসিয়া
টারি চায়া বাঙ্গার খেতে কিষাণ করো যায়া।
ভাদর মাসে ঘোর রৈদে বাঙ্গার চক্র ফুটে
তাক দেখিয়া কিষাণের বেটার মুখের হাসি ফোটে।
কেরকেয়া ধুনিয়া বাঙ্গার গড়েয়া নিল পাইজ
এক সূতা ছাড়িয়া দিল আটিয়া কলার মাইজ।
মথুরার হাটত্ সূতা নিয়া বেড়ায় বেচেয়া
জোলা সব দেখিয়া সূতা নিল তো কিনিয়া।
সূতা পায়া জোলা সব আনন্দিত মন
আপোনার বাড়ি বুলি করিল গমন।
কি করিস রে জোলানি তুই নিশ্চিন্তে বসিয়া
সব চরকি ধরি শীঘ্র টানা খসাও আসিয়া।[১১]

বন্দনা অংশে যথারীতি দেববন্দনা না করে কামাখ্যা দেবী ও গোসানীমারীর উল্লেখ করা হয়েছে। রাধাকৃষ্ণ হয়ে উঠেছে মানব-মানবী। চরিত্র সৃষ্টিতে নতুন রাধাকৃষ্ণের জন্ম হয়েছে। পরিবেশের সঙ্গে সুন্দর সাযুজ্য রেখে হালকা রসের মিশ্রণে কাহিনির ভাব, ভাষা ও সাহিত্য এক সুন্দর লোকায়ত রূপ পেয়েছে। আঞ্চলিক শব্দ প্রয়োগ ও ব্যবহারিক সামগ্রীর উল্লেখ করে জীবনচর্যাকে পরিস্ফুট করেছে।

রাজবংশী জনগোষ্ঠী আদি কৌম পরিচয় নিয়ে বর্তমানে দ্বিমতের অবকাশ নেই। প্রাক্ আর্য যুগ থেকেই এই জনগোষ্ঠী নিজস্ব সমাজ সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। ধর্মীয় সংস্কৃতিও সময়কালের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধারা মতের সম্মুখীন হয়েছে। গ্রহণ বর্জন, আত্তীকরণের মধ্য দিয়ে আর্যীকরণের অংশীদার হয়েও কৌম চরিত্রটি যেমন বর্জন করেনি তেমনি জীবনচর্যার অনুষঙ্গ গুলিকে ঐতিহ্য পরম্পরায় বহন করেছে। পরবর্তীকালে কোচ-রাজবংশ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে নতুনভাবে সমন্বিত হয়ে সুসংগঠিত হয়েছে। কিন্তু কৌম রীতিনীতি এযাবৎ বর্জন করেনি। উপরন্তু ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অনেক কিছু গ্রহণ করে হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির অংশ হয়েছে। সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও যোগ্যভাবে সমন্বয় সাধনে সক্ষম হয়েছে। রাজবংশী জনগোষ্ঠীর ভাষা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য প্রাচীনত্বের পরিচায়ক। তারই দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় পুরাণ, উপপুরাণ, শাস্ত্রাদি সহ বিভিন্ন কৃতিবিদদের সৃজন সাহিত্যে। ভাষা সম্পর্কে বলা যায় 'রাজবংশী' আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের সংজ্ঞায় একটি পূর্ণাঙ্গ ভাষা। রাজবংশী ভাষার মৌলিক শব্দাবলীর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উচ্চারণ লক্ষণীয় এবং সেগুলি একবিংশ শতাব্দীতেও জীবন্ত ও ভাস্বর। বহু মৌলিক রাজবংশী শব্দ ভোট-চীনীয় ভাষা বংশের অন্তর্গত বোড়ো ভাষার চিহ্ন বহন যেমন করে তেমনি বহুসংখ্যক আগন্তুক শব্দ - সংস্কৃত, আরবী, ফারসী, দ্রাবিড়, অস্ট্রিক, ইংরাজি, পর্তুগীজ, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার শব্দভাণ্ডার দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে। রাজবংশী জনগোষ্ঠীর লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখার (প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা, ছড়া, পাঁচালী, লোককাহিনি সঙ্গীতের প্রভৃতি) সম্ভারে নিজস্ব বাকশৈলী, ধরন, অলঙ্কার, ব্যঞ্জনা সহ ভাষাতত্ত্বের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি ধরা পড়ে। সেইসঙ্গে সমাজ ও সংস্কৃতির বিষয়গুলি উঠে আসে।

শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেনের সৌজন্যে পূর্ববঙ্গের লিখিত ও অলিখিত সাহিত্য কিছুটা গুরুত্ব পেলেও উত্তরবঙ্গের সাহিত্য সৃজনশীলতা কোথাও কোথাও শুধু উল্লেখিতই হয়েছে, বিশ্লেষণ

বা মূল্যায়নের পর্যায়ে বিশেষ গুরুত্ব পাইনি। এই সৃজনশীলতা কালের অমোঘ নিয়মে বেশ কিছু হারিয়ে গেছে, কোথাওবা মৌখিক লোকসাহিত্যের আদলে যুগ যুগ ধরে প্রবাহিত হয়েছে এবং অল্প সামান্যই লিখিত রূপ পেয়েছে। সামগ্রিকভাবে যা বাংলা সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি বলা যায়। ১৮৭৬-৭৭ খ্রিস্টাব্দে বিশিষ্ট ভাষাবিদ স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ারসন অবিভক্ত উত্তরবঙ্গের রংপুর, দিনাজপুর এবং কোচবিহার, কামরূপের গ্রাম গঞ্জ থেকে রাজবংশী সমাজের ছড়া, গান, পাঁচালী, ছিল্কা (শ্লোক) সংগ্রহ করে ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে 'মানিকচান্দ রাজার গান' নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এরপর ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য মহাশয় অতিরিক্ত কিছু গান (তিন যোগী ভিখারীর কাছ থেকে) সংগ্রহ করে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তৎকালীন রংপুরের মহকুমার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য সংগৃহীত এই গানগুলি ড. দীনেশচন্দ্র সেন এবং বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয়দ্বয় সংকলন করে বই আকারে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'গোপীচন্দ্রের গান' নামকরণ করে প্রকাশ করেন। এরপর ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে আবার তিনটি পর্বে প্রকাশ পায়। প্রথম ভাগে ছিল মৌখিক সংগ্রহ ও লোকসাহিত্য থেকে পাওয়া 'গোপীচন্দ্রের গান'গুলি। দ্বিতীয় ভাগে ছিল গোপীচন্দ্রের পাঁচালী, রচয়িতা ছিলেন ভবানী দাস। আর তৃতীয় ভাগে গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস পর্বের গানগুলি রচয়িতা ছিলেন সুকুর মামুদ। তারপরে আরো কিছু গান সংগ্রহ করে নলিনীকান্ত ভট্টশালী এবং বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশ করেন 'ময়নামতীর গান' নামে একটি গ্রন্থ। একই বিষয়কে অবলম্বন করে একাধিক গ্রন্থ প্রকাশ পায় পাশাপাশি সময়ে মৌখিক ভাষ্যকে সংগ্রহ করে। যা পরবর্তীকালে সাহিত্যের অংশ হয়ে ওঠে। গাথা বা গীতিকা হিসাবে যোগীগণের মুখে মুখে এগুলি ছিল আখ্যানমূলক লোকগীতি। এই গীতিকাগুলি গুরুবাদী নাথ সম্প্রদায়ের যোগীগণের। এতে প্রেম ভালোবাসার বিষয় ছাড়ায় লোক ঐতিহ্যের বিষয়বস্তুও নিহিত ছিল। এই গীত গাথাগুলি থেকে তৎকালীন সমাজের বেশ কিছু বিষয় প্রতিভাত হয়। উল্লেখ্য রাজবংশী জনগোষ্ঠীর মানুষজন তখন সংখ্যাধিক্য ছিল এবং তাদের মধ্যে নাথ ধর্মের প্রভাব যথেষ্টই ছিল। ময়নাগুড়ি এলাকায় কয়েক দশক আগেও নাথ যোগীদের 'লাউয়ের বস' নিয়ে গান করে ভিক্ষা করতে দেখা যেত। যা যুগীর গান হিসাবে রাজবংশী সমাজে প্রচলিত। ভিক্ষা করার বিশেষত্ব হল ভিক্ষা দেওয়ার সময় যোগী (যুগী) পেছন ফিরে

থাকবে অর্থাৎ ভিক্ষার পরিমাণ সে দেখতে পারবে না। এটাই ছিল প্রচলিত রীতি। তাছাড়া ময়নাগুড়ি নামটির সঙ্গেও জনশ্রুতিতে 'ময়নামতী মাও' যুক্ত হয়ে আছে। গানের কথাতেই সে সময়ের সামাজিক অবস্থার ছবি পাওয়া যায়। নাথ গীতিকার একটি অংশ গোরক্ষনাথ-মীননাথের কাহিনি 'গোরক্ষবিজয়', 'মীন চেতন' হিসাবেও আখ্যায়িত। আরেকটি অংশ গোপীচন্দ্রের গান বা ময়নামতীর গান। নাথ বিশ্বাসের ধারায় এই দুই কাহিনী এতদঞ্চলে বহুল প্রচলিত ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য নাথ গীতিকাগুলি ব্রাহ্মণ্য প্রভাব ও সংস্কৃতি মুক্ত গীতিকা। গ্রামের যোগী সাধুরা ঘুরে ঘুরে গান শুনিয়ে প্রচারের কাজটি করতেন।

এছাড়াও রাজবংশী সমাজে গোরখনাথ ঠাকুরের পূজাকে ঘিরে এক ধরনের গান গোন্নাথ মাগার গান (গোরখনাথের গান) হিসাবে এখনও প্রচলিত। অতীতে বহুল প্রচলিত থাকলেও বর্তমানে উত্তরবঙ্গের কিছু কিছু জায়গায় শোনা যায়। রাখাল বালকেরা গোরখনাথের পূজা উপলক্ষে রাতে গান করে বাড়ি বাড়ি মাগন করত। হাতে থাকত লাঠি কিংবা বাঁশের দণ্ডে পাথর ঢুকিয়ে মাটিতে আছাড় মেরে মেরে বিশেষ শব্দের সঙ্গে সুর করে গান করত। গোল করে ঘুরে ঘুরে দলের একজন গান ধরত — বাকিরা 'ধুয়া' ধরত। পূজা হত মাঠে। গোরখনাথ রাজবংশী সমাজে গবাদি পশুর রক্ষাকর্তা হিসাবে কোথাও শিবের সঙ্গে কোথাওবা কৃষ্ণের সঙ্গে অন্বিত হয়েছে। কোচবিহারের এক-এক এলাকায় একেকভাবে মান্যতা পেয়েছে। পরবর্তীকালে শিব ও কৃষ্ণের ব্যাপক প্রসারে গোরখনাথের প্রভাব রাজবংশী সমাজে হ্রাস পায়। গানের সূত্রতেও সেটা বোঝা যায়। 'এ শিবে' অথবা 'এ থুবে' এই স্মরণ উচ্চারণ দিয়েই মাগনের দল গান শুরু করে। গোরখনাথের গানগুলি 'হাইচাও গান' হিসাবেও সমধিক পরিচিত। বিশেষ করে কোচবিহার জেলায়। আবার গানগুলি অঞ্চলভেদে রূপান্তরিতও হয়েছে। গানে সামাজিক, ঐতিহাসিক ঘটনা, এমনকী রাজনৈতিক বিষয় সহ দেহতত্ত্ব, আখ্যানমূলক, সমাচারের বিষয়গুলিও লোক কবির রচনায় ধরা পড়েছে। গানগুলি মৌখিক সাহিত্যেরই একটি অংশ স্বাভাবিকভাবে তাই প্রাচীনত্ব খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তবে গানগুলি পয়ার ছন্দের গাওয়া হয় এবং সংস্কৃত ও তৎসম শব্দের মিশ্রণ বিদ্যমান। এই গানগুলির মধ্য দিয়ে নীতি বার্তা, চাষাবাদের বিষয়, ঘর নির্মাণের পদ্ধতি, মনঃশিক্ষার বিষয়গুলিও সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। সর্বোপরি রাজবংশী সমাজ জীবনের চিত্রাবলী খুঁজে পাওয়া যায়। গানগুলিতে ছন্দ, লয় ব্যবহারে কোথাও কোথাও অসঙ্গতি থাকলেও

পুরাণ কথা, ধর্মতত্ত্ব, জীবন চর্যা কিংবা বিশ্বাস ভাবনার দিক থেকে লোক পুরাণের প্রেক্ষিতে গানগুলি রাজবংশী সমাজ জীবনের দলিল। মজা আনন্দের বিভাবে বালকেরা গানগুলি পরিবেশন করে। আর এর মধ্যেই লোক সাংবাদিকতা, শিক্ষার বিষয়টি প্রসারিত হয়। এরকমই একটি গান যেখানে পাট চাষের বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে —

থুবে/সুবে/শুভে
মাগি বলে মুনসা মোর বচন ধর।
হেগুাবন মারিয়া পাটাবন কর।।
এক চাষ করিয়া দুই সারি মই।
তবু না উঠিয়া গেল কেল্লা দুবার বই।।
দুই চাষ করিয়া চার সারি মই।
তবু না উঠিয়া গেল ভেলোয়া দুবার বই।।
আট চাষ করিয়া রে ষোলো সারি মই।
তবে তো উঠিয়া গেল কেল্লা দুবার বই।।
পাটা না ফেলেরে দিলাম আর মই।
পাটা না গাজেয়া উঠিল ধান সে ভাজা খই।
আট আঙুল পাসুন রে ভাই নয় আঙুল ডাটা।
পাটা না নিলাইতে গেল গোরকনাথের বেটা।
ফেলালো পাটা উটিল মাতে।
ভাদ্য মাস তা আগাল ফাটে।
গোর ছেয় ছেয় আগাল ছাটে।
মদ্যো খান দরিয়ায় ঢালে।
পাটা জাগাইতে নাগে কি।
আম তুলসি ভুখির মাটি।।
তিন দিন পরে দিয়া ভড়া।
পনোর অন্তরে পাটা খুয়া।।

বাপে বেটা আনলুং ধুয়া।

পাটা সুকাইতে লাগে কি

পংগোর/হাংগোর নড়ি।।

পাটা সুকিয়া ঢোপ করি

বাপে বেটা ঘর করি।

বাইসা/বায়সা ছয় মাস ছড়ি বলি।

সুবে/শুবে। [১২]

গোরক্ষবিজয় কিংবা ময়নামতীর গানে সমকালীন সমাজ ব্যবস্থার ছবি ধরা পড়েছে। যেমন - গোরক্ষবিজয়ে

"কাটিনু চিকন সূতি তোহ্মিহ বুনিবা ধুতি

হাটে নি বেচিলে পাইবা কৌড়ি।

নয়ানে নয়ানে চাহে হাত নাড়ি কথা কহ

চল যোগী আহ্মার সে বাড়ী।।" [১৩]

সুতো কেটে কাপড় বানানোর রীতি বহু প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। রাজবংশী নারীরা তাঁতে করে নিজেদের ব্যবহার্য কাপড় চোপড় নিজেরাই বানাতেন। তাপুরি অর্থাৎ চরকা কাটা ছিল রাজবংশী সমাজ জীবনের অংশ। 'গিলাপ', 'ফোতা' কার্পাস তুলার সূতা দিয়ে বানিয়ে ব্যবহার করত। মেখলিগঞ্জ এলাকায় বহুল ব্যবহৃত ছিল মেখলী, ধোকরা। 'ধোকরা' তো ব্যবসায়িক শিল্পের পর্যায়েই তৈরি হত। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে মিলের কাপড় আমদানির ফলে এই শিল্পটি অবলুপ্ত হয়। অনেকে এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত থেকেই জীবিকা নির্বাহ করতেন।

ময়নামতীর গানে যেমন পাই —

"জখন জংলানি গএনার নাম শুনিল

মএনাক নিগিয়া ভিতরে আন্দরে আগিলাত বসিবার দিল।" [১৪]

এরকমই আরেকটি গানে

"আপনার সামিক দ্যাখে নিম জ্যান তিতা।

পরার পুরুষ দ্যাখে জ্যান্ সংসারের মিতা।। [১৫]

এরকম বহু গানে রাজবংশী ভাষা শব্দের চিহ্ন শুধু নয় উপমা অলঙ্কারের রাজবংশী প্রবাদ-প্রবচনের বিষয়টিকেও উজ্জ্বল করে। গোর্খ বিজয় কিংবা ময়নামতীর গানে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের সমাজ জীবনের ছবি পরিস্ফুট হয়। বয়ন শিল্পের কথা যেমন জানা যায় তেমনি সাংসারিক কূটকচালী, পরকীয়া, ষড়যন্ত্র, অভিসন্ধি, লোভ, স্বার্থপরতা আবার লোকশিক্ষার হিতোপদেশমূলক উক্তিও পাওয়া যায়। যা রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির অতীত ভাষ্যকে নিরূপণ করে। সে ছড়া বা প্রবাদ প্রবচনগুলি আজও রাজবংশী সমাজে প্রচলিত।

> “ছোট লোকের ছাওয়া যদি বড় বিসই পায়।
> টেরিয়া করি পাগড়ি বান্দি ছেঞার দিগগে চায়।। [১৬]

> “হাট গ্যাছেন বাজার গ্যাছেন কিনিয়া খাইছেন খই।
> আমার পিতার মরণের দিন সতি গ্যাছেন কই।।” [১৭]

> তুঞি হবু বটবৃক্ষ আমি তোমার লতা।
> রাঙাচরণ বেড়িয়া লমু পালাইয়া যামু কোথা।। [১৮]

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও রাজবংশী সমাজ জীবনের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়। ড. সুকুমার সেনের মতে ‘মানিক দত্তের কাব্যের সব পুঁথি উত্তরবঙ্গের।’[১৯] গোসানীমারী চণ্ডীরই প্রতিভূ। চণ্ডীপূজা রাজবংশী সমাজে আজও প্রচলিত। মালদহ ও দিনাজপুর জেলায় চণ্ডীমঙ্গল পাঁচালী গানের প্রচলন যথেষ্ট। বহু স্থান নামে চণ্ডী শব্দটি যুক্ত হয়েছে। মঙ্গল চণ্ডী, বুলবুল চণ্ডী, ওলাই চণ্ডী। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সমাজ ও সংস্কৃতির অংশ যুক্ত হয়ে আছে।

রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায় মনসামঙ্গল পদ্মপুরাণ কাব্যে। দুর্গাবর মনকর মহারাজা বিশ্বসিংহের অনুগ্রহ পুষ্ট ছিলেন। মানকরের পুঁথিটি অসম্পূর্ণ পাওয়া গেলেও কাব্যবৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল ছিল। মানকরের কাব্যগ্রন্থে শিবের বংশীবদন ও কোচ রমণীর প্রতি প্রেমের আর্তি রাজবংশী সমাজের লোক ভাবনাকে প্রতিফলিত করে। সোনা রায় দেবতারও উল্লেখ পাওয়া যায়। দুর্গাবরের ‘পোঞা বেহুলী মঙ্গল’ ও মানকরের ‘পোঞার পাঁচালী’ একটি আরেকটির পরিপূরক।

রাজবংশী সমাজে মনসা বিষহরির প্রভাব ব্যাপক। বলা যায় শিবের পরই অন্যতম দেবতা এই বিষহরি মনসা। জল জঙ্গলের ভৌগোলিক পরিবেশে মনসা-বিষহরি রাজবংশী সমাজ জীবনের অংশ। মনসা বিষহরি শুধু রাজবংশী জনগোষ্ঠী নয় উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জনগোষ্ঠী মেচ, রাভাদের মধ্যেও প্রচলিত। নিজস্ব লোকাচার ও নৈবেদ্যে পূজার্চ্চনা করে। রাজবংশী পরিবারে মনসার থান বাস্তু দেবতার মতই গুরুত্বপূর্ণ। অধিকারী পুরোহিতকে দিয়ে পূজা প্রদান কিংবা সময়ে অসময়ে নিজেরাই কাঁচা দুধ, কলা দিয়ে পূজা করে। তার জন্য তিথি নক্ষত্রের প্রয়োজন পড়ে না। যদিও শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে পূজার রীতি রাজবংশী সমাজে প্রচলিত নয়। যে কোন ধরনের শুভকার্যের আগে (অন্নপ্রাশন, বিয়ে) মনসা পূজা ও মাড়েয়া গানের আয়োজন রীতির মধ্যে পড়ে। কয়েকদিন ধরে চলে। রাজবংশী সমাজের ঐতিহ্য বলা যায়। যে কারণে মদনমোহন মন্দিরে এখনও শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মাড়েয়া গানের আসর বসে। কবি জগজ্জীবন ঘোষালের 'মনসামঙ্গল' উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজজীবনে অধিক প্রচলিত। আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতিতে এই মনসামঙ্গল কিংবা মাড়েয়া গান সুদূর অতীতকাল থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রচলিত। অন্যান্য সাংস্কৃতিক উপাদানের অনেক কিছু পরিবর্তিত হলেও একমাত্র মনসামঙ্গল বা মাড়েয়া গানের বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। এমনকী বিশ্বাস ভাবনার ক্ষেত্রেও। ওঝা, কবিরাজের প্রভাব করেছে কিন্তু এই মাড়েয়া গানের ঐতিহ্য বা পরম্পরা রক্ষায় রাজবংশী সমাজ এখনও সমান যত্নবান। 'কবি জগজ্জীবন বিরচিত মনসামঙ্গল' কাব্যে রাজবংশী সমাজ জীবনের বহু উপাদান স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। শুকটা, সিদল থেকে ঘরোয়া অনেক নিয়মাচারের কথা অবধি।

মাঝিয়াত নাই মাটি
চতুর্দ্দিকে নাই চাটি
বাহিরে না পড়ে তার পানি।।
ঘরে আছে সর্ব্বস্ব ভাঙ্গ আছে দলী দল
মৎস্যের সুকটা দলা (সিদল) সাত।। [২০]

প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গে বর্তমানে প্রচলিত 'সতী বেহুলা' পালা গানে স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায়ের খাদ্যাভ্যাসের একটি অপূর্ব বর্ণনা পাওয়া যায় —

ডিমার তরকারী রান্দিছে ঢোল মানকচু দিয়া।
অম্বল রান্দিয়া থুইছে শুকাতি মিশাইয়া।।
খেসারীর ডাইলোত দিচে শুকটার ফোরণ।
পায়েস রান্দিচে দিয়া করকচ লবণ।।
সরবতে মিশিয়া দিচে সিদলের রস।
বিয়াই খাইয়া কত করিবে সুযশ।।
ট্যাংয়া দইয়ে কটকটা চূড়া।
আটিয়া কলার বিচি খাবে চাঁদ বুড়া।।

মনসামঙ্গল সংক্রান্ত গানগুলিতে ধরা পড়েছে রাজবংশী জীবনচর্যার বিষয়, মনন ভাবনার কথা। সামগ্রিকভাবে রাজবংশী সমাজ জীবনের ছবি পাওয়া যায় এবং কয়েক শতাব্দীর এক প্রবহমানতাও ধরা পড়ে। যা মনসামঙ্গলে প্রতিফলিত হয়েছে। মনসাকে ঘিরে ষাইটল বিষহরি, গীদালি, মাড়েয়া গানও কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার প্রান্তীয় এলাকার আরেকটি ধারা। সেখানেও রাজবংশী নারীর ভাবনা, অভিপ্রায় ও সুখ-দুঃখ প্রতিফলিত হয়। এ প্রসঙ্গে ষাইটল সম্রাজ্ঞী ফুলতী গীদালির নাম করতে হয়। তিনি এই ধারাটি আজও বাঁচিয়ে রেখেছেন। মনসামঙ্গল কাব্য কিংবা মাড়েয়া গানের মধ্যে রাজবংশী সমাজ জীবনের শুধু সাহিত্য সংস্কৃতির মনোভাব নয় আদিকৌম পরিচয়ও লুকিয়ে আছে। ১৯৬০ খ্রি: ড. আশুতোষ দাস ও শ্রী সুরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'কবি জগজ্জীবন বিরচিত মনসামঙ্গল' সম্পাদনা করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। বলা যেতে পারে এই মৌখিক সাহিত্যকে লোকসাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করেন।

রাজবংশী সমাজে বর্তমানে যে কীর্তন প্রচলিত তা শ'দেড়েক বছর আগের বিষয়। অধিকারী পুরোহিতদের সংযোজন। তাঁরা রাজবংশী সমাজের পূজা-অর্চনার অধিকার লাভের পর গৌড়ীয় ভাবাদর্শে কীর্তনের প্রবর্তন করেন, তাঁরা গানও রচনা করেন। কারণ তাঁরাই প্রথমত: গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারের কাজটি করেছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের কৌপিন ধারণ, পঞ্চম সংস্কার, দশম সংস্কার প্রভৃতি ধর্মীয় আচার আচরণ রাজবংশী সমাজের মধ্যে প্রবর্তন তাঁদের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। তার আগে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এতদঞ্চলে শঙ্করীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবই মূলত: ছিল। তারপর যোগ্য নীতিবান প্রচারকের অভাবে এই ধর্মের প্রভাব ক্রমশ অবলুপ্তির

পথে যায়। তখন রাজবংশী সমাজে প্রচলিত ছিল 'ডাকের গান'। ডাক গান, ডাক গণনা এবং ডাকের বচন ইত্যাদি বিষয়গুলি সমাজে বিশেষ প্রচলিত ছিল। এই ডাক গান ষোড়শ শতাব্দীর বলে অনেক পণ্ডিতের মত।[২১] বর্তমান কীর্তনের আগে উচ্চকণ্ঠে সমবেত সুরে এই ডাক গান বা কীর্তন করা হত। এই গানের একটি পদ —

"হরি তোর লীলা বুঝা ভার
অনিত্য সংসার মাঝত হরি
তুঞ কর্ণধার
তোর লীলা বুঝা ভার।"[২২]

গানের কথা ভাবে শঙ্করীয় বৈষ্ণব ধারার প্রভাব যেমন লক্ষণীয় তেমনি 'নাম ঘোষা'র সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্যপূর্ণ। স্বাভাবিকভাবে শঙ্করীয় বৈষ্ণব মতই এই ডাক গান বা কীর্তনই 'রাজবংশী' সমাজের আদি কীর্তন। যা পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হয়।

বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মত কোচবিহার রাজ্য তথা উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের মধ্যে বহু ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচন, গাথা-আখ্যান, রূপকথা-উপকথা, লোকনাট্য, লোকসঙ্গীত, পূজা-পার্বণ, ব্রতকথা ইত্যাদির ভাণ্ডারটি সুবিশাল। রাজবংশী জনজীবন থেকে উদ্ভূত এবং জীবনাশ্রয়ী এইসব উপাদান লোকসাহিত্যেরই গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সুদীর্ঘকাল এইসব উপাদান অনালোচিত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এইসব মূল্যবান উপাদান উদ্ধার ও সংরক্ষণে অনেকে এগিয়ে আসেন। অনেক উপাদানই কালের স্রোতে হারিয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও বলা ভাণ্ডারটি ছোট নয়, সাহিত্যের অংশ হয়ে গবেষণার দাবি রাখে। সর্বোপরি যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এইসব উপাদানের মধ্যে তৎকালীন সময়ের রাজবংশী সমাজ জীবন, জীবনচর্যা ও মনন সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

রাজবংশী সমাজজীবনে লোকসাহিত্যের উপাদানগুলি মৌখিক সাহিত্য রূপে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। গান, কবিতা, ছড়া, শিল্লুক (শ্লোক), প্রবাদ প্রবচন এবং লোককাহিনির আদলে সেগুলিই বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বিভিন্ন পণ্ডিত বিদ্বজ্জন সংগ্রহ ও সংকলিত করেন। গ্রন্থাকার প্রকাশের মধ্য দিয়ে সাহিত্যের এই নবতম ধারাটি উজ্জীবিত হয়। এই ধারাটি অতীত কালে সাহিত্য সৃজনের অন্যতম মাধ্যম ছিল বলেই এই প্রান্তীয় অঞ্চলে অসংখ্য পুঁথির সন্ধান পাওয়া যায়।

বহুসংখ্যক উদ্ধার হলেও অসংখ্য যে হারিয়ে গেছে এটাও সত্যি। মনীষী পঞ্চানন বর্মা 'রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ'কে ঘিরে সেই ধারাটিকে বেগবান করেন। বলা যেতে পারে উত্তরবঙ্গের প্রাচীন সম্পদ হিসাবে সাহিত্যের উপাদানগুলি পণ্ডিত মহলকে সচেতন করে। ১৩২২ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ অবধি তিনি অনেকগুলি পুঁথি শুধু সংগ্রহ করেন। বহু গান, কবিতা, ছিল্কা (শ্লোক) প্রকাশের উদ্যোগও নেন। তাঁর সংগৃহীত পুঁথির মধ্যে অন্যতম 'গোবিন্দ মিশ্রের গীতা'। পরবর্তীকালে তিনি স্বয়ং অনুবাদ কর্মের পাশাপাশি 'রংপুরের রূপকথা', 'জগন্নাথী বিলাই', 'কথা ও ছিল্কা' প্রকাশ করেন। নিজেও রাজবংশী সমাজ জীবনকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে 'ডাংধরী মাও', 'ক্ষত্রিয়দের প্রতি', 'বেটাছাওলার প্রতি', 'একটি ঘটনা' ইত্যাদি রচনা করেন। বলা যেতে পারে তিনি লিখিত সাহিত্য ধারাটিও সচল হয়। বহু প্রাচীন, কয়েক শতাব্দী ধরে প্রচলিত রাজবংশী সমাজ জীবনের অনুষঙ্গ ছিল্কা, গান, ছড়াগুলিকে সংগ্রহ করে সাহিত্যের ভাবনাকে জারিত করেন। যা রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির একটি ধারাকে পুনরুজ্জীবিত করে। বলা যেতে পারে বিগত সময়ে লোকসাহিত্যের ধারাটি বেগবান ও সজীব থাকলেও বিংশ শতাব্দীর সূচনাকালে একটা নবজাগরণের মধ্যে দিয়ে বাংলা সাহিত্যের অংশভাগ হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে অবশ্যই জর্জ আব্রাহম গ্রিয়ারসনের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। কারণ তিনি প্রথম ভাষা অনুসন্ধানে এই প্রান্তীয় অঞ্চলের রাজবংশী জনজাতির বহু গান, ছড়া, শ্লোক সংগ্রহ করে গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নেন।

রাজবংশী সমাজের লোকসাহিত্যের অংশটি সুবিস্তৃত। ছড়া, গান, ছিল্কা ছাড়াও ব্রতের কথামালায়, পাঁচালী, কাহিনিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যার মধ্যে প্রাচীনত্বের চিহ্ন যেমন পাওয়া যায় তেমনি জীবনচর্যার পদক্ষেপে সমাজ, সংস্কৃতির উপাদানগুলিকে খুঁজে নেওয়া যায়। রাজবংশী সমাজে বহু ব্রত সুপ্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত। অধুনা কিছু বিলুপ্ত হলেও এখনও গ্রামগঞ্জের নারীমহল নীরবে পালন করে। ষাইটল, সুবচনী, মেচেনী, ধরমঠাকুর, ষাট পূজা, হুদোম দ্যাও, কাতি পূজা, দেউল পূজা, কাত্যায়নী ব্রত এইসব ব্রতকথা ও গানে রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির বিশ্বাস-ভাবনা, অভিপ্রায় ধরা পড়েছে। প্রতিটি কৃত্যের সঙ্গে রয়েছে গান। আর এই গানেই প্রতিভাত হয়েছে কৃষি নির্ভর রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির আদি কৌম সংস্কৃতির চিহ্নাবলী। যেমন হুদুম দ্যাওর গানে আমরা পাই —

''হিল্-হিলাইছে কমরটা মোর
শির্ শিরাছে গাও
কোনঠেকেনা গেলে এলা
হুদুমার দেখা পাঁও।
পাটনীখান পড়িছে খসিয়া,—
আইসেক রে হুদুমা-দেওয়া
তোর বাদে মুই আছোঁ রে বসিয়া।।
ডিংসল্ সল্ কমরটা
তাতে নাই মোর ভাতারটা
করোঁ কি মুই কাঁয়ে বা কয়
কোন্ঠে গেলে দেখা হয়,
দেখা হালে দেহাটা জুড়ায়।।'' ২৩

হুদোম দ্যাও পূজায় বৃষ্টি কামনায় নগ্নদেহে নারীর নৃত্য ও গীত প্রভৃতির মধ্যে আদিম কৌম সংস্কার ও ভাবনারই প্রকাশ ঘটেছে।

ব্রত কথা ও গানগুলিতে আদিম সংস্কৃতির উপাদান পাওয়া যায়। ধর্মবিশ্বাস, যাদুশক্তির প্রভাব, আভিচারিক ক্রিয়া, ব্রতকথা, পাঁচালীতে সংযুক্ত হয়েছে। ম্যাজিক কথা ভাবনা নৃত্যও কিছু বিষয়কে প্রকট করেছে। যেটা হুদোম দ্যাও-র নৃত্য ও হলকর্ষণের বিভিন্ন ভঙ্গীমায় প্রকাশ পায়। বট পাকুড়ের গায়ে সুতো জড়ানো, ময়না ডালকে পূজা, মঞ্জুষা বা সুকর তৈরি, ছুরি-কাটারির পূজা, উলঙ্গ নৃত্য ইত্যাদি আদি কৌম সমাজ ভাবনাকে চিহ্নিত করে। সুবচনী, ষাইটল ব্রতকথায় যেমন সৃষ্টিতত্ত্বের কথা বর্ণিত হয় সেইসঙ্গে সামাজিক রীতিনীতি, জীবন-জীবিকার বৈচিত্র্য, দৈনন্দিন আচার-সংস্কার, আহার-বিহার, বিশ্বাস, রঙ্গ-রস ইত্যাদিরও সংযোজন ঘটেছে। সমকালীন সমাজব্যবস্থার ছবিও ধরা পড়েছে। 'উক্নাই-ছত্রকাকই' এবং 'দায়ো-বায়ো' আখ্যানে যেমন দাসীকে বিয়ে করার এবং দাসীর গর্ভে সন্তান উৎপাদনের কথা জানা যায়, সেকালে দাস ব্যবসা ছিল এটাও পরিষ্কার হয়। 'ঘট পাতালী ভাসাবার' কথায় দেখা যায় ব্রাহ্মণ শুধুমাত্র রুচি (জাত নয়) বিচার করে শূদ্রাণীকে গৃহিণী এবং ব্রাহ্মণীকে দাসী করেছিলেন। রুচিশীলতার

গৌরবকে গুরুত্ব দেওয়া এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। 'দায়ো-বায়ো' আখ্যানে রাজার কন্যাপণ দেওয়ার কথা জানা যায়। ভাবী জামাইকে কনের বড় ভাই এবং বোনের বরণ করে নেওয়ার কথা জানতে পারি। সে সময় বিবাহের বিভিন্ন রীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। ছত্রকাকই দাসীকে 'পানিছিটা' পদ্ধতিতে বিয়ে করা, 'কাত্যায়নী পূজা' ব্রতে 'মিস্তর ধরা' অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে। বিয়েতে বিভিন্ন কুটুম্বের দান প্রদান ও বিয়েতে হাস্যকৌতুকের বিষয়গুলিও আখ্যানে বর্ণিত হয়েছে। সমাজে নারীর অবস্থা, বন্ধ্যা নারীর কষ্ট, নারীদের কেশ বিন্যাস, অলঙ্কার, পোশাক পরিচ্ছদ, রন্ধনপ্রণালী ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এই ব্রতকথা গানে সমকালীন ভাষা বৈশিষ্ট্য, শব্দচয়ন বাক্যগঠন, উপমা প্রয়োগ ও পুনরাবৃত্তির সুষমা প্রয়োগে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সাহিত্যের উপাদানগুলিকে খুঁজে পাওয়া যায়। সর্বোপরি এই ব্রতকথাগুলি আখ্যান বর্ণনে তৎকালীন সময়ের রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে বর্তমান সময়ের তুলনামূলক একটা চিত্রলিপিও অনায়াসে খুঁজে নেওয়া যায়। যা সমাজ ও সংস্কৃতির নিরিখে গুরুত্বপূর্ণ।

লোকসঙ্গীত তো লোকায়ত জীবনের দর্পণ। জীবনের গতিশীলতা ও সমকালের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। রাজবংশী সমাজ জীবনের ক্ষেত্রেরও তাই, রাজবংশী সমাজ জীবনে সঙ্গীত তো সূতিকা গৃহ থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত। পরতে পরতে গান সংস্কারের অঙ্গীভূত হয়েছে। রাজবংশী সমাজে লোকসঙ্গীতের ভাণ্ডারটিও সুবিশাল। ধর্মীয় সংস্কৃতির সঙ্গেও সম্পৃক্ত হয়েছে। দেহবাদী মনোজগৎ থেকে রঙ্গরসিকতা, জীবনমুখী গানের ছড়াছড়ি। আবার পরিবেশ প্রকৃতি আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটও গানের সুরে ধ্বনিত হয়েছে। সেখানে সমাজ সংস্কৃতির বাক্‌বদলের চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায়। শব্দ ব্যঞ্জনা, উপমা, প্রতীক ব্যবহার কিংবা ঘটনার বিন্যাসে সাহিত্যের উপাদান সংযোজিত হয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। গ্রামের নিরক্ষর অতি সাধারণ মানুষের এই সৃজন ক্ষমতা ও ভাবনা সাহিত্যের মূল্য বিচার বিশ্লেষণে সাহিত্যের দিকটি উজ্জ্বল হয়। সেখানেও সমাজ জীবনের পরিবর্তনের আভাসগুলি ধরা পড়েছে চেতনা ও ভাববোধে। রাজবংশী লোকসঙ্গীতে আমরা এক লহমায় পেয়ে যাই ধর্মীয় জীবন, ধর্ম নিরপেক্ষ জীবন, আধ্যাত্মিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন সেইসঙ্গে জীবনচর্যার পর্যায় ভিত্তিক গান যেমন বিয়ে, পূজা-পার্বণ, মৃত্যুচেতনা, দেহতত্ত্ব, মনঃশিক্ষা বিষয়ক, প্রকৃতি প্রেম, জীবনরস, বোধভাবনার গান সাহিত্যের মূল্যে যা অমূল্য সম্পদ। আবার পেয়ে যাই সময়কালের পরিস্থিতি, সমাজ

জীবনের ছবি। বিভিন্ন মত ও ধারার সংযোজন ঘটেছে চেতনাবোধের উত্তরণে। আধুনিকতার বিচারেও ভাওয়াইয়ার কাব্যগীতি নিঃসন্দেহে যুগোপযোগী।[২৪] ভাষা হল সাহিত্যের প্রাণ আর সাহিত্য ভাষার পরিবেশন। ভাষার আগেই জন্মায় সুর, সুরের প্রভাবে ভাষা অবগাহন করেই জন্ম দেয় গানের। তাই গান সৃষ্টির উপর নির্ভর করে সাহিত্যের উৎকর্ষ। সাহিত্যের প্রাণ ভোমরা সংশ্লিষ্ট সমাজের গান। সেই বিচারে ভাওয়াইয়া গানও উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য।[২৫] ভাওয়াইয়া গানে রাজবংশী সমাজজীবনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে তাই প্রাগসরতা এবং সাংস্কৃতিক বিবর্তনের দলিল বটে।

ভাওয়াইয়া সঙ্গীতে বৈষ্ণব পদাবলীরই পদচারণা লক্ষ করার মত।

“আর যদি দ্যাকোং আর যদি শোনোং অইন্যজনের সঙ্গে কতা।
এ হেনা যৈবন সাগরে ভাসামো পাষাণে ভাঙ্গিমো মাতা।।

যেদিন দেখিব আপন নয়ানে, কহে কার মনে কথা।
কেশ ছিঁড়িব বেশ দূরে থোব, ভাঙ্গিবো আপন মাথা।।

নিচের গানের কথাগুলি তো তৎকালীন সমাজ জীবনের ছবিকে তুলে ধরে —

ওকি বাইদন
কি দেকিবা দিলারে বিয়া মোর
আমার শ্বশুর বাড়্িত চালোত্ নাইরে ছন।
পিন্দনে নাই কাপড় বাইদন ঘরে নাই খাওন।

(বাইদন - বাপধন; ছোন - খড়; পিন্দন - পরিধান)

কিংবা

আই মুই সকীন দ্যাকিয়া বসনু রে কাইন/দিন মানেনা
পরে হাতের গাইন, দিনে আইতে বেড়াওঁ বারাবানি।

(সকীন - সৌখিন; কাইন - দ্বিতীয় বিবাহ; গাইন - উদুখলের পেষণ দণ্ড; বেড়াওঁ বারাবনি - ধান কুটে বেড়ানো)

ভাওয়াইয়া সঙ্গীতে প্রকৃতি পরিবেশ অনাবিলভাবে ধরা পড়েছে। নদী, পশু-পাখি কোনকিছুই বাদ যায়নি, জীবন সংলগ্নতাকে প্রকাশ করেছে।

“ও বিরিক্ষো শিমিলারে — গগনে ম্যালে ঠ্যাল্
নারী হয়্যা অসের যৈবন আইক্‌বো কতয়কাল।
বিরিক্ষো মোর শিমিলারে- -।।”

কিংবা

“দৈয়ল রে - - কার জইন্যে আকিবোরে সোনার যৈবন।
লাজে নাই কঙ দৈয়ল রে দৈয়ল বাপো মায়ের আগে।
তোলা মাটির কলা য্যামন হল্‌ফল্ হল্‌ফল্ করে
ঐ মত সোনার যৈবন দিনে দিনে বাড়ে রে।।”

নদীও এসেছে জীবনের সঙ্গে অন্বিত হয়ে।

ও নদীরে, ও মোর তিস্তারে —।
ও রে তোর য্যামন থৈ থৈ ব্যালা
সেইমত মোর হৃদের জ্বালা রে।

(ব্যালা - নদীর বুকে ওঠা ঢেউ)

উপমায় জীবন্ত হয়ে ওঠে হৃদয়ের গোপন ভাষা। এ তো সাহিত্যেরই অংশ। ভাওয়াইয়ায় এরকম ছত্র, কলি অসংখ্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। পশুও এসেছে গানের কথায় —

“পাটাবাড়ীত মোর শিয়াল কান্দে, কান্দে শিয়াল মোর অনুরাগে,
আজি কালা মুই একেলায় রে।”

কিংবা আব্বাস উদ্দিনের সেই বিখ্যাত গান —

“ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দেরে।
ফান্দ বসাইছে ফান্দি রে ভাই পুঁটি মাচো/মাছো দিয়া।
(ওরে) মাছের নোভে/লোভে বোকা বগা পড়ে উড়াও/উড়াল দিয়া রে।।
ফান্দে পড়িয়া রে বগা করে টানাটুনা,
(ওরে) আহারে কুক্কুরার সূতা, হলু লোহার গুণা রে।

ফান্দে পড়িয়া রে বগা করে হায়রে হায়,
(ওরে) আহারে দারুণ বিধি সাথী/সাতী ছাউড়া যায় রে।।
উড়িয়া যায় চকোয়ারে পংখী বগীক্ বলে ঠারে,
(ওরে) তোমার বগা বন্দী/হইছে/হইচে ধল্লা নদীর পারেরে
এই কথা/কাথা শুনিয়া রে বগী/দুই পাখা/পাঙ্খা মেলিল,
(ওরে) ধল্লা নদীর পাড়ে যাইয়া দরশন দিল রে।
বগাক্ দেখিয়া বগী কান্দেরে
বগীক্ দেখিয়া বগা কান্দেরে।"

প্রতীকী ব্যবহারে যে মুন্সিয়ানার লক্ষণ তা তো সাহিত্যের উপাদান। 'বগার ফান্দে পড়ার' মধ্যে দিয়ে জীবন সংসারের জটিল আবর্তে আটকে পড়ার বিষয়টিকে অসম্ভব বোধ বীক্ষায় গ্রামের লোকশিল্পী রচনা করেছেন। আবার সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রতিও সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করেছেন। সর্বোপরি দেহচেতনারও উর্দ্ধে উঠে মায়া কায়ার থেকে উত্তরণের বার্তাও নিহিতে দিয়ে রেখেছেন। আত্মা পরমাত্মার তত্ত্ব সম্পৃক্ত করেছেন অসম্ভব দক্ষতায়। এখানেই তো সাহিত্যের গুরুত্ব, ট্র্যাজেডিকে সম্পৃক্ত করেছেন। আলঙ্করিকের সন্ধানও আমরা পেয়ে যাই —

'হাঁটিয়া যাইতে নদীর জল
খাক্লুম কি খুক্লুম কি খল্লাল খল্লাল করে।'

কিংবা দীঘল নারীর বর্ণনায় অপূর্ব সংযোজন —

'হাটিয়া যাইতে কমর ঢোলে—
আহারে, কাঙ্কিনী গচের গুয়া।'

উপমা, ব্যঞ্জনা কিংবা প্রতীকীতে সমুজ্জ্বল। যা সাহিত্যেরই অনুষঙ্গও বটে। ভাওয়াইয়া গানের সাহিত্য সৌন্দর্য এভাবে ছত্রে ছত্রে ধরা পড়েছে।

পরবর্তীকালে সমাজ অর্থনীতির পরিবর্তনের সাথে সাথে লোককবিদের মনন দর্শনেরও পরিবর্তন ঘটেছে। বিভিন্ন বিষয় প্রসঙ্গ উঠে এসেছে, ধরা পড়েছে সমকালীন সময়ের চিহ্ন কিংবা অবস্থান। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ে রাজবংশী গ্রাম সমাজ ছিল সহজ, সরল, মানবিক আত্মীয়তার পরিসরে আবদ্ধ। সেখানে সঙ্গীতও রচিত হয়েছে প্রকৃতি পরিবেশের অনাবিল

মুক্তাঙ্গনে, গভীর জীবন সাযুজ্যে। মনের উদাত্ত ভাবনা, চিন্তা চেতনায় প্রকৃতির উপসর্গগুলি জীবন সাযুজ্য হয়েছে একান্ত অনুভবে। পরবর্তীকালে ভূগোল, ইতিহাস, সমাজ, রাজনীতি বদলের সাথে সাথে সঙ্গীতের বর্ণনা, কথা, ভাষ্য, প্রতীক, উপমাও পাল্টে যায় যা সাংস্কৃতিক পরিবর্তনকে সূচিত করে। ধর্মীয় গীতি সঙ্গীতগুলি অপসৃয়মান হয়, জীবনমুখী, সমাজমুখী ভাবনার প্রতিফলন বেশি করে ঘটে। তাই তো দেহতত্ত্ব-মনঃশিক্ষার গানগুলি কিংবা চারযুগের গান এবং জীবনরসের গানগুলি হারাতে বসেছে। রাজবংশী সমাজজীবন, আর্থসামাজিক কাঠামো পরিবর্তন ঘটার সাথে সাথে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সূত্র ধরে এই পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

কথায় কথায় প্রবাদ -প্রবচন বলার লোক যেমন কমে যায় তেমনি সঙ্গীত রচয়িতার ক্ষেত্রে বর্তমান সময় পরিস্থিতির বিষয়গুলি চলে আসে। ইতিমধ্যে পালাগান, লোকনাটকের অপসৃয়মানতা ভিন্ন এক শূন্যতার সৃষ্টি করে। ভাষা-শব্দ, ভঙ্গি, পোষাক-পরিচ্ছদ পাল্টে যায়। ইতিমধ্যে পূজার্চ্চনা, ব্রতপালন তৎসংক্রান্ত গান বাজনা (যেমন হুদুম দ্যাও, কাতি পূজা, সোনা রায়ের মাগন, গমীরার গান ইত্যাদি) কমে যায়। বর্ণহিন্দুদের কিছু আচার-সংস্কার পূজা-পার্বণ রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হয়। স্বভাবতই এক ভিন্ন সাংস্কৃতিক আবহ তৈরি হয় যে আবহ রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির আবাহন কালের অনেক কিছুরই বিকৃত রূপ হয়ে ওঠে। সেটা নাচ গান থেকে সংস্কার, রীতি আচার এমনকী মনন ভাবনাতেও। এই পরিবর্তন স্বাধীনোত্তর কয়েক দশকে ভিন্ন এক সাংস্কৃতিক সংকটের জন্ম দেয়। তা সত্ত্বেও বলা যায় রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির আদি কৌম চিহ্নগুলি একেবারে হারিয়ে যায় নি। এর মধ্যে কৃষ্টি সংস্কৃতি নিয়ে একটা অংশ সচেতন হয়েছে। ভাষা সংস্কৃতি নিয়েও একটা উদ্যোগ লক্ষ করার মত। এই সাংস্কৃতিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতি আবর্তিত হয়ে যাচ্ছে।

ভাওয়াইয়া সঙ্গীত কীভাবে সময়কালীন সমাজভাবনা ও সমাজ আবহকে প্রতিফলিত করে সেটা দেখতে পাই আব্বাসউদ্দিনের ব্রিটিশ বিরোধী গানের মধ্যে—

‘ও ভাই মোর গাঁওয়ালিয়া রে
চতুর্দিকে জ্বলে সূরুয বাতি,
তোমরা ক্যানে আঁধার রাতি রে।।
হায়রে হায়, পরের বোঝা তোমরা কদ্দিন বইবেন ভাই

ভাই মোর গাওয়ালিয়ারে রে।।
বালুটিটি পংখী কাঁদে নিজের আহার খুঁজির বাদে রে
হায়রে হায়, তোমরা বুজি নেও নিজের অধিকার
ভাই মোর গাওয়ালিয়ারে রে।।

এক বেলা তোমার অন্ন জোটে, পেন্দোনোত তোমার কাপড় কোন্টে
হায়রে হায়, তোমরা বুঝি নেও নিজের অধিকার
ভাই মোর গাওয়ালিয়ারে রে।।

তোমার হাতোত ভাইরে কোদাল কাঁচি
তবু প্যাটে পাথর বাঁধি আছেন বাঁচি রে, আর তোমরায় জোগান ভাত
ভাই মোর গাওয়ালিয়ারে রে।'

রাজবংশী সমাজের ভাওয়াইয়া সঙ্গীতে সুদূর অতীতকাল থেকেই সমাজ, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, রীতি আচারের প্রতিফলন ঘটেছে। আজকের সময়েও সেই একই ধারা পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক বিষয়ের সঙ্গে প্রাচীন সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি নিয়েও গান রচিত হচ্ছে। ভাওয়াইয়া সঙ্গীতের কথা ও সুরে প্রচলিত কথাটি ভীষণভাবে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ রচয়িতার নাম উহ্য হয়ে শিল্পীর মুখে মুখে তা ছড়িয়ে পড়ে। আধুনিক সময়ের গানেও রচয়িতার নাম বিশেষ শোনা যায় না। এরকম একটি গান, যে গানের মধ্যে রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির পরিচয় যেমন পাওয়া যায় তেমনি অতীত ঐতিহ্য নিয়ে গোষ্ঠী পরিচয়কে তুলে ধরেছে।

আমরা রাজবংশী ভাই — আমরা রাজবংশী ভাই
এই মাটিরে ছাওয়া আমরা ভাওয়াইয়া গান গাই
রে ভাই ভাওয়াইয়া গান গাই, হে।
আসাম, বাংলা, জলপাইগুড়ি যেমন সোদর ভাই
আমরা পরসী নোয়াই এই মাটিরে
ছাওয়া আমরা ভাওয়াইয়া গান গাই।

আছে রে ভাই রাজবাড়ী — সিংহ দুয়ার আছে পরি (২)
বড় দেবী সাগর দীঘি আরো কত ভাই
নাই রে নাই ভাই মইশের বাথান
আছে খালি ভাওয়াইয়া গান — এই ভাওয়াইয়া
গান যে আমরা মিলিমিশি গাই আর এই মাটিরে
ছাওয়া আমরা ভাওয়াইয়া গান গাই।।

ছ্যাকা প্যালকা সিদল আওটা — শুকান চুরা মাছের ভরতা (২)
দই চুরা আর শাক সুকাতি বারো মাসে খাই
ধাপরা পুয়া পুষনার দিন — ছুবিয়া খাই আরো
বাঁশের ঢিং — জাকই পলো নিয়া আমরা
বাহো মারির যাই আর এই মাটিরে
ছাওয়া আমরা ভাওয়াইয়া গান গাই।।

চেমুক খেলা দাড়িয়া বান্দা — আটখরি আর যোল পাইতা (২)
হাডুডু আর বউছি লাঠি আমরা প্রিয় খেলা ভাই
মদনকাম আর বিষহরি সতপির মাশান বুরাবুড়ি
গোরখনাথ আর সোনারায়ের পূজা করি ভাই
আর এই মাটিরে ছাওয়া আমরা ভাওয়াইয়া গান গাই।।

● বাংলা সাহিত্যে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি

উত্তরবঙ্গের বৃহত্তম জনজাতি এই রাজবংশী জনগোষ্ঠী। কয়েক শতাব্দী ধরে এই রাজবংশী সংগঠিত ও সুদৃঢ় হয়েছে। এই রাজবংশী জনগোষ্ঠীর মধ্যে অনেক জনজাতি গোষ্ঠীর মহাসম্মীলন ঘটেছে সময়কালের ঘাত প্রতিঘাতে। এক দীর্ঘ পথ পরিক্রমা, আত্তীকরণ, সংশ্লেষণ, সংমিশ্রণ, আরোপনের মধ্য দিয়ে রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতি আজকের সময়ে এসে পৌঁছেছে। উত্তরবঙ্গের এই ভূখণ্ডটি বাংলা সাহিত্যের অনেক আখ্যান কাহিনির কেন্দ্রবিন্দু হয়েছে। বিস্তার লাভ করেছে এতদঞ্চলের অধিবাসী, সমাজজীবন, সংস্কৃতি, মননবীক্ষার আলোকপাতে। স্বাভাবিকভাবে রাজবংশী সমাজ জীবন, ধর্ম সংস্কৃতির বিষয়গুলি ধরা পড়েছে। আবার আখ্যান কাহিনির কলমে গাথা হয়েছে তৎকালীন সময়ের সমাজ, পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক অবস্থান ও বিবর্তনের ছবিও। সেটাই আমরা বাংলা সাহিত্যের বেশ কয়েকজন প্রথিতযশা সাহিত্যিকের লেখনীতে পেয়ে যাই। বিষয় সময় প্রেক্ষাপটের নিরিখে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা সাহিত্যিকদের কলমেও উত্তরবঙ্গের বিশেষ করে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি ধরা পড়েছে। গল্প কবিতায়ও রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি গুরুত্ব পেয়েছে। সাহিত্যিক দেবেশ রায়ের ‘তিস্তা পারের বৃত্তান্ত’ তো রাজবংশী সমাজ জীবনকে ঘিরেই। তাঁর ‘তিস্তাপুরাণ’, ‘মফঃস্বলি বৃত্তান্ত’-এ রাজবংশী সমাজ জীবনের ছবি আমরা পেয়ে যাই। অমিয়ভূষণ মজুমদারের আখ্যান, উপাখ্যানের পরিসর তো প্রান্তবর্তী কোচবিহার সহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ও রাজবংশী সমাজ জীবনের আলোকেই উদ্ভাসিত হয়েছে। তাঁর ‘মহিষকুড়ার উপকথা’, ‘দুখিয়ার কুঠি’ কিংবা ‘নয়নতারা’য় সমাজ ও সময়ের চিহ্ন প্রতিভাত হয়েছে। স্মৃতিসত্তায় অতীত বর্তমান উঠে এসেছে নিবিড় অনুভব ও দৃষ্টিভঙ্গিতে। সেখানে গভীর আত্মীয়তাও প্রসারিত হয়েছে। আজীবন তিনি আসংলগ্ন ছিলেন ‘গড় শ্রীখণ্ডের’ রাজনগর ও ভুবনজোতের জীবন ও সমাজে। সামগ্রিকভাবে উত্তরবঙ্গ অনেক সাহিত্যিকের সৃজন আখ্যানে স্থান পেয়েছে কিন্তু দেবেশ রায়, অমিয়ভূষণ মজুমদার উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক ও সামাজিক অবস্থানকে প্রাধান্য দিয়ে রাজবংশী সমাজ জীবনকে ভিন্ন মাত্রায় বৃহত্তর পাঠক সমাজের কাছে তুলে ধরেছেন। পরবর্তীকালে আরও কয়েকজন ঔপন্যাসিক, গল্পকার রাজবংশী সমাজজীবনকে আলোকপাত করেছেন নিজস্ব আখ্যান বিশ্বে। বিপুল দাস, চোমংলামা, দেবাশীষ চক্রবর্তী, জীবন সরকার, পীযূষ ভট্টাচার্য সহ আরো

অনেকে। অভিজিৎ সেনের নাম গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। তাঁর গল্প 'দেবাংশী' নাট্যরূপে বিপুল জনপ্রিয় হয়েছে। তুলসী লাহিড়ীর নামও করতে হয় তাঁর 'ছেঁড়াতার' নাটকের জন্য। উৎপল দত্ত নকশাল আন্দোলনকে প্রেক্ষাপট করে রাজবংশী সমাজজীবনকে ভিন্নভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর 'তীর' নাটকে। নাট্য সাহিত্যকেও আমরা বাদ দিতে পারি না। হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের নাটকে যেমন ধরা পড়েছে তেমনি রাজবংশী সমাজ জীবনের অবস্থান উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন নাট্যকারের কথায় রাজবংশী সমাজজীবন ও সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়গুলি আধারিত হয়েছে। সাহিত্যে রাজবংশী সমাজজীবনের অধ্যায়টি কোনভাবে ব্রাত্য থাকেনি। ধারাবাহিকভাবে উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষাপটে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি বিভিন্ন আঙ্গিকে বিষয় হয়ে উঠেছে।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের সর্বেক্ষণ মাটির কাছাকাছি থেকে, অনুভূতি ও অনুভবের স্তর থেকে বিষয়ভাবনাকে তিনি তাঁর আখ্যান, গল্পে ঠাঁই দিয়েছেন। গতানুগতিক ধারা, ধরনের পথে তিনি হাঁটেননি। মননের স্তরেই তাঁর ব্যাখ্যান, অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে। এভাবেই হয়ে উঠেছে তাঁর উপন্যাস ও গল্পের বিষয় পরিসর। সমস্ত প্রতিবেশ, জীব-জড় জগত আবদ্ধ হয়েছে কথনের সম্প্রসারণে। সেখানে জীবন এসেছে, কথা বলেছে, নড়াচড়া করেছে, সম্প্রসারিত হয়েছে দেখা ও অনুভবের শব্দমালার গাঁথুনিতে। চরিত্রের বিকাশও ঘটেছে মনন জগতের পর্যবেক্ষণে। ভিন্ন এক আন্তরিক যোগাযোগের সেতু রচনা করেছে তাঁর লেখনি। এরকমই একটি উপন্যাস 'মহিষকুড়ার উপকথা' ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশ পায়। গল্পের পটভূমি তারও বহু আগে রাজন্যশাসিত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকালে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এলাকার প্রান্তজীবনের পারিপার্শ্বিক কথা, পরিবর্তনের ঢেউকে আশ্রয় করে।

চারিদিকে ঘন অরণ্য, বন্য জন্তুদের নিরন্তর আনাগোনা, হাঁটা পথ, গরুর গাড়ি, থমথমে গুরুগম্ভীর পরিবেশে কতিপয় মানুষের পরিবার, সমাজ। আদি জনগোষ্ঠীর আদিম সংস্কৃতির ছোঁয়া, বিশ্বাস, সংস্কার, জীবন-জীবিকা, সহজ সরল ধর্ম মানবিকতা তারই মাঝে চালাক, ধুরন্ধর, লোভী জাফরুল্লা সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রতীক। নিঃসর্গ প্রকৃতি, অরণ্যচারী সমাজ সভ্যতাকে ভিত্তি করেই মানুষ চরিত্রগুলোকে চিত্রিত করেছেন। আসকাফ জাফরুল্লার চাকর — আদিম সমাজ সংস্কৃতির হাতিয়ার হয়ে বর্তমান কৃষিসভ্যতার পথিক হয়ে উঠেছে। অরণ্যের সেই প্রকৃতি সমাজ সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড়তার মাঝে মানবসভ্যতার আগ্রাসী মনোভাব, বন উচ্ছেদ, দখলদারী,

জমিদারির ক্ষমতা বিস্তার; মানুষকে পশুর মত দাসত্বে বাধ্য করার মানসিকতার উচ্ছ্বাস, সব মিলিয়ে ভিন্ন এক প্রতিবেশ রচনা করে প্রেক্ষাপটের বিস্তারে। হারানো জল জঙ্গল, বুনো জন্তু, মোষ, বাইসন, অতীত সময় কথা বলে ওঠে। অরণ্য ধ্বংস, কালো পিচের রাস্তা ধরে প্রকৃতি সভ্যতাকে গ্রাস, আধিপত্য কায়েম ইত্যাদির আড়ালে শোষণ শাসনের ব্যাপ্তি প্রতিভাত হয়েছে। ঘটনার বিন্যাসে চরিত্রগুলি এই পরিবর্তনের ক্রিয়নক হিসাবে বিচরণ করেছে সময় সভ্যতার শরিক হয়ে। আসকাফ, কমরুদ্দিন, মুন্নাফ চরিত্রগুলি বনের কোলে এক শৃঙ্খলার মধ্য থেকে পরিবর্তনকে অনুভবে দেখে নেয়। আসলে এই পরিবর্তন শুধু বাইরের নয় ভেতরের। জাফরুল তার শরিক। ভোগের লিপ্সায় অরণ্য নিষ্কাশিত হয়ে সমাজ সংস্কৃতির পরিবর্তন 'মহিষকুড়ার উপকথা'র মূল আবেদন। বন্য মোষের মত, বাইসনের মত প্রকৃতির শৃঙ্খলকে বশে আনার লড়াই। সেখানে জাফরুল্লার লড়াই জোর করে জমি দখল, সেটেলমেন্টের লোকজনকে নিয়ন্ত্রণে আনা, বেআইনি কাজ করা সবই তথাকথিত সভ্যতার আড়ালে বেড়ে উঠেছিল। আসকাফের চোখে ধরা পড়েছে বুনো মোষের পোষ মানার মত বিষয়। মহিষকুড়ার উপকথা একাধিক খণ্ডাংশের গল্প। সেখানে অনুভূতি উপলব্ধিই প্রাধান্য পেয়েছে। ইতিহাস রূপকথা-উপকথা মিলেমিশে সময়, স্থিতিকে অবলোকন করেছে ছোট ছোট চরিত্রের মধ্য দিয়ে। এই প্রান্তীয় অংশের সমাজজীবন যেভাবে অরণ্য ঘেষা নিরালম্ব স্থিতিতে চলমান ছিল তা হঠাৎই ধীরে ধীরে বদলাতে শুরু করে সভ্যতার গুটিকয় মানুষের পিপাসায়। ইতিহাস ভূগোল বদলে যায়। এই সরল জনপদের অধিবাসীদের সমাজজীবনের রূপান্তরের কথকতা আমাদের ভাবায়। 'ডারিঘর' যেমন আগুনের মালসা ঘর হয়, আসকাফের তাই বিভ্রান্তি হয় 'ভুলুয়া ধরলে কালে জ্বর হয়', 'ভুলুয়া ধরা', 'পরী ধরা' বিষয়গুলি তাই নিছক বিষয় নয়। বৃত্তান্তের ভেতর নড়াচড়া করে। যেমন করে বাথান গড়ে ওঠে, বুড়ি মোষের মৃত্যু হয়। চরিত্রে (জাফরুল্লা, আসকাফ, মুন্নাফ) এতদঞ্চলে নস্য শেখ মুসলিম সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে উঠে এলেও আদপে এই অঞ্চলের আদি জনগোষ্ঠী রাজবংশী সমাজও এর বাইরে নয়। দীর্ঘ এক পরিবর্তনের সাক্ষী। চোখের সামনে এই ঘন পরিবর্তন অনুভবের জগতে নাড়া দেয়। 'মহিষকুড়ার উপকথা' এক দীর্ঘ সময়ের পরিবর্তনের বৃত্তান্ত। ছোট ছোট ঘটনায় (পিচের রাস্তা, বাথান, রিজার্ভ ফরেস্ট ঘোষণা, জাফরুলের লরি কেনা, শহরে ওষুধ আনতে যাওয়া ইত্যাদি) সবই একপ্রকার বিস্তার। রাজবংশী সমাজও

এই পরিবর্তন, সময়ের শরিক। ভূমিজ কৃষি সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সমাজ সংস্কৃতির যে পরিবর্তন সেটাকেও অন্তরালে সূচিত করেছে। মীরজুমলার আগমন দিয়ে যে সময়কালের সূত্রবিন্দু ধরা হয়েছে পরবর্তীকালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আইনকানুন, বিভিন্ন উপায়ে জাফরুলের মতো জমিদারের উদ্ভব সবই রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির বাইরে নয়। এই ছবি তো শুধু প্রান্তীয় কোচবিহারের একটি অংশের নয় সামগ্রিকভাবে রাজবংশী সহ অন্যান্য সমস্ত জনগোষ্ঠীর চোখের সামনে ভূগোল-ইতিহাস পাল্টানোর উপকথা। সেখানে সংস্কৃতির বিষয়টি তো ওতপ্রোতভাবে আসে। 'মহিষকুড়ার উপকথা' তাই এতদঞ্চলের সামগ্রিক পরিবর্তনের আখ্যান। আবাহন কালের সমাজ ও সংস্কৃতির দিক চিহ্নিত বিস্তার।

'নয়নতারা' উপন্যাসে তিনি উনিশ শতকের পরিবর্তমান সমাজ ও সময়কে চিহ্নিত করেছেন। 'মহিষকুড়ার উপকথা'তেও তিনি এতদঞ্চলের কয়েকশ বছরের পরিবর্তনকে ধরতে চেয়েছেন। সেখানে শুধু ভূগোল-ইতিহাস ছিল না, ছিল সমাজ সংস্কৃতি, মনন ভাবনা সেইসঙ্গে আপোষ ও সমঝোতার মানসিক পরিবর্তন যেমনি করে বুনো মোষ 'ফান্দি'র দ্বারা বাথানের মোষ হয়ে পোষ মানে, তেমনি। সমকালীন নানা সংস্কার, চেতনা, অভিপ্রায়, দ্বিধাদ্বন্দ্ব, লড়াই, সমঝোতা, জাফরুলের মত লোকের উত্থান সবই সময়কালের নিরিখে সমাজ ও ইতিহাসের কথকতা ও অতিক্রমণ বৃত্তান্ত।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের আরেকটি অসামান্য উপন্যাস 'দুখিয়ার কুঠি' (১৩৬৪ বঙ্গাব্দ)। যে উপন্যাসে উত্তরবঙ্গের আদি কৌম জনগোষ্ঠীর সমাজ সংস্কৃতি পরিবর্তনের সময় সন্ধিক্ষণ সূচিত হয়েছে সড়ক যোগাযোগের বিস্তার ভূমিতে। এই সড়ক যোগাযোগকে ঘিরেই উত্তরের এক প্রান্তীয় খণ্ডে সমাজজীবন আধুনিকতার অনুসন্ধান খোঁজে। লোকায়ত সংস্কৃতি ইতিহাস প্রমুখ হয়ে ওঠে ঘটনার বিন্যাসে। আরণ্যক প্রকৃতি নিবিষ্ট কৌম সমাজ প্রাথমিক স্তরে সভ্যতার যোগাযোগকে মেনে নিতে পারে না। বিস্ময়, কৌতূহল, আকর্ষণকে পাথেয় করে ধীরে হলেও আধুনিকতার পরশ নিতে শুরু করে কৌম জনগোষ্ঠী। তাদের জীবনধারা পাল্টে যায়, জীবিকা পাল্টে যায়, অনেকে শহরমুখী হয়, অনেকের মধ্যে আধুনিক হওয়ার আগ্রহ তৈরি হয়, সচেতনতা বৃদ্ধি পায়, দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে যায়। অনেকে সর্বস্বান্ত হয়ে রাগ, ক্ষোভ, দুঃখ নিয়ে জীবনজীবিকার স্বার্থে অন্যের দাসত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হয়। মাতালু, কাঁকরুর মত চরিত্রগুলি এই দ্বিধা দ্বন্দ্বের

ভাবনা নিয়েই বিষয়ের প্রতিনিধিত্ব করেছে। এই নতুন আধুনিকতা যে এক নতুন সংকটের জন্ম দেয় সেটা ঘটনার বিন্যাসে ধরা হয়। একটা পরিবর্তন — সমাজের পরিবর্তন — সর্বোপরি সাংস্কৃতিক পরিবর্তন। সময়কাল ক্ষণটিকে ঘটনার বিন্যাসে আনুমানিক চিহ্নিত করা যায়। বিংশ শতাব্দীর সূচনা লগ্নের পাশাপাশি সময়কে ধরলে বোঝা যায় আরণ্যক প্রকৃতি ঘেষা সমাজজীবনে কীভাবে আধুনিকতার ঢেউ ছুঁয়ে যায়। মানুষের আগমন বেড়ে যায়। যাতায়াত সুগম হয়। গ্রাম গঞ্জে মানুষের বনভূমির সংকোচন ঘটে। পোশাক আশাক পাল্টে যায়। বিলাতি কাপড় চোপড় আসতে থাকে। এন্ডির চাদর, হাতে বোনা কাপড়ের কদর কমে যায়। হাট বাজার, দোকানপাটের চেহারা বদলে যায়। গ্রামের শান্ত স্নিগ্ধ জীবন গতিময়, চঞ্চল হয়ে ওঠে। মাতালুর মত কিছু মানুষের আধুনিকতার প্রতি ঝোঁক তৈরি হয়। আধুনিকতা শহুরে সভ্যতার নানাবিধ উপসর্গ গ্রাম্যজীবনেও অন্তর্ভুক্ত হয়। ঠক লোকের সংখ্যা বাড়ে। মাফিয়ার জন্ম হয়। ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব বাড়ে। ভাইয়ে-ভাইয়ে মামলা মোকদ্দমা, অর্থ উপার্জনের জন্য লখাই চক্রবর্তীর মত চোরাকারবারীর আগমন ঘটে। সব মিলিয়ে সম্পর্কের মধ্যে জটিলতর বিন্যাস রচিত হয়। ভয়, অবিশ্বাস, ক্রোধ, ক্ষোভ অনেক কিছুর জন্ম দেয়। দুখিয়ার কুঠি উপন্যাসে গদাধর নদী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার নিস্তরঙ্গ জীবনে কৌম আদিবাসী জনগোষ্ঠীর লোকায়ত ভুবনের কথাই বিন্যস্ত হয়েছে। এই উপন্যাসের ঘটনাক্রমে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বিশেষ করে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, সর্বোপরি সাংস্কৃতিক পট পরিবর্তনের ছবিই ধরা পড়ে। মূলত ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, ব্রিটিশ উপনিবেশিক ক্ষমতা বিস্তার, ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার পরিবর্তন কিছু মানুষ ও সরকারি কর্মচারীর যোগসাজসে নতুন শ্রেণির উদ্ভব, অভিবাসী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি সব মিলিয়ে গ্রাম সমাজ পাল্টানোর সাথে সাথে এতদঞ্চলের রাজবংশী সমাজ গভীর সংকটে আবর্তিত হয়। প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ত্বরান্বিত হয়। রাজবংশী জনগোষ্ঠী এক সন্ধিক্ষণের মুখোমুখি হয়। জীবনজীবিকা থেকে পরিবেশ, সামাজিক ব্যবস্থা, মনন বোধ ভাবনা সবেতেই এক দ্বিধা দ্বন্দ্বের সূচনা ঘটে তাই যথাযথভাবে 'দুখিয়ার কুঠি' উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। এই উপন্যাসে ঘটনা বিষয়ক্রম থেকে আমরা সুন্দরভাবে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর এক সাংস্কৃতিক বিবর্তনের সূচনা ও পরিক্রমণের বৃত্তান্ত পেয়ে যাই।

আরেক শক্তিশালী ঔপন্যাসিক দেবেশ রায়ের কয়েকটি উপন্যাসে (মফঃস্বলি বৃত্তান্ত, তিস্তাপারের বৃত্তান্ত, তিস্তাপুরাণ) রাজবংশী সমাজজীবন ও সংস্কৃতির উপাদান ধরা পড়েছে। সাহিত্যিক দেবেশ রায় দীর্ঘদিন উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলায় থেকেছেন। স্বাভাবিকভাবে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় ছিল। তারই প্রতিফলন ঘটেছে এই উপন্যাসগুলির পটভূমিকায়। এই তিনটি উপন্যাসেই প্রতিফলিত হয়েছে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলায় বসবাসকারী রাজবংশীদের সমাজজীবন। জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যেই উপন্যাস তিনটির ঘটনাবিন্যাস ঘোরাফেরা করেছে। উপন্যাসগুলিতে অন্যান্য জনগোষ্ঠীদের কথাও এসেছে তবে মূলত রাজবংশী সমাজজীবনের কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। 'মফঃস্বলি বৃত্তান্ত', 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' দুইটি উপন্যাসেই জোতদারদের কথা এসেছে, আধিয়ারদের সঙ্গে সম্পর্কের কথা এসেছে, ভূমি সংস্কার আইনে জমি খাস হওয়ার বিষয়টি এসেছে। 'তিস্তাপারের বৃত্তান্তে' আছে জোতদারদের নিঃস্বত্ব ভূমিদাসের (চাকিন্দার) বাঘারুর কথা। তিস্তাপুরাণে আছে একটি জোতদার পরিবারের চাষবাস ও প্রাত্যহিক দিনলিপির ভাষ্য। 'তিস্তাপুরাণ'-এ রাজবংশী সমাজজীবন সংস্কৃতির বিস্তৃত বিবরণ তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। বাড়িঘর নির্মাণের বাস্তুতন্ত্রের শ্লোকটি উল্লেখ করে "পুবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ/উত্তরে গুয়া, দক্ষিণে ধুয়া।" আগদোর অর্থাৎ বাইরের 'এগিনা'য় ডারিঘর (বৈঠকখানা) ও ঠাকুরবাড়ি থাকার বিষয়টি তুলেছেন। 'ডারিঘরে'র বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। যদি তৎকালীন সময়ের জোতদার আধিয়ার সম্পর্কের আভাস সেভাবে স্পষ্ট হয়নি। শুধু 'তিস্তাপারের বৃত্তান্তে' গয়ানাথ জোতদারের সঙ্গে তাঁর চাকিন্দার বাঘারুর পার্থক্যটাকে স্পষ্ট করেছেন। জোতদারি ব্যবস্থার অনেক কিছু তাঁর উপন্যাসে ধরা পড়লেও পারস্পরিক সম্পর্কের যথাযথ ছবিটা ধরা পড়েনি। 'তিস্তাপুরাণে' একাধিক জোতদারের প্রসঙ্গ এসেছে। বুড়িমার গোতের প্রসঙ্গ ধরেছেন, আধিয়ারের প্রকারভেদের কথা তুলেছেন। অনেকে জোতদার হয়েও অন্য জোতদারের আধিয়ারী করতেন। ফরেস্টের জমি নিয়ে চাষ করার বিষয়টি উত্থাপন করেছেন। আবার অ-কৃষক জোতদারদের উদ্ভব নিয়েও কথা বলেছেন যাদের সঙ্গে আধিয়ারদেরও সরাসরি যোগাযোগ ঘটত না। তবে কোন উপন্যাসেই তিনি জোতদারকে অত্যাচারী শোষক হিসাবে প্রতিপন্ন করেননি। বরং পারস্পরিক যোগাযোগ, বিপদে আপদে পাশাপাশি থাকার বিষয়টি আলোকপাত করেছেন। আকাল বা সংকটে আধিয়ারদের

জোতদার সাহায্য করতেন এই আভাসই দিয়েছেন। সেই সময়কার জোতদার-আধিয়ার সম্পর্কে খারাপ ধারণা হয় না। বঙ্গদেশের অন্যান্য জায়গায় জোতদার জমিদারদের অত্যাচারের যে ঘটনার কথা শোনা যায় উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়িতে অন্য ছবিই পাওয়া যায়। গরিব কৃষকদের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন। ''শিষ দেখিলে বিশ দিন, কাটে মারে দশ দিন'' প্রবাদে বর্ণিত হয়েছে। সামগাইনে চাল তৈরির বিষয়টি তিনি উল্লেখ করেছেন। 'হাউলি' খাটার কথাও তিনি তিস্তাপুরাণে উল্লেখ করেছেন। তার তিস্তাপুরাণ উপন্যাসে বিভিন্ন পেশার কথা জানতে পারি কলা বেচা, পান বেচা, কাপড়িয়া তেমনি ঘাটোয়ালদের কথাও উল্লেখ করেছেন। গাছে ওঠার মানুষ, গুয়া মানষি — যিনি সুপারি পেড়ে দেন, গীদালদের কথা বলতে ভোলেননি। আবার চাকিন্দার, রাখোয়াল, গাড়িয়াল বন্ধু, মাহুত, মৈষালদের কথাও বলেছেন। কষ্টের বৃত্তি ও জীবনের সুখ দুঃখের বিবৃতি দিতে গিয়ে তিনি ভাওয়াইয়া গানের প্রসঙ্গ টেনেছেন। এছাড়াও খাবারদাবার, পোশাক (ফোতা), ছ্যাকাপাড়া, ছ্যাকা-প্যালকা, খোকরা ভাত (বাসি ভাত) খাওয়া খাদ্যাভ্যাসের বিষয়গুলি তুলে ধরেছেন। নামকরণে সময়কাল ধরে রাখার নীতির কথাও তুলে ধরেছেন। আবার তিস্তাবুড়ি পূজার গানে পছোরা চাদরের প্রসঙ্গ টেনেছেন।

সামগ্রিকভাবে বলা যায় দেবেশ রায়ের এই তিনটি উপন্যাসে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ের রাজবংশী সমাজজীবনের ছবি পাওয়া যায়। রাজবংশী সমাজের বাসস্থান, পেশা, খাদ্যাভ্যাস, পোষাক সহ আরও কিছু রীতিনীতি তিনি বিস্তার ধরেছেন। এটা বলা যায় স্বাধীনতা পূর্বকালের কয়েক দশকের আর্থ-সামাজিক কাঠামো সহ রাজবংশী সমাজজীবনের বিস্তৃত ছবি তিনি আখ্যানে তুলে ধরেছেন। সেইসঙ্গে রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির পরিবর্তনের সূচনা সময়কালকেও আধারিত করেছেন। কারণ তখন অভিবাসনের চাপ ততটা বোঝা হিসাবে চাপেনি উত্তরবঙ্গের জনজীবনে। একটা স্থিমিত নিস্তরঙ্গ শান্ত জীবনযাপনে উত্তরবঙ্গের মানুষ বিশেষ করে রাজবংশী সমাজের সমাজ ও সংস্কৃতি স্থিতাবস্থায় ছিল। কারণ তার পরেই বিশেষ করে স্বাধীনতার পরের দশকে জনবিন্যাসের চেহারা পাল্টানোর সাথে সাথে রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতি বিবর্তমান হয়ে পড়ে। ক্ষোভ-বিক্ষোভও দানা বাঁধতে থাকে। পরবর্তী সময়কালটা আমাদের জানা — ভূমি সংস্কার, অপারেশন বর্গা, তেভাগা আন্দোলন নানাবিধ বিষয় রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির বুকে ঢেউ তোলে। দেবেশ রায়ের উপন্যাসে আমরা রাজবংশী সমাজজীবনের বিশ শতকের প্রথম ভাগের

ছবি যেমন পাই তেমনি পরবর্তী কয়েক দশকে আর্থসামাজিক কাঠামো ছবি বদলানোর সাথে সাথে সমাজ, সংস্কৃতি পরিবর্তনের বিষয়টিকে অনুধাবন করতে পারি। অমিয়ভূষণ মজুমদারের উপন্যাসে যেমন অরণ্য ধ্বংস, কৃষিজমির সম্প্রসারণ, সেটেলমেন্ট ব্যবস্থা, সরকারি আইন বিধিব্যবস্থা, যোগাযোগের রাস্তাঘাট নির্মাণ, আধুনিকতার পরশ তার ঘাত-প্রতিঘাত, জনগণের বিভ্রান্তি, সমাজ সংস্কৃতির পরিবর্তন, সেইসঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক ব্যক্তিবর্গের আগ্রাসন ইত্যাদি বিষয়গুলি জানতে পারি এবং সেটা সময়কালের নিরীক্ষণে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর আর্থসামাজিক অবস্থান। ফলত দুই ঔপন্যাসিকের আখ্যানে আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না যে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি বিভিন্ন ঘাত -প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে আজকের সময়ে এসে পৌঁছেছে এবং সেটা গ্রহণ বর্জন, আত্তীকরণ, সংরক্ষণ ইত্যাদি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে।

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস ‘বর্ষাদুয়ার’ সম্পূর্ণভাবে রাজবংশী সমাজের লোকদেবতা ‘মাশান’কে ঘিরেই আবর্তিত। মাশানকে ঘিরে ভয় বিশ্বাস, সংস্কার প্রতিপাদ্য হয়ে উঠেছে। মাশানের যাবতীয় প্রকারভেদ, চরিত্র, রাজবংশী সমাজজীবনে তার প্রভাব এই উপন্যাস থেকে জানতে পারি। সেইসঙ্গে তৎকালীন সময়কালে ঝাড়ফুঁক, তুকতাক, কুসংস্কার, অন্ধত্ব, অসহায়তার কথা উঠে আসে। দেউসী, ভৌরিয়াদের আধিপত্য, তাদের ধান্দাবাজির বিষয়গুলিও উঠে আসে। উত্তরের চা-বাগানকে ঘিরে গড়ে ওঠা ঔপনিবেশিক জীবন, পরিবর্তমান সময়কালকে ঔপন্যাসিক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। লোক উপাদানের বুনোনে রাজবংশী সমাজে প্রচলিত প্রবাদ, গানকেও সুন্দরভাবে ব্যবহার করেছেন। যেমন রেলগাড়ির চলা দেখে পটেশ্বরীর উচ্চারণ —

ইঙ্গিরাজের বুদ্দি ভারি
আনিছে এল গাড়ির কল।
এক দিক দি অঠিছে ধয়া
এক দিক দি পড়েছে জল।

আবার বর্ষায় জল জঙ্গলের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে পশুপাখির সঙ্গে মাহুত আন্ধারুর গলায় গান শোনায় —

'আরে তোমরা গেইলে কি আসিবেন, মোর মাহুত বন্ধুরে
হস্তী রে নড়ান, হস্তী রে চড়ান, হস্তীর গলায় দড়ি
ওরে সত্য করিয়া কন রে মাহুত, কোন বা দ্যাশে বাড়ি রে।

আবার রানীবালা তার শ্বশুরের উচ্চারিত শিল্লুক প্রবাদ উল্লেখ করে ধারাবাহিক পরম্পরা ঐতিহ্যকে স্মরণ করায় —

উত্তম কৃষি, মধ্যম বাণ
ধিক চাকরি, ভেক নিদান!

উত্তরবঙ্গে ষাট-সত্তর দশকে অবস্থান, ক্ষোভ-বিক্ষোভ, একটা অংশের জঙ্গী হয়ে যাওয়া, তাদের চাওয়া পাওয়া সবই বৃত্তান্তে ঢুকেছে। শালগুড়ি বাগানের চারপাশ বদলে যাওয়ার সাথে সাথে রাজবংশী সমাজজীবনের ঘাত-প্রতিঘাত ঘটনার বিন্যাসে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। যা সময়কালকে চিহ্নিত করে। মূলত বিশ শতকের দীর্ঘ সময়ে উত্তরবঙ্গের সমাজজীবন ও রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির সংকট অপসৃয়মানতাকে উপজীব্য করা হয়েছে উপন্যাসের পরিক্রমায়। সেখানে তাই লোকসাহিত্যের উপাদানগুলি অনায়াসে ঠাঁই পেয়ে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির বিষয়টিকে উজ্জ্বল করেছে। এই 'বর্ষাদুয়ার' উপন্যাসটি সম্পূর্ণভাবে উত্তরবঙ্গের সমাজজীবনকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর সম্পূর্ণ সময়কালটি এই উপন্যাসটির পথ ও পরিসর হলেও ষাট সত্তর দশকে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর ক্ষোভ-বিক্ষোভ, আন্দোলনকে প্রেক্ষাপট করে তিনি বিগত বিশ শতকের শেষদিকে উত্তরবঙ্গের সময়কে ইঙ্গিত করেছেন। সেইসঙ্গে রাজবংশী সমাজজীবনের পরিবর্তন, সাংস্কৃতিক সংকট ও উত্তরণের প্রয়াস সমস্ত কিছুকে উপজীব্য করে নতুন সময়ের আগমনকে সাহিত্যের ঘটনায় তুলে ধরেছেন।

দেবেশ রায়ের বহু গল্পেও রাজবংশী সমাজ জীবনের কথা ধরা পড়েছে। আটষট্টি সালের বন্যা, বর্গা অপারেশন, নকশাল আন্দোলন, ভেস্ট জমি দখল, তিস্তা নদী ও বাঁধ প্রভৃতি ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজবংশী সমাজ জীবনের লড়াই, ঘাত-প্রতিঘাতকে তিনি চরিত্র বিন্যাসের মধ্যে প্রতিফলিত করেছেন। তাঁর 'দখল' গল্পটিতে যেমন তিস্তার গতিপ্রকৃতির সাথে কিছু মানুষের চরের জমি দখল এবং চাষবাসকে ঘিরে সংঘবদ্ধ লড়াই। তিলক চন্দ্রের দখলের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তাদের ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে ড্যামনা, অরিদাস, অমনীরা তো রাজবংশী সমাজের উচ্ছেদ

হওয়া আধিয়ার ভূমিহীন বেকার যুবক। প্রজাসত্ত্বের আইনে উচ্ছেদ হওয়া আধিয়ারদের গল্প 'দখল'-এ সে-সময়কার অবস্থানই বর্ণিত হয়েছে। 'ধর্ণা' গল্পে যেমন অনাহার ক্লিষ্ট বন্যার্ত মানুষ যারা ভাতের জন্য সরকারি লঙ্গরখানায় সমবেত হয়। 'বানা' অর্থাৎ বন্যা গল্পে যেমন তিস্তার তীরবর্তী মানুষের হাহাকার অসহায়তা ফুটে উঠেছে। সেখানে তো রাজবংশী মানুষেরও স্পন্দন আছে। 'অনৈতিহাসিক' গল্পেও তাই, সেখানে তিস্তার অববাহিকায় বেঁচে থাকা মানুষের লড়াই, টিকে থাকা কিংবা ভেসে যাওয়ার গল্প। সেখানেও রাজবংশী সমাজ জীবনের ছবি ধরা পড়েছে গল্পের বিন্যাসে। 'মূর্তির মানুষ' গল্পটিতে তো গ্রামের টটাই, যে কিনা রাজবংশী সমাজের কৃষক প্রতিনিধি 'অবহেলিত উত্তরবাংলার অবহেলিত লোকশিল্পী' হিসেবে মানব পুতুল সেজে একাকার হয়ে যায়। প্রফেসর কিনুর ভাবনার মধ্য দিয়ে নাগরিক সমাজের কাছে রাজবংশী মানুষের সমাজ জীবনের প্রস্তাবনা নিদারুণভাবে ধরা পড়ে। টটাই অনেকটা বাঘারুর মতো প্রতিনিধি হয়ে উপস্থাপিত হয়। 'জোত জমি' গল্পটিতে বর্গা অপারেশনকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। আধিয়ারদের নাম নথিভুক্তকরণ নিয়ে পিতৃপরিচয় হীন কৈলাশচন্দ্রের উচ্চারণের মধ্য দিয়ে সে সময়কার অনেক রাজবংশী কৃষকের ভূমিচ্যুত হওয়ার গল্পই ধ্বনিত হয়েছে — "এইঠে মুই কৈলাশচন্দ্র পর্বত হালুয়া। হুজুর মুই এই জমিখানের হালুয়া। মোক শিকড়-বাকড়-সুদ্ধা উপড়ান, উপড়ান হুজুর, মুই এই জমির তাল-তাল মাটি নিয়া উপরি আসিম।" 'গীতাল যুগীনের টেকনোলজি গ্রহণ' গল্পে ফুটীন গীদালের মধ্য দিয়ে রাজবংশী সংস্কৃতির বিবর্তমানের ছবিটা ধরা পড়েছে। ভাষা বদলে, যন্ত্রানুষঙ্গ বদলে ভাওয়াইয়া গানের আধুনিক গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবার মধ্য দিয়ে পরিবর্তনের বিষয়টি গল্পের উপজীব্য হয়ে উঠেছে।

দেবেশ রায়ের গল্পে জলপাইগুড়ি তরাই-ডুয়ার্সের সমাজ জীবন জীবন্ত হয়ে ধরা পড়েছে। সেখানে রাজবংশী সমাজ-সংস্কৃতির কথা বাস্তবতা ও বহুরৈখিক মাত্রায় উপস্থাপন করেছেন। ঘটনার বিন্যাসে তার ব্যাখ্যান ভিন্ন এক সুর, মাত্রা তৎকালীন সমাজ জীবনের প্রতিভাস হয়ে আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়। বলতে দ্বিধা নেই দেবেশ রায় উপন্যাসের মতই গল্পেও রাজবংশী সমাজ জীবন ও সংস্কৃতির চালচিত্রকে প্রধানত প্রাধান্য দিয়েছেন।

অভিজিৎ সেনের 'দেবাংশী' গল্পটির প্রসঙ্গও গুরুত্বপূর্ণ। এই নাটকে তেভাগার বিষয়টি যেমন প্রাধান্য পেয়েছে তেমনি আদি কৌম জনগোষ্ঠীর সংঘবদ্ধতা, প্রতিরোধ মানসিকতার

সন্ধান পাই। পাঁচের দশকের তেভাগা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে গ্রামের (দক্ষিণ দিনাজপুর) সহজ সরল মানুষেরা সেতু, চৈতা, নগেন, গিদন প্রতিবাদে মুখর হয়। দাবী আদায়ে সক্রিয় হয়। সেইসঙ্গে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সচেতনতা, দেবাংশী হয়ে ওঠার দেবত্ব ও মানবিক দ্বন্দ্বের অবকাশ তাকে জারিত করে। ভূত, প্রেত মন্ত্রে বিশ্বাস ধর্মীয় পূজার্চ্চনার মধ্যে যে অসহায়তা সেটাকে তুলে ধরে আলোর সন্ধান সেটাও দেবাংশীতে স্পষ্ট হয়। সর্বোপরি রাজবংশী জনগোষ্ঠীর এক নতুন সচেতনতার যাত্রাকে ঘোষণা করে। ধর্মীয় কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাসকে নস্যাৎ করে সামন্ততান্ত্রিকতা কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ লড়াইকে (তেভাগা আন্দোলন) প্রতিষ্ঠিত করেন। এই প্রেক্ষিতে বুঝে নেওয়া যায় পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাজবংশী জনগোষ্ঠী লড়াইয়ের শরিক হয়েছে। সেখানে সমাজ ও সাংস্কৃতিক বদ্ধতা থেকে বেরিয়ে আসারও লড়াই এক পরিবর্তনকে সূচিত করে। বলা যায় রাজবংশী জনগোষ্ঠীর এক উত্তরণের পর্যায় কথা। অভিজিৎ সেনের 'দেবাংশী' তাই নিছক পুজোর পুরোহিত নয়; নতুন এক যুগপরিবর্তনের সূচনা পুরুষ।

এছাড়াও অনেকেই রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতিকে তাদের উপন্যাসের কিংবা গল্পের উপজীব্য করেছেন। সমাজ সংস্কৃতির পরিবর্তনকে সূচিত করেছেন। যেমন বিপুল দাস তাঁর 'লাল বল' উপন্যাসে ভূমিসংস্কার, অপারেশন বর্গা, আধিপত্যহীনতার বিষয়গুলি উত্থাপন করে রাজবংশী সমাজের সংকট, উত্তরণের বিষয়গুলি ধরার চেষ্টা করেছেন। আয়ুর আল প্রামাণিক, সোনামণি সরকারদের জমিদারি চলে যাওয়ার ফলে শরণার্থীদের মধ্যে জমির পাট্টা বিলির ঘটনাকে কেন্দ্র করে আর্থ-সামাজিক কাঠামো বদলের বিষয়টি এসেছে। লেখক তারই প্রেক্ষিতে বর্তমান সময়ের রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির অবস্থানকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন।

পীযূষ ভট্টাচার্য যেমন তার 'বোধন পর্ব' গল্পে পরিবর্তিত সমাজ অর্থনীতির কাঠামোয় সহজ সরল রাজবংশী যুবক বাংকার-এর চতুর হওয়ার গল্প বলেছেন। আবার কীভাবে সমাজ বদলের সাথে সাথে সাধারণ একজন লোক শিল্পী তথা সহজ-সরল, সাধারণ মানুষের মনন জগতের ছবি পালটে যায় সেটা তুলে ধরেছেন। এটাও পরিবর্তনের একটি দিক, সেটা 'বোধন পর্ব' গল্পে ধরা পড়েছে। দীনেশ চন্দ্র ডাকুয়ার 'উত্তরের গল্প'-এ রাজবংশী সমাজ জীবনের বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। ভাষার প্রসঙ্গ যেমন এসেছে, রাজনীতির কথা, সমাজ ভাবনার কথা তিনি চারটি গল্পে বিধৃত করেছেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়কালের রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির

প্রসঙ্গে তিনি সুন্দরভাবে অতীত কথার সমন্বয় ঘটিয়েছেন। এছাড়াও চোমংলামা, দেবাশীষ চক্রবর্তী, জীবন সরকার তাদের উপন্যাস, গল্পে রাজবংশী সমাজজীবনের কিছু কিছু দিক তুলে ধরেছেন। যা সময়ের নিরিখে পর্যালোচনার অবকাশ রাখে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় ড. চারুচন্দ্র সান্যালের 'দি রাজবংশীস অব নর্থবেঙ্গল' গ্রন্থটির নাম। এই গ্রন্থটি রাজবংশী জনগোষ্ঠীর 'সমাজ ও সংস্কৃতি' বিষয়ক আকরগ্রন্থ। নৃ-গোষ্ঠীগত পরিচয় থেকে ঐতিহাসিক পরিচয়, ব্রিটিশ আধিকারিক গবেষকদের সর্বেক্ষণ সবকিছুই ধারাবাহিকভাবে উল্লেখিত হয়েছে। পাশাপাশি বিংশ শতাব্দীতে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তিনি তুলে ধরেছেন। যদিও যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা কিংবা অন্যান্য কারণে উত্তরবঙ্গের বিস্তৃত অঞ্চলের রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির বিষয়গুলি সন্নিবেশিত করতে পারেননি। তথাপি বলা যায় এই গ্রন্থটি রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক আকরগ্রন্থ। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এমন এক সন্ধিক্ষণে যে সময় অর্থাৎ স্বাধীনতার পরবর্তী দুই দশক পরে যে উত্তরবঙ্গের আর্থসামাজিক কাঠামোর যেমন ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে তেমনি রাজবংশী জনগোষ্ঠীও এক পরিবর্তনের মুখোমুখি হয়। জনবিন্যাসের পরিবর্তনের সাথে সাথে মনন দর্শন ও চেতনারও পরিবর্তন ঘটে। সেইসঙ্গে ক্ষোভ-বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশও একটা অংশ আলোড়িত হয়। স্বাভাবিক এই গ্রন্থটি রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির এক সন্ধিক্ষণে গ্রন্থিত। কারণ এরপরেই দ্রুত রাজবংশী সমাজ সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এমনকী ধর্মীয় সাংস্কৃতিক দিক থেকে পরিবর্তনের শরিক হয়।

উল্লেখ করতে হয় উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জনগোষ্ঠীর আরেক কৃতী সন্তান উপেন্দ্রনাথ বর্মনের নাম। তাঁর 'উত্তর-বাংলার সেকাল ও আমার জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে ধরা পড়েছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রাজবংশী সমাজ জীবন, অর্থনৈতিক অবস্থা, ব্যবসা বাণিজ্য, প্রতিবেশী ভুটান দেশের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক, মেলা-উৎসব সর্বোপরি মানুষের জীবন-জীবিকা এবম্বিধ বহু বিষয়। যা তৎকালীন সময়ের রাজবংশী সমাজজীবন ও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর 'রাজবংশী ভাষায় প্রবাদ- প্রবচন ও হেঁয়ালী' বিষয়ক গ্রন্থটিও রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। কারণ সে সময়ে রাজবংশী সমাজে প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচন, শিল্লুক (শ্লোক) যা লোকসাহিত্যের উপাদান হিসাবে বিধৃত করেছেন। যা তৎকালীন রাজবংশী সমাজ জীবনের মনন ভাবনার দলিল

ও লোকশিক্ষার বার্তা বহন করে। ড. গিরিজাশংকর রায়ের লোকসাহিত্যের সংগ্রহ গ্রন্থটিও (১ম ও ২য় খণ্ড) গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই সংগ্রহের মধ্যে দিয়ে সমাজ জীবনের জীবন্ত উপাদানগুলি ধরা পড়েছে। তাঁর 'উত্তরবঙ্গের ক্ষত্রিয় জাতির পূজা-পার্বণ' গ্রন্থটিতে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের রাজবংশী সমাজের দেবদেবী, পূজার আচার-সংস্কার, জীবন চর্যার রীতিনীতি, ধর্মীয় প্রভাব ও সংস্কৃতির বিষয়গুলি আধারিত হয়েছে। যা পরবর্তীকালের সময়ের নিরিখে সংস্কৃতির চালচিত্র বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ। গ্রন্থটিতে রাজবংশী সমাজের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বৃত্তের পরিসরটি আলোকিত হয়েছে।

সামগ্রিকভাবে বাংলা সাহিত্যেও রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তনের বিভিন্ন দিকগুলি ধরা পড়েছে গল্প অথবা উপন্যাসের বিন্যাসে, ঘটনার বিস্তারে। আমরা দীর্ঘ সময়ের পর্যায়ক্রম পরিবর্তনের বিভিন্ন দিকগুলি চিহ্নিত করতে পারি লেখকদের ভাবনার বিস্তারে, তাঁদের অবলোকন ও দৃষ্টিভঙ্গির দূরদর্শিতায়। সহায়ক হয়ে ওঠে দীর্ঘ সময়ের অবকাশে কীভাবে একটা জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত, ঘটনা কিংবা পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সমাজ সংস্কৃতির পরিসরকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। অথচ অবচেতনে আদি কৌম সত্তাকে লালন পালন করে। রাজবংশী জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সেটা দেখা যায়। বাংলা সাহিত্যে তার প্রতিফলন ঘটেছে। সেটা যেমন অমিয়ভূষণ মজুমদারের কলমে প্রতিফলিত হয়েছে অনেকটা সময়কালের ব্যাপ্তি নিয়ে তেমনি দেবেশ রায়ের উপন্যাসেও স্বাধীনতার পূর্ববর্তী কয়েক দশক থেকে স্বাধীনোত্তর সময় কালের পরবর্তী কয়েক দশকের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট গ্রন্থিত হয়েছে। আর এর মধ্যেই রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির দিকগুলি, পরিবর্তনের প্রেক্ষিতগুলি চিহ্নিত হয়ে যায়।

সাহিত্য যেহেতু সমাজ দর্পণ। স্বাভাবিকভাবে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির বিষয়গুলি সময়কালের ওঠানামায় প্রভাবিত হয়েছে এবং সাংস্কৃতিক বিবর্তনের কারণ হিসাবে রাজবংশী সমাজ ও জাতিকে চালিত করেছে। তাই রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বিবর্তনের দলিল হিসাবে বাংলা সাহিত্যও গুরুত্বপূর্ণ আখ্যান ধারণ করে আছে এটা বলা যায়।

- **রাজবংশী সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি**

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে রাজবংশী জনগোষ্ঠী অনেকটা সুদৃঢ় হয়। জাতিসত্তার প্রশ্নে শুধু নয় সমাজ ও সংস্কৃতির দিক থেকে অনেক বেশি সচেতন হয়ে ওঠে। মনীষী পঞ্চানন বর্মার 'ক্ষত্রিয়করণ' আন্দোলনের প্রেক্ষিতে শিক্ষা সংস্কৃতির প্রসারে অনেকে এগিয়ে আসেন। স্বাভাবিকভাবে সাহিত্য সৃজনের বিষয়েও অনেকে ব্যাপৃত হন। এই কাজটি অবশ্য পঞ্চানন বর্মা 'রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ' পত্রিকায় সম্পাদক থাকার সময়েই গুরুত্ব দিয়ে প্রথম উদ্যোগী হন। ছড়িয়ে থাকা লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানগুলি (ছড়া, গান, কবিতা) সংগ্রহ করার পাশাপাশি মৌলিক সৃজনের প্রতি তিনি আলোকপাত করেন। রাজবংশী জনগোষ্ঠীর লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রটি সুদূরকাল থেকেই সুবিস্তৃত। লোকসঙ্গীত, লোকনাটকের ভাণ্ডারে গল্প, আখ্যান বরাবর ছিল, ছিল লোককাহিনির পরিসর। স্বাভাবিকভাবে সমাজ ও সংস্কৃতি বিকাশের সাথে সাথে গল্প, উপন্যাসের আখ্যানগুলি লিখিত রূপ পেতে থাকে। এ বিষয়ে বেশ কিছু বিদ্বজ্জনও উদ্যোগী হন। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে রাজবংশী ভাষা সাহিত্য চর্চার বিষয়টি বিস্তৃত হয় এবং গল্প, উপন্যাসও রচিত হতে থাকে। কবিতা নিয়ে অনেকে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা, বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে রাজবংশী ভাষায় কবিতার উর্বরতা বৃদ্ধি করতে থাকেন। আধুনিকতা, উত্তর-আধুনিকতার ভাববোধ রাজবংশী কবিতায় স্পষ্ট হতে থাকে। আট-নয় দশকে গল্প রচনার সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি কিছু উপন্যাসও প্রকাশ পায়। যার বিষয় বিস্তারে রাজবংশী সমাজ জীবনের কথা, ভাবনার কথা, বোধের বিষয়গুলি ধরা পড়ে। উপন্যাসের বিস্তৃত আখ্যানে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত সহ সমাজ অর্থনীতির বিষয়গুলি, সমাজ পরিসরের শোষণ শাসন, ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়া, ক্ষোভ-বিক্ষোভ-প্রক্ষোভ সর্বোপরি অভিপ্রায়ের বিষয়গুলি উঠে আসে। রাজবংশী সমাজ জীবনের মনন ছবিও প্রতিফলিত হয়। গল্পের বিন্যাসে ছোট ছোট বিষয়, ভাবনা, বক্তব্য, ঘটনার বিবৃতিও রাজবংশী জীবনকেই প্রতিফলিত করে। বিগত কয়েক দশকে রাজবংশী ভাষায় লিখিত সাহিত্যের পরিসরটি তাই ছোট নয়। যেখানে রাজবংশী সমাজ জীবনের ছবি, হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতির কথা এবং বিবর্তনের ছবিগুলিও ধরা পড়েছে।

সাহিত্য হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র রস। জিজ্ঞাসা, কৌতূহল ও জানার আগ্রহ মানুষকে সৃজনে উদ্বুদ্ধ করেছে। হৃদয়ের উচ্ছ্বাস অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে সাহিত্যের প্রকরণে। আবার বিশ্বপ্রকৃতি ও

সমগ্র মানব সমাজের মধ্যে প্রতিনিয়ত যে সঙ্গীতের ধ্বনি অনুরণিত হচ্ছে তার ভাষার রূপ হল সাহিত্য। অভিজ্ঞতা ও কল্পনার জগৎ মানব মনে রচিত হয় সাহিত্যের বহিঃপ্রকাশে, জীবন সংসারের বাস্তব রূপটিকে প্রতিভাত করে সাহিত্য। জীবনের বৈচিত্র্য, চিন্তার বিভিন্নতা, পরিবর্তনশীলতা সাহিত্যের গতি প্রকৃতি নির্ণয় করে। সাহিত্য ও সমাজ নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত যা পরস্পরকে আবদ্ধ করে। কখনও সমাজ জীবনের অগ্রগতি সাধিত হয় নব নব সৃষ্ট সাহিত্যের আধুনিকতায়, কখনও সাহিত্যের ধারাগুলি পুষ্ট হয় সমাজ জীবনের উপকরণ সমাহারে।

উপন্যাস আধুনিক জীবনের গদ্যকাব্য। এক তীব্র জীবনমুখীনতা এবং বাস্তব ঘনিষ্ঠতা আধুনিক উপন্যাসের সম্পদ। জীবন দর্শনের সমগ্রতাকে প্রতিফলিত করে উপন্যাস। সমকালীন জীবন ও মানুষের মানসিক স্তরকে বিন্যস্ত করে ভাষা ভাব ব্যঞ্জনায়। সাহিত্যের মূল উপকরণ তাই জীবন এবং জীবনের প্রতিবেশ। মানবজীবনের ভাণ্ডার থেকে সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনা, প্রেম-হিংসা, হৃদয়বৃত্তি সমস্ত কিছুই শাব্দিক অবয়বকে প্রস্ফুটিত করে সাহিত্য। ব্যক্তি হৃদয়ের আর্তি, অভিপ্রায়, স্বপ্ন, কল্পনা ও বাস্তবকে ভর করে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা (কবিতা, গদ্য, নাটক, প্রবন্ধ, গান) গুলির সম্প্রসারণ এবং শিল্পী জীবনের উপকরণ সমূহকে উপলব্ধি ও প্রকাশভঙ্গির মধ্যে দিয়ে পাঠক সমাজের হৃদয়ে উপস্থাপিত করে। সমকাল জীবন, বাস্তবতা, রাজনীতি, ইতিহাস, নৈতিকতাবোধ সর্বোপরি সমাজবীক্ষণের সঙ্গেই সাহিত্যের মূল সখ্যতা। সাহিত্য সম্পূর্ণত নির্মাণ (constructed reality) ও সৃষ্টির সমন্বয়; মানব জীবনেরই এক উন্মুক্ত ভূখণ্ড ভূমি।

ষাট-সত্তর দশকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে রাজবংশী সমাজ জীবন বিভিন্নভাবে আলোড়িত হয়। ক্ষোভ-বিক্ষোভ, প্রতিবাদের প্রকাশ ঘটে আন্দোলনের উত্তালতায়। অবহেলা, বঞ্চনার অভিযোগ তীব্র হয়। আবার অভিবাসনের চাপে ঘনীভূত সংকটের বিষয়টিও প্রচারিত হয়। শোষণের বিষয়টিও বাদ যায় না। স্বাভাবিকভাবে জাতিসত্তার সংকট সহ সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংকটের বিষয়টি গুরুত্ব পায়। একটা শ্রেণি উত্তরণের প্রয়াস চালিয়ে যান। শিক্ষা সচেতনতা বাড়ে। বিভিন্ন পেশায় ছড়িয়ে পড়ার মানসিকতারও তৈরি হয়। পাশাপাশি একটা শ্রেণির মধ্যে মধ্যবিত্ত মানসিকতার জন্ম হয়। সংস্কৃতির প্রতি ঔদাসীন্য কিংবা হীনমন্যতা বোধও তৈরি হয়। ঠিক এই সময়েই একটা শ্রেণি সাহিত্য সংস্কৃতি রক্ষা ও উন্নয়নে ব্রতী হয়। ভাষা সংস্কৃতির উন্নয়ন, মৌলিক সাহিত্য সৃজন, পত্র-পত্রিকা-গ্রন্থ প্রকাশ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে একটি সাহিত্য

সংস্কৃতির পরিসর তৈরি হয়। সেটা ধারাবাহিক চলতে থাকে এবং ক্রমশ বেগবান হয়। স্বাভাবিকভাবে রাজবংশী ভাষায় গল্প, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, গান, নাটক লেখা শুরু করে সাহিত্য অনুরাগী একটা মহল। পাশাপাশি সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ, লোকসাহিত্যের নানা দিক, বিষয়গুলি নিয়ে ব্যক্তিগত স্তরে অনেকেই সাহিত্য সৃজন শুরু করেন। অনেকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার কাজও শুরু করেন। নিয়মিত প্রকাশনারও একটা পরিসর তৈরি হয়। পর্যালোচনায় তাই দেখা যায় বিগত কয়েক দশকে সাংস্কৃতিক বিবর্তনের হাত ধরে বেশ কিছু গল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ রাজবংশী ভাষায় লিখিত হয়েছে। যার বিশ্লেষণে যেমন ধরা পড়েছে সমাজ সংস্কৃতির নানাবিধ বিষয় তেমনি পরিবর্তনের কারণ হিসাবে বিভিন্ন বিষয়কে চিহ্নিত করা যায়।

বিগত কয়েক দশকে রাজবংশী ভাষায় সাহিত্যচর্চার আবহ তৈরি হয়েছে উত্তরবঙ্গের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে। ভাষার নামকরণ নিয়ে কিছু ক্ষেত্রে বিতর্ক থাকলেও সাহিত্য অনুরাগী লেখক, পাঠক সবাই সাহিত্য সৃজনকেই গুরুত্ব দিচ্ছেন। নামকরণ বিতর্কের উর্ধ্বে উঠে বলা যায় ইতিমধ্যে রাজবংশী সাহিত্য সম্ভারের বৃত্তটি ছোট নয়। একটি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অন্তঃস্বর ধরা পড়ছে সময়কালকে ধারণ করে। কয়েক দশকে বেশ কিছু পত্র-পত্রিকা যেমন নিয়মিত বেরোয় তেমনি লেখক, কবি, প্রাবন্ধিকের সংখ্যাটিও উল্লেখ করার মত। বেশ কিছু গল্প, কবিতা, উপন্যাস সাহিত্য গুণ বিচারে আলোচনার দাবী রাখে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু লেখক-লেখিকা নিয়মিত সাহিত্য চর্চার মধ্যেই আছেন। তাদের লেখা সুধী বিদ্বজ্জনের বিচারে প্রশংসিতও হয়েছে। ধরে নেওয়া যেতে পারে ধারাবাহিকভাবে এই চর্চার পরিসরটি থাকলে রাজবংশী সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠতে পারবে।

উপন্যাস সমাজজীবনের দর্পণ। উপন্যাসে সমাজের সামগ্রিক ছবি ধরা পড়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে। লোকায়ত সমাজের ক্ষেত্রে উপন্যাসের বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাজবংশী উপন্যাসের ক্ষেত্রেও তাই, রাজবংশী সমাজ জীবনের বিভিন্ন বিষয়গুলি ধরা পড়েছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক বিষয়গুলির সঙ্গে জীবনচর্যার বিভিন্ন অনুষঙ্গগুলি গ্রন্থিত হয়েছে। আবার পরিবর্তন সমাজের টানাপোড়েন, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, চাওয়া পাওয়া, ক্ষোভ-বিক্ষোভ আবার মানবিক মূল্যবোধের জায়গাগুলিও। ঐতিহ্য পরম্পরার বিষয়গুলি তো আছেই। পরিবর্তনের সূত্রগুলিও

আখ্যানে ব্যাখ্যানে উঠে এসেছে। সাংস্কৃতিক বিকাশের স্তরগুলি চিহ্নিত হয়েছে কখনও ভাষ্যের পরিসরে। আন্তঃসাংস্কৃতিক বিনিময়ের পর্যায়, অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন, সচেতনতা ও বিকাশ, অগ্রগতি আবার সামাজিক ক্ষেত্রে স্তর বিন্যাস, মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব, পেশা বৃত্তিগত পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়গুলি রাজবংশী উপন্যাস সাহিত্যের বিষয় হয়ে উঠেছে। একটা সামগ্রিকতা এবং উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যকে অনুসরণ করে সৃজন সাহিত্যের সম্ভার হয়েছে। রাজবংশী সমাজ জীবনের গোষ্ঠীবদ্ধতা, কৃষিকেন্দ্রিক সামাজিক ও ধর্মীয়, সংস্কৃতি, সহজ, সরল প্রকৃতি নির্ভর সমাজজীবন, মনন দর্শনের পরিবর্তন উপন্যাসের বিষয় আধার হয়েও সময়কে চিন্তিত করেছে।

রাজবংশী ভাষার প্রথম উপন্যাস 'ভকোস' ১৩৮২ বঙ্গাব্দে প্রকাশ পায়। লেখক দক্ষিণ দিনাজপুরের মির্জাপুর গ্রামের বীরেন্দ্রনাথ রায়। রাজবংশী সমাজ জীবনের আধারে তাঁর উপন্যাসের বিষয় পরিসর বিস্তৃত হয়েছে। সমাজজীবন ও সংস্কৃতির কথা এসেছে। আবার পরিবর্তনের ঢেউ ও সংকটের কথা এসেছে। সামগ্রিকভাবে উপন্যাসের বিস্তৃত কিছু চরিত্রকে সামনে রেখে গল্প বলার ঢঙে পরিসর রচিত হয়েছে। সময়কালের বিস্তৃতি বর্তমান সময়ের আশপাশকে ঘিরে। সমাজজীবনের একটা সরল বৃত্তের ছবি ধরা পড়েছে লেখকের মনন ভাবনার টানাপোড়েনে। এসেছে জোতদার আধিয়ারদের কথা, ভূমি রাজনীতির সঙ্গে ইংরেজ সরকারের পদধ্বনি তিনি তুলে ধরেছেন। চিরাচরিত শোষণ নিপীড়নের বিষয়গুলি সংযুক্ত হয়ে উপন্যাসের বিস্তৃতি ও চরিত্রগুলিকে পরিস্ফুট করেছে। কথনের মধ্য দিয়ে রাজবংশী সমাজজীবনের ভাষ্য রচনা শুধু নয় আন্তঃসাংস্কৃতিক জটিলতা, সংঘাত জটিলতার বিষয়গুলিও ধরা পড়েছে। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী একটা দীর্ঘ সময়ের ঘটনাপ্রবাহ প্রতিফলিত হয়েছে 'ভকোস' উপন্যাসে। 'ভকোস' শব্দের অর্থ শোষণ। নামের মধ্যে ব্রিটিশ সময়কাল থেকে বর্তমান সময়ের সমাজের এক শ্রেণির শোষণতন্ত্রই উপন্যাসের বীজভাষ্য।

ভগীরথ দাস একাধিক উপন্যাসের রচনাকার। ইতিমধ্যে চারটি উপন্যাস প্রকাশ পেয়েছে। 'সেন্দুকের ছোড়ানি', 'বাহে জীবন', নিছালটিয়ার বাঁশি' ও 'ডাঙর আঈ'। তার লেখনীতে সময়কালের ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে। বঞ্চনার কথা, প্রতিবাদের কথা জোরালো ভাবে এসেছে। তার 'সেন্দুকের ছোড়ানি' উপন্যাসে চেতনাকে আঘাত করেই আখ্যান এগিয়েছে। শিক্ষিত যুবক কৃষ্ণকান্ত নিজস্ব অধিকার প্রতিষ্ঠায় চেতনার প্রতীক হিসাবে উপনীত হয়েছে। কয়েক দশক

আগের সময়কালকে তিনি ভাষ্য কথায় বিস্তৃতি দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। অনেকগুলো সমস্যা, অভিবাসন সমস্যা, জমি হারানোর দুঃখ, বর্ণহিন্দুদের বিদ্বেষ, তাদের লোভ লালসা, দাবিয়ে রাখার প্রবণতার বিরুদ্ধে কৃষ্ণকান্তর ভঙ্গি ও উচ্চারণ। এসেছে কোচ রাজার কথা, গৌরবের সময়কাল, স্বাধীনোত্তর সময়ে সংকটের আবর্তে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির সংকট, জীবন জীবিকার সংকটে বিদেশ বিভুঁইয়ে ছুটে যাওয়া সবকিছুকে উপলক্ষ্য করে কৃষ্ণকান্ত মূর্ত হয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রয়াস উপন্যাসের মূল উপজীব্য। অবশ্যই বিগত কয়েক দশকের চেনা ছবিটাকে তিনি তুলে ধরেছেন। সেইসঙ্গে সংকটের মুহূর্তে দাঁড়িয়ে পরিবর্তনকে মেনে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর প্রতিজ্ঞা নিয়েই কৃষ্ণকান্তর পদচারণা। কৃষ্ণকান্তর মধ্য দিয়ে সমাজ চেতনার কথা, প্রকাশের কথা, ঘুরে দাঁড়ানোর প্রয়াসকেই সময়কালের নিরিখে এই উপন্যাসটির বিস্তৃতি স্বাধীনোত্তর সময়কালের কয়েক দশকের। সেইসঙ্গে স্মৃতি সত্তা, অতীত গৌরব পটভূমি হিসাবে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। রাজবংশী সমাজের কাছে জোরালো বার্তা দিতে চেয়েছেন। উপন্যাসের ব্যাখ্যানে ক্ষোভ বিক্ষোভ কিংবা কষ্ট দুঃখের কারণ গুলো যেমন জানতে পারা যায় তেমনি প্রতিহত করার উপায় সম্পর্কে তিনি সজাগ করে দেন। কথার বাধনীতে বিভিন্ন প্রবাদ ও শ্লোক ব্যবহার করে রাজবংশী সমাজজীবনের ধারাটি যেমন ধরতে পারি তেমনি আগামী সময়ের ডাকও শুনতে পারি। ভগীরথ দাসের এই উপন্যাসটি যথার্থই সমাজ সংস্কৃতি পরিবর্তনকে আখ্যানে সূচিত করেছে। উপন্যাসটিও কথকতার গুণে আশা জাগায়। সাহিত্য মূল্যের বিচারেও উল্লেখযোগ্য ধরে নিতে পারি। তার আরো কয়েকটি উপন্যাস আছে। তিনি একজন শক্তিশালী কবিও বটে। তার পর্যবেক্ষণ সমাজবীক্ষায় রাজবংশী সমাজের কথাগুলি বিভিন্ন আঙ্গিকে উঠে আসে, সেইসঙ্গে সময়ের ঘাত প্রতিঘাতকে তিনি মুন্সিয়ানায় তুলে ধরেছেন। আধিপত্যকামী মানুষের অভিলাষ, প্রয়াস — নাউয়াটারি গ্রামের নাম পরিবর্তনের মানসিকতা দিয়ে তিনি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। উপন্যাসটি সরল রৈখিক পথে অগ্রসর হয়নি বরং বিবিধ বিষয়ের সংস্থাপনে সেই সময়কালের রাজবংশী সমাজ জীবনের সংকট, অর্থনৈতিক চাপ তথা সাংস্কৃতিক বিবর্তনের বিষয়গুলি এক একটি শাখায় উন্মুক্ত হয়েছে। ফলে উপন্যাসের বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্য সামগ্রিকতার পরিচয় 'সেন্দুকের ছোড়ানি' তে স্থান পেয়েছে। সর্বোপরি ভাষা, শব্দ ব্যবহারে তিনি দক্ষতার পরিচয় রেখে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর বোধ ভাবনায় সর্বতোভাবে আসংলগ্ন থাকতে পেরেছেন। সেইসঙ্গে

সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিবর্তনের সময়কালকেও যথার্থভাবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন।

স্বাধীনোত্তর পরবর্তী সময়কালের সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতাকে পটভূমি করে উপন্যাস লিখেছেন তারামোহন অধিকারী ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে। তিনিও একজন গল্পকার ও শিল্পী মানুষ। ভাওয়াইয়া সঙ্গীত ও সংস্কৃতির সঙ্গে তার নিবিড় সম্পর্ক। সমাজ সচেতন একজন মানুষের লেখনীতে সমাজচিত্রের জীবন্ত ছবিই ধরা পড়বে এটাই স্বাভাবিক। তারই দৃষ্টান্ত তারামোহন অধিকারীর 'আসামী' উপন্যাসটি। উপন্যাসটিকে রাজনৈতিক উপন্যাস হিসাবেও চিহ্নিত করা যেতে পারে। কারণ ষাট-সত্তর দশকের ভাষা আন্দোলন, অধিকার আদায়ের ভাবনাকে প্রেক্ষাপট করে বিস্তৃতি পেয়েছে। প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলিও তিনি উত্থাপন করেছেন, সংস্কৃতির বিষয়গুলি এসেছে জাতির ইতিহাস অতীত গৌরবের কথা থেকে। তবে মূল বিষয় ভাষা আন্দোলন, তাকে ঘিরে জাতিসত্তার প্রশ্নে আন্দোলন, ক্ষোভ-বিক্ষোভ, অধিকারের বিষয়গুলি প্রাধান্য পেয়েছে। ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিচ্ছিন্নতাবাদীর তকমা প্রদান, ষড়যন্ত্র, জেল খাটানো, অত্যাচারের ঘটনার মধ্য দিয়ে কয়েক দশকে উত্তাল সময় পরিস্থিতি ধরা পড়েছে। রাজনৈতিক নীতি হীনতার বিষয়গুলি উত্থাপন করে একটা জনগোষ্ঠীকে অবদমিত করার চক্রান্ত, আধিপত্য কায়েমের অন্যায় অপপ্রয়াস উপন্যাসের কথনে বর্ণিত হয়েছে। সেইসঙ্গে একটা বিভেদরেখাকে অবলম্বন করে জাতিসত্তার প্রশ্নে সোচ্চার হওয়া সবই উপন্যাসের উপজীব্য হয়েছে। কিন্তু গুণে কিংবা শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যে সামঞ্জস্য থাকেনি। খানিকটা প্রতিবেদনধর্মী অভিযোগ পত্রের মত হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও এই উপন্যাসের বিষয়, ঘটনা, চরিত্র গুলির মধ্যে স্বাধীনোত্তর সময়ের কয়েক দশকের সমস্ত ছবিই ধরা পড়েছে বলা যায়। সেইসঙ্গে একটি জনগোষ্ঠীর সংকট — সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সংকটের মত বিষয়গুলি উপন্যাসের বিস্তারে ধরা পড়েছে। যা সময়কালকে চিহ্নিত করে। এখানে শিক্ষিত মন, নারান মাস্টার তাদের ভাবনাকে তত্ত্ব ইতিহাসের নিরিখে সমাজজীবনে উচ্চারণের চেষ্টার মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণির চিন্তা চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করার একটা প্রয়াসও লক্ষণীয়।

প্রায় একই সময়ে লেখা ভগীরথ দাসের 'সেন্দুকের ছোড়ানী' (২০০৬ খ্রি:) ও তারামোহন অধিকারীর 'আসামী' (২০০৬ খ্রি:) — দুই উপন্যাসেই স্বাধীনোত্তর সময়কালের রাজবংশী সমাজের অস্থিরতা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাপ সহ সাংস্কৃতিক সংকটকে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে

যেমন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে তেমনি বিপ্লব আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই জাতিসত্তার প্রতিষ্ঠা অধিকার আদায়ের প্রয়াসকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সেখানে সামনের সারিতে রাখা হয়েছে সচেতন শিক্ষিত যুব সম্প্রদায় এবং মাস্টার মশায়ের অগ্রগণ্য ভাবনাকে। তারামোহন অধিকারীর 'আসামী' উপন্যাসটি প্রতিবেদনধর্মী হয়েও সময়কালের নিরিখে সমাজ দর্শনের একটা খণ্ডচিত্র আঁকতে সক্ষম হয়েছে বলেই মনে হয়।

আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য ভগীরথ দাস ও তারামোহন অধিকারীর উপন্যাসে স্বাধীনোত্তর সময়কালের সমাজ বিন্যাস, সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন, অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক সংকট, আন্তঃসাংস্কৃতিক দেওয়া নেওয়া সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়গুলি গুরুত্ব পেয়েছে। আবার অতীত স্মৃতিচারণে বর্তমান সময়ের ঘাত, অভিঘাতকে প্রতিহত করার অভীপ্সাও জাগরিত হয়েছে। এই উপন্যাস দুটির মধ্যে ষাট থেকে নব্বই দশকের সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিবর্তনের প্রেক্ষাপট ও কারণগুলিকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি। অবশ্যই অর্থনৈতিক অবস্থাও যেখানে রাজনৈতিক ক্ষমতা সমীকরণ নির্ভর তাই এই বিষয়টি উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

আরেকটি উপন্যাস গোকুল রায়ের 'সতীসুনীতি' ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। নিতান্ত সামাজিক প্রেক্ষাপটে রচিত উপন্যাস। রাজনৈতিক ঘনঘটার বিষয় আশ্রয় পায়নি এই উপন্যাসে। গল্প কথনের বৃত্তান্তে মূল চরিত্র সুনীতির নিজেকে উজ্জ্বল করার গল্প। কথনে লোকজীবনের অনুষঙ্গগুলি এসেছে। আবার পারস্পরিক সম্পর্ক, স্বার্থের বিচরণ স্থির সামাজিক জীবনকে কীভাবে আলোড়িত করে তার আখ্যান। সামাজিক চৌহদ্দির মধ্যে বিচরণ নায়ক শ্রীকুমারের প্রতিষ্ঠা লাভ সুনীতির আত্মত্যাগ লোককাহিনির পর্যায়ে আবদ্ধ থেকেছে। বৈশিষ্ট্য বিচারে সমাজ চিত্রই বলা যেতে পারে। তবে ভাষা ব্যবহার ও কথনভঙ্গির বিশেষত্বে উপন্যাসটির চলন জীবন্ত সামাজিক চিত্রকে প্রতিভাত করে।

আরেকটি উপন্যাস অভিজিৎ বর্মনের 'বাথান' ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। এই উপন্যাসে উঠে এসেছে রাজবংশী সমাজ জীবনের বাথান সংস্কৃতির কথা। মৈষালী জীবন, দুঃখ-কষ্ট, প্রেম, বিরহ তথা ত্যাগের মননবোধ। লোকজীবনে ভাষার সম্পৃক্ততা সেটা প্রতিফলিত হয়েছে কাহিনির ছত্রে ছত্রে। শব্দ সংযোজন, প্রবাদ, শিল্লুকের ব্যবহারে উপন্যাসটির চলন হয়ে ওঠে জীবন্ত, প্রকৃতি বিচরণকারী। রাজবংশী সমাজ জীবনের বাথান সংস্কৃতির ভূমিকা, অর্থনীতির

বিকল্প উপায় হিসাবে বাথানের উৎপত্তি। তাকে ঘিরে মৈষালী বৃত্তি ও জীবন যাত্রা, উদাসীনতায় শিল্পী মনের বিকাশ রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির অংশ। এই সংস্কৃতিকে আধার করেই এই উপন্যাসের বিস্তার। বাথান, প্রকৃতি, উদাসীনতা, মনের প্রকাশই উপজীব্য হয়েছে। উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য একরৈখিক সংস্কৃতি বিষয়ক, সমাজ জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের বিষয়গুলি বিশেষ গুরুত্ব পায়নি। স্বাভাবিকভাবে উপন্যাসটি সম্পূর্ণতই হারানো সংস্কৃতিকে বহন করে রচিত হয়েছে। সমাজ জীবনের একটা অতীত অংশই শুধুমাত্র লোক কাহিনির শিল্প মাধুর্যে উত্তীর্ণ হয়েছে। বিস্তৃত সমাজ জীবনের কথা ভাষ্য উপন্যাসটিতে অনুপস্থিত। আক্ষেপ আছে, বেদনা আছে কিন্তু উচাটন নেই। যা আগামী সময়কালকে অনুসরণ করে। রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির একটি সমৃদ্ধ দিক মাত্রই 'বাথান' উপন্যাসে ঘোষিত হয়েছে। অবশ্য অতীতের এক সময়কাল চিহ্নিত হয়েছে এই উপন্যাসে।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস পরেশচন্দ্র রায়ের 'বাতাসীর বাসিয়া কাথা' ১ম খণ্ড, ২০১২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। কাহিনির চরিত্রের বিস্তারে রাজবংশী সমাজের জীবন জীবিকা পরিবর্তনের আভাস ধরা পড়েছে। ছোট ছোট আখ্যান এবং খণ্ড চিত্রের মাঝে রাজবংশী সমাজের পরিবর্তিত লোকজীবনের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়েছে। ট্রিলজি ধরনের কথন বিস্তার। উপন্যাসের ভাষায় আঞ্চলিকতার টান চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তোলে। কথনের চলনে বোঝা যায় সময়ের সূচনা স্বাধীনোত্তর সময়কালের কয়েক দশক পরে। অভিবাসনের চাপে গ্রাম ও শহরের বিন্যাস যখন পাল্টে যায়, যোগাযোগ সহজ হয়ে ওঠে। শহর সম্প্রসারিত হতে থাকে গ্রামের জীবন জীবিকায়। শুধু কৃষি নির্ভরতা নয় রাজবংশী সমাজেও পরিবর্তনের ধাক্কা, প্রতিযোগিতা, টিকে থাকার লড়াই, বিভিন্ন উপায়ে রোজগারের আশায় যখন মানুষ ছুটছে, ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে অনেকে অবস্থার পরিবর্তন ঘটাচ্ছে সে সময়কার গল্প। রাজবংশী সমাজ জীবনে তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। সে সময় অধিকাংশ পরিবার অর্থনৈতিক সংকটে জেরবার হয়ে বিভিন্ন পেশায় (ধান্দা) ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে সহায় সম্বলহীন অবস্থায় বাধ্য হয় যে কোন ধরনের কাজে যুক্ত হয়ে উদরপূর্তির চেষ্টা করে। সে রকমই একটি পেশা গরুর দালালি (যেটা একসময় অন্য সম্প্রদায়ের মানুষরাই করত, রাজবংশীরা সহজে এই পেশায় যেত না) তে যুক্ত হয়ে পড়ে পেনকেটুর মত অনেকে; কেউ কেউ আবার জমির দালালির কাজে যুক্ত হয়, অনেকে এই

উপায়ে বেশ টাকা পয়সা রোজগার করতে থাকে, শহরে আধুনিকতার সঙ্গে ক্ষমতার বিস্তারে জড়িয়ে যায়। তখন অনেক শহরও সম্প্রসারিত হচ্ছিল গ্রামের দিকে। এই সময় সন্ধিক্ষণে জমি জিরেতের ব্যবসায় অনেকে দালালিতে যুক্ত হয়ে যায়। রাজবংশী বহু মানুষও এইভাবে রোজগারে নামে। খইরুল (পেনকেটুর গুরু) গরুর দালালি ছেড়ে জমির দালালিতে যুক্ত হয়ে ক্ষমতার অধিকারী হয়। পানিয়া নিতান্ত সহজ সরল ছাপোষা মানুষ। তার জমিতে সমস্যা হওয়ায় খইরুলের দ্বারস্থ হয়। সেই সুযোগের আশ্রয় নিয়ে খইরুল, পেনকেটুকে (গুরুর অধিকার নিয়ে) কাজে লাগায়। শর্তসাপেক্ষে মা কালীর সামনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে বিয়ে করতে রাজি করায় তার ভাগ্নিকে এবং এক বছর বাদে যৌতুক হিসেবে পাওয়া ৩ বিঘা জমি খইরুলের নামে রেজিস্ট্রি করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি আদায় করে। পেনকেটু লোভে পড়ে চাপের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। সহজ সরল এই গল্পের মধ্যে লুকিয়ে আছে সত্তর-আশি দশকে রাজবংশী সমাজ বদলের বীজগুলি। নগরায়ন ঘটছে, গ্রামগঞ্জের জমিও তখন মাফিয়াদের নজরে। যেখানে আড়ালে রাজনৈতিক যোগসাজস ক্ষমতা বিস্তার করে। একটা চক্র তৈরি হয়। সেই চক্রে রাজবংশী সহজ সরল মানুষও জীবন জীবিকার ধান্দায় লোভের বশবর্তী হয়। সেখানে পেনকেটুর সংস্কার, ধর্মের বিষয়টিও হাতিয়ার হয়ে ওঠে। গুরুর পরামর্শ নৈতিক ভাবে মান্য করে মা কালীর সামনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে বাধ্য হয়। খইরুল ধর্মকে সূক্ষ্মভাবে ব্যবহার করে। এখানেই সমাজ পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণ, পেনকেটু যেমন গরুর দালালি পেশায় যুক্ত হয়ে বিষময় ধান্দাবাজির চক্রে আবদ্ধ হয়ে পড়ে তেমনি খানিকটা নিবুর্দ্ধিতায় লোভে পড়ে। এভাবে বহু রাজবংশী মানুষ কুচক্রীদের জালে আবদ্ধ হয়ে নিজের জমিজমা, ভিটেটুকু পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে। শিলিগুড়ি কিংবা অন্যান্য শহর লাগোয়া যেসব অঞ্চল আজকে নগরায়নের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেগুলি এই ধরনের বহু চক্রের জমিজমা হাপিসের গল্প ধারণ করে আছে। এই চক্রে রাজবংশী সমাজের মানুষেরাও দিশেহারা হয়ে নিযুক্ত হয়। আসলে সাত-আট দশকে রাজবংশী সমাজ সংগঠন এক অস্থির পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক চাপে অনেকেই দিশেহারা হয়ে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কাজে যুক্ত হয়ে পড়ে। শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব যেমন ছিল তেমনি চক্রব্যূহও রচিত হয়েছিল। সেখানে রাজবংশী শ্রেণির একটা অংশ লিপ্ত হয়। সামাজিক ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব, হিংসা থেকে পারস্পরিক পারিবারিক বিরোধও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়। পরেশবাবু এই সময়কালের রাজবংশী

সমাজ চিত্রটিকে তার উপন্যাসে নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। আমরা কথনে সহজে বুঝতে পারি সত্তর-আশির দশকে কিভাবে রাজবংশী গ্রাম জীবন, সমাজ জীবন এবং মানুষজন বদলাতে শুরু করে। সেইসঙ্গে পালটে যেতে থাকে নীতি, মূল্যবোধ, নৈতিকতা সাংস্কৃতিক জীবন। ক্ষমতায়নের বৃত্তে সহজ, সরল মানুষও কেমন তার চরিত্র স্বভাব বদলে ফেলে। কালো অন্ধকারের দিকে ঠেলে ফেলে দেয়। উপন্যাসটি এক সময় সন্ধিক্ষণের বার্তা দেয়। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে, শৈল্পিক ভাবনায় রাজবংশী সমাজ বদলের গতিপ্রকৃতি তুলে ধরেছেন। উপন্যাসটির দ্বিতীয় খণ্ড যেহেতু অসমাপ্ত, আশা করা যায় পরবর্তী সময়কালের সমাজ সংস্কৃতি বিবর্তনের এক দীর্ঘ ধারাভাষ্য আমরা পাব। যা সাহিত্য গুণের বিচারে আগামী সময়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে গৃহীত হবে।

রাজবংশী উপন্যাসের সংখ্যা দীর্ঘ নয়। কিন্তু যে কয়েকটি উপন্যাস ইতিমধ্যে গ্রন্থিত হয়েছে রাজবংশী ভাষা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যা যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই উপন্যাসগুলির মধ্যে থেকে আমরা পেয়ে যাই সংস্কৃতির কথা, অতীত গৌরবের কথা, ক্ষোভ-বিক্ষোভ, চিন্তা চেতনার কথা সেই সঙ্গে আগামী সময়ের প্রস্তুতির কথাও। কৃষ্ণমুখ, নারান মাস্টার, জিতেন মাস্টার-এর মতো সমাজ ভাবুকদের বিবেক চেতনার কথা। উত্তরণের গল্পও লুকিয়ে আছে কথাভাষ্যের বুনোনে। সর্বোপরি উপন্যাসের কালক্রমে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর মানুষজনের লড়াই, ঘাত-প্রতিঘাত, হেরে যাওয়া, ঘুরে দাঁড়ানোর গল্পও পেয়ে যাই। সঙ্গে পেয়ে যাই ধারাবাহিক সময়কালের বিবর্তনের কথা ও সাংস্কৃতিক সংকটের খবর।

সৃজন সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় শিল্পরূপ হল ছোট গল্প বা Short Story. ছোটগল্প একান্তভাবেই আধুনিক সাহিত্য প্রকরণ। পদ্য সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত আখ্যায়িকা। যেখানে লেখকের মানস প্রতীতির সংহত প্রকাশ ঘটে সেইসঙ্গে ঘটনা, চরিত্র, পরিবেশের মধ্যে এক সম্পাদনার মধ্য দিয়ে সমগ্রতার আভাস ফুটে ওঠে। ছোটগল্পে আনন্দ, উল্লাস, বিস্ময়, সবই এক আন্তরিক প্রয়াসের মধ্যে দিয়ে শিল্পরূপের পর্যায়ে উন্নীত হয়। সম্পূর্ণ এক ভিন্ন শিল্পরূপ যা আকার বা আয়তনে কিংবা প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যে ছোট নয়। কবিতার মত ঐক্যভাবাশ্রয়ী নয় — কল্পনামুখ্যও নয়, সম্পূর্ণত জীবন নির্ভর। খণ্ডতার মধ্যে সম্পূর্ণতা। এই কারণে ছোটগল্পকে বলা হয় "Peculiar

Product of the Nineteenth Century."। গল্প বলা বা শোনার রীতি মানব সমাজের সুপ্রাচীনকালের সংস্কার। প্রাগৈতিহাসিক যুগেও মানুষ গল্প কাহিনি রচনা করেছে, শুনেছে। ধারাবাহিকভাবে তা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ছোটগল্প বা Short Story-র সংজ্ঞা লাভ করেছে। সেটাও সম্ভব হয়েছে আধুনিক সাহিত্যের শিল্পরূপ তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য অর্জনে। সমালোচকদের মতে এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ছোটগল্পের উৎপত্তি। তাই সমালোচকরা বলে থাকেন যে জিজ্ঞাসা চিহ্ন হয়েই ছোটগল্পের আবির্ভাব। আরো বৈশিষ্ট্যগুণে সমৃদ্ধ হয়ে সাহিত্যের অন্যতম সম্পদ হয়ে ওঠে। কথাসাহিত্যের এই জনপ্রিয় শাখা ছোটগল্পের চর্চা শুধু বাংলা ভাষা সাহিত্যে নয় বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায়ও ব্যাপ্তি পায় এবং বৃহত্তর সাহিত্যের ভাণ্ডারকে পুষ্ট করে। যা আধুনিক সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রাসঙ্গিক ও আলোচনার বিষয়। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ভাষা ও চর্চায় ছোটগল্প যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে এবং কথাসাহিত্যের এই ছোটগল্পের শাখাটি আঞ্চলিকতার সামাজিক বাস্তবতার প্রেক্ষিতে ধারাবাহিকভাবে সমৃদ্ধ করে চলেছে।

রাজবংশী সমাজে গল্প বলার রীতি বহু প্রাচীনকালের। সেইসব গল্প মৌখিক সাহিত্য রূপে ছড়িয়ে আছে আধুনিক সাহিত্যে যা আজ লোকসাহিত্য হিসাবে মান্যতা পেয়েছে। রাজবংশী গল্পমালা ছড়িয়ে আছে শিশু ভোলানো ছড়া (ছাওয়া ভুলকা), হেঁয়ালি বা ধাঁধা (ছিলকা) প্রবাদ প্রবচন (শিলুক বা শিল্লুক), রসিকা গীতিকা, লোকসঙ্গীত, লোককথা (কিচ্চা)য় রাজবংশী সমাজ জীবনের গল্পের ছড়াছড়ি। এই কথা ও কাহিনির মধ্যে সমাজ গোষ্ঠীর খণ্ড খণ্ড চিত্র, মনস্তত্ত্ব জড়িয়ে আছে।

রাজবংশী ভাষায় সাহিত্য চর্চার ধারাটি কয়েক শতাব্দীর, যদিও তা মৌখিক সাহিত্যের অঙ্গনেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে কোচ-রাজ পৃষ্ঠপোষকতায় বলিষ্ঠ একটি সাহিত্য সৃজনের ধারায় সৃষ্টি হয়। পাশাপাশি মৌখিক রচনার ক্ষেত্রটি উন্মুক্ত হয় এবং শাখা প্রশাখা বিভক্ত হয়ে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারাটিকে পুষ্ট করে। ব্রতকথা, গান, পাঁচালীর আখ্যানে তা মুখে মুখে প্রসার লাভ করে। রাজবংশী জনগোষ্ঠীও ধারাবাহিকভাবে এই সৃজনশীলতাকে বহমান রাখে, তুলে ধরে এই অঞ্চলের চিত্র, জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পরিচয়, ইতিহাস, জাতিসত্তার কথা, মনন দর্শনের ভাববোধকে। যদিও লিখিত সাহিত্য সৃজন খুব বেশিদিনের নয়। কিন্তু ভাষা শিল্পের প্রকাশ ঘটেছে ধারাবাহিকভাবে। অনেক গবেষকদের মতে সেসব উপাদান সাহিত্যের ভাণ্ডারকে পুষ্ট

করেছে, সমৃদ্ধ করেছে। ভাষাবিদ জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন যেমন ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে সংগ্রহ করার উদ্যোগ নেন তেমনি দীনেশ চন্দ্র সেন সহ অনেকেই সংগ্রহ ও গ্রন্থাগারে প্রকাশের উদ্যোগ নেন। পরবর্তীকালে মনীষী পঞ্চানন বর্মা উদ্যোগী হন উত্তরবঙ্গের ভাষাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, গান, কবিতা সংগ্রহ এবং প্রকাশের। এ বিষয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর শাখা 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ' বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৩১৩-১৩১৯ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বেশ কিছু শ্লোক, রূপকথা গান পরিষদের পত্রিকায় প্রকাশ পায়। পঞ্চানন বর্মা স্বয়ং বেশ কিছু রচনা ও পাদটীকা সহ প্রকাশ করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল গোবিন্দ মিশ্রের গীতা, পাদটীকা (মহিলা ব্রত) সহকারে কথা ও শ্লোক, কিছু লোক গল্প যেমন - নাদিম পরামাণিকের পাঠা, জগন্নাথী বিলাই। যদিও তিনি কামতা বিহারী ভাষা হিসাবে রাজবংশী ভাষাকে উল্লেখ করেন।

বলা যেতে পারে এইসব লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা থেকে রাজবংশী ছোটগল্পের সূচনা। উনিশ শতক থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত সময়সীমায় ধারাবাহিক উৎকর্ষতায় জন্ম হয় আধুনিক যুগের রাজবংশী সাহিত্য তথা ছোটগল্পের। গল্পের মধ্যে ধরা পড়ে রাজবংশী সমাজ জীবনের খণ্ড খণ্ড চিত্র, মনন কথা যেখানে ঐতিহ্য পরম্পরায় প্রবাদ-প্রবচন, লোকভাবনা সবই সহজেই অন্তর্ভুক্ত হয়। রাজবংশী ছোটগল্পের সঙ্গে লোককথা বা কিচ্চার (Folk Tale) ধারাবাহিক সম্পর্ক, সেই সম্পর্কের আধুনিক রূপ হল আজকের রাজবংশী ছোটগল্পের সাহিত্য। অনেকে লোককথা ও উপকথার নামান্তরে উদ্ধারের প্রয়াসী হলেও আজকের রাজবংশী ছোটগল্প সাহিত্য বৈশিষ্ট্যের গুণে আধুনিক হয়ে উঠেছে। রাজবংশী ভাষায় আধুনিক ছোটগল্পের সূত্রপাত আনুমানিক বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক। ইতিহাসগত ভাবে এই ষাটের দশকে রাজবংশী জনগোষ্ঠী সমাজ বিবর্তনেব ঝড়ে সমাজ সচেতন হয় এবং ভাষা সাহিত্য সৃজনে ব্রতী হয়। রাজবংশী ছোটগল্পের প্রসঙ্গে প্রথমে যে নামটি আসে সাহিত্য আকাদেমি, ভারত সরকার কর্তৃক 'রাজবংশী ভাষা সম্মান'-এ ভূষিত ড. গিরিজাশঙ্কর রায়ের নাম। তথ্য অনুসন্ধানে জানা যায় তিনি প্রথম রাজবংশী ছোটগল্প লেখেন 'মাস্টারী জীবন' ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে। ছোটগল্পের প্রসঙ্গে কিছু পত্র-পত্রিকার নাম গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। কারণ এই পত্রিকা গুলিকে ঘিরে বেশ কিছু লেখক গল্প রচনায় উদ্যোগী হন। আবার বিষয় শৈলী নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষাও চলতে থাকে। এ বিষয়ে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় 'পোঁহাতী' পত্রিকার নাম, ১৩৮০ বঙ্গাব্দে ২৭ মাঘ প্রথম প্রকাশ

পায়। বেশ কয়েক বছর নিয়মিত প্রকাশিত হয়। রাজবংশী ভাষার প্রথম এই পত্রিকায় ভাষাচার্য ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছিলেন। এরপর প্রকাশিত হয় 'পোঁহাতীয়া তারা' তারপর 'দুন্দ' নামে আরেকটি পত্রিকা প্রকাশে কয়েকজন উদ্যোগী হন। বলা যেতে পারে প্রথম পত্রিকা 'পোঁহাতী' থেকে গল্প লেখার পরিসর তৈরি হয়। ড. গিরিজাশঙ্কর রায়, বাচ্চামোহন রায় প্রমুখ কয়েকজন ছিলেন পথ প্রদর্শক। 'পোঁহাতী' সহ এই পত্রিকাগুলি প্রকাশ পায় ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি এলাকা থেকে। পরবর্তীকালে অন্যান্য জায়গা থেকে বেশ কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশ পেতে থাকে। তার মধ্যে তুফানগঞ্জ থেকে 'রায়ডাক', জলপাইগুড়ি থেকে 'বাঘধেনুক'; 'ডেগর' শিবমন্দির, শিলিগুড়ি থেকে; 'পূবালী' শিবমন্দির, শিলিগুড়ি; 'উজানী' ময়নাগুড়ি; 'ভোগা' (রাজবংশী ভাষা আকাদেমি প: ব: সরকার), 'মনসুয়া', মাথাভাঙ্গা এলাকা থেকে। তারপরে আরও কিছু পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে বিভিন্ন জায়গা থেকে। আর এইসব পত্রিকায় বেশ কিছু গল্পকার রাজবংশী ছোটগল্পের পরিসরকে সমৃদ্ধ করতে থাকে। ধরা পড়তে থাকে রাজবংশী সমাজ জীবনের কথা, জীবনের বাস্তব চিত্র, দারিদ্র্যতার বিরুদ্ধে লড়াই, সচেতনতার কথা, সমাজ বাস্তবতার কথা, সাংস্কৃতিক সংকটের কথা আবার মনোভাবের কথা সবই ছোটগল্পের বিষয় বিস্তার হতে থাকে। পূর্বে যা ছিল বংশানুক্রমে মৌখিক আলোচনার বৃত্তে তা লিখিত সাহিত্যে সাহিত্যের প্রকরণ বৈশিষ্ট্য লাভ করে উর্বর হতে থাকল।

'পোঁহাতী' পত্রিকাকে ঘিরে যারা গল্পকার হিসাবে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করতে শুরু করেন তারা হলেন ড. গিরিজাশঙ্কর রায় — যার ছদ্মনাম বাউদিয়া রায়, বাচ্চামোহন রায় (কুহুলি ছদ্মনামে লিখতেন), পরেশ চন্দ্র রায়, ভূপেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ। বাচ্চামোহন রায় ছিলেন একজন বলিষ্ঠ লেখক। সমাজমনস্ক এই মানুষটি বেশ কিছু গল্প লিখেছেন। তার মধ্যে অন্যতম 'ছোটলোক', 'উপায় আছে কিন্তুক শেষ নাই', 'ঠাই', 'কাপালির কাপাল', 'পথ কোঠে' এরকম আরও কিছু গল্প। তার গল্পে সামাজিক পট পরিবর্তনের কথা, সমসাময়িক পরিস্থিতিতে মানুষজনের দুরাবস্থা, নিবুর্দ্ধিতা, বিপদগামীতা ইত্যাদি বিষয়। তার 'ছোটলোক' গল্পে পাই জোতদারের সর্বস্বান্ত হওয়ার গল্প আর স্বার্থান্বেষী মানুষের জাতাকলে শোষিত হওয়ার কথা, সামাজিক আর্থিক পতনের বিয়োগান্তক ছবি এঁকেছেন বাচ্চামোহন তার গল্পে। 'উপায় আছে কিন্তুক শেষ নাই', 'ঠাই', 'পথ কোঠে' গল্পে আশাহত মানুষজনের হাহাকারের কথা মূর্ত হয়ে উঠেছে।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়কালের রাজবংশী মানুষগুলির হতাশাবোধ, স্বভূমিচ্যুত হওয়ার বিষয়গুলি বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে তাঁর গল্পে।

সে সময় 'পোঁহাতী'তে বেশ কিছু গল্প প্রকাশ পায়। মধুরেশ চক্রবর্তী গল্পগুলি ছিল সুখপাঠ্য, জীবনতাড়িত। ড. কালীপদ শীলের 'দুখাতির কাথা', নরেশ চন্দ্র রায়ের 'নিহাই চুন্নি দাদা' গল্প দুটি পরবর্তীকালে হরিপদ চক্রবর্তীর 'প্রান্ত উত্তরবঙ্গের উপভাষা' গ্রন্থে স্থান পায়। 'পোঁহাতী'-র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত রমেশ রায়-এর লেখা গল্প 'অবলার পিরিতি' খুবই প্রশংসনীয় গল্প হিসেবে রাজবংশী সাহিত্যে পরিচিত হয়ে থাকবে। গ্রন্থটি প্রকাশ পায় 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়' থেকে। বাচ্চামোহন রায় এবং ড. গিরিজাশঙ্কর রায় অন্যান্য পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। ২০০১ খ্রিস্টাব্দে 'বাঘধেনুক' পত্রিকায় বাচ্চামোহন রায় একটি গল্প লেখেন 'দ্যাভর'। গল্পটিতে পরিবর্তনশীল রাজবংশী সমাজের কথা নির্মমভাবে তিনি তুলে ধরেছেন। মনচন চরিত্রের মধ্যে দিয়ে সমাজের জটিলতা, মানুষের অবস্থানগত পরিবর্তন, তথাকথিত অগ্রগতির পশ্চাতে এক শ্রেণির সর্বস্ব হারানো, ক্ষমতায়ন ইত্যাদি বিষয় মনচনের ভাবগতিতে ধরা পড়েছে। সেই সংখ্যায় আরো কয়েকজন বিশিষ্ট লেখকের গল্প প্রকাশ পায়। তার মধ্যে অন্যতম নিয়তি রায়, নগেন্দ্রনাথ রায়, বিজয়ভূষণ রায় প্রমুখ। নিয়তি রায়ের 'রিফুজী' গল্পটি ঘিরে দেশভাগের পর ওপার-এপার বাংলার প্রান্তিক মানুষজনের সংকটের কথা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ওপার বাংলার মানুষ যেমন ছিন্নমূল এপার বাংলায় আশ্রয় নেয় আর এপার বাংলার অনেক রাজবংশী মানুষ ভাগ্যান্বেষণে পার্শ্ববর্তী শহরমুখী হয়ে রিফুজীতে পরিণত হয়। ভাষার ব্যাখ্যানে আর কথনের ভঙ্গিতে গল্পটি বাস্তব ও সময়োচিত হয়ে ওঠে। নগেন্দ্রনাথ রায়ের 'উজান ভাঁটি' গল্পেও তারই প্রতিচ্ছায়া, জীবন সংকটের কথা। স্বাধীনোত্তরকালে জোতদারি উচ্ছেদ আইনে অনেক জোতদার সর্বস্বান্ত হয়ে গ্রাম দেশ ছেড়ে অন্যত্র কাজের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে বাধ্য হয়। সুন্দরভাবে তিনি উপস্থাপিত করেন লক্ষপতি জোতদারকে সামনে তুলে ধরে। বিজয়ভূষণ রায়ের গল্পেও সমাজ জীবনের সংকটের ভিতরকার কথা উত্থাপিত হয়েছে তার 'এখে নগতে নওয়া' গল্পে। রাজবংশী পরিবার গুলির জমি জিরেত হারিয়ে শহরমুখী হয়ে মজুরে পরিণত হওয়া, ভূমিজ কৃষি নির্ভরতা থেকে শহর নির্ভর হওয়ার বিয়োগ ব্যথার কথা গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে।

উল্লেখ্য সে সময় কয়েকটি গল্প সংকলনও প্রকাশ পায়। তার মধ্যে উল্লেখ্য নিয়তি রায়ের

‘ভোরের পখী’ রাজবংশী গল্প সংকলন। উত্তরবঙ্গ সাহিত্য পরিষদ, শিবমন্দির, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশ পায় ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে। সংকলনটিতে ছিল মোট ছয়টি গল্প। নিয়তি রায়ের চারটি, একটি বীরেন রায়ের এবং আরেকটি কর্ণদেব রায়ের। নিয়তি রায় বর্তমানে একজন প্রতিষ্ঠিত লেখিকা। তার গল্পের কেন্দ্রভূমি নারী, নারীর মনোজগৎ তাদের স্বপ্ন, বিলাস, উত্থান, পতনের গল্প। তার ‘ভোরের পখী’ সংকলনের ‘চোর’, ‘ভাত’, ‘শ্যাষবেলাকার সূর্য’প্রত্যেকটি গল্পে নারীর স্বতন্ত্র লড়াইয়ের কথা উচ্চারিত হয়েছে। এগিয়ে যাবার কথা, থেমে না যাওয়া সংকল্প মনোভাবের প্রকাশভঙ্গিতে বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করার দৃঢ়তাই সমস্ত চরিত্রের মধ্যে ফুটে উঠেছে। তার অন্যান্য গ্রন্থগুলির মধ্যেও আমরা চেতনার কথা পাই, সমাজ পটভূমি পরিবর্তনের সাথে সাথে অতিক্রমণের গতিমুখে নারী শক্তির প্রকাশ ঘটেছে। নগরের ইতিকথায় যেমন ‘নয়া বাসর’, ‘মালিক’, ‘ঘাউলাদানা’, ‘হারে যাওয়া কাটাতারের বেড়া’ প্রত্যেকটি গল্পে অতিক্রমণেরই ভাষ্য, চরিত্রগুলি ভেঙে পড়েনি। তাদের কথা লেখিকা সমতলের গল্পের আধারে তুলে ধরেছেন। কর্ণদেব রায়ের ‘কাইচালুর কাচাল’ গল্পে জীবনভাষ্যের অপূর্ব বৈশিষ্ট্য কোলাজ চিত্রকল্পকে বাস্তব করে তোলে। ভাষার সৌকর্য মুগ্ধ করে। ‘ভোরের পখী’ সংকলনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য গল্প বীরেন্দ্রনাথ রায়ের ‘সতীর কাথা’। ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে ‘আভংফুলের মধু’ নামে আটটি গল্পের সংকলন প্রকাশ পায়। ‘ধাউলীর ঘর মরণ নাই’, ‘ইন্টারভিউ’, ‘ছুয়াপাত ফেলানী’, ‘পেত্তানীর কাহিনী’, ‘সতীর কাথা’, ‘সাকাই’, ‘ঢ্যালা জোতদার’ আর ‘আভংফুলের মধু’। বীরেন রায়ের গল্পে সমাজ বাস্তবতায় জীবনের সুখ দুঃখ, আশা-নিরাশা-বঞ্চনা, জীবনবোধের কথা সুন্দর ভাষার বুননে উঠে আসে। চূড়ান্ত অভিজ্ঞতালব্ধ কথন যা লেখক বীরেন রায়কে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে। ‘ধাউলীর ঘর মরণ নাই’ গল্পে পিছিয়ে পড়ার কাহিনি, অর্থনৈতিক অবস্থা কিভাবে মানুষকে বাধ্য করে বাস্তুছাড়া করে তার সকরুণ উচ্চারণ। ‘ইন্টারভিউ’ গল্পে ধরা পড়ে বঞ্চনার কথা, স্বজনপোষণ দুর্নীতির কথা। ‘ছুয়াপাত ফেলানী’ গল্পে দিনজলি হল ভোজ অনুষ্ঠান শেষে এঁটো পাত ফেলানী। সঙ্গে নিয়ে আসে সে সন্তান বুধারুকে। আশা, কাজের শেষে ভোজের খাবার তাদের জুটবে। গল্পটির বিয়োগান্তক শেষে তাদের আর খাবার জোটে না। সমাজের কিছু মানুষের এক ঋণাত্মক অমানবিক চরিত্রের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। লেখক অসম্ভব দক্ষতায় শৈল্পিক সত্তা নিয়ে ছেঁচে তুলেছেন। মন ভারাক্রান্ত বিষাদময় হয়ে পড়ে। ‘আভং ফুলের মধু’

গল্পে ফুলমতী প্রতিবাদী নারী চরিত্রের প্রতীক হয়ে ওঠে। বাচ্চামোহন রায়ের গল্পে কিংবা গিরিজাশংকর রায়ের বাউদিয়া ছদ্মনামে লেখা 'ন্যান্দর বিয়াত দান পড়িল ভোটুয়া কুকুর' (অক্টোবর, ২০১৫, উজানীতে প্রকাশিত)-এ দৃঢ়চেতা প্রতিবাদী নারীর সন্ধান দেয়। নিয়তি রায়ের গল্পের নারী যেখানে অনেক স্থিতধী, অধিকার সচেতন এবং উদ্যোগী। ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে তুফানগঞ্জের মিনতি অধিকারীর সম্পাদনায় রাজবংশী ভাষায় তৃতীয় গল্প সংকলন 'গল্প গোটো' প্রকাশ পায়। ষোলোটি গল্পের সংকলনে উল্লেখযোগ্য গল্প উপহার দিতে পেরেছেন মিনতি অধিকারী স্বয়ং, কমলেশ সরকার, কমলেশ সিংহ, বীরেন্দ্রনাথ রায় এবং প্রতাপ রায়। ভাষার বুনোনে প্রত্যেকটি গল্প মনোগ্রাহী ও উপজীব্য হয়ে ওঠে। কমলেশ সরকার একজন বলিষ্ঠ কবিও বটে। তার গল্পে সমাজ সচেতনতার সজাগ ভাষ্য উল্লেখযোগ্য। চতুর্থ গল্প সংকলন 'দুখাতি' প্রকাশ পায় ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে নগেন্দ্র চন্দ্র রায়ের সম্পাদনায়। রাজবংশী সমাজের উত্থান, পতন, সাংসারিক টানাপোড়েন তার মধ্যে মজা, হাস্যরসের সমাহার রাজবংশী জীবনবোধে জীবন রস উপস্থিতিকে সম্পূর্ণমাত্রায় উপস্থাপিত করেছে প্রবাদ-প্রবচন, শ্লোকের ব্যবহারে কথন বেশি বেশি করে মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে। 'দুখাতি বুড়ি' কিংবা 'ছনুয়া ভিটা' গল্পে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে রাজবংশী সমাজের অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া, অসহায়, সম্বলহীন হয়ে অধঃপতন, মজুর হয়ে ওঠা সবই ধরা পড়েছে। নগেনবাবুর গল্পে দেশভাগের ফলে জনবিন্যাসের পরিবর্তন, উদ্বাস্তু রিফুজির চাপ সেইসঙ্গে স্থানীয় রাজবংশী মানুষের পিছিয়ে পড়ার ভাষ্যগুলি গল্পের বিষয় হয়ে সময়কালকে চিহ্নিত করেছে।

হরিমাধব রায় তাঁর প্রথম গল্প সংকলন 'ঢুপলুং-ঢাপলাং' প্রকাশ করেন ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে। প্রকাশক উপজুনভুই পাবলিশার্স, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার। সংকলনটিতে তার ৮টি গল্প গ্রন্থিত হয়েছে। রাজবংশী জাতির চালচলন, চিন্তা-ভাবনা, কৃষ্টি-সংস্কৃতির মনন, জীবনরসের কিছু দিক আলোকিত হয়েছে। রাজবংশী আশা আকাঙ্ক্ষা, সাংসারিক টানাপোড়েন, রাজনৈতিক চাটুকারী, দুর্নীতি, ভ্রস্টাচার, অবক্ষয়, দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ, প্রতিবাদ, ক্ষোভ বিষয়গুলি গল্পগুলির ভাষ্য হয়ে উঠেছে। 'হলাশুর পেন্টি' গল্পে যেমন এই বিষয়গুলি ধরা পড়েছে তেমনি 'যাত্রাপালা' গল্পে সমাজের অবক্ষয়, মাদক দ্রব্যের জন্য সমাজের মূল্যবোধের অবনতি, সংকটের বিষয়টি উজ্জ্বল হয়েছে। এই গল্পে উরা পড়েছে হারিয়ে যাওয়া লোকক্রীড়াগুলির কথা। 'হনুমানি সাধন' গল্পে যেমন

রাজবংশী সমাজের কৌম কৃষ্টি কৃষিকার্যের বিষয়গুলি পর্ব ধরে ধরে উল্লেখিত হয়েছে। এই গল্প সংকলনটির প্রত্যেকটি গল্পে রাজবংশী সমাজ জীবনের অতীত বর্তমানের বিভিন্ন ছবি ধরা পড়েছে। যা সময়কে চেনায় আবার উদ্বুদ্ধ করে পথ চলার নিশানায়।

পরবর্তী সময়কালে পত্র-পত্রিকা সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লেখালেখির জগতে আরো প্রবীণ নবীনের সমাগম ঘটে। বলা যেতে পারে ষাটের দশকের পর থেকে ধারাবাহিকভাবে রাজবংশী সাহিত্য সৃজনের ধারাটি বেগবান হয়। সময়কালের সঙ্গে সঙ্গে গল্পের বিষয় ও পরিসরের ব্যাপ্তি ঘটে। গল্পের মাধ্যমে জীবন খণ্ডের টুকরো টুকরো ছবি, খণ্ড খণ্ড কথন ভাষ্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, পটভূমি আধার বিন্দু হয়ে উঠে আসে। অনেকেই গল্পকার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। বলা যেতে পারে রাজবংশী ভাষার গল্পকারের সংখ্যা এই মুহূর্তেই মোটেই ছোট নয় — নিপুছা প্রামাণিক, উধাসু রায়, সুশীল চন্দ্র রায়, মণিভূষণ রায়, বিজয়ভূষণ রায়, হরিপদ রায়, প্রসেনজিৎ রায়, উমাশংকর রায়, দ্বীপেন রায়, পরেশ চন্দ্র রায়, অমল বর্মা, নন্দগোপাল রায়, গিরীন্দ্র দাস, ভগীরথ দাস প্রমুখ। এছাড়াও অনেকে নীরবে নিভৃতে সাহিত্য চর্চা করে যাচ্ছেন।

পরিশেষে একটি বিষয় উল্লেখ্য রাজবংশী ছোটগল্প যেমন সাহিত্য প্রকরণ বৈশিষ্ট্যে একটা আধুনিকতার জায়গায় পৌঁছেছে তেমনি ছোটগল্প রচনা রাজবংশী সাহিত্য পরিসরকে সমৃদ্ধ করেছে। এর মধ্যে অনেকে পরীক্ষা নিরীক্ষাও করেছেন। নতুন আঙ্গিকে নতুন ভঙ্গি ভাষায় ছোটগল্পকে বৃহত্তর সাহিত্যের অঙ্গনে তুলে ধরার প্রয়াসও নিচ্ছেন। আগামী সময়ে তার প্রতিফলন ঘটবে আশা করা যেতে পারে। কারণ বিগত কয়েক দশকের গল্প সমাহারে যে পরিবর্তনের ঢেউ, সমাজ বাস্তবতা, জীবনযাপনের কথা, লড়াই-প্রতিবাদ, সচেতনা সক্রিয়তা, এগিয়ে যাওয়ার পথ ও পরিসর আবার সংস্কৃতির গরিমা, হারানোর কষ্ট, বেদনা সবই গল্পের বিষয় আধার হয়ে উঠেছে। পরিবর্তনকে পাথেয় করেই যে সৃজন ধারা রাজবংশী সমাজে ধাবমান হয় তা সময়কালকে, পরিস্থিতি ও অবস্থানকেও সঠিকভাবে চিহ্নিত করেছে। স্বাভাবিকভাবে ছোটগল্পের পরিসরে আমরা পেয়ে যাই বিগত কয়েক দশকের দীর্ঘ আখ্যান, কথকতা এবং উত্তরণের কথালিপি, গল্পের বিস্তারে আমরা পেয়ে যাই স্বাধীনোত্তর সময়কালের রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির এক দীর্ঘ পরিচয় এবং বিবর্তনের চিহ্ন। সেইসঙ্গে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক সমাজ সংস্কৃতির পরিবর্তনের বার্তা। যা কালের নিরিখে কিংবা সাহিত্যগুণের বিচারে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সাহিত্যই

তো সময়ের দলিল, যেকোন সমাজের মনন চেতনার উন্নতি কিংবা অবনমনের উচ্চারণ। সেই জাতির সময়কালের সম্পদও বটে।

রাজবংশী ভাষায় কবিতাচর্চার ব্যাপ্তি ও পরিসরটি বিস্তৃত। কারণ কবিতা চর্চার ধারাটি সুদীর্ঘকালের প্রাচীন এবং ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে সৃজন সাহিত্যে অঙ্গীভূত হয়েছে। তবে আধুনিক কালের এই কবিতা চর্চায় একটি নতুন ধারা সেটা কাব্যগুণ, শব্দচয়ন, বিষয়, আঙ্গিক সবকিছুই রাজবংশী কবিতায় অঙ্গীভূত হয়েছে। প্রাচীন মধ্যযুগে কাব্যচর্চার গতিমুখটাও ছিল ভিন্ন। প্রাচীন যুগে রচিত লোকসাহিত্যের ছড়া, কবিতা, গান, শ্লোক (শিল্লুক), প্রবাদ-প্রবচনের ভাণ্ডারটিও সুবিশাল। মধ্যযুগে রাজন্য পৃষ্ঠপোষকতায় কাব্য সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি রতিরাম দাসের 'জাগ গান' কানাই ধামালী কিংবা পথ সাহিত্যের খোঁজ পাওয়া যায় অর্থাৎ ধারাবাহিক এক ঐতিহ্যের প্রবহমানতা আছে। যদিও সেটা অতটা বিস্তৃত ছিল না। কিন্তু সময়কালকে বিচার করলে এই ধারাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক কালে বিশেষ করে বিগত পাঁচ-ছয় দশকে রাজবংশী ভাষায় কবিতা চর্চার পরিসরটি যথেষ্টই উল্লেখযোগ্য এবং সেটার সূত্রপাতও করে যান মনীষী পঞ্চানন বর্মা। নিজস্ব সৃজন সাহিত্য (ডাংধরী মাও, ক্ষত্রিয়দের প্রতি, বেটা ছাওয়ালার প্রতি) এবং পুরোনো পুঁথি, পাঁচালী, ছড়া, শ্লোক সংগ্রহ করার মধ্য দিয়ে। এই কাজটি তিনি বিশ শতকের শুরুতেই করেন। সেখানে উত্তরবঙ্গের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতিও বিশেষ প্রাধান্য পায়। পরবর্তীকালে অনেকে এগিয়ে আসেন। উদ্ধার, সংরক্ষণ ও প্রকাশের (লিখিত) প্রয়াস শুরু হয়।

বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকে এক অস্থির রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে রাজবংশী ভাষায় সাহিত্যচর্চার একটি প্রেক্ষাপট তৈরি হয়। অনেকেই ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস নিয়ে সচেতন হয়ে ওঠেন এবং সৃজন সাহিত্যের একটি পরিসর তৈরি করেন। কিছু পত্র-পত্রিকা, গ্রন্থ প্রকাশেরও উদ্যোগ হয়, পাশাপাশি সাহিত্য চর্চার ধারাটিও বেগবান হয়। সেই ধারায় রাজবংশী ভাষায় কবিতা সাহিত্যর সম্ভারটি কিন্তু সমৃদ্ধ হয়। সেখানে আধুনিকতার বৈশিষ্ট্যগুলি সংযুক্ত হয়। বেশ কিছু লেখক লেখিকারও আগমন ঘটে।

এই সময়েই ১৩৬৮ বঙ্গাব্দের দিকে ড. গিরিজাশংকর রায় প্রকাশ করেন 'সাতভাইয়া' শীর্ষক একটি কবিতার সংকলন। সাতজন কবির কবিতা। বাসুদেব সেন, রাধানাথ দাস, কলীন্দ্রনাথ বর্মন, বিনোদবিহারী বর্মন, হেমকান্তি রায় প্রধান, তুষার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাউদিয়া রায়

(গিরিজাশংকর রায় স্বয়ং নিজে ছদ্মনামে)। ‘সাতভাইয়া’ কাব্যগ্রন্থে তিনি সংযোজিত করেন তার ‘ময়নামতী’ কাব্য আখ্যানের সঙ্গে চর্যাপদ, বৈষ্ণব পদাবলী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিস্কৃতি কবিতার রাজবংশী ভাষার অনুবাদ সমূহ। এই ‘সাতভাইয়া’ সংকলন গ্রন্থটি রাজবংশী ভাষায় সংকলিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ। দেখা যায় ‘সাতভাইয়া’য় সংকলিত কবিতার বিষয়বস্তুর মধ্যে নতুনত্ব, সমাজ সচেতনতা, জাতির প্রতি আবেদন, সুখ-দুঃখ, অভাব-হতাশা, নারীর অভীপ্সা, প্রকৃতি ভাবনা ভিন্নতর কাব্যময়তায় ধরা পড়ে। এই সংকলনে কবি তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেশ কয়েকটি কবিতা অর্ন্তভুক্ত হয়েছে। অসামান্য গঠন শৈলী ও কবিতাবোধের অধিকারী এই মানুষটি বাংলা কবিতার পাশাপাশি বেশ কিছু রাজবংশী কবিতা রচনা করেন। যে কবিতাগুলি রাজবংশী ভাষা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হয়ে আছে। তার ‘অললই ঝললই মাদারের ফুল’ কাব্যগ্রন্থটি তো রাজবংশী কবিতা সাহিত্যের অন্যতম একটি গ্রন্থ। রাজবংশী ভাষায় অ-রাজবংশী কবির প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ যেমন তেমনি রাজবংশী ভাষায় রচিত একক কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ এই ‘অললই ঝললই মাদারের ফুল’। প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে। তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতায় চরিত্র বাস্তব হয়ে ওঠে শব্দ ব্যঞ্জনার উপযুক্ত প্রয়োগ, উপমার ব্যবহারে। পরিচিত পরিবেশ ও ভাবনাকে তিনি রূপময়তায় ভরিয়ে তুলে জীবন সংলগ্ন করে তুলেছেন। তার কবিতায় গীতিময়তার স্পর্শ ছত্রে ছত্রে। তুষার বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন রাজনৈতিক সচেতন মানুষ, সেই বক্তব্যকে তিনি শ্রমজীবী খেটে খাওয়া মানুষের জীবনযন্ত্রণার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন কবিতার পঙক্তিতে। যেমন —

এলা হামরালায় পরদেশী হয়ে আছি ...
কাথালা ভাবিলে বুকখানোতে অগুন জ্বলি উঠে
হাতগিলা বড় বাঁশার নাখান শক্ত হয়া যায়
হামার আগিলা পুরুষ নাকি আজা ছিল্
বাউদিয়া বৈরাগীর মতন হামরা এলায় ...
ভিটার জমি, হাল-গরু বেচায়া হাত পাতেছি
মহাজন ব্যাপারী সগারে হাড্ডি শুষি খাছে ...
পুরানা দিনগালা চোখু বুজিলে ভাসি উঠে
গাঁওলা এলা ধুধুয়া পাথার, নিধুয়া শ্মশান।

তুষার বন্দ্যোপাধ্যায় সমকালীন রাজবংশী সমাজজীবনের ছবি নিখুঁত ভাবে তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে সেই সময়কালে রাজবংশী সমাজের অর্থনৈতিক দুরবস্থা, অভিবাসনের চাপে অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন, চিরাচরিত ভূমিজ ব্যবস্থার পরিবর্তনে রাজবংশী পরিবারগুলির সর্বস্বান্ত হওয়া সবকিছুই ধরা পড়েছে। ক্ষোভ-বিক্ষোভ মানসিক অবস্থার হদিশও আমরা তার কবিতায় পেয়ে যাই। বস্তুত তুষার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কবিতায় বিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়কালের কয়েক দশকের রাজবংশী সমাজ মননের ছবি যেমন এঁকেছেন তেমনি পরিবর্তনের ধাপগুলিকে চিহ্নিত করেছেন।

তার কবিতায় চরিত্ররা উঠে এসেছে জীবন্ত হয়ে। প্রকৃতি সন্নিবেশিত হয়ে উপমায় ধরা পড়েছে জীবনচর্যার প্রাত্যহিকী এবং চিরায়ত সংস্কৃতির ছবি। 'হালুয়ার চিন্' কবিতায় যেমন —

হালুয়ার চিন্ আইলের দাতিৎ
মাহুতের চিন্ পাগেলা হাতীৎ
জালুয়া বান্ধে খালতে আলি ...
খোলুয়ে চিন্ দ্যায় শোল-বোয়ালি
বৈদ্যের গুণখান্ জ্বরের ঝোকায়
গাছের চিন্‌খান ফলের থোকায়
রূপসী নারীর না নাগে গয়না
পাখির সেরা টিয়া আর ময়না।

তাঁর কবিতামুখ গীতিময়তায় রাজবংশী সমাজের ভাওয়াইয়া সঙ্গীতকে আবদ্ধ করে। চিত্রকল্পের সমৃদ্ধতায় রাজবংশী সমাজ জীবনের স্পন্দন অনুভূত হয় নিবিড়ভাবে 'হালুয়ার শোভা লাঙ্গল গোরু' কবিতায় যেমন পংক্তিতে পংক্তিতে ধরা পড়েছে -

দিনের শোভা সুরজের বাতি
রাইতের শোভা চান,
হালুয়ার শোভা লাঙ্গল গোরু
জমিনের শোভা ধান।

...   .

...   .

মরদ মানষির শোভারে ভাই
খোলা বুকের ছাতি,
ঘরের শোভা বাড়ে যদি
কইন্যা রূপবতী।

কলীন্দ্রনাথ বর্মন ছিলেন সমাজ সচেতন মানুষ। কবিতায় তার সমাজ হিতৈষণার বিষয়টি বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। যথার্থই তিনি সমাজ সাহিত্য নিয়ে সজীব ছিলেন, তার 'রাজবংশী অভিধান' সংকলন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যা রাজবংশী ভাষা সাহিত্যের ফলক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। কবিতায় তিনি সেই সমাজ সচেতনতারই সাক্ষর রেখেছেন। 'হামার উত্তরবাংলা', 'জাতির চিকনভাষা', 'আপন পায়ে দাড়াও', 'কিতায় এই দুর্গতি', 'মাথাগনতি' কবিতার নামের মধ্যেই তার ভাবনা ও বোধের পরিচয় উঠে আসে। আবার নারীর অভীপ্সা, আর্তিও তিনি কবিতায় আবদ্ধ করেছেন মননশীল মানসিকতায়। 'গাভুর চেঙেরির খেদ' কবিতায় সেটা প্রকাশ পেয়েছে। কলীন্দ্রনাথ বর্মনের কবিতায় আধুনিকতার ছাপ ছিল স্পষ্ট, ছন্দ শব্দ সুরের সাথে পরিচিত উপমা ও শব্দ শুনে মানুষের চেতনা আবেগকে স্পর্শ করা বা নাড়া দেওয়ার প্রয়াস তার কবিতায় মূর্ত হয়েছে। 'জাতির চিকন ভাষা' কবিতার ছত্রে তাই দেখা যায় -

নদীর চিকন বান বরিষণ
বালুর চিকন বাও
নারীর চিকন সোয়ামী পরিজন
ছাওয়ার চিকন মাও।
ভুইয়ের চিকন আলি
ভেমরুলের চিকন বাসা
মানষির চিকন শালি
জাতির চিকন ভাষা।

মানষি বাঁচিয়া রয়াও
জাতি মরে কোন বেলা?
ভাষা, সংস্কৃতি কৃষ্টি
ভুলিয়া যায় যেই বেলা।

কলীন্দ্রনাথ বর্মন ছিলেন একজন পণ্ডিত মানুষ, একজন সমাজ কর্মী এবং রাজনীতিবিদ। একাধিক ভাষা জনতেন। তার কবিতা সংকলন 'নয়া ডেগর' বস্তুত রাজবংশী কবিতায় নতুন পথের দিশারী ছিল এই কাব্যগ্রন্থ।

হেমকান্তি রায় প্রধান ছন্দে, সাধারণ শব্দবন্ধে কবিতায় বার্তা দিতেন যেখানে ব্যক্তিগত পরিসর থেকে সমাজ চেতনা, জাতি-ভাষা-সংস্কৃতির প্রতি দরদ ধ্বনিত হয়েছে। অসম্ভব দক্ষতায় তিনি লেখেন 'মাদেরেঙ্গার চিঠি' শিরোনামে একাধিক কবিতা সেখানে দীর্ঘ কবিতাও বৈশিষ্ট্য গুণে নতুন ধারার সৃষ্টি করে। সমাজ জীবনের ভাবনার কথাও তিনি কবিতার সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন —

শতেক যুগের কেচ্ছা দুঃখের
পুত মরা মার ব্যাথা
কায় লেখিবে মুই মরিলে
হামার আঙ্গ-এর কাথা?

এখানে তো আহ্বানই ধ্বনিত হয়েছে। নিজের কথা ভাবনা হয়ে উঠেছে সামগ্রিক। তাঁর বেশ কয়েকটি কবিতা 'সাতভাইয়া'য় সংকলিত হয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে রাজবংশী সমাজের নিবিড়তা, সাংস্কৃতিক জীবনে যে সুর, ছন্দ, রূপ, মাধুর্য সর্বোপরি জীবনরস হেমকান্তি রায় প্রধানের কবিতায় আবদ্ধ হয়েছে। কবিতায় তিনি যেমন বার্তা প্রদানের ভঙ্গি সম্পৃক্ত করেছেন তেমনি কবিতায় গল্প সংবদ্ধ করেছেন নিপুণ বৈশিষ্ট্যে। কবি হেমকান্তি রায় প্রধান অসংখ্য কবিতা লিখেছেন কিন্তু সংরক্ষণের অভাবে যা আজ স্মৃতিসম্ভার মাত্র। তিনি হরিমোহন বর্মন সম্পাদিত 'উত্তরবঙ্গ' পত্রিকা সহ জলপাইগুড়ির সুধীরঞ্জন বিশ্বাস সম্পাদিত 'উত্তরবাঙ্‌লা'; বারবিশা, জলপাইগুড়ি, বিনোদবিহারী বর্মন সম্পাদিত 'জাগরণী' পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। অনেকেই তাকে রাজবংশী ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি বলে মনে করেন। রাজবংশী সাহিত্যে পত্রকাব্য যেমন তাঁর অভিনব সংযোজন

তেমনি সাহিত্য সমালোচনা রাজবংশী ভাষা সাহিত্যে হেমকান্তিই প্রথম শুরু করেছিলেন। এই কাজটি তিনি করেন বাউদিয়া রায়ের 'ময়নামতী' কাব্যের সমালোচনার মধ্যে দিয়ে। একটি বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ্য যে আধুনিক কালে যে কয়েকজন রাজবংশী ভাষা সাহিত্যে চর্চা শুরু করেন তার মধ্যে হেমকান্তি রায় প্রধান অন্যতম ব্যক্তিত্ব এবং অনেক উত্তরসূরী তৈরি করার পেছনে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এমনকী বাউদিয়া রায়ের মধ্যে তিনি শিক্ষক হিসাবে সাহিত্যের বীজ বপন করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়কালে রাজবংশী ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অগ্রণী পথিক এবং পরিবর্তনের একজন কাণ্ডারীও বটে।

বাউদিয়া রায় তাঁর কবিতায় সমকালীন সমাজভাবনাকে বাঙ্ময় করেছেন। তাঁর কবিতায় নমনীয়তার সুরে ঘোষণা আছে, আহ্বান আছে আবার কাব্য গুণ বৈশিষ্ট্যকে তিনি অব্যয় হিসাবে মান্য করেছেন। যার প্রতিফলন তার চর্যাপদ, বৈষ্ণব পদাবলীর অনুবাদ কৃত্যে ঘটেছে। তার 'রাজবংশী' কবিতায় যেমন সূক্ষ্ম বার্তা আছে —

দুনিয়ার হাটে সগায় বসিয়া
যাছেরে বেসাতি করি,
স্বপনের ঘোরে এলাও আছিত্
নরম শেষাতে পড়ি?

কিংবা

নিন্ তোর এলাও ফুরায় না
আল্‌সি এলাও সাত্?

প্রশ্নবোধক চিহ্নের মধ্যে শুধু আহ্বান নয় তীর্যক শ্লেষও তিনি ছুঁড়ে দিয়েছেন জেগে ওঠার আশা নিয়ে। কবিতায় তিনি প্রাণকে যুক্ত করেছেন মননশীলতার ভাবগভীরে গিয়ে। এই বার্তা প্রদানও সেই সময়কালীন অবস্থায় জরুরি ছিল। সেটাকেও তিনি চিহ্নিত করেছেন কবিতার মধ্যে। এই জাগরণের আহ্বান তার সমাজবোধের প্রাজ্ঞতাকে স্মরণ করায়। অনুবাদ কর্মেও তিনি এই দক্ষতা ও উপলব্ধিকে সমাগত করেছেন অনায়াসে —

এই দেহার গড়ত পাঁচকিলা ধান
চনমন মনে সোন্ধায় কায়।

মাপিয়া নেক্ মাহাসুখ পোক্ত করিয়া,
এই গিয়ান আর্জেক গুরুকে পুছিয়া।
সমাধি মারিয়া তোর কিবা ফল হবে,
সুখ-দুখের মরণ তুই এড়াবো কি ভাবে?
ভবলীলা সুখের আশা ছাড়েক তুই,
শূন্যের পাখে পাও বাড়া কছে যে লুই।
পিড়া বানানেক তায় ধমন-চমন,
ধ্যানোতে জানিলো লুই বিচার হিমন।

(লুই পাদের "কায়া তরুবর পঞ্চ কি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল।" - পদের অনুবাদ।)

বাউদিয়া রায়ের কবিতায়ও গল্পের বিস্তার লুকিয়ে থাকে। 'কাজল-ভোমরা', 'নয়ানশ্বরী', 'বাউদিয়া' শীর্ষক কবিতায় গল্পের ভাষ্য রচিত হয়েছে শব্দ ছন্দের প্রকরণে। 'ময়নামতী' কাব্যে তারই প্রতিফলন ঘটে বিস্তারে। বাউদিয়া রায় ওরফে গিরিজাশংকর রায় অন্যতম ব্যক্তি যিনি আধুনিক রাজবংশী ভাষা সাহিত্য চর্চার গতিপথ নির্ণয়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন। লোকসাহিত্য থেকে গদ্য সাহিত্য, কবিতা প্রবন্ধ, রচনা সহ গ্রন্থ প্রকাশ সবেতেই তিনি আধুনিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। 'প্রসঙ্গ উত্তরবঙ্গ : লোক সাহিত্য (প্রথম পর্ব)' ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে এবং 'প্রসঙ্গ উত্তরবঙ্গ : লোক সাহিত্য (দ্বিতীয় পর্ব) ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন। প্রথমটিতে রাজবংশী ভাষা ও ছড়া এবং দ্বিতীয়টিতে রাজবংশী উপকথাগুলি সংকলিত করেন। সমকালীন পরিস্থিতিকে পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবন করে তিনি ভাষা সাহিত্য চর্চার উপর যেমন গুরুত্ব আরোপ করেন তেমনি আধুনিক সাহিত্যের গুণাবলী সম্পর্কে সচেতন হয়ে বিস্তারের প্রয়াস চালিয়ে যান। বলা যেতে পারে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি আধুনিক রাজবংশী ভাষা সাহিত্যের গতিমুখ নির্ণয়ে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছেন। কয়েক দশক ধরে নিরলস রাজবংশী ভাষা সাহিত্য চর্চায় যুক্ত থেকে তিনি রাজবংশী সাহিত্য সংস্কৃতির যুগ সময়কেও চিহ্নিত করেছেন।

একটি বিষয় উল্লেখ্য রাজবংশী ভাষা সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে অ-রাজবংশী কবি, লেখকরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। কবি তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম যেমন গুরুত্বের সঙ্গে

আসে তেমনি বাসুদেব সেনের নাম উল্লেখ করতে হয়। তিনি শুধু কবিতা চর্চা নয় একজন লোকশিল্পী ছিলেন। আবার প্রকাশনার ক্ষেত্রে বেশ কিছু বুদ্ধিজীবী সচেতনভাবে এগিয়ে এসেছিলেন। এ প্রসঙ্গে যেমন 'উত্তরবাঙ্‌লা' পত্রিকার নাম যেমন করতে হয় তেমনি পরবর্তীকালে 'পোঁহাতী' পত্রিকার ক্ষেত্রেও দেখা যায় বহু অ-রাজবংশী সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষ এগিয়ে এসেছেন। বেশ কয়েকজন গল্পকারের নাম যেমন জানতে পারি তেমনি সুবীররঞ্জন বিশ্বাস (সম্পাদক, উত্তরবাঙ্‌লা), অবনীন্দ্রপ্রসাদ সিংহ প্রমুখদের নাম আসে। 'পোঁহাতী' পত্রিকার সঙ্গে তো সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. চারুচন্দ্র সান্যাল, ড. হরিপদ চক্রবর্তী, ড. নির্মল কুমার বসু প্রমুখ পণ্ডিতবর্গও বিভিন্নভাবে যুক্ত ছিলেন। বিশ শতকের ষাটের দশকের পরবর্তী সময়কালে সমাজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন রাজবংশী সমাজের ক্ষেত্রেও দেখা যায় সেখানে অরাজবংশীরাও সমানভাবে এগিয়ে এসেছিলেন। সমাজ সচেতন মানসিকতা ও পারস্পরিক মেলবন্ধনের ছবিই যা থেকে স্পষ্ট হয়। স্বর্গীয় হরিশ চন্দ্র পাল যেমন ভাওয়াইয়া সংস্কৃতির জন্য এগিয়ে এসেছিলেন তেমনিভাবে সমাজের বিভিন্ন স্তর, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ রাজবংশী ভাষা সাহিত্য চর্চার পরিসরকে সমৃদ্ধ করেছেন।

বাচ্চামোহন রায় যেমন একজন প্রতিষ্ঠিত গল্পকার ছিলেন তেমনি একজন সমাজ সচেতন কবি হিসাবেও পরিচিত ছিলেন। রাজনৈতিক বোধ বীক্ষাকে গুরুত্ব নিয়ে ইতিহাস, সংস্কৃতি গ্রামজীবন, প্রকৃতির সন্নিবেশ তাঁর কবিতার বিষয় হয়ে উঠেছে। তিনিও 'পোঁহাতী' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আবার পরবর্তীকালে তিনি 'উজানী' পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। তার প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'আসোল ঘাটা'। তার কবিতার ছত্রে ছত্রে সময়ের স্পন্দন প্রতিফলিত হয়েছে। 'মোর এই আবাহন', 'নিশিনা', 'এইটায় হামার গান' কবিতাগুলির মধ্যে দিয়ে তার সমাজ বদলের স্বপ্ন, চেতনার স্তুতি ও অভিপ্রায় প্রকাশ পায়। রাজবংশী কবিতা সাহিত্যে তার ভূমিকা আধুনিকতার নিশানা। শ্যামাপদ বর্মনও রাজবংশী ভাষা সাহিত্যে আরেকটি উল্লেখযোগ্য নাম। তিনি শুধু কবি নন, একজন গীতিকারও বটে। তার উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'চান্দের হাসি ম্যাঘের কোলত।' তিনি বেশ কিছু আধুনিক ছড়াও লিখেছেন রাজবংশী ভাষায়।

সত্তর-আশির দশকে রাজবংশী সমাজের সামাজিক পরিবর্তন, অর্থনৈতিক সংকট এবং সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা রাজবংশী সমাজকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়। অনেকে ভূমি থেকে বিচ্যুত হয়ে

কাছে দূরের শহরে-নগরে বিভিন্ন বৃত্তি পেশায় ছড়িয়ে পড়ে। একটা অংশের মধ্যে সাংস্কৃতিক উদাসীনতা দেখা যায়, গ্রামে সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকবৃন্দেরাও (জোতদার পরিবার) কেউ কেউ সর্বস্বান্ত হয়ে শহরমুখী হয়। আবার এই সময়ে সমাজ সচেতনতাও দেখা যায় একটা অংশের মধ্যে। শিক্ষার বিষয়ে আগ্রহ তৈরি হয়। এক চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার মধ্যে রাজবংশী পরিবার সমাজ নতুন করে ভাবতে বাধ্য হয়। এই সময়ে তথাকথিত একটা শ্রেণি সমাজ সংস্কৃতি, সাহিত্য নিয়ে ভাবতে শুরু করে। বলা যায় এই সময়ে গিরিজাশংকর রায়, কলীন্দ্রনাথ বর্মন, ধর্মনারায়ণ বর্মা, বাচ্চামোহন রায়ের মত কতিপয় ব্যক্তিবর্গ পত্র-পত্রিকা, গ্রন্থ প্রকাশকে ঘিরে রাজবংশী ভাষা সাহিত্যের পরিসরে আবদ্ধ হন। পরবর্তীকালে নয়ের দশকে ভাষা সংস্কৃতি চর্চার মধ্যে দিয়ে সামাজিক-সাংস্কৃতিক এমনকী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডও শুরু হয়। বিভিন্ন সংগঠনও তৈরি হয়। কিন্তু যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হল ভাষা সংস্কৃতির বিষয়টি, বেশি গুরুত্ব পায়। অনেকে সচেতন হয়ে ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চায় যেমন উদ্যোগী হন তেমনি সংঘবদ্ধভাবে আধুনিকতার অনুসারী হন। পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে থাকেন। পত্র-পত্রিকা, গ্রন্থ প্রকাশের পরিসরও তৈরি করেন। লোক সাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানগুলি সংগ্রহ, সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ, জাতিসত্তার কথা, আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চায় অনেকে ব্রতী হন। এই প্রচেষ্টা শুধু উত্তরবঙ্গে নয় নিম্ন অসমের বিস্তৃত অঞ্চল, বিহার, নেপাল থেকেও শুরু হয়। স্বাভাবিকভাবে এই সময়কালটি রাজবংশী ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, একটা সংঘবদ্ধ প্রয়াসের অভিমুখ তৈরি হয়। বিস্তৃতিও পায় সময়কালের প্রেক্ষিতে। পরিবর্তনের ধারাও সূচিত হতে থাকে। তালিকাটি তারই প্রতিফলন —

রাজবংশী ভাষার বই, রাজবংশী বিষয়ের বইয়ের তালিকা [২৬]

(ক) কাব্য, কবিতা, গান, গীত ...

	লেখক	বই	প্রকাশক	সন	দাম
১.	তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়	অললই ঝললই মাদারের ফুল	জীবন বাগচী, গ্রন্থভারতী জলপাইগুড়ি	১৯৭৭	৪
২.	গোকুল রায়	নোখোলিয়ার বাঁশি	মানিক বর্মন, জলপাইগুড়ি	১৩৮৭	৫
৩.	সন্তোষ সিংহ (সম্পাদক)	সোনার লাঙ্গল রূপার ফাল (কবিতা ফোল্ডার)	ঋষ্যমুখ প্রকাশন, মাথাভাঙ্গা	১৯৮৮	

৪.	বীরেন রায়	উত্তরবঙ্গের ফুল্লরা পোহাতি	উত্তরবঙ্গ সাহিত্য পরিষদ, কদমতলা, দার্জিলিং	১৯৮৮	২০্
৫.	নগেন্দ্রনাথ রায়	হোকোলখোলি	তরণীকান্ত রায়, লোকসাহিত্য প্রকাশনী	১৯৮৮	৪্
৬.	বীরেন রায়	যুগের হাওয়া বদলে গেইছে	তিলক বর্মন, দার্জিলিং	১৯৯০	৭০্
৭.	বীরেন রায়	কর্ণবধকাব্য	মাধুরী রায়, কদমতলা, শিলিগুড়ি	১৯৯১	৮্
৮.	বিনোদবিহারী বর্মন	দিন যায় রাতি যায়	নীলদিগন্ত, তুফানগঞ্জ	১৯৯৫	৬্
৯.	যতীন বর্মা	একনা মানষি চায়	নীলদিগন্ত, তুফানগঞ্জ	১৯৯৫	৪্
১০.	বিনোদবিহারী বর্মন যতীন বর্মা (সং)	রাজবংশী কবিতা সংকলন	নীলদিগন্ত, তুফানগঞ্জ কুচবিহার	১৯৯৬	৪০্
১১.	অনন্ত রায়	কামতা কাব্য	মহেন্দ্রনাথ দাস, নটবর নবরত্ন কমিটি	১৯৯৬	৩৫্
১২.	সুজন বর্মন	বুক ভাঙে মোর নদীর দৈন্যা	দিশা নিকিলন, ভাটিবাড়ি, জলপাইগুড়ি	১৯৯৬	১৫্
১৩.	নগেন্দ্রনাথ রায়	শ্রীশ্রী গীতাআয়ী (অনুবাদ কাব্য)	গুরুসৈত্য প্রকাশনী	১৯৯৮	৫১্
১৪.	যতীন বর্মা	কবিতায় মোর ভাতের শাক	রায়ডাক প্রকাশন, তুফানগঞ্জ	১৯৯৮	৫্
১৫.	সুশীলচন্দ্র রায়	দুঃখিনী কামতা আঈ	বীরবাহাদুর ছেত্রী	১৯৯৯	১০্
১৬.	সুশীলকৃষ্ণ পাল (সম্পা)	ওকি গাড়িয়াল ভাই	দি মাইক সাপ্লাই, কোচবিহার	১৯৯৯	৩০্
১৭.	শ্যামাপদ বর্মন	সুজন সোনার ঘাট	লেখক	২০০০	২০্
১৮.	হরিমোহন বর্মন	বেকার	তুষার বর্মন, রাঙ্গালীবাজনা, জলপাইগুড়ি	২০০০	১০্
১৯.	অমূল্য দেবনাথ	এই নীলুয়া দ্যাওয়ার তলোৎ	নর্থবেঙ্গল কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন, কোচবিহার	২০০০	২০্
২০.	সুজন বর্মন	সুখ চান্দায় হায় সুখের হাবিলাস	দিশা নিকিলন, ভাটিবাড়ি, জলপাইগুড়ি	২০০০	২৫্
২১.	তপন-সন্তোষ (সম্পাদিত)	উত্তুরা বাও	পঞ্চানন প্রকাশনী, ঠাকুরপাট, জলপাইগুড়ি	২০০১	১০্
২২.	নগেন্দ্রনাথ রায়	চণ্ডালিকা (অনুবাদ কাব্য)	উত্তরবঙ্গ ইতিহাস, পরিষদ, জলপাইগুড়ি	২০০২	৩০্
২৩.	সুভাষচন্দ্র রায়	ইশাবাষ্য উপনিষদ	শ্রীউপাসু	২০০৩	২৫্
২৪.	দীনেশচন্দ্র সিংহ (সম্পাদিত)	রাজবংশী জাতির তেপুন্না গীত সংগ্রহ	বিশ্বজিৎ দেবশর্মা	২০০৩	১০্

২৫. কমলেশ সরকার (সম্পাদিত)	উত্তরবঙ্গের জাগের গান	নর্থবেঙ্গল কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন		৪্
২৬. হরিমোহন বর্মন	আবোনাতি	চিত্রা বর্মন, রাঙ্গালীবাজনা, জলপাইগুড়ি	২০০৪	৮্
২৭. তপন রায়প্রধান দিলীপ বর্মা (সং)	রাজবংশী কবিতা সংগ্রহ	দীপ প্রকাশন, কল-৬	২০০৪	৯০্
২৮. সন্তোষ সিংহ	কবিতা কুঙ্কুরার সুতা	সাহিত্য ভগীরথ	২০০৪	২০্
২৯. শ্যামাপদ বর্মন	গীতি সংগ্রহ	প: ব: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী গবেষণা কেন্দ্র	২০০৪	৫০্
৩০. প্রেমানন্দ রায়	কুসুমকালের কবিতা	নর্থবেঙ্গল আকাদেমি অব কালচার	২০০৫	১০্
৩১. মনোজ কুমার সিংহ	বুকের মাটি	ঐ	২০০৫	১০্
৩২. তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়	তিস্তা-তোর্যায় উজান ভাটি	দৌড় প্রকাশ, কল-১২৭	২০০৬	৪০্
৩৩. কমলেশ সরকার (সং)	গেয়ান গীতা	নয়া, তুফানগঞ্জ	২০০৬	৭্
৩৪. কমলেশ সরকার	ডাকনাম (১ম খণ্ড)	লেখক	১৪১৩	১২্
৩৫. অভিজিৎ বর্মন	ঘাণ্টিফুলের কটপ	রাজবংশী একাডেমী	২০০৭	৪০্
৩৬. অভিজিৎ বর্মন	ঢেসা ধানের সমাই	রাজবংশী একাডেমী	২০০৭	৪০্
৩৭. অভিজিৎ বর্মন	শাক তুলিনু বেছি কুছি	রাজবংশী একাডেমী	২০০৮	৪০্
৩৮. বাচ্চামোহন রায়	আসোল ঘাটা	রাজবংশী একাডেমী	২০০৮	৩০্
৩৯. বসন্ত বর্মন	অভিমান	রাজবংশী একাডেমী	২০০৮	৪০্
৪০. নগেন্দ্রনাথ রায়	রাজবংশী গুরুগীতা	রাজবংশী একাডেমী	২০১০	৬১্
৪১. অভিজিৎ বর্মন	তোরে বাদে	রাজবংশী একাডেমী	২০১১	৫০্
৪২. ড. নিখিলেশ রায়	কালনাত্তির কবিতা	রাজবংশী একাডেমী	২০০১	৪০্
৪৩. ড. নিখিলেশ রায়	উকাশের উককথা	রাজবংশী একাডেমী	২০০৬	২০্
৪৪. জ্ঞানবিলাস যৌষিৎরঞ্জন রায়	কটোপ	পাইকান বুকস ভেটাগুড়ি, কোচবিহার	২০১৪	৪০্
৪৫. অমূল্য দেবনাথ	ন্যাওটা জীবন	নিউ জেনারেশন পাব. মাথাভাঙা, কোচবিহার	২০১৪	১০০্
৪৬. ক্ষীরোদচন্দ্র দাস	তোমার মোর দুঃখের চিঠিগুলা /	লেখক	২০১৪	১০০্
৪৭. ধৃতিশ্রী রায়	মুই নারী মুই নদী	পাইকান বুকস	২০১৬	৬০্
৪৮. প্রসেনজিৎ রায়	চড়োক মেলা	পাইকান বুকস	২০১৬	৮০্
	শিমিলার ফুল	পাইকান বুকস	২০১৬	৮০্
	সাত আটটা রঙ	পাইকান বুকস	২০১৬	৮০্
৪৯. কমলেশ সরকার	বাঘ বাঘিনী ফুলটুসি	রাজবংশী ভাষা প্রসার সমিতি	২০১৬	৪০
	ফুলপরী	নয়া সাহিত্য বাসর ভেলাপেটা, তুফানগঞ্জ, কুচবিহার	২০১৫	৮০্

(ক) অভিধান, প্রবন্ধ, নিবন্ধ ...

১.	কলীন্দ্রনাথ বর্মন	রাজবংশী অভিধান	বীরেন্দ্রনাথ রায়, রাঙ্গালীবাজনা জলপাইগুড়ি	১৩৭৭	৫
২.	উপেন্দ্রনাথ বর্মন	রাজবংশী ভাষায় প্রবাদ প্রবচন ও হেঁয়ালি	জিতেন্দ্রনাথ রায় অজিতকুমার বর্মন	১৩৮৬	২০
৩.	খগেন্দ্রনাথ রায়	কামতাপুর ইতিহাসের আলোৎ (প্রাচীন যুগ)	উমাপদ রায়, মুন্সিপাড়া শালকুমার হাট, জলপাইগুড়ি	১৯৮৮	২
৪.	হরিপদ রায়	জয় বাবা জল্পেশ	হরিপদ রায়	১৯৯৪	১০
৫.	হরিপদ রায়	সংস্কৃতির মিলনৎ : বাবা জল্পেশ	লেখক	১৯৯৫	২০
৬.	ধর্মনারায়ণ বর্মা	কামতাবেহারী ভাষায় ব্যাকরণ ও রচনা শিক্ষা	অসিতকুমার বর্মন	১৯৯৫	৭
৭.	গুণধর বর্মন	কামতাপুরের ভাষা, কৃষ্টি, ইতিহাস	সুরঞ্জন রায়, চৌহদ্দী, গাড়িয়ালটারি, ডাউকিমারী, জল	১৯৯৯	১০
৮.	মণীন্দ্রলাল কুণ্ডু	তুলনামূলক বঙ্গীয় রাজবংশী ধাঁধা	মনুজেন্দ্র কুণ্ডু, শিলিগুড়ি	১৯৯৯	৪৫
৯.	ধর্মনারায়ণ বর্মা	কামতাপুরী ভাষা সাহিত্যের রূপরেখা	রায়ডাক প্রকাশন	১৪০৭	১২৫
১০.	গুণধর বর্মন	কামরূপ কাথা	সতীশচন্দ্র রায়, শিমলাবাড়ি, জলপাইগুড়ি	২০০০	
		আগিলা কাথা	ঐ		
১১.	সুখমন্ত বর্মন	কোচবিহারের লৌকিক শব্দকোষ		২০০০	
১২.	শচীন্দ্রনাথ বর্মন	কামতাপুরী ভাষাতত্ত্ব (ফোল্ডার)	কামতাপুরী ভাষা সাহিত্য পরিষদ	২০০০	৩
১৩.	হরিমোহন বর্মন	কামতাপুরী ভাষা	অপর্ণা বর্মন	২০০১	৭
১৪.	দীনেশচন্দ্র সিংহ	নয়া জমিদারী	লেখক	২০০২	৭
১৫.	ধর্মনারায়ণ বর্মা	কামতাপুরী ভাষা প্রসঙ্গ	রায়ডাক প্রকাশ	২০০২	৩০
১৬.	রঞ্জনা রায়	উত্তরবঙ্গ ভাষা সমস্যা	চিত্তরঞ্জন বর্মন	২০০২	
১৭.	হরিপদ রায়	আগিলা দিনের কথা (১ম)	হরিপদ রায়	২০০২	১২
১৮.	ধীরেশ চন্দ্র রায়	ছনছে ছনছে কাথা	প্রফুল্ল কুমার রায়, গোসাইহাট	২০০৩	৮
১৯.	হরিপদ রায়	দুই চাইর কাথাৎ রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মার জীবনী	প্রফুল্লকুমার রায়	১৪১০	৬
২০.	হরিপদ রায়	পাছিলা ফিরি দেখা	লেখক	২০০৪	৮
২১.	ড. দীপক কুমার রায়	মনীষী পঞ্চানন ও অসম	রাজবংশী একাডেমী	২০০৯	৫০
২২.	ড. নিখিলেশ রায়	সম্পাদকীয়	রাজবংশী একাডেমী	২০০৭	৪০
২৩.	সুজন বর্মন	কামতাপুরী অভিধান	কামতাপুরী ভাষা উন্নয়ন পরিষদ, দিনহাটা, কোচবিহার	২০১১	৭৯০
২৪.	তারামোহন অধিকারী	ভাষা আন্দোলনের গরজ ক্যানে	মিনতি অধিকারী হরিপুর লাঙ্গল গ্রাম, কোচবিহার	২০১২	৮০

২৫. দীপককুমার রায়	রাজবংশী সমাজ আরো সংস্কৃতির কথা	সোপান ২০৬, বিধান সরণী, কল - ৬	২০১২	১০০৲
২৬. যোগেন্দ্রনাথ দাস	উখকতার উখকতা	লেখক, আলিপুরদুয়ার	২০১৪	৮০৲
২৭. প্রসেনজিৎ রায়	ফুলে ফুলে ভরিয়া ভরফুল	পাইকান বুকস	২০১৬	৮০৲
২৮. ভগীরথ দাস	এক নজরে বীর চিলা রায়	পাইকান বুকস	২০১৬	৪০৲

(গ) নাটক, নাটিকা ...

১.	রামেশ্বর রায়	পুরান ভিটা	অমিত রায়	১৯৯৬	১৫৲
২.	হরিমোহন বর্মন	সেচায় সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশ	তুষার বর্মন	১৯৯৮	৬৲
৩.	হরিমোহন বর্মন	ভারত কাথা	তুষার বর্মন	১৯৯৯	৭৲
৪.	খুশী সরকার	ঋণ-তেভাগা		২০০৩	২০৲
৫.	খুশী সরকার	আয়েরা শাল বনের তেপুন্না	রেখা সরকার	২০০৫	১০৲
৬.	খুশী সরকার	চল পরির যাই	রেখা সরকার	২০০৫	২৫৲
৭.	সন্তোষ সিংহ	খুটার বিলাই	অম্লানজ্যোতি ডাকুয়া	২০০৫	২৫৲
৮.	আনন্দমোহন রায়	কমরেড আশারু	নিড্ডারু প্রকাশনী বীরপাড়া আলিপুরদুয়ার	২০১৫	১১১৲
৯.	প্রসেনজিৎ রায়	দালান বাড়ি	পাইকান বুকস	২০১৬	৬০৲

(ঘ) গল্প / উপন্যাস

১.	গোকুল রায়	সতী-সুনীতি (উপন্যাস)	পরেশচন্দ্র রায়	১৯৮১	১০৲
২.	হরিমোহন বর্মন	বড়াইর বটুয়া (Folk tale)	অপর্ণা বর্মন, রাঙালিবাজনা	১৯৮১	৪৲
৩.	বীরেন্দ্রনাথ রায়	আভং ফুলের মধু (গল্প)	কাবেরী কর্মকার, সঞ্চয়িতা, প্রসন্ন নগর, জলপাইগুড়ি	১৯৯৭	১২৲
৪.	হরিমোহন বর্মন	বেড়ানির কাথা (ভ্রমণ, গগয়াখণ্ড)	অপর্ণা বর্মন রাঙালিবাজনা, জলপাইগুড়ি	২০০০	৭৲
৫.	বীরেন রায়	ভোকস (উপন্যাস)			
৬.	সুভাষ নাথ	বুনসিড়ির ঢক (গল্প)	মালতী নাথ	২০০১	৫৲
৭.	হরিপদ রায়	গল্ফর ঝপা	লেখক	২০০২	৩০৲
৮.	কমলেশ সরকার	কাগা-টুনির কিচ্চা	নয়াপ্রকাশ, নাটাবাড়ি, কুচবিহার	২০০৩	২০৲
৯.	মিনতি অধিকারী (সম্পাদিত)	গল্পগোটা (গল্প)	রায়ডাক, তুফানগঞ্জ, কুচবিহার	২০০৩	৬০৲
১০.	নগেন্দ্রচন্দ্র রায়	দুখাতি (গল্প)	কমলা রায়, হিরন্ময় রায়	২০০৩	৩২৲
১১.	হরিপদ রায়	ঘরজেয়া (গল্প)	লেখক	২০০৫	২০৲
১২.	শচীমোহন বর্মন	আগোছালো পৃথিবী (গল্প)	নন্দবালা বর্মন		১০৲
১৩.	হরিমোহন বর্মন	বেড়ানির কাথা (ভ্রমণ)	নীরদকুমার রায়, রাঙালিবাজনা	২০০৫	৮৲

১৪. ভগীরথ দাস	সেন্দুকের ছোড়ানি	ফ্রিক, কুচবিহার	২০০৬	৩০
১৫. অভিজিৎ বর্মন	বাথান (উপন্যাস)	রাজবংশী একাডেমী	২০০৯	৮০
১৬. হরিমাধব রায়	ঢুপলুং-ঢাপলাং (গল্প)	উপজনভুই পাবলিশার্স মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার	২০১৬	১৩০

এই সময়কাল থেকে একঝাঁক সার্থক কবির আবির্ভাব ঘটে। যাদের কবিতায় সময়কালের প্রতিধ্বনি সহ সমাজ জীবনের কথা, উত্তরণের ভাবনা তথা ভাষা সাহিত্যের গৌরব রক্ষা ও সম্পৃক্তায়নের প্রয়াস দেখা যায়। যতীন বর্মা, নিখিলেশ রায়, কমলেশ সরকার, সুজন বর্মণ, অমূল্য দেবনাথ, সন্তোষ সিংহ, তারামোহন রায়, অভিজিৎ বর্মণ, প্রেমানন্দ রায় প্রমুখ। এদের কবিতায় আধুনিকতার বোধ সংযুক্ত হয়। কবি নিজেই অনুভবে একাত্ম হওয়ার সাথে সাথে সমাজ চেতনায় ব্যাপ্তি ঘটায়। সেইসঙ্গে গতিময়তা — যতীন বর্মা, তারামোহন অধিকারী, অমূল্য দেবনাথ কিংবা সুজনের কবিতায় সেটা ধরা পড়ে। যতীন বর্মার ‘একনা মন’ কবিতায় যেমন ধরা পড়েছে —

‘ত্যাঙো একদিন চান ডুবি গেইল
পঙ্খির ঝাক উড়ি গেইল বৈদ্যাশে
রসিকে না করে দোতারা বাজেয়া
ভাওয়াইয়া গান
ও হাইল্লার সাথুয়াক না ড্যাকায় টিয়ারি হাকে
দোতারা-কুষান গানত না হয় এলা ফ্যাসা।
মানষি উক্টায় লৈক্ষ মানষির ভিতিরা
একলা মন
হউক না ক্যানে কাঙাল মন
হাউরিয়া মন, মাওরিয়া মন
মানষি উক্টায় লৈক্ষ মানষির ভিতিরা
একটা পিরিতি মাখা মন।

তার অন্যান্য কবিতার ‘কবিতায় মোর ভাতের শাক’, ‘আয় আমরা ঠ্যাং বাড়াই’, ‘উমার পীরিতির

টানে’ কবিতাগুলিতেও সেই একই আভাস, গীতিময়তার সুর। কবি কমলেশ সরকারের কবিতায় প্রতিবাদের ভাষা অন্তর্হিত থাকলেও গীতিময়তায় তিনি যেমন সময়, অবস্থান, পরিস্থিতিকে সুন্দরভাবে ধরেছেন তেমনি নিজেকেই শরিক প্রতিপন্ন করে বোধের সন্ধান করেছেন। ‘কবি তুমি’ কবিতায় শুধু নয় অন্যান্য কবিতায় তারই প্রতিফলন দেখতে পাই। কমলেশ সরকার একজন শক্তিশালী কবি, বাংলাভাষার কবিতায়ও তিনি স্বাচ্ছন্দ্য। কবিতায় তার মনোবেদনা, প্রতিবাদ কখনও কখনও ধ্বনিত হয়েছে। সুজন বর্মণ একজন যত্নশীল কবিই শুধু নন তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত প্রাবন্ধিকও বটে। তবে ‘কামতাপুরি অভিধান’ একটি উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যা রাজবংশী ভাষা সাহিত্যের প্রসারে ভীষণ জরুরি ছিল সময়কালের নিরিখে। তার একাধিক কাব্যগ্রন্থও আছে। সমাজ হিতৈষী ভাবনা ও জাতিসত্তার বিষয়ে তার অত্যন্ত সংবেদনশীল মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে কবিতায় শব্দবন্ধে। অমূল্য দেবনাথের কবিতায় জাতির অবনমন, পরিচয় হারানোর ব্যথা, আবেগ কষ্ট ধ্বনিত হয়। সেখানে জড়িয়ে থাকে ক্ষোভ, বিক্ষোভ, মনোবেদনা ও তার ‘এই নিলুয়া দ্যাওয়ার তলৎ’ কাব্যগ্রন্থে ‘পরিচয়’ কবিতার মধ্যে ধরা পড়েছে।

‘যদি মোক পুচ করেন
তোমরা কায়।
মুই কইম
মোক কামাই দ্যাও বাবু কামাই উক্টাং।’

চেতনাকে আঘাত করে কঠোর কঠিন বাস্তবতাকে কবিতায় ধরেছেন। ‘হাত দুকান ইতিহাস গড়ায়’, ‘ইমরা কি মরি যাইবে’ কবিতায় যেমন মর্মন্তুদ ক্ষোভের কথা উচ্চারিত হয়েছে তেমনি প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য, মাধুর্যও তার কবিতায় ধরা পড়েছে।

প্রেমানন্দ রায়, তারামোহন অধিকারীর কবিতায় আর্তি আছে, খেদোক্তি আছে। তারামোহন অধিকারীর কবিতায় বৌদ্ধিক বিদ্রোহের আভাস আছে। সময়ের করাল স্রোতে চেতনার বিকাশ, সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার মুহূর্তকে সচেতন থাকার বার্তা, অর্থনৈতিক উত্তরণের ভাবনা সবকিছুই কবিতায় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। স্মৃতি, সত্তা, ভবিষ্যতের ভাবনায় এক ধরনের আবেশ রচনা করার ক্ষমতা তারামোহন অধিকারীর কবিতায় পেয়ে যাই। প্রেমানন্দ রায়ের কবিতাতেও অনুভবী কষ্ট, আবেগে, উচ্চারণে ঘুরে দাড়ানোর প্রয়াস দেখা যায়। তার

'মাটি মাও আর ভাষা' কবিতায় যেমন -

মাটি যেলা ডেক্‌চি উভুর করি লেপি দেওয়া হয়
সেলা উয়ার নাম নেওয়ালি।
মাটি যেলা কপালত ডপ ডপ করি চিতি দেওয়া হয়
সেলা উয়ার নাম তিলক।
মাটি যেলা বসত গড়ে চাতরের চাইর ঘর
সেলা উয়ার নাম ভিটা।
মাটি যেলা সোনার জিরাইত ফলায় —
এমাথা ও মাথা খালি সোনার বরণ
সেলা উয়ার নাম জমিন।
চাইর পহর রাতি জাগি থাকি থাকি
হালুয়া স্বপন দেখে কত কি রঙীন

কবি প্রেমানন্দ রায়ের কবিতাতেও এই ধরনের আবেশ ছড়িয়ে থাকে। জাতিসত্তার জন্য, ভাষার জন্য আবার সৌন্দর্য চেতনায় স্বদেশ, স্বজন আন্তরিক উচ্চারণে হাত বাড়ায়। কবিতাই কথা বলে ওঠে।

বিগত শতকের আট-নয় দশকের সময় মধ্যবর্তী কালটুকু রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের ক্রান্তিকাল, সংকটজনক সময়। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেও গুরুত্বপূর্ণ। বলা যেতে পারে এই সময়কালেই রাজবংশী সমাজের সামগ্রিক বিবর্তন ঘটতে শুরু করে। চিরাচরিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিন্যাস ভেঙে যায়। পেশা বৃত্তির সম্প্রসারণ ঘটে। অবনমনই ঘটে বলা যায়। চূড়ান্ত এক প্রতিযোগিতার মধ্যে টিকে থাকার লড়াই জমাট বাধতে থাকে। রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলাও বৃহত্তর এই জনগোষ্ঠীকে বিভ্রান্ত করে। জোতদারি বিলোপ আইন, ভূমি সংস্কার-অপারেশন বর্গা, তে-ভাগা আন্দোলন অভিবাসনের স্রোত, জনবিন্যাসের ব্যাপক পরিবর্তন, রাজবংশী সমাজের ভূমিচ্যুত হওয়া দারুণভাবে আলোড়িত করে। এই সময়েই ভাষা-সংস্কৃতি নিয়ে আন্দোলন, সচেতনতার জাগরণ, প্রতিবাদের ভাষা হিসাবে উঠে আসে। একটা অংশ অতি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং আরেকটা অংশ গভীর নিষ্ঠায় মননশীলতাকে সম্বল

করে সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় মনোনিবেশ করে। সমাজকে জাগরণের পথ অনুসন্ধানে সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চাকে হাতিয়ার করে। বেশ কিছু পত্র-পত্রিকা (বাঘধেনুক, ডেগর, রায়ডাক) প্রকাশের পাশাপাশি সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সূচনা ঘটে, আধুনিকতার ছোঁয়া লাগে। বাচ্চামোহন রায় সহ সন্তোষ সিংহ, নিখিলেশ রায়, কমলেশ সরকারের মত বেশ কয়েকজন কবি কলম ধরেন। নিখিলেশ রায়, সন্তোষ সিংহের কবিতায় বলিষ্ঠতা সবার নজরে আসে। সমাজ চেতনায় গভীরতা, উপলব্ধি, ভাবাবেগকে ছাপিয়ে প্রতিবাদের ভাষা হয়ে ওঠে। আট-নয়ের দশকটি রাজবংশী ভাষা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ সময়, প্রতিষ্ঠার জেদ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ভাষা কবিতায় বাধা পড়ে। সন্তোষ সিংহের কবিতা 'কবিতা কুঙ্কুরার সূতা' এই সময়ে কবিতা ফোল্ডার। দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্তে'র বাঘারুকে তার কবিতায় মূর্ত করে তোলেন, প্রশ্নের বানে তিনি সমাজ সংসারে নিজের অবস্থানকে চিহ্নিত করেন দৃঢ়তায়, কবিতার শব্দবন্ধের ক্ষমতায় 'মোর গাঁও মোর মাও' কবিতায় সেটাই উচ্চারিত হয়েছে -

"হামরা যেলা হামার নাকান চলি
হামরা যেলা ঠাকুর পঞ্চাননের কতা কই
সেলা হামরা সাম্পোদায়িক, বিচ্ছিন্নতাবাদী, কামতাপুরী —

হামার সউক গোলমাল হয়া যায় —
"আচ্ছা, হামরা কায়?"
হামরা যেলা ডাক্তার হই, ইঞ্জিনিয়ার হই
বড় অফিসার হই
সেলা সগায় হামাক 'কোটা'-র জোর দেখায়
সেলা হামরা নিবুদ্ধিয়া তপশিলি —
হামার খুব ধন্দো নাগি যায় — 'হামরা কায়'?
হামরা সাম্পোদায়িক, বিচ্ছিন্নতাবাদী, কামতাপুরী —
না গণতান্ত্রিক ভাল্ মানষি, না বাহে, আজবংশী
তপশিলি না বাঙালি।"

সেই সময়কালের সমাজ বিবর্তনের সংকটকালে জরুরি প্রশ্নটি কবিতায় ধরা পড়েছে। ক্ষোভ - বিক্ষোভের উৎস সন্ধানে জাতিসত্তার প্রশ্নে, সমাজ জীবনে রাজবংশী মানুষের অবস্থান ও সামগ্রিক মনোভাবকে কবিতায় জবাবদিহি করেছেন। আবার নিজের কাছেও নীরবে প্রশ্ন রেখে আত্মমর্যাদা বোধের ভাবনায় জারিত হয়েছেন, জারিত করেছেন বৃহত্তর সমাজকে। ঘুরে দাড়ানোর বার্তাও তাঁর সাহিত্যকর্মে অনায়াসেই উপলব্ধ হয়। এরকম বেশ কিছু কবিতা তিনি লিখেছেন আবার গ্রাম, সমাজের প্রতি নিবিড় ভালোবাসার কথাও শুনিয়েছেন —

"তুই কায়? তোক কেনেবা চিনায় যায়ছে না।
তুইকি মোর মাও?
মাথাটা হইছে পখির ভাসা
খ্যাসেরে বিরাইচে অগ্ —
শীদলের আওটার নাকান, ভুরভুরা চুরার নাকান গাও —
তুই কায়? — মোর দুখিনা মাও।"

তার শব্দচয়ন, উপমার ব্যবহার অসম্ভব কুশলী শিল্পী মনের পরিচয় দেয়। কবিতা ভাষ্য হয়ে গল্পের বিস্তার ঘটায় সমাজ বাস্তবতাকে প্রখর দৃষ্টি হেনে। ভোট সর্বস্ব রাজনীতির অবস্থাকে কবিতায় তিনি ধরেছেন নির্মমভাবে। কারণ গ্রামগঞ্জের সহজ সরল মানুষদেরকে নিয়ে প্রতিশ্রুতির ফাঁদে ফেলার করুণ বাখ্যানও তার কবিতার সম্পদ। যেমন —

" — এ সোমারু, মুই যেদু জিতোং
তোর ছাওয়াটা ট্‌টনা হবে
তোর নেংটি খান ধুতি হবে
তোর বুকের বাতা ঢাকা যাবে
তোর খসখসা গাও ছলছলা হবে
তোর ঝামটা দাতোত্ বসেয়া দিম্ নিশি ...।"

কিংবা

"বছর গিলা ঘুরি গেইল ... নাউয়ের গছ্‌টা বড় হইল্
নাউয়ের গছে ফুল হইল ... সেই ফুলে নাউ হইল্

নাউ হয়া পুরাট হইল্ ... পুরাট নাউয়ের বস্ হইল্
সেই বস্ বৈরাগী নিয়া হইল্ দেশান্তরী
— ওই যে তোমরা চলি গেইলেন
ওই যে তোমরা কয়া গেইলেন
আর আইস্‌লেন না ...।''

কবিতায় যুক্তি, ব্যাখ্যা, শ্লেষ এবং উপমায় অসামান্য দ্যোতক হিসাবে বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়েছে। আধুনিকতার স্বরে প্রতিবাদও উচ্চকিত কিন্তু নমনীয়তার গুণে গভীর ভাবনায় নিমজ্জিত করে। আবার আত্মসমালোচনা, নিজের সত্তার প্রতি বিশ্লেষণ ও সমাজ মনস্কতাকে ছড়িয়ে দেয়। প্রতিবাদের ভাষার মধ্যেও নিজস্ব সত্তাকেও দাঁড় করিয়ে তার রচনায় নিজের চেতনাকেও কেন্দ্রবিন্দু করা তার আধুনিকতার পরিচয়। 'মনটা কয়' কবিতায় সেটাই ধরা পড়েছে। সমসাময়িক সমাজ বাস্তবতা ও সমাজ ভাবনাকেও কবিতায় ধরেছেন - 'ডাওয়াপাড়ির কথা' 'অক্তমাখা কাইব্য কাহিনী' 'লোহার ফুটবল', 'দেওয়ালীর কোটা', 'পাথর', 'তুষের আগুন', 'শূন্য শেযাতে' 'শঙ্কিনী' কবিতাগুলির মধ্যে নিজের রাজবংশী সমাজের দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ, জীর্ণতাকে অনায়াসে তুলে ধরেছেন। আবার সমাজচিত্রকে তুলে এনে তৎকালীন সময়ের রাজবংশী সমাজের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎকে সীমাবদ্ধ করার লক্ষণও লক্ষ করার মত। তার কবিতার আধুনিক উচ্চারণ ভবিষ্যৎ পরবর্তী প্রজন্মের পথ ও পরিসরকে প্রশস্ত করে।

আরেক কবি নিখিলেশ রায়। রাজবংশী কবিতা সাহিত্যের নতুন পথের দিশারী। তার কবিতার মধ্যে গভীর মননশীলতার ছাপ যেমন স্পষ্ট তেমনি সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস চেতনার বিষয়গুলি অত্যন্ত নিবিড়ভাবে উঠে এসেছে। ভাষা-সংস্কৃতি চর্চার পরিসরে আত্মপ্রকাশের সঙ্গে জীবনযাপন, স্বভাবধর্মের বিষয়গুলিও পরম যত্নে তিনি কবিতার বিষয় করে তুলেছেন। আমরা সমাজজীবনে পরিষ্কার ছবি পাই। তার কবিতা আধুনিকতার বৈশিষ্ট্যগুণে উজ্জ্বল। প্রতিবাদের ভাষার মধ্যে চূড়ান্ত বলিষ্ঠতার প্রকাশ ঘটেছে শব্দ ব্যঞ্জনার গুণে। প্রতিক্রিয়ার প্রকাশে সংযম, সংবেদনশীলতা সমীহ জাগায়। 'কালনাত্তির কবিতা' (২০০১) গ্রন্থের কবিতায় ধরা পড়েছে সময়ের স্পন্দন —

''আন্ধার পড়িলে মধ্যনাত্তিত যেদু কুকুর ভোকে
ও ঘর থাকি মাও কয় — মানষি বিরাইছে কতা রে! কুকুর নাগচে

কুকুর নাগার কতা না হয় বুঝিলুং
কিন্তু মানষি বিরায় ক্যাং করি
সেখেনা বুঝিতে আরো ভালেদিন নাগিচে
কুকুর নাগিলে মাগোর কথায় জাগি নচি আমরা গোটায় নাত্তি

... ...

... ...

কুকুর নাগুক আর না নাগুক এলা সমসমায়
মাও ছাড়া এই কতাটা কায় আর এ্যামন করি জানিবে।

এই গ্রন্থের আরেকটি অসামান্য কবিতা 'আলো'। কবি নিজে চেতনার ভরকেন্দ্র হয়ে সমাজ ভাবনার প্রেক্ষিতে আলো জ্বেলেছেন —

মনে মনে মুই একেনা আলো আকোং
সেই আলোখুনা আস্তোকে হয়
পইলা পইলা ঘুবিয়া ঘুবিয়া নাকোং
ইলায় যেদু উনাক ফোকের কয়!

আলো পোষা কি যেমন তেমন কতা!
কোটে যায় নিন, কোটে বা প্যাটের ভাত
আলোখুনা যেদু বুকত বত্তি রয়
পাছে থো তোর শীদল ছ্যাকারও স্বাদ!

হাওয়া দেয় এদি, হুড়কা আর এক দিয়া
এদি ঝরি পড়ে, ওদি থিক থিকা কুয়া
তার মইধ্যত আলোখুনা কাপি ওঠে
কাশিয়াবাড়িত ওঠে হুক্কা হুয়া।

বাড়ি, বাড়ি সেই আলো খুনা বাটি দিম
প্যাটের না হয়, এ মোর বুকের ভোক
মনে মনে মুই একেনা আলো আকোং
সেই আলোখুনা আসলে আকে মোক।

'মানষিলা' কবিতাটি সমাজ সচেতনতার জীবন্ত দলিল। রাজনীতির দুর্বিপাকে শোষিত মানুষজনের করুণ কাহিনির ছবি কবিতার ভাষায় হাহাকার হয়ে ওঠে। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের ভাষা সনির্বন্ধ হয় অনুভবের আকাঙ্ক্ষায়।

আরও এমন কদ্দিন যে যাবে
কদ্দিনে আর পেট ভরেয়া খাবে?
কদ্দিনে আর নিজের কতা কবু
কদ্দিন আর বুদ্ধু হয়া রবু?
ভিকিরি উঠি ঘুরিয়া হয় খাড়া
এক নিস্টা এত্তোখুনা চাড়া।
মানষিগুলা নড়িচড়ি ওঠে
মানষিগুলা একটে খুনা জোটে।

এই উচ্চারণ তো নির্দিষ্ট কোন জনগোষ্ঠীর মানুষের জন্য নয়, শোষিত, নিপীড়িত নিম্ন মানব সমাজের। চারিদিকে শুধু তৃষ্ণার মাঝে এক শ্রেণির মানুষের লোভ, লালসা, শোষণ, চালাকিকে নগ্ন চেহারায় কবিতার শব্দবন্ধে ধরেছেন কবি নিখিলেশ রায়। 'কালনাত্তির কবিতা' কাব্যগ্রন্থের প্রত্যেকটি কবিতায় এই সচেতন ভাবনার দীপ্ত উচ্চারণ। আবার উত্তরণের আহ্বান তিনি রেখেছেন এবং দীর্ঘ সময় যাপনের প্রস্তুতিকে মাথায় রেখে সেখানে মা, মাটি সংলগ্ন হয়েছে শেকড়ের সন্ধানে।

নিজের ছাওয়ালা কাঙো কাঙো বোঝে কতা
বিরায় উমরা ঘর ছাড়ি — সউগ ছাড়ি
মাটি কান্দিলে বসি থাকিবার না পাই
আসুক হুড়কা, বাও-বাতাস বা ঝরি

এং করিয়ায় মাথা বাড়িবার ধরে
দেখার দেখি বিরায় আরো কত ঝনে
কত মরে কত ধর ধরি করে পুরুক .....
ভিতিরাত বসি উমরাও দিন গনে

পরবর্তীকালে শূন্য দশকে আমরা পেয়ে যাই আরেক কবি অভিজিৎ বর্মনকে। অসম্ভব অনুভবি এই কবির কবিতায় গ্রামজীবন, প্রকৃতির সৌন্দর্য, লালিত্য, মানুষের কথা, হাসি ঠাট্টা, জীবন রস উপচে পড়েছে। তার 'শাক তুলিনু বেছি কুছি' আর 'ঢেসা ধানের সমাই' কাব্যগ্রন্থ দুটিতে রাজবংশী শব্দ মঞ্জুরীর ভাঁড়ার হয়ে উঠেছে তার গভীরতার গুণে। ব্যঞ্জনাময় শব্দে অনুরণন ঘটেছে অনুভূতির। অতীত গৌরবের আহ্লাদ ভেসে ওঠে তার ব্যবহৃত শব্দের সমাহারে।

খাচারি কিনা আজারি করি পিতারি আনির যা
নাতারি পিতারি শাকের ভাজা খকরা দিয়া খা।
নাখিরি দিয়া কাখিড়ি খাটেক আখাত আকাড়ি দেক্
বোগোরি খাবার যাবোতে তুই নগদ নগরি নেক্।

আরেক নবীন কবি পীযূষ সরকার। ইতিমধ্যে তার কাব্যগ্রন্থ ''আমাছামা চান'', রাজবংশী ভাষা আকাদেমি পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে প্রকাশ পেয়েছে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে। সম্ভাবনাময় এই কবিতায় স্পষ্ট আধুনিকতার ছাপ। শূন্য দশক থেকে রাজবংশী ভাষায় কবিতা চর্চার যে বাঁক তার কবিতার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। কবিতায় কবির অনুভব, মননবোধ সেই সমাজ পর্যবেক্ষণের ভাবনাকে জারিত করেছেন। বিগত সময়ের ঝঞ্ঝা দীর্ণতা কাটিয়ে স্থির মননচিত্রের ছাপ কবিতাগুলির মধ্যে। আধুনিকতার জীবনমুখী সুর, স্ব-উচ্চারণে ভাবনার সম্প্রসারণ কবিতার শব্দবন্ধে ধ্বনিত হয়েছে। আগামী সময়ের পদধ্বনি তার কবিতায় শোনা যায়। যেমন —

আগিলা জনমে মুই পালাগান হইম
দুনিয়াদারির সউগ কাউরহাট্টি পার হয়া
রসিয়া ক্ষীরোলপুর,
আর সেই উদাং ডাবিরি ...
যেটিখুনা মুই মোক কুড়ি পাই চোং

যেটিখুনা সমে-সমে পিরিতির ঝুনঝুনাতি বাজে

ওটিখুনা জনম জনম ...

কিংবা

এইলা মুই আন্ধার পড়ি পড়ি জানিছোং
প্যাটের ভোক চিপি ধরি, ম্যাদেরা মুছি
ছিড়া স্বপনত ছিপটিপিন নাগাইতে নাগাইতে চখু খুইলচে মোর
না দেখিয়াও কয়া দিম — কার ভিতিরা কি;
কায় কোন রঙত ডুবি আছে ...

এইসব কবিতার ভাষা, মুখ থেকে যেমন আধুনিক রাজবংশী কবিতার গতিপ্রকৃতি বোঝা যায় তেমনি ধারাবাহিক বিবর্তনের ছবিটাও ধরা পড়ে এবং আগামী সময়ের পদধ্বনির উচ্চারণটাও ধ্বনিত হয়।

উপন্যাস, গল্প, কবিতার পাশাপাশি উল্লেখযোগ্যভাবে রাজবংশী সাহিত্য চর্চার অংশ বলা যায় প্রবন্ধ সাহিত্য। ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য নিয়ে বহু প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা সহ গ্রন্থে প্রকাশ পায়। আত্মসচেতনতা, জাতিসত্তার উন্মোচন সহ ভাষা বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধে রাজবংশী ভাষা সাহিত্য চর্চার বিষয়টি সমৃদ্ধ হয়েছে। সমাজ অর্থনীতি এমনকি রাজনৈতিক বিষয়গুলিও আধারিত হয়েছে বিভিন্ন প্রাবন্ধিকের কলমে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই নাম করতে হয় হরিমোহন বর্মনের নাম। তিনিই প্রথম ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে 'উত্তরবঙ্গ' পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখেন "সোচায় সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দ্যাশ!" নাম করতে হয় ড. গিরিজাশংকর রায়, নগেন্দ্রনাথ রায়, ড. গিরিন্দ্রনাথ রায়, ধর্মনারায়ণ বর্মা, ড. নিখিলেশ রায়, ড. দীপক কুমার রায়, ড. দ্বীজেন্দ্রনাথ ভকত, হরিপদ রায়, ক্ষিতীন্দ্রনাথ সরকার, বাচ্চামোহন রায় প্রমুখ অনেকের নাম। সুজন বর্মন, ড. ধীরেন্দ্রনাথ দাস, বজলে রহমান, ভগীরথ দাস, ইন্দ্রমাধব দাস সহ আরও অনেকে রাজবংশী ভাষা-প্রবন্ধ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। বলা যেতে পারে প্রবন্ধ সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সামগ্রিক সাহিত্য সংস্কৃতি ধারাটি উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রবন্ধ সাহিত্যের দু-তিনটি রাজবংশী পত্রিকাও প্রকাশ পাচ্ছে — উদিস (সম্পা-নিখিল বর্মা), লোক উৎস (সম্পা-পরিমল বর্মন)।

রাজবংশী ভাষায় নাট্য রচনার একটি পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছে। ভাষা-সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে নাট্য সাহিত্যের ভূমিকাটিও অস্বীকার করা যায় না। এমনিতেই রাজবংশী সমাজে লোকনাট্যের পরিসরটি সুবিস্তৃত। সুদূর অতীতকাল থেকে যা অব্যাহত ছিল। যদিও বিগত কয়েক দশকে দোতরাডাঙ্গা, পালাটিয়া কিংবা কুশানের পরিবেশটি অস্তমিত প্রায়। তবুও এই ধারায় কিছু কিছু সংস্থা, গোষ্ঠী পালাগানের এই ধারাটি ধরে রেখেছেন। ইদানীং নাট্যধর্মী কিছু পালাকে অবলম্বন করে কিছু নাট্যসংস্থাও তৈরি হয়েছে। নাট্যকার হিসাবেও দু'একজন পরিচিতি পেয়েছেন। সবার আগে নাম করতে হয় ভাটিবাড়ী, আলিপুরদুয়ার জেলার গুণেশ্বর অধিকারীর নাম। তিনি একাধিক নাটকের রচয়িতা শুধু নন তাঁর নির্দেশনায় 'ময়নার চখুর জল', 'ঘরজেয়া'র মত নাটকগুলি উত্তরবঙ্গ ও আসামে জনপ্রিয় হয়। বিশেষ করে 'ময়নার চখুর জল' রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি করে। ধূপগুড়ি এলাকায় তপন রায়, মহেশ রায়, সুশীল রায়, কৃষ্ণবিহারী বর্মন সহ বেশ কয়েকজন নাট্য রচনার সঙ্গে যুক্ত। মনয়াগুড়ি থেকে দীনেশ রায় 'রাবান' সহ বেশ কয়েকটি নাটক রচনা করেছেন। মেখলিগঞ্জ, চ্যাংরাবান্দা থেকে শচীমোহন বর্মন এই নাট্যচর্চার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত হয়ে আছেন। গুণেশ্বর অধিকারীর 'ময়নার চখুর জল' নাটকে পণপ্রথা মুখ্য বিষয় হয়ে রাজবংশী সমাজের সংস্কৃতির পরিবর্তনের দিকটি তুলে ধরেছেন। কারণ অতীতে রাজবংশী সমাজে 'কন্যাপণ' প্রচলিত ছিল। তাঁর 'ঘরজেয়া' নাটকে ঘরজামাই-র যন্ত্রণা, অপমানের কাহিনিকে বর্তমান প্রেক্ষিতে তুলে ধরেছেন। অতীতে রাজবংশী সমাজের ঘরজেয়া বিয়ে অর্থাৎ ঘরজামাই থাকা বহুল প্রচলিত একটি প্রথা ছিল। তাঁর 'জোনাকির সংসার' নাটকে ধরা পড়েছে রাজবংশী সংস্কৃতির একটি অনবদ্য বিষয় 'চোর চুরনীর' আখ্যান। যা মূলতঃ লোকনাটকের একটি বিষয় ছিল। অতীতের লোকটানকের বিষয়ই বর্তমান লোকনাটকের অংশ হয়ে উঠেছে। রাজবংশী সমাজের লোকনাটকের পরিসরটি বিস্তৃত। সেটা চোরচুরনী থেকে মেচেনী সবেতেই লোকনাটকের উপাদান বিদ্যমান। দোতরা, কুশানকে ঘিরে তো অজস্র ভাওয়াইয়া সঙ্গীতের জন্ম। স্বাভাবিকভাবে নাট্যরচনার বিষয়টি রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির এক বিশেষ ঘরানা।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাকে ঘিরেই রাজবংশী ভাষায় সাহিত্য চর্চার পরিসরটি সম্প্রসারিত হয়েছে। তাদের এই উদ্যোগ এবং প্রয়াসের মধ্যেই আজকের রাজবংশী ভাষা সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রটি বিরাজমান। অনেক বাধাবিপত্তি, সামাজিক, রাজনৈতিক চাপ, বিভ্রান্তি ও বক্তব্যকে অতিক্রম

করতে হয়েছে তাদের। তাই সাহিত্য চর্চার প্রসঙ্গে এই পত্রিকাগুলির নাম গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। হরিমোহন বর্মনের 'উত্তরবঙ্গ' পত্রিকা যেমন, তেমনি জলপাইগুড়ি থেকে প্রকাশিত সুবীররঞ্জন বিশ্বাস সম্পাদিত 'উত্তরবাঙলা' পত্রিকা কিংবা কলীন্দ্রনাথ বর্মনের 'নয়া ডেগর', বিনোদবিহারী বর্মনের 'জাগরণী', 'পোঁহাতী', 'দুন্দ', 'উজানী'। ধর্মনারায়ণ বর্মার পৃষ্ঠপোষকতায় 'রায়ডাক', নরেন দাসের উদ্যোগে 'বাঘধেনুক', নিখিলেশ রায়ের সম্পাদনায় 'ডেগর' রাজবংশী ভাষা আকাদেমির 'ভোগা', অজিত কুমার বর্মার 'মনসূয়া', নির্মল বর্মার 'উদিস' — এইসব পত্রিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। গোষ্ঠীচেতনাকে অতিক্রম করে সমাজ ভাবনার বিষয়টি যেমন গুরুত্ব পেয়েছে তেমনি সংস্কৃতি চর্চা তথা সমকালীন সমাজের উত্থান পতন, ঘাত-প্রতিঘাত সমূহকে লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরার প্রয়াস তারা নিয়েছিলেন। বিগত শতাব্দীর ষাট-সত্তর দশক থেকে রাজবংশী সমাজ জীবনের যে পরিবর্তনের ধারা, জীবন-জীবিকার লড়াই, ঝড়-ঝঞ্ঝা সমস্ত কিছুকে ধারণ করে ইতিহাসের উপাদান হিসাবে ধরে রেখেছেন। সর্বোপরি রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের যে পথ পরিক্রমা তারও বৃত্তান্ত মনন প্রক্রিয়ায় তুলে ধরেছেন। যা রাজবংশী সমাজ জীবন তথা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জরুরি বিষয় শুধু নয় জাতিসত্তার উন্মোচন ও বিকাশের পক্ষেও আবশ্যক ছিল। সঙ্গে সাংস্কৃতিক উপাদানের অতীত গৌরব উদ্ধার ও ভবিষ্যৎ সময়ের জন্য সংরক্ষণ, প্রসারের যে পরিসর তাও সাহিত্যচর্চার আবহে সংবৃত্ত করতে পেরেছেন। যা সামগ্রিকভাবে বাঙলার তথা ভারতীয় সংস্কৃতির অনন্য সম্পদ। কারণ ভারতীয় সংস্কৃতির বহুত্বে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। স্বাভাবিকভাবে একটি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষায় সাহিত্য চর্চার বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ এর মধ্যেই এই জনগোষ্ঠীর পথ পরিক্রমা, উত্তরণ, সমৃদ্ধি ও সম্ভাবনার বীজ লুকিয়ে আছে। অন্যান্য জনগোষ্ঠী অপেক্ষা প্রাগসর এই জনগোষ্ঠীর অতীত সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে যেমন প্রাচীন ও মধ্যযুগের অনুবাদ রচনা ও লোক সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে পাই তেমনি বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত, সংগৃহীত এবং সংকলিত পুঁথি গ্রন্থ থেকে এই জনগোষ্ঠীর সমাজ সংস্কৃতি সম্পর্কে বিশদে জানতে পারি। স্বাধীনোত্তর সময়কালে এই জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক পরিচয় এই সাহিত্যচর্চার বিন্যাসে গ্রন্থিত হয়েছে যা সমাজ বিজ্ঞানের ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ। সাংস্কৃতিক বিবর্তনের প্রেক্ষিতেও যা ভবিষ্যৎ সময়ের জন্য জরুরি।

তথ্যসূত্র :

১. খা চৌধুরী, আমানত উল্লা; কোচবিহারের ইতিহাস (১ম খণ্ড), গন্ধর্বনারায়ণের (বংশাবলী, পত্র সংখ্যা পাদটীকা নং - ৩২) পৃষ্ঠা - ৮৬

২. রায়, শচীন্দ্রনাথ; সাহিত্য সাধনায় রাজন্য কোচবিহার, এন. এল. পাবলিশার্স, শিলিগুড়ি, ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ, ২০১৩, পৃষ্ঠা - ১৪

৩. শর্মা, নবীন্দ্র চন্দ্র (সম্পাদিত); দরঙ্গ রাজবংশীবলী (সূর্যকান্ত দৈব বিরচিত), পৃষ্ঠা - ৬৬

৪. ঐ, পৃষ্ঠা - ৬৮

৫. রায়, শচীন্দ্র নাথ রায়; সাহিত্য সাধনায় রাজন্য শাসিত কোচবিহার, এন. এল. পাবলিশার্স, শিলিগুড়ি, পুনর্মুদ্রণ, ২০১৩, পৃষ্ঠা - ১৩

৬. সেন সুকুমার; বঙ্গভূমিকা; পৃষ্ঠা - ৪০

৭. রায়, নিহাররঞ্জন; বাঙালীর ইতিহাস (২য় খণ্ড), সাক্ষরতা সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ৬২৩

৮. সেন, দীনেশ চন্দ্র; বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১৩১৫, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ১৩৪

৯. বর্মা, সুখবিলাস; জাগ গান, আর্ট পাবলিশিং, কল - ৯, ২০১০ (২য় সংস্করণ), পৃষ্ঠা - ৭৯

১০. ঐ, পৃষ্ঠা - ৮১

১১. ঐ, পৃষ্ঠা - ৫১

১২. বসুনীয়া, নারায়ণ চন্দ্র; গোরক্ষনাথের গান লোকপুরাণের আঙিনায় রাজবংশী জীবন কথা, গ্রন্থবিকাশ, কল-৭৩, ২০১৪, পৃষ্ঠা - ৫০-৫১

১৩. ভট্টাচার্য, আশুতোষ; বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, আলোচনা সংস্করণ, ১৯৬২, পৃষ্ঠা - ৩৮৫

১৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত; বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় খণ্ড, সংস্করণ ১৯৬৬, পৃষ্ঠা - ৩৭৯

১৫. সেন, উমা; প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সাধারণ মানুষ (সংস্করণ ১৯৭১), পৃষ্ঠা - ১৫৪

১৬. ঐ, পৃষ্ঠা - ১৬২

১৭. বন্দ্যোপাধ্যায় অসিত; বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ৩য় খণ্ড, সংস্করণ ১৯৬৬, পৃষ্ঠা - ৩৮৯

১৮. চৌধুরী, ভূদেব; বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (প্রথম পর্যায় : সংস্করণ - ১৯৬৫), পৃষ্ঠা - ৭৫

১৯. সেন, সুকুমার; বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃষ্ঠা - ৩৬০

২০. ভট্টাচার্য, সুরেশ চন্দ্র (সম্পাদনা); কবি জগজ্জীবন বিরচিত মনসামঙ্গল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০, পৃষ্ঠা - ২৯০

২১. বর্মা, ধর্মনারায়ণ ও মান্তা, ধনেশ্বর (সম্পাদনা); কামরূপ কামতা কুচবেহার রাজ্যের ইতিহাস, তুফানগঞ্জ, কুচবিহার ২০০৫, পৃষ্ঠা - ৩৬০

২২. ঐ, পৃষ্ঠা - ২৪৫

২৩. প্রচলিত

২৪. চট্টোপাধ্যায়, বিমল চন্দ্র; উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত ভাওয়াইয়া ও চটকা, ১ম প্রকাশ ১৯৯২, পৃষ্ঠা - ১১৫

২৫. ঐ, পৃষ্ঠা - ১১৩

২৬. ডেগর - ৪, ২০০৬, রায়, নিখিলেশ (সম্পাদক), নর্থবেঙ্গল আকাদেমি অব কালচার, শিবমন্দির, কদমতলা, দার্জিলিং, ৭৩৪০১৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাজবংশী সংস্কৃতি রূপান্তরের ধারা

ষোড়শ শতকের গোড়ায় কোচ রাজবংশ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে রাজবংশী জনগোষ্ঠী যেমন সংগঠিত হয় তেমনি সমাজ ও সংস্কৃতি পরিবর্তনের সূচনা ঘটে। মহারাজা বিশ্বসিংহ সিংহাসনে আরোহন করেই হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন। কাশীচন্দ্র ভট্টাচার্যের নিকট শৈবধর্মে দীক্ষিত হন। যদিও বিশ্বসিংহের রাজ্যলাভের সময় থেকেই হিন্দু ধর্মাবলম্বনের সূত্রপাত হয়েছে এই উক্তির সমর্থনে যথার্থ যুক্তির কোন প্রামাণ্য নথি নেই। বিশ্বসিংহের পুত্রের সমসাময়িক ঐতিহাসিক শেখ আবুল ফজলের 'আকবর নামা' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে বিশ্বসিংহের মাতা জল্পেশ্বর শিবের আরাধনা করে তাকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। সুতরাং বিশ্বসিংহের মাতা-পিতা যে হিন্দু ছিলেন তা নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে।[১] তাছাড়া কোচ-রাজবংশ উত্থানের আগে কামতাপুরে তিনজন খেন বংশের নৃপতি - নীলধ্বজ (১৪৪০-১৪৬০ খ্রি:), চক্রধ্বজ (১৪৬০-১৪৮০ খ্রি:) এবং নীলাম্বর (১৪৮০-১৪৯৮ খ্রি:) রাজত্ব করেন। নীলাম্বরের রাজত্বকালে রাজ্যের সীমানাও বহুদূর বিস্তার লাভ করে। এরা 'কান্তেশ্বর' নামে পরিচিত ছিলেন। এদের আরাধ্য দেবীও ছিল 'কামতেশ্বরী'। দেবী দুর্গার প্রতিরূপ কামতেশ্বরী চণ্ডীর আরাধনা আজও প্রচলিত। রাজধানী ছিল বর্তমান দিনহাটা কোচবিহারের গোসানীমারী। নীলাম্বরের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর ষড়যন্ত্রে গৌড়ের হোসেন শাহের সৈন্যদের আক্রমণে খেন রাজবংশের অবসান ঘটে। সে সময়কার ঘটনা, সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয়ে হিন্দু ধর্মের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। তবে এটা বলা যায় কোচ-রাজবংশের যথার্থ প্রতিষ্ঠা ও মহারাজা বিশ্বসিংহের সময়কালে (১৫১০-১৫২৮ খ্রি:) ব্রাহ্মণ্য ধর্ম অর্থাৎ হিন্দুধর্মের সংগঠন বিস্তার লাভের সূচনা হয়। বিশ্বসিংহ নিজে শিব ও দুর্গার উপাসক ছিলেন। 'তিনি কনৌজ, কাশী এবং অন্যান্য স্থান থেকে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে আনয়ন এবং তাহাদিগকে স্বরাজ্যে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ বাসুদেব ভট্টাচার্য্যের পুত্র বল্লভাটাচার্যকে শ্রীক্ষেত্র থেকে আনয়ন পূর্বক তাহাকে তিনি কামাখ্যাদেবীর সেবাপূজায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন।'[২]

একথা বলা যায় মহারাজা বিশ্বসিংহের রাজত্বকালের সময় থেকেই বহিরাগত বিশেষ করে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মানুষের আগমন ঘটে। এই ধারা পরবর্তী সময়কালেও অব্যাহত থাকে। মহারাজা নরনারায়ণের রাজত্বকালে এসে রাজ উদ্যোগে মিথিলা ও গৌড় প্রভৃতি স্থান থেকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিয়ে ব্রহ্মোত্তর ভূমি দান করে বিভিন্ন মন্দিরে পূজা-অর্চনার কাজে নিয়োজিত করা হয়। এমনকী রাজসভাতেও তাদের স্থান দেওয়া হয়। সংস্কৃত শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়।[৩] এটা বলা যায় যে কোচ-রাজবংশকে ঘিরে বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠী যেমন সংগঠিত হয় তেমনি আর্যীকরণের পর সাংস্কৃতায়নের সামাজিক প্রক্রিয়ায় রাজবংশী জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় ও সামাজিকীকরণ ঘটে দ্রুতগতিতে। রাজবংশী সমাজে বৈষ্ণব ধর্মের অন্তর্ভুক্তি ঘটে — সেটাও রাজানুগ্রহে। মহারাজা নরনারায়ণের সময়কালে শংকরদেবের আগমন ঘটে তার 'একশরণ' ধর্ম এবং 'নাম ঘোষা' গীতের প্রচলন ঘটে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর মধ্যে। রাজবংশী সমাজে শংকরদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব সুদূর প্রসারী। 'অসমের বৈষ্ণব ধর্মগুরু কোচবিহার রাজ্যে শংকরদেব মহারাজা নরনারায়ণের রাজত্বকালে আশ্রয় নেন এবং একশরণ বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন।'[৪] মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণের সময়কালে বৈষ্ণব ধর্ম ব্যাপক প্রসার লাভ করে। শংকরদেবের ভাবশিষ্য মাধব দেব এবং দামোদর দেব পরবর্তীকালে কোচবিহার রাজ্যে এসে বসবাস করেন। মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণ স্বয়ং বৈষ্ণব ধর্মের দীক্ষা নেন। মাধব দেব ও দামোদর দেবের প্রভাবে বৈষ্ণব ধর্ম কোচ-রাজ্যে ব্যাপক প্রসার লাভ করে। অনেকের অনুমান বৈষ্ণব ধর্মের অনুভাবেই কোচ-মহারাজাগণ নারায়ণ উপাধি ধারণ করেন নরনারায়ণের সময়কাল থেকে। এই এলাকায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার ঘটে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে নয় অসমের ধর্মগুরু শংকরদেবের প্রভাবে। রাধাবিহীন বিষ্ণুরূপী কৃষ্ণের একক আরাধনা প্রচলিত হয় 'মদনমোহন' নামে। 'মদনমোহন' কোচ-রাজবংশের কুলদেবতা হিসাবে আখ্যায়িত। সেই সাক্ষ্য আজও বহন করে চলেছে। বলা যায় রাজবংশী সমাজে শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার ঘটে অনেক পরে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত মানুষজনের সংস্পর্শে। কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গে দেশ বিভাজিত হওয়ার পর পূর্ববঙ্গ থেকে আগত মানুষজন বিষয়-আশয়ের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তিকেও নিয়ে এসেছিলেন। এদের প্রভাবেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম এই এলাকার মানুষজনের মধ্যে ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব ও ভাবনায় রাজবংশী সমাজও হরি সংকীর্তনে মেতে ওঠে। অনুরূপভাবে

অনেক লৌকিক দেবীও ঠাঁই পায় পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বাঙালি সমাজের পূজা-অর্চনা ও বিশ্বাস ভাবনা অনুসরণে। বলা যেতে পারে ধর্মীয় ভাবনার সম্প্রসারণ ঘটে অনুগ্রহণ, আত্তীকরণের মেলবন্ধনে। স্বাভাবিকভাবে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ধারাটি তরান্বিত হয়।

১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ১২ সেপ্টেম্বর রাজতন্ত্রাধীন কোচবিহার রাজ্য গণতান্ত্রিক ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি কোচবিহার পরিণত হয় একটি জেলায়। উল্লেখ্য বর্তমান জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং দার্জিলিং জেলার বৃহদাংশই একদা এই কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। নিম্ন আসাম সহ অন্যান্য অঞ্চলও ছিল। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকার প্রশাসনিক স্বার্থে জেলাওয়ারী বিভাজন করে। এই অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজবংশীদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ধ্যানধারণা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রসারিত হতে সাহায্য করে। বলা যেতে পারে বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ভাবনা এতদঞ্চলের রাজবংশীদের মনোভাব অনুযায়ী বরাবরই ছিল। স্বাভাবিকভাবে বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সামাজিক কিংবা সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের বিষয়ে কোচবিহার ও পার্শ্ববর্তী জেলা জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের প্রসঙ্গটি বেশি করে আসে। বৃহত্তর রাজবংশীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ভিন্নভাবে আধারিত হয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর কিংবা মালদহে। পার্শ্ববর্তী প্রদেশ বিহার, ঝাড়খণ্ড থেকে নেপাল কিংবা বাংলাদেশের প্রভাবও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাছাড়া মালদহ ও দার্জিলিং দীর্ঘকাল ভাগলপুর ডিভিসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দার্জিলিং জেলায় নেপালি ভাষাভাষী বহু মানুষের আগমন ঘটে। বৃহত্তর বাঙালি সংস্কৃতির প্রভাব তো আছেই। তাছাড়া মালদহ জেলায় সংখ্যাগত দিক থেকে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর অবস্থান কোচবিহার বা আলিপুরদুয়ার জেলার মত নয়। সেখানে সামাজিক সংগঠনও ভিন্নভাবে গড়ে উঠেছে। বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠীর ওপর কোচ-রাজবংশের প্রভাব অনস্বীকার্য এবং সর্বাংশে পরিবর্তনের অনুসারী। রাজপরিবারবর্গের ভাবনা ও অনুসরণকে রাজবংশী জনগোষ্ঠী শুরু থেকেই অনুগ্রহণ করে। সেটা শুরু হয় মহারাজা বিশ্বসিংহের ধর্মীয় আচরণ ও ভাবনাকে সূত্র করে। তাছাড়া কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলা চারটিতে সকল রাজবংশীদের মধ্যে আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে সমতা দেখা যায়। সেইসঙ্গে রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক পরিসর যেহেতু অনেকাংশে লৌকিক ধর্মাশ্রীত, স্বাভাবিকভাবে ধর্মীয় বোধের সঙ্গে সঙ্গে রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক ভাবনাও সেভাবে সম্প্রসারিত হয়।

রাজপরিবারের সঙ্গে বাইরের অরাজবংশী পরিবারের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন এবং সামগ্রিক সাংস্কৃতিক পরিবর্তন বৃহত্তর রাজবংশী সমাজের উপরও পড়ে। এই পরিবর্তন ভেতর ও বাহির দু'দিক থেকেই সম্পন্ন হতে থাকে। প্রাচীনকাল থেকেই কোচবিহারের সংস্কৃতি পরিবর্তনের এই ধারা অব্যাহত ছিল এবং বলা যায় সূচনাকাল থেকে। তবে সেই পরিবর্তনের ধারাও পরিবর্তিত হয় সময়ের সাথে সাথে। সেখানে কোচ-রাজবংশের যেমন প্রভাব তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। শেষদিকে মনীষী পঞ্চানন বর্মার সমাজ সংস্কারও একটি বড় পরিবর্তন ঘটায়। উল্লেখ্য প্রাচীনকাল থেকে রাজবংশী সমাজের পরিবর্তন হলেও রাজবংশী সমাজের নিজস্ব সংস্কৃতির অবয়ব সম্পূর্ণ মাত্রায় ছিল। বিদেশীদের আগমনও প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কিন্তু তারপরেই বহিরাগতদের কোচবিহার সহ পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে স্থায়ীভাবে বসবাসের ফলে রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক ধারা অনেকটা পশ্চাদপসরণ হতে হতে বর্তমানে অনেকাংশে ম্লান হয়েছে। রাষ্ট্রনৈতিক কারণে এটা ঘটেছে। দেশ বিভাজন, বাংলাদেশের '৭১ এর মুক্তি যুদ্ধ কিংবা আসাম, মেঘালয় নেপাল, ভুটানের রাজনৈতিক কারণেও বহু মানুষের আগমন ঘটে, তারা কোন না কোনভাবে এখানকার স্থায়ী বাসিন্দাও হয়ে ওঠে। এর সম্পূর্ণ প্রভাব রাজবংশী জনগোষ্ঠীর উপর পড়ে। জনসংখ্যার বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থার পরিবর্তন, সামাজিক কাঠামো পরিবর্তনের ফলে রাজবংশী সমাজ একটা সমস্যার সম্মুখীন হয় বইকি এবং এটা ইতিগতভাবে সত্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে বিংশ শতাব্দীর সূচনায় রাজবংশী জাতির পরিচয় নিয়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসকবৃন্দের কাছে এবং তথাকথিত বর্ণহিন্দুদের ভাবনায় বিভ্রান্তি তৈরি হয়। বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠীর মানুষজন এর প্রতিবাদে সংঘবদ্ধ হয়। গড়ে ওঠে ক্ষত্রিয় সমিতি ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে। রাজবংশীরা ক্ষত্রিয় জাতি এবং কোচদের থেকে উন্নত এই ভাবনায় আন্দোলন সংঘটিত হলে ব্রিটিশ সরকার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয় যে রাজবংশীরা ক্ষত্রিয় এবং কোচদের থেকে ভিন্ন। ব্রিটিশ প্রশাসক ও ম্যালে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য — "... There is no doubt that at the present day irrespective of any question of origin, the Rajbanshi and the Koch are separate castes." ক্ষয়িষ্ণু রাজবংশী সমাজকে তার চিন্তা ও মননের দ্বারা বৃহৎ জনগোষ্ঠীর স্বকীয়তা, সম্মান ও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে মনীষী পঞ্চানন বর্মা আজীবন লড়াই করেছেন। মনীষী পঞ্চানন

বর্মাই ছিলেন ক্ষত্রিয় সমিতির পুরোধা পুরুষ। পঞ্চানন বর্মার আবির্ভাব বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে। রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলন প্রথম থেকেই বর্ণহিন্দু সমাজের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। বর্ণহিন্দু সমাজ রাজবংশীদের ক্ষত্রিয় মর্যাদা দিতে সহজে প্রস্তুত ছিলেন না। ফলস্বরূপ অনেক ব্রাহ্মণ রাজবংশীদের ধর্মীয় ও সামাজিক ক্রিয়া আচার সম্পাদনে অস্বীকার করে। তবে মিথিলা, কামরূপ ও স্থানীয় কিছু ব্রাহ্মণ রাজবংশীদের সমর্থন ও আন্দোলনে সামিল হন। পঞ্চানন বর্মা রাজবংশীদের ক্ষত্রিয়ত্ব দাবী নিয়ে তৎকালীন পণ্ডিতবর্গের মতামত গ্রহণ করেন। কোচবিহারের পণ্ডিত মহামোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থনাথ বিদ্যাবাগীশ ও অন্যান্য; কামরূপের দিগেশ্বর ভট্টাচার্য ও অন্যান্য; কলিকাতার পণ্ডিত শ্রেষ্ঠা মহামোপাধ্যায় কামাক্ষ্যানাথ শর্মা ও অন্যান্য, রংপুরের পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন ও অন্যান্য, নবদ্বীপের ভুবনমোহন শর্মা ও অন্যান্য; কাশিধামের (বেনারস) বামশাস্ত্রী ভট্টাচার্য, পণ্ডিত চন্দ্রভূষণ শর্মা ও অন্যান্য এবং মিথিলার মহামোহপাধ্যায়, চিত্রধর মিশ্র ও অন্যান্য পণ্ডিতবর্গ তাঁদের মতামত ব্যক্ত করে বলেন যে রাজবংশীরা ক্ষত্রিয় ও তারা 'উপবীত' গ্রহণ করতে পারেন। তিনি উপবীত গ্রহণের ব্যবস্থাও (২৭ মাঘ, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ) করেন। উপবীত গ্রহণ রাজবংশীদের কাছে ক্ষত্রিয় ধর্মের প্রতীক স্বরূপ গৃহীত হয়। তিনি শুধু এই উপবীত গ্রহণের মধ্যেই ক্ষাত্র পরিচয়কে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি রাজবংশী জাতির সামগ্রিক উন্নতি (সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা প্রভৃতি) সহ আচার ধর্মের সংস্কারেও উদ্যোগী হন। উপবীত গ্রহণ করে রাজবংশীরা দাস, সরকার ইত্যাদি উপাধি পরিত্যাগ করে ক্ষত্রিয় পদবি বর্মন, বর্মা, রায়, সিংহ প্রভৃতি গ্রহণ করেন। এছাড়াও বর্ণহিন্দুদের ন্যায় সমাজে বাল্যবিবাহ, পর্দা প্রথা প্রভৃতি প্রচলন করেন। ব্রাহ্মণ, পুরোহিত দ্বারা বিভিন্ন শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার রীতিও শুরু হয়। সমাজে নিত্যপূজা, সন্ধ্যা আহ্নিক, গায়ত্রী মন্ত্রোচ্চারণ, গীতাপাঠ ইত্যাদি শুরু হয়। এই উদ্দেশ্যে ক্ষত্রিয় সমিতি প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ করে ঘরে ঘরে বিতরণ করে। ধর্মীয় সংস্কারের অঙ্গ হিসাবে পঞ্চানন বর্মার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শক্তির প্রতীক হিসাবে 'চণ্ডীপূজার'ও প্রচলন ঘটে। বলা যায় এর পর থেকেই রাজবংশী সমাজের আচার-সংস্কার সহ সমাজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কিছু বিধিনিষেধ আরোপিত হয়। ক্ষত্রিয় সমিতির এই উদ্যোগে বৃহত্তর উত্তরবঙ্গের রাজবংশী মানুষের আচরিত ধর্ম ও অভ্যাসে কিছু পরিবর্তনও ঘটায়। খাবার দাবার থেকে ধর্মীয় আচার-সংস্কারে কিছু বিষয় যুক্ত বিযুক্ত হয়। ক্ষাত্রধর্ম পালনের বিষয়ে সমাজকে সচেতন করেন।

এছাড়াও এই জাতির উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেন। আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য একসময় উত্তরবঙ্গের রাজবংশীরা হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করে অন্যান্য ধর্মের প্রতি ঝুঁকেছিল, সেই সময়ে পঞ্চানন বর্মার ক্ষত্রিয় আন্দোলন রাজবংশীদের হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিল। এখানেই পঞ্চানন বর্মার কৃতিত্ব এবং ক্ষত্রিয় আন্দোলনের গুরুত্ব। যদিও তার সঠিক মূল্যায়ন হয়নি। বলতে দ্বিধা নেই বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে পঞ্চানন বর্মা রাজবংশী সমাজ ধর্মকে ক্ষাত্রপথে পরিচালিত করেন। বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠীর জাতি স্বীকৃতি আদায় ও সংগঠিত করে আজকের সমাজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং বলা যায় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও একটি পরিবর্তনের ধারা সূচিত হয়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক শ্রীচৈতন্যদেব কোচ রাজ্যে আসেননি। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের ভাবধারা এই এলাকায় প্রভাব বিস্তার করে। তবে সেটা ব্যাপকতা পায় অনেক দেরিতে। বলা যেতে পারে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। এখানে বিশেষ করে রাজবংশী সমাজে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার করেছিলেন শংকরদেব ও তার দুই শিষ্য মাধব দেব ও দামোদর দেব। মহারাজা নরনারায়ণের সময় প্রবর্তিত ‘একশরণ’ কথাই ছিল একমাত্র কৃষ্ণের উপাসনা। শংকরদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মে কোনপ্রকার জাতিভেদ প্রথা ছিল না। তার শিষ্য মাধব দেব প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মমত ‘মহাপুরুষিয়া’ বলে পরিচিতি পায়। ‘একশরণ’ ধর্ম রাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করে। তাছাড়া বৈষ্ণব ধর্ম কোচবিহার রাজ্যে এবং অসমে ঝুম চাষ থেকে স্থায়ী কৃষি অর্থনীতির বিস্তারে সহায়তা করে, সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী কোচ, মেচ উপজাতির মধ্যে হিন্দুধর্ম বিস্তারে সহায়তা করে এবং স্তুপীকৃত গৃহ নির্মাণ পদ্ধতির পরিবর্তে ভিতযুক্ত মাটির গৃহ নির্মাণ পদ্ধতির প্রচলনে সহায়তা করেছিল। মহারাজা নরনারায়ণ এবং পরবর্তী রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ বৈষ্ণব ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণ বৈষ্ণব ধর্মকে রাজধর্ম হিসাবে ঘোষণা করেন। শংকরদেব ও তার শিষ্যদের প্রভাবে কোচ রাজ্যে বৈষ্ণব ধর্মের ভাবধারা বিস্তার লাভ করে। রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষজন এই ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হন। বাড়ি বাড়ি তুলসী তলা, সন্ধ্যা প্রদীপ প্রজ্জ্বলন রীতি আচারের অন্তর্ভুক্ত হয়। শৈব ভাবনার পাশাপাশি বৈষ্ণব ভাবনার সম্প্রসারণ ঘটে। শঙ্করদেবের প্রভাবেই কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে যে কৃষ্ণ পূজিত হন তা একক কৃষ্ণ। এই প্রভাবেই মদনমোহন মন্দির সহ রাজ্যের অন্যত্র বিভিন্ন মন্দিরে একক কৃষ্ণ প্রতিষ্ঠা পায় এমনকী

বাড়ির ঠাকুরবাড়ির থানেও। পরবর্তীকালে কৃষ্ণ ভাবনার সম্পৃক্তায়ন ঘটে বিশ্বাস ভাবনা তৎসহ দেবতার কল্পনায়। যেমন গোরখনাথ, রাখাল ঠাকুর, মদনকাম ঠাকুর প্রভৃতি। গানের কথায়ও কৃষ্ণ আশ্রয় পায়। দেহতত্ত্ব, মনঃশিক্ষা গানেও কৃষ্ণের অন্তর্ভুক্তি ঘটে। পালাগানের আসর বন্দনায় কৃষ্ণকে স্মরণ করতে থাকে শিল্পী-গীদালরা। কীর্তিনীয়াদের (রাজবংশী সমাজে পারলৌকিক ক্রিয়াদির সময় কীর্তন করেন) মৃত্যুজনিত শ্রাদ্ধ-শান্তির গানে-কথায় কৃষ্ণের সংযুক্তি ঘটে। বিষ্ণুরূপী কৃষ্ণের ভাবনার প্রসার ঘটে রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতিতে। কিন্তু সেখানে রাধাকৃষ্ণের যুগল ভাবনার গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধারার সম্পৃক্তি ঘটে অনেক পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। শ্রীচৈতন্যদেবের 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে' এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর মন্ত্র সারা বাংলাদেশকে আলোড়িত করলেও রাজবংশী সমাজ শংকরদেবের 'নামঘোষা'য় মগ্ন ছিলেন। কোচবিহার তথা বৃহত্তর রাজবংশী সমাজে তখন শংকরদেবের একশরণ নাম ধর্মেরই প্রচার ও প্রসার। ততদিনে পঞ্চানন বর্মার নেতৃত্বে রাজবংশী সমাজ আন্দোলিত হচ্ছে এবং সমাজ সংস্কারের পর্ব চলছিল। দেশ বিভাজিত হওয়ার মুহূর্তে পূর্ববঙ্গ থেকে বর্ণহিন্দু মানুষজনের আগমনও শুরু হয়। চা-বাগান সূত্রেও অনেকে আসে। তারা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। তারাই বিষয়-আশয়ের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি ও ভাবনাকে নিয়ে আসে। এদের প্রভাবেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম এদতাঞ্চলে সাবেক মানুষের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। শ্রীচৈতন্য প্রভাবে রাজবংশী সমাজ হরি সংকীর্তনে মেতে ওঠে। গ্রামের হাট কিংবা খোলা মন্দিরে গড়ে ওঠে হরিমন্দির। রাজবংশী সমাজ ও বর্ণহিন্দুদের যৌথ উদ্যোগেই হরিমন্দিরের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এক ক্ষেত্র সমীক্ষায় দেখা যায় রামপুর (কোচবিহার জেলা), আলিপুরদুয়ার হাটখোলা, চিকলীগুড়ি, কামাখ্যাগুড়ি (আলিপুরদুয়ার জেলা) থেকে মেখলিগঞ্জ, হলদিবাড়ির হাট সমস্ত জায়গাতেই হরিমন্দির গড়ে ওঠে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষদিকে কিংবা তার পরবর্তী সময়ে। রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতি আবর্তিত হতে শুরু করে শ্রীচৈতন্যদেবের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনায়। গ্রাম ঠাকুরের পাট কিংবা মেলার মাঠগুলি হয়ে যায় হরিমন্দির। হরিবোলা ঠাকুরের আবির্ভাব ঘটে। গ্রামের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় স্থল হয়ে ওঠে হরিমন্দিরগুলি। ততদিনে অধিকারী পুরোহিতদের আগমনও ঘটে যায়। গুরু কর্তারও প্রভাব শুরু হয়। এখন তো অষ্টপ্রহর হরি সংকীর্তনের ব্যাপক প্রসার, সবখানেই ফি-বছর আয়োজন হয় সপ্তাহব্যাপী। বৃহত্তর

রাজবংশী সমাজও এর বাইরে নয়। বরং বিগত দুই-তিন দশকে রাজবংশী মানুষজনের বেশিরভাগই এখন বৈষ্ণব ভক্ত। তুলসীর মালা ধারণ করে তিলক কেটে ঘুরে বেড়াতেও দেখা যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের রীতিনীতি তিথি নক্ষত্র ধরে তারা পালন করছেন। তবে একটি বিষয় উল্লেখ্য রাজবংশী সমাজের আর্থ- সামাজিক কাঠামোর অবনমন, কৃষিভূমি থেকে রাজবংশী সমাজের বিচ্যুতি সেইসঙ্গে সামাজিকভাবে প্রান্তিক হওয়ার ফলে রাজবংশী সমাজের মানুষজন বেশি বেশি করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনার বশবর্তী হয়েছেন। সমীক্ষায় এটাই ধরা পড়ে। হতাশাবোধ থেকে সামাজিকভাবে নিজেকে প্রকাশ করবার ভাবনা থেকেও এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনার প্রসার ঘটে রাজবংশী সমাজে। রাজবংশী সমাজের আর্থ-সামাজিক কাঠামো যত দুর্বল হয়েছে ততই বিপুল সংখ্যক মানুষ এই ভক্তিরসে সামিল হয়ে দেহাতীত সুখের সন্ধান করছেন। সেখানে হতাশাবোধ যেমন একটা কারণ আবার প্রতিযোগিতায় হেরে যাওয়া, যান্ত্রিকতা, ভোগবাদী দুনিয়ার কাছে নিজেদের গুটিয়ে নেওয়ার প্রবণতাও দায়ী। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলায় এটা লক্ষণীয়। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ জেলায় তো এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনার ব্যাপক প্রভাব, প্রায় ৯০ শতাংশ রাজবংশী মানুষই এখন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্ত। গুরু-গোঁসাইর ব্যাপক প্রভাব। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারে এই গুরু-গোঁসাইরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এখানে কোচ, দেশীয়া, পলিয়া একযোগে সম্মিলিত হয়েছে। আচরিত কৃত্যাদির মধ্যেও বৈষ্ণবী রীতি সংস্কার এখন বাড়ি বাড়ি। বিয়ের পরই তুলসীমালা ধারণ এখন অবশ্য রীতির মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।বিয়ে, মৃত্যুর আচারাদিও পরিবর্তিত হয়েছে। তবে একটি বিষয় উল্লেখ্য শংকরদেব প্রচলিত বৈষ্ণব মতাদর্শ বৃহত্তর রাজবংশী সমাজের আদর্শায়িত লোকায়ত সংস্কৃতির বিশেষ ক্ষতি করেনি। আগ্রাসী কোন বিষয়ও ছিল না। কিন্তু চৈতন্যীয় মতাদর্শে বৃহত্তর রাজবংশী সমাজের লোকায়ত অঙ্গন যায় বদলে। আচার-সংস্কারের পরিবর্তন ঘটে। রাজবংশী সমাজ ও পরিবারের চিরায়ত রূপটি পাল্টে যায়। সর্বোপরি ভাষা, শব্দের ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। সে ধারা আজও অব্যাহত।[৫] তবে গুরু-গোঁসাইয়ের প্রভাব কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলায় কম হলেও মেখলিগঞ্জ, হলদিবাড়ি, শিলিগুড়ির রাঙাপানি, খড়িবাড়ি, নকশালবাড়ি এলাকায় এখনও আছে। আর উত্তর দিনাজপুরের তপন, কুশমণ্ডি, বালুরঘাট, গঙ্গারামপুর, কালিয়াগঞ্জ এলাকায় তথা মালদহ জেলার একলাখি পাণ্ডুয়া এলাকায় গুরুদেব গোঁসাইয়ের

প্রভাব যথেষ্টই বেড়েছে। আর সব মিলিয়ে লৌকিক আচার আচরণের মধ্যেও একটা ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষণীয়। পালনীয় আচার কৃত্যাদির মধ্য দিয়ে প্রাচীন রাজবংশী জনগোষ্ঠীর অনেক কিছু আজ লোকান্তরের পথে। বিগত কয়েক দশকে সেটা বেশি বেশি করে দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ জেলায় এই চিত্র পরিসংখ্যানে উঠে আসে।

প্রায় সাড়ে চারশ বছর আগে এতদঞ্চলে বৈষ্ণবীয় ভাবনা প্রসারিত হয়। শংকরদেবের ধ্যান জ্ঞানে রাজবংশী সমাজের সবাই অনুরক্ত হয়। তুলসী তলা, সন্ধ্যা প্রদীপ, সংকীর্তন ডাকনাম ইত্যাদি প্রচলিত হয়। লোকায়ত মূল সংস্কৃতির পরিসরটি অক্ষুণ্ণই থাকে, বরং উর্বর হয়। শৈব শাক্ত ভাবনার পাশাপাশি বৈষ্ণব ভাবের সম্পৃক্তায়ন ঘটে। অন্যদিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে শ্রীচৈতন্যদেবের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সম্প্রসারণ ঘটতে থাকে। শুরু হয় লোক সাংস্কৃতিক পরিবর্তন। বিশেষ করে ভাষার ক্ষেত্রে। গৌড়ীয় চৈতন্যীয় প্রভাবেই অধিকারী পুরোহিতদের প্রভাব বাড়তে থাকে। কীর্তনের শাখাপ্রশাখা আরও বিস্তৃত হয়। রাজবংশী সমাজের দেহতত্ত্ব, তুক্ষা, মনঃশিক্ষার মত কিছু গানে বৈষ্ণবীয় ভাবনা সংযোজিত হয়। মন্ত্রের শব্দ ভাষা পাল্টে যায়। নতুন নতুন গান রচিত হয়। তুলসীধারী, অধিকারী গোঁসাইরাও নবদ্বীপ থেকে গান সংগ্রহ করে নিজেদের ভাষা শব্দ ব্যবহার করে গান রচনা করতে থাকেন। ফলে রাজবংশী ভাষায় বহু কীর্তনের সন্ধান পাওয়া যায়। অন্যান্য ধর্মীয় গীতে দেশীয় শব্দের সঙ্গে অন্যান্য শব্দ ঢুকতে থাকে। পালা নাটকগুলি তার অন্যতম উদাহরণ। রামায়ণ, মহাভারত কিংবা সামাজিক ঘটনাকেন্দ্রিক পালাগানের কথায় বাংলা শব্দের সংযোজন ঘটে। মান্যতা পেয়ে যায়। আর এভাবে লোকসঙ্গীতের ভাষা, উচ্চারণ ভঙ্গি এমনকী অনেক অনুষ্ঠানের অবয়ব পালটে যায়। যার ফলে পালাগান, লোকনাটক, কুশান কিংবা বিষহরা পালাতেও ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

রাজবংশী সমাজে একদা হরিবাড়ির ভিন্ন গুরুত্ব ছিল। সমস্ত ধরনের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হত এই হরিমন্দিরে। গ্রামের মঙ্গলার্থে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজাও সম্পন্ন হত। কীর্তন ধর্মকথার আসরও বসত। গোঁসাই, বোষ্টম কিংবা ভবঘুরে গায়ক-গায়িকাদের নিয়েও আসর বসত। এই হরিবাড়িগুলি নির্মিত হয় রাজবংশী কোন উদ্যোগী মানুষের আগ্রহে, তারই জমিতে এবং তারই দানে। অন্যান্যরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই উদ্যোগে সামিল হয়। এই হরিবাড়িকে কেন্দ্র করে গ্রামের বারো মাসের তেরো পার্বণ, লোকায়ত উৎসবগুলি সম্পন্ন হত। হরিলুঠ, খই

ছিটানো, বাঁশপূজা, মদনকামের গান, ডাকনামের আসর, গোরখনাথের মাগন যাত্রাও হরিবাড়ির মাহাত্ম্যে আবর্তিত হত। উদ্যোগে থাকত গ্রামেরই কিছু উৎসাহী মানুষ। পালাগানের আসরও বসত ফি-বছর। এই হরিবাড়িগুলি 'হরিমন্দিরে' পরিবর্তিত হয় অনেক পরে স্বাধীনতার পাশাপাশি সময়ে। হরিনাম সংকীর্তনের আসর বসতে থাকে নিয়মিত। শ্রীচৈতন্যদেবের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার বৃদ্ধি পেতে থাকে। রাজবংশী সমাজও এই মহানাম সংকীর্তনের অংশ হয়ে ওঠে। শংকরীয় বৈষ্ণবভাবের প্রভাব কমে রাজবংশী সমাজও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবাদর্শের অনুগামী হয়ে পাড়ায়-পাড়ায় কীর্তনের দল তৈরি করে। বিভিন্ন পর্বের অনুষ্ঠানে সেটা গৃহপ্রবেশই হোক, ব্রত তিথি পালন কিংবা শ্রাদ্ধশান্তি সবেতেই সংকীর্তনের বিষয়টি আবশ্যিক হয়ে ওঠে। আর কিছু মানুষ রাজবংশী সমাজে যারা পিছিয়ে পড়ছে তারা হতাশাবোধ থেকে ঐকান্তিক ঐশ্বরিক সুখের খোঁজে শ্রীচৈতন্যদেবের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবাদর্শের অনুরক্ত হয়ে কাপলে তিলক কেটে ঘুরে বেড়াতে শুরু করেন। মন্দির দেবস্থলে এরা সমবেত হতে শুরু করে। বিগত কয়েক দশকে রাজবংশী সমাজে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবাদর্শের বিপুল প্রসার এভাবেই ঘটেছে। রাজবংশী সমাজের গরিষ্ঠ অংশই এখন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্ত।

স্বাভাবিকভাবে একটি প্রশ্ন আসে এই বৈষ্ণব প্রভাব কিংবা অন্য কোন ধর্মগুরুর প্রভাবে রাজবংশী সমাজের বৃহত্তর লোকায়ত সংস্কৃতির পরিসরটি কীভাবে বদলে যাচ্ছে। কারণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তের যেমন আচরণীয় কিছু কৃত্যাদি আছে তেমনি অন্যান্য ধর্মগুরুর ক্ষেত্রে কিছু অনুশাসন মেনে চলতে হয়। সেটা বালক ব্রহ্মচারী, স্বামী স্বরূপানন্দ থেকে অনুকূল ঠাকুর অবধি। বিশেষ করে অনুকূল ঠাকুরের শিষ্যদের বেশ কিছু নিয়ম রীতি সকলকে মেনে চলতে হয়। সেখানে লৌকিক সংস্কারের সঙ্গে পার্থক্য বর্তমান। জন্ম অশৌচ, মৃত্যু অশৌচ, বৈষ্ণব সেবার যেমন নিজস্ব নিয়ম আছে তেমনি বিয়ের ক্ষেত্রে কণ্ঠি বদলের বিষয়টি কিংবা মৃত্যু অশৌচের ক্ষেত্রে ৪-৫ দিনের নিয়ম রীতি পালনের পর ছয় গোঁসাই অর্থাৎ বৈষ্ণব এনে বিশুদ্ধিকরণের রীতি উল্লেখ্য। অনুকূল ঠাকুরের ক্ষেত্রে তো বিবিধ আচার যোজন-যাজন, উপযোজনা, ইষ্টভৃতি ইত্যাদি নিয়ম আচার পালনীয় কর্তব্য। এর উত্তরে নির্দ্ধিধায় বলা যায় রাজবংশী সমাজের নিজস্ব লোকায়ত সংস্কৃতির বলয়টি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। রাজবংশী সমাজের চিরায়ত সাংস্কৃতিক বিন্যাসের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটাচ্ছে।

বিভিন্ন কারণে সাংস্কৃতিক রূপান্তর ঘটে। মিশ্রণও ঘটে। আবার আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে লোক সংস্কৃতির অবয়ব বদলায়। লোকসংস্কৃতি একটি চলমান স্রোত। আর রাজবংশী সমাজ যেহেতু একটি বৃহত্তর জনগোষ্ঠী এবং বহু জনশাখার সমন্বয় ঘটেছে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত ও সময়ের স্রোতপ্রবাহে। স্বাভাবিকভাবে রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তনে একাধিক বিষয় ও প্রক্রিয়া কার্যকরী হয়েছে। বিভিন্ন ধর্মগুরু, বিভিন্ন ব্যক্তি, সংগঠনের প্রভাব সর্বোপরি ধর্মীয় আবর্তে লোকসাংস্কৃতিক পরিসরটির সংযোজন বিয়োজন ঘটেছে। বিশ্বায়নের কড়াল গ্রাসকেও অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। বিভিন্ন জনস্রোতের প্রভাব, আর্যীকরণ, ক্ষত্রিয়করণ ইত্যাদি প্রক্রিয়ার বাইরেও আর্থ-সামাজিক কাঠামো পরিবর্তনের সাথে সাথে সাংস্কৃতিক আত্তীকরণ (Assimilation), সাংস্কৃতিক অধিগ্রহণ (Borrowal), সাংস্কৃতিক অনুকরণ (Imitation), সংমিশ্রণ (Acculturation), আরোপণ (Imposition) ইত্যাদি প্রক্রিয়া কার্যকরী হয়েছে। সেইসঙ্গে প্রগতি, শিক্ষা, যোগাযোগ সহ অন্যান্য ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলেও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের বিষয়টি সচল হয়েছে। বিভিন্ন সংস্কৃতির চাপ, আগ্রাসন, আধুনিক করে তোলার প্রবণতাও বিবর্তনের কারণ হয়ে উঠেছে। তবে উল্লেখ্য এতদ্‌সত্ত্বেও রাজবংশী সমাজের লোকায়ত সংস্কৃতির নৃ-গোষ্ঠীগত ঐতিহ্যের একটি অংশ আজও রাজবংশী সমাজ নীরবে নিভৃতে অনুসরণ করে চলেছে। অনেক কিছুকে গ্রহণ বর্জন করেও বিশেষ এক সংস্কৃতির পরিসরকে লালন পালন করে যাচ্ছে রাজবংশী সমাজ এবং এই লৌকিক বৃত্তের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির নৃ-গোষ্ঠীগত কৌম পরিচয় ও ধারা চিহ্ন।

রাজবংশী সমাজের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের পর্যায়ক্রম

• কোচ-রাজবংশ প্রতিষ্ঠা। • মহারাজা বিশ্বসিংহের সময়কালে হিন্দুত্বকরণ ও পৃষ্ঠপোষকতা (১৫১০ খ্রিস্টাব্দ)	• শংকরদেবের ‘একশরণ’ (শরণীয়াকরণ) ধর্ম। • মহারাজা নরনারায়ণের সময়কালে পৃষ্ঠপোষকতা • শংকরদেবের আবির্ভাব। • মাধব দেব, দামোদর দেবের আগমন। (১৫২৮-১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দ)	• গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রভাব (অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনার প্রবেশ।) • অধিকারী পুরোহিতদের অন্তর্ভুক্তি। • পরবর্তীকালে বর্ণহিন্দুদের আগমনে ত্বরান্বিত হয়।	• পঞ্চানন বর্মার ক্ষত্রিয়করণ ও সংস্কার আন্দোলন। (ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে সূচনা ঘটে)	• স্বাধীনোত্তর সময়ে বিভিন্ন ধর্মগুরুদের প্রতি আসক্তি।

• পূজা-পার্বণ ও আচার-সংস্কার

বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে ভারতবর্ষে কোন প্রাচীন সমাজই আদিম ভাবধারা নিয়ে সম্পূর্ণভাবে চলতে পারেনি, আধুনিকতার অপ্রতিরোধ্য ভাবধারার সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে চলাটাই স্বাভাবিকভাবে লক্ষ করা গেছে; সেখানে রাজবংশী সমাজও তার বিপ্রতীপে থাকেনি। তারাও এই প্রক্রিয়ায় সম্মিলিত হয়েছে। কিছু পরিবর্তন, গ্রহণ বর্জনকে স্বীকার করে নিয়ে নিজস্ব কৃষ্টি-সংস্কৃতি তথা পূজা-পার্বণ ও আচার-সংস্কৃতি বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়েছে। আচার-ব্যবহার, পোশাক-আশাক, খাবার-দাবার এমনকী ভাষাভঙ্গিও বদলে যাচ্ছে। দৈহিক গঠনের ক্ষেত্রেও কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা যেতে থাকে আন্তর্বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক সম্পর্কের বিন্যাসে। স্বাভাবিকভাবে আচরিত ধর্মানুষ্ঠানের অনেকগুলি লোকান্তরিত আর্থ-সামাজিক কাঠামোর ক্রম পরিবর্তনে। ফলে অনেক দেবদেবীর নাম পাওয়া যায়, কিন্তু পূজা অনুষ্ঠানের নিদর্শন মেলে না। অনেক পাল-পরবেরও সংকোচন ঘটে মানসিকতা ও পরিবেশগত কারণে। ব্রতকথা তো হারিয়েই গেছে বলা যায়। সবক্ষেত্রেই একাধিক কারণ ও বিষয় সামগ্রিক পরিবর্তনে সহায়ক হয়েছে। এক কথায় কারণ ও ঘটনা একমাত্রিক নয় বহুমাত্রিক।

রাজবংশী সমাজ কৌমভাবনায় সম্পৃক্ত হয়েছে আদিমকাল থেকে। লোকায়ত কৌমজীবন থেকেই কোচ রাজবংশের জন্ম। রাজবংশী যখন কৌম জীবনে বসবাস করত তখন তারা প্রকৃতি সমন্বিত। বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা অর্চনা করত অর্থাৎ প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত দেবদেবীরই প্রাধান্য ছিল। যেমন - নদীর দেবদেবী, অরণ্যের দেবদেবী, পর্বতের দেবদেবী, বৃষ্টির দেবদেবী এবং বিভিন্ন জীবজন্তুর দেবদেবী প্রভৃতি। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে রাজবংশীরা এইসব প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পেতে আধুনিক বিশ্বাস, পদ্ধতি ও ভাবনার শরিক হয়েছে। তাই রাজবংশী সমাজ আগের মত প্রাকৃতিক পূজা-অর্চনা আর কৃত্যাদি পালন করে না। যেমন বৃক্ষ পূজা, পাথর পূজা, মহাকাল ঠাকুর, বনদুর্গা এমনকী বিষহরি প্রভৃতি।

রাজবংশী সমাজ অতীতে সম্পূর্ণভাবে কৃষিনির্ভর ছিল। আর্থ-সামাজিক কাঠামো পরিবর্তনের ফলে রাজবংশী সমাজের একটা বড় অংশ কৃষি থেকে বিচ্যুত হয়। তারা ভিন্ন ভিন্ন পেশায় ছড়িয়ে পড়ে। অতীতে যে রাজবংশী সমাজ মাটি কাটার কাজ থেকে চা-বাগানের কাজকে অস্বীকার করেছে তারাই এখন অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিক, দিনমজুর, ভেণ্ডার, ইটভাটা, ছোটখাটো

ব্যবসা এমনকী যে কোন ধরনের চাকুরিতেও যুক্ত হতে বাধ্য হয়েছে। কয়েক দশকে উত্তরবঙ্গের বহু রাজবংশী যুবক কাজের সন্ধানে পাড়ি দিয়েছে ভিন প্রদেশে। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার জেলার এমন কোন গ্রাম নেই যে গ্রাম থেকে এক-দুজন যুবক রাজস্থান, হরিয়ানা, দিল্লী, কেরালায় কাজের সন্ধানে পাড়ি দেয়নি। জয়পুরে তো রাজবংশী মহল্লাই তৈরি হয়েছে। জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং জেলার ক্ষেত্রেও ছবিটি প্রায় একইরকম। বলতে দ্বিধা নেই বৃহত্তর রাজবংশী সমাজের একটা বৃহৎ অংশ এখন কৃষি থেকে বিচ্যুত। এর ফলে সাংস্কৃতিক সংকট তৈরি হয়েছে। উত্তরবঙ্গে কাজের সুযোগ বিস্তৃতি না ঘটলে এই সমস্যা আরো বাড়বে। বিশেষ করে রাজবংশী সমাজের ক্ষেত্রে। বিগত কয়েক দশকে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ভূমিহীন রাজবংশী পরিবারগুলির ক্ষেত্রে। অপেক্ষাকৃত তরুণ প্রজন্ম আজকে ভিনদেশী। তারা সেখানে দারোয়ান থেকে হোটেল বয়, প্লাইউড ফ্যাক্টরী থেকে রাজমিস্ত্রি সবেতেই কাজ খুঁজে নিচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির পক্ষে বিষয়টি উদ্বেগের। কারণ তাদের সন্তান-সন্ততিরা ভিন্ন সংস্কৃতির শরিক হয়ে উঠছে। এটা শহরাঞ্চলে বসবাসকারী রাজবংশী পরিবারের ক্ষেত্রেও কিছুটা প্রযোজ্য। কারণ তাদের সন্তান-সন্ততিরাও রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির পরিসর থেকে সরে যাচ্ছে। তারাও সুযোগ পাচ্ছে না রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির পরিসরটি জানতে। ফ্ল্যাট কালচারে অনেকেই ছেলে মেয়েকে রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির আড়ালে বড়ো করছেন। সেইসঙ্গে বিয়েতে বর্ণহিন্দু বা অন্য গোষ্ঠীর প্রতিও আগ্রহ দেখাচ্ছেন। রাজবংশী সমাজের কৃষ্টি সংস্কৃতির মধ্যে উর্বরা সংস্কৃতি অর্থাৎ Fertility Cult এর প্রভাব উল্লেখযোগ্য। কৃষিকেন্দ্রিক আচার অনুষ্ঠান তো বটেই দেবদেবীর কল্পনায় ও পূজা-অর্চনার উপাচারেও এই ভাবনার প্রকাশ পাওয়া যায়। বিভিন্ন উৎসব এবং উৎসব কেন্দ্রিক সংগীতেও উর্বরা ভাবনা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। বিষুয়া, বৈশাখী-আষাঢ়ী সেবা, আমাতি (অম্বুবাচি), ধানের ফল আনা, ক্ষেতিলক্ষ্মী পূজা, পুষুনা, বুড়াবুড়ি, চড়ক ইত্যাদি পূজা ও উৎসবকে সম্পূর্ণভাবে কৃষিভিত্তিক পূজা-পার্বণ বলা যায়। বৎসরের বিভিন্ন সময়ে কৃষিকর্মের সূত্রে উর্বরতাকেন্দ্রিক বহু সংস্কার পালন করে রাজবংশী সমাজ। অনাবৃষ্টিজনিত খরা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার উদ্দেশ্যে মহিলাদের সমবেতভাবে হুদুম দ্যাও পূজা এবং আনুষঙ্গিক কৃত্যাদি উর্বরা ভাবনারই দৃষ্টান্ত। রাজবংশী সমাজের নদীকে দেবী হিসাবে পূজা, তিস্তাবুড়ি তার মধ্যে অন্যতম এবং তৎসংশ্লিষ্ট মেচেনী খেলা ও গান সেখানেও কৃষি ও উর্বরতা ভাবনা সক্রিয়। উত্তরবঙ্গের

সর্বত্রই গ্রামঠাকুর বিভিন্ন নামে পূজা পায়, বিশেষ করে রাজবংশী সমাজে। এই পূজা সাধারণত কৃষিজমি রোপণযোগ্য করার পর জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসের দিকে সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ হৈমন্তিক ধান (হেউতি ধান) বোনার বিছন বা চারাগাছ জমিতে রোপণ করার পূর্বে গ্রাম ঠাকুরের পূজার আয়োজন হয়। এই পূজার সঙ্গেও কৃষি উর্বরার সম্পর্ক স্পষ্ট। থানছিড়ি বা স্থানশ্রীর ঠাকুরের সঙ্গেও কৃষির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কেননা ধান্যচ্ছেদনের পরই ধানের শীষগুলি তার প্রতীক বাঁশের দণ্ডে বেঁধে রাখা হয়।

রাজবংশী সমাজে শিব হল অন্যতম দেবতা। মহারাজা বিশ্বসিংহ স্বয়ং শৈবধর্মে দীক্ষিত ছিলেন। উত্তরবঙ্গে শিব বহু নামে পরিচিত। জল্পেশ্বর, জটেশ্বর, সর্বেশ্বর, বাণেশ্বর আবার দিনাজপুরে মহারাজা ঠাকুরও শিবেরই প্রতিভূ। মালদহে যেমন গম্ভীরা। আবার মহাকালও শিবেরই আরেক রূপ। মাশানও শিবের সঙ্গে সম্পর্কিত দেবতা। ব্র্যাঘ্র দেবতা। রাজবংশী সমাজে শিব ঘরের মানুষ, কৃষির দেবতা। শিবের প্রতীকগুলির মধ্যেই (বৃষ, সর্প, লিঙ্গ) উর্বরতা তথা কৃষি ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। শিব আঞ্চলিক রূপে গ্রাম ঠাকুর, গ্রাম পাহারা দেয় — আঞ্চলিক নামও বহুরূপে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন নামে পূজা পায়। রাজবংশী সমাজে শিবের বহুরূপ, বহু নামে আখ্যায়িত হয়ে লৌকিক বৃত্তকে অনন্য করেছে। রাজবংশী সমাজ আরও কিছু দেবদেবীর পূজা করে। যেমন - সোনা রায় (বন্যজন্তুর দেবতা) গোরখনাথ (গোপালকদের দেবতা) মদনকাম (কাম দেবতা) বলরাম (লাঙল দেবতা) এবং বিষহরি (সর্পদেবী)[৬] রাজবংশী সমাজে মনসা-বিষহরি আরেক অন্যতম স্ত্রী-দেবতা। বিষহরির থান সমস্ত রাজবংশী বাড়িতেই বর্তমান। বিয়ে বা শুভকার্যের আগে বিষহরির মাড়েয়া গানের আসর বসে। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদহ জেলাতেও রাজবংশী সমাজে মনসামঙ্গলের প্রভাব আজও বিদ্যমান। এইক্ষেত্রে দেশিয়া, পলিয়াদের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। মূলত: ঝাড়-জঙ্গল ঘেরা উত্তরবঙ্গের সর্পভীতির কারণে মনসা বিষহরির প্রভাব বৃদ্ধি পায়, বিশেষ করে রাজবংশী সমাজে। এই পূজার সঙ্গে উর্বরা ভাবনা নিহিত আছে।

শিবের যেমন বহুরূপে রাজবংশী সমাজে অবস্থান তেমনি শক্তির প্রতীক কালীরও বহুরূপে মান্যতা। এখানে বৌদ্ধীয় ভাবনার সম্প্রসারণ ঘটেছে যেমন - তারা কালী, চামুণ্ডা কালী আবার আঞ্চলিকভেদে কালির বহু নাম বুড়ি কালী, বোকালী, পাঁচ কালী, কাঁচা কালী, পেটকাটি কালি।

মালদহ জেলায় যেমন জহুরা কালী রাজবংশী সমাজেও মান্যতা পেয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে তো বহু নামের কালির ছড়াছড়ি। আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য রাজবংশী সমাজে দেবতার জন্য বিশেষ এক স্থান থাকে। যেখানে বিষহরি, কালী, শিতলা, শিব, বুড়াঠাকুর, পীর প্রভৃতি সমস্ত দেবদেবী মূলত: চালাঘরেই স্থান পায়। এই স্থানটি ঠাকুরবাড়ি, ঠাকুরের পাট হিসাবে পরিচিত। মন্দির খুব কম বাড়িতে দেখা যায়। দশমীর দিন রাজবংশী সমাজের যাত্রা পূজা করার রীতি। এই যাত্রাপূজায় অনুষ্ঠিত হালযাত্রা, গবাদি পশুর পরিচর্যা ইত্যাদি কৃত্যাদিও আসলে কৃষিপূজার নামান্তর। যাত্রা পূজার আরেকটি অন্যতম অনুষঙ্গ সরস্বতী পূজা অর্থাৎ বাণীবন্দনা। রাজবংশী সমাজে শারদীয়া দুর্গোৎসব মূলত: ভাণ্ডানী দেবীর পূজার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। এই ভাণ্ডানী দেবীও কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত। ভাণ্ডানী দেবীর পূজা-উৎসব ও মেলা অতীতে বহু জায়গায় হত। হাল আমলে ময়নাগুড়ি, মাথাভাঙ্গা, কুমারগ্রামের মত এলাকাতেই সীমাবদ্ধ। লক্ষ্মীপূজা ও সরস্বতী পূজার রীতি রাজবংশী সমাজে কয়েক দশক আগেও প্রচলিত ছিল না। রাজবংশী সমাজের নিজস্ব পুরোহিত অধিকারীরাও এই পূজার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন না। শারদীয়া দুর্গোৎসবও রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতিতে পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়। রাজবংশী সমাজে নবান্নোৎসবে যেমন শিয়াল ঠাকুরের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য নিবেদন করা হয় তেমনি ব্যাঘ্রভীতি, ভাল্লুকভীতির কারণে সোনা রায়, মহাকাল, ভাণ্ডানী, শালশিরি পূজারও প্রচলন ঘটে। বৃক্ষ পূজা, বৃক্ষকে ঘিরে নানাবিধ সংস্কার ও বিশ্বাস বট-পাকুড়ের বিয়ে, জিগা গাছের সঙ্গে সখী পাতানো রাজবংশী সমাজের বহু প্রাচীন কালের বিশ্বাস ও রীতি। বৃক্ষোপসনার এক একটি অনুষঙ্গ। এক এক দেবতা একেক নামে পরিচিতি পেয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাসে। যেমন - জুড়াবান্দা ঠাকুর জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও কোচবিহার জেলায় এই দেবতাকে খড়-বিচালির জুড়া অর্থাৎ পুটলী উৎসর্গ করা হয় আবার উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ জেলায় পীরযুক্ত হয়ে বিভিন্ন নামে পীরের দেবতা হয়েছে। রাজবংশী সমাজে বৃক্ষপূজার বহুবিধ আচার-সংস্কার আদিম সংস্কৃতিকে চিহ্নিত করে। বর্তমানে অনেকাংশে এই বৃক্ষ পূজার রীতি প্রথা কমে গেলেও উত্তরবঙ্গের অনেক জায়গাতেই এখনও রাজবংশী সমাজের এই অনুসরণ চোখে পড়ে। যেমন বট-পাকুড়ের বিয়ের প্রথা কমে গেছে, আবার বন্ধ্যাত্ব মোচনের জন্য কিংবা শিশুর দীর্ঘ জীবন কামনায় জিগা গাছের সঙ্গে সখী পাতানোর বিষয়টি নজরে আসে না। এ প্রসঙ্গে বলতেই হয় আধুনিক সময়ের জ্ঞান-বিদ্যা ও

সংস্কৃতির প্রভাবে জিগা গাছের সঙ্গে সখী পাতানো কিংবা বট-পাকুড়ের বিয়ে বিষয়টিও গুরুত্ব হারিয়েছে। অন্যদিকে শালশিরি, সোনা রায়, ধরম ঠাকুর, রাখাল ঠাকুর, গোরখনাথের পূজাও লোকান্তরের পথে। হুদুম দ্যাও, কাতি পূজা ও উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজ জীবন থেকে হারিয়ে গেছে বলা যায়। আবার মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় 'জলমাঙ্গা' বা 'জল কাঙাল' অনুষ্ঠানটিও অবলুপ্তির পথে। বৈশাখী ও আষাঢ়ী সেবার মত অনুষ্ঠানগুলি আর সম্পন্ন হয় না। এই অনুষ্ঠানটিও কৃষি কৃত্যেরই অংশ। তবে আমাতি অর্থাৎ অম্বুবাচীর কিছু নিয়ম আচার রাজবংশী পরিবারগুলি মেনে চলেন। পূজা-অর্চনার বিষয়গুলি লুপ্ত হলেও তিনদিন কৃষিকৃত্যাদি বন্ধ রেখে বসুধা দেবীকে স্মরণ করেন। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার জেলার কিছু জায়গায় কামাখ্যা দেবীর উদ্দেশ্যে পূজা দেন। তার মধ্যে আলিপুরদুয়ার জেলার কামাখ্যাগুড়ির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে রাভা সম্প্রদায়ের মানুষজনও কামাখ্যা দেবীকে পূজা করেন।

রাজবংশী সমাজে সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে নিজস্ব আচার বিশ্বাসের পাশাপাশি প্রাচীন বৌদ্ধীয় প্রভাব, শৈব প্রভাব, শাক্ত প্রভাব যেমন — মনসা, চণ্ডী, শীতলা, ষষ্ঠী প্রভৃতির প্রভাব পড়েছে তেমনি পরবর্তীকালে বর্ণহিন্দু ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ফলে পৌরাণিক প্রভাব, বৈষ্ণব প্রভাব, গৌরাঙ্গ প্রভাবও পড়েছে। বহু লৌকিক দেবদেবীর পূজা-অর্চনা করে রাজবংশী সমাজ। তবে আর্থ-সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন এবং বর্ণহিন্দুদের সঙ্গে সহাবস্থানে রাজবংশী সমাজের ধর্মীয় আচরণ, দেবদেবী, পূজা-পার্বণ ও সাংস্কৃতিক অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটে। রাজবংশী সমাজের উপর বর্ণহিন্দুদের প্রভাবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের দ্বারা পূজা-অর্চনা করার রীতির প্রচলন এবং মৃন্ময় মূর্তির সংযোজন।[৭] অতীতে রাজবংশীরা মাটির ঢিপি, পাথরকেই দেবদেবী জ্ঞানে পূজা-অর্চনা করতেন। আজও গ্রামেগঞ্জে মাটির ঢিপি, পাথরের থানে ঠাকুর বাড়ি দেখা গেলেও অনেক ক্ষেত্রে মাটির মূর্তির সংযোজন ঘটেছে। তাছাড়া দেবদেবীর পূজার পরিবর্তন কিংবা রূপান্তরের সূচনা আদপে ঘটে রাজন্যবর্গের সময়কালেই। রাজপরিবারের আগ্রহে শৈবধর্ম গৃহীত হয়। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে কোচ-রাজবংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি মহারাজা নরনারায়ণ মুদ্রার এক পিঠে 'শ্রী শ্রী শিবচরণ কমল মধুকরস্য' খোদাই করা থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে তারা শৈবধর্মের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন।[৮] পরবর্তীকালে শুধু শৈবধর্ম নয় বিষ্ণুর প্রতিও রাজপরিবারের আগ্রহ বাড়তে থাকে।

এর সূত্র ধরে বলা যায় যে ধর্মের ক্ষেত্রে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের পরিবর্তে বৈষ্ণব ধর্মের সহজ সাধনা বা ভক্তিবাদের আবির্ভাব ঘটে। মহারাজা নরনারায়ণ শংকরদেবের প্রভাবে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন।[৮] মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণের সময়কালে বৈষ্ণব ধর্ম রাজধর্ম হিসাবে প্রচার পায়। রাজবংশী সমাজও ধীরে ধীরে রাজধর্মের প্রতি অনুরক্ত হয়। সংস্কার সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটে। এইভাবে তারা তাদের সমাজের বাইরের ধর্ম গ্রহণ করেছেন এবং এর ফলে তাদের আদিম সংস্কৃতি ক্রমে ক্রমে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে। এখনও পূর্বতন প্রজন্ম তাদের আদি দেবদেবীর আরাধনার চেষ্টা করছে কিন্তু তা শুধু আন্তরিকতায় কিংবা ভক্তির সাথে, কোনো জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে নয়। আবার সময়ের সাথে সাথে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকেও গ্রহণ করছে কোন বিরোধে না গিয়ে। স্বাভাবিকভাবে আদি দেবদেবী ও সংস্কৃতির গুরুত্ব হারাচ্ছে বর্তমান প্রজন্মের কাছে।

রাজবংশী সমাজে মৃন্ময় মূর্তির প্রচলন ছিল না। পরবর্তীকালে বর্ণহিন্দুদের সংস্পর্শে মাটির মূর্তির প্রচলন হয়। অতীতে শোলার মূর্তিই প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হত। মালি সম্প্রদায়ের একটা শ্রেণি এই শোলার কাজ করত। তারা বিষহরির মঞ্জুষ, বিয়ের মুকুট, কদম ফুল বানাতো। কিন্তু বর্তমানে শোলা দিয়ে মূর্তি বানানো বিশেষ দেখা যায় না। এর পরিবর্তে মাটির দ্বারা মূর্তির প্রাধান্য দেখা যায়। অনেকে বাড়িতে মাটির মূর্তিতেই মন্দির স্থাপন করেছেন।

উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বিষহরি মনসার প্রভাব পূর্বের মতই বর্তমান। কোচবিহার জেলায় ষাইটল বিষহরির প্রসার কয়েক দশকে কমেছে। একমাত্র কোচবিহার জেলাতেই এখনও কোন কোন বাড়িতে আসর বসে সন্তান কামনায়। মানত থাকলেই সাধারণত এখনও ষাইটল গিদালীর খোঁজ পড়ে। কোচবিহার ভেটাগুড়ির ফুলতী গীদালীর (বঙ্গরত্ন প্রাপক) দলটিই এখন অন্যতম। বলা যেতে পারে ফুলতী গীদালীই ষাইটল বিষহরির শেষ প্রতিনিধি। গ্রামগঞ্জে ষাইটল বিষহরির প্রভাবও কমেছে। মানত ও মনস্কামনার মানসিকতাও এখন হারিয়ে যাবার পথে। সেখানে বিষহরি মাড়েয়া গানের প্রভাবও কমেছে। বাড়ির কোন শুভ অনুষ্ঠানের (অন্নপ্রাশন, বিয়ে প্রভৃতি) আগে নিয়ম রক্ষার্থে আয়োজন হয় বটে সেটাও অল্প সময়ের (আগে ৩ দিন অথবা ৭ দিনের আসর বসত) জন্য, তাও অবস্থাপন্ন পরিবারের মধ্যে সীমিত। বেশিরভাগ পরিবার এখন সামান্য নৈবেদ্য নিবেদনের মধ্যেই সম্পন্ন করেন এই পর্বটি। উল্লেখ্য অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হওয়া যেমন অন্যতম একটি কারণ তেমনি বর্ণহিন্দুদের সম্পর্কে মনন মানসিকতার পরিবর্তনও

অনেকাংশে দায়ী, সেইসঙ্গে বর্তমান প্রজন্ম এই বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ আগ্রহী নয়। তা সত্ত্বেও বলা যায় বিষহরি মনসার প্রভাব সব জেলার (উত্তরবঙ্গের) রাজবংশী সমাজের মধ্যে কমবেশি বর্তমান। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের রাজবংশী সমাজে মনসামঙ্গলের আসর বসে। মালদহ জেলার রাজবংশী সমাজে বিষহরি মনসার প্রভাব এখনও হারিয়ে যায়নি। গাজোল, হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় রাজবংশী সমাজের বিয়েতে এখনও চণ্ডীগানের পর মনসামঙ্গলের আসর বসে। অনেকেই বিষহরি পূজায় হাঁস বলি দেয়। আরেকটি বিষয় রাজবংশী সমাজ কিন্তু মনসা পূজার দিন মনসা পূজা করে না তারা তাদের মত করে মনসা বিষহরির উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য প্রদান করে। কোচবিহার জেলার সব মহকুমাতেই মাশানের পাট দেখা যায়। জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার জেলাতেও মাশানের প্রভাব আছে, তবে কম। কোচবিহার জেলাতেই বেশি। উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর-এ কালিয়াগঞ্জ এলাকায় কয়েকটি জায়গায় মাশানের পূজা হয়। কোচবিহার জেলার প্রায় সর্বত্রই মাশান ঠাকুরের প্রভাব। ১৮ প্রকার মাশানের বিশ্বাস রাজবংশী সমাজে। আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য কোচবিহার জেলায় মাশান শুধু রাজবংশী সমাজের দেবতা নয়। বর্ণহিন্দুরা নস্য শেখ মুসলিম সমাজ সহ বর্ণহিন্দুদের একাংশের মধ্যেও যথেষ্ট প্রভাবশালী এই দেবতা। অনেক এলাকায় গ্রামভিত্তিক পূজাও সম্পন্ন হয়, সবাই অংশগ্রহণ করে, মানতের বশবর্তী হয়। এই দেবতার পূজার উপকরণে রাজবংশী সমাজের নৃ-গোষ্ঠীগত পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ এই দেবতার পাট যেমন সাধারণত নদী, জলাশয়, নিটকবর্তী এলাকায় তেমনি উপাচার হিসাবে মাছ পুড়িয়ে দেওয়া হয়। অতীতে শ্মশান এলাকাতেই মাশানের পাট ছিল। শ্মশান মাশান শব্দটি এইভাবে প্রচলিত হয়েছে। তাছাড়া মাশান ঠাকুরের প্রভাব রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজে বলা যায় যথেষ্টই এবং ভীতিপ্রদ অপদেবতা। মাশান রাজবংশী সমাজের লৌকিক দেবদেবীর মধ্যে অন্যতম এক দেবতা।

মদনকাম ঠাকুরের পূজা ও গান প্রায় অন্তরালের পথে। কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ এলাকায় এখনও মদনকাম ঠাকুরের পূজা ও গানের প্রচলন থাকলেও অন্যত্র বিশেষ দেখা যায় না। মদনকাম ঠাকুরের প্রতীক বাঁশ। জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং-এ 'বাঁশ খেলার গান' হিসাবে পরিচিত। কিন্তু কোথাও বিশেষ দেখা যায় না। তবে কোচবিহারের মদনমোহন মন্দিরে মদনকামের পূজা সহ কিছু প্রাচীন রীতি অনুসরণ করা হয়। এই পূজাটি আসলে বৃক্ষোপসনারই অঙ্গ। বাঁশ

এখানে মদনকাম ঠাকুর, মূলত: শিবেরই প্রতিরূপ। হিন্দু-মুসলিম (নস্য শেখ) সবার কাছে মান্য। ৫/৭টি বাঁশের মধ্যে একটি মাদার পীরের নামে রাখা হয়।

মহারাজ ঠাকুর উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ এলাকায় রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের দেবতা। রাজবংশীদের নিজস্ব পুরোহিত গোঁসাইরাও পূজা করেন। দুধ, কলা, চিনি, চিড়া সাধারণ উপকরণ। হৈমন্তিক ধান (হেউতি ধান) ওঠার পর ফাল্গুন মাসের দিকে সম্পন্ন হয়। ইদানীং মাটির মূর্তি, রাজকীয় বেশ, হস্তি বাহন, ত্রিভূজা, কোথাও হাতির বদলে ঘোড়া। অন্যত্র নেই, সম্ভবত ব্যক্তি দেবতাই গ্রাম দেবতা থেকে শিবের সঙ্গে সমন্বিত হয়েছে। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং জেলার অন্যত্র মহারাজ ঠাকুরের প্রচলন নেই। যখা আর এক দেবতা, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এলাকায় এই দেবতার প্রচলন থাকলেও বর্তমানে নেই। সময় ও পরিবেশে এই দেবতার লোকান্তরের পথে। যেমনটি হয়েছে সোনা রায় ঠাকুরের ক্ষেত্রে। এক সময় সোনা রায়ের পূজাকে ঘিরে বালকগণের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ ছিল এবং বহু গ্রামে সম্পন্ন হত। জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং জেলার রাজবংশী সমাজে সন্ন্যাসী ঠাকুরের প্রভাব থাকলেও অন্য জেলাগুলিতে নেই। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহে এই ঠাকুরের নাম শোনা যায় না।

পাঁচ-সাত দশক আগে রাজবংশী সমাজে ধর্ম ঠাকুর বা ধরম ঠাকুরের প্রভাব থাকলেও বর্তমানে নেই বললেই চলে। পূজা হত বৈশাখ মাসের সংক্রান্তিতে। এইজন্য রাজবংশী সমাজে বৈশাখ মাস ধর্ম মাস হিসাবেও পরিচিত। পূজার উপকরণ ছিল সাদা। সাদা পাঁঠা, সাদা ষাঁড়, সাদা পায়রা। ষাঁড়, পাঁঠা ধর্ম ঠাকুরের নামে ছেড়ে দেওয়ার প্রথাও এখন বিশেষ নেই। ধর্মঠাকুরের নিকট সবাই পুত্র কন্যা ও সংসারের মঙ্গল কামনাই করত। ছেড়ে দেওয়া পাঁঠা, ষাঁড় ধর্ম ঠাকুরের নামেই ঘুরে বেড়াত। ধরম ঠাকুরের পূজাটি এখন অবলুপ্তির পথে। স্ত্রীলোকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এই অনুষ্ঠানটি অবলুপ্তির অন্যতম একটি কারণ শৈব ভাবনার ব্যাপক প্রসার। ধরম ঠাকুরের প্রচলিত গানগুলিতেও শৈব প্রশস্তিই মুখ্য। অতীতে কিছু মানুষ পাত্র (লাউয়ের বস) নিয়ে বাড়ি বাড়ি ধরম ঠাকুরের গান করে ভিক্ষা করত। গান শেষে ভিক্ষার পাত্র পেছন দিকে রেখে ভিক্ষা নিত। ভিক্ষা না দেখার নিয়ম ছিল। এই ধরম ঠাকুর পূজা গান রাজবংশী সমাজের উপর সম্প্রদায়ের প্রভাবকে চিহ্নিত করে। ড. চারুচন্দ্র সান্যাল তাঁর 'দি রাজবংশীস অব নর্থবেঙ্গল'

গ্রন্থে এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। ধরম ঠাকুর নাথ সম্প্রদায়ের দেবতা এবং রাজবংশীদের উপর নাথ ধর্মের প্রভাবের উদাহরণ এই ধরম ঠাকুর পূজা।[১০]

মহাকাল ঠাকুরের পূজা আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায় বহুল জায়গাতেই সম্পন্ন হয়। আলিপুরদুয়ার জেলায় তো মহাকালগুড়ি, মহাকালধাম নামে জায়গা আছে। শিলিগুড়ি নকশালবাড়ির পথে ঘোষপুকুর এলাকায় 'মহাকাল ঠাকুরানি' পূজা হয়। হিংস্র জন্তুর হাত থেকে রক্ষা পাবার উদ্দেশ্যে এই ঠাকুরানীর পূজা। বলা যেতে পারে শিবেরই পূজা। ড. চারুচন্দ্র সান্যালের মতে আলিপুরদুয়ার জেলার জটেশ্বর এবং কোচবিহার জেলার বাণেশ্বরের শিব মহাকাল।[১১] তবে উপাচার ও ভঙ্গি ভিন্ন ভিন্ন। লৌকিক মতেই শিবের আরাধনা উত্তরবঙ্গের সব জেলাতে। সেটা কখন গ্রামঠাকুর হিসাবে পূজা পায়, কখন বুড়াঠাকুর হিসাবেও শিবের লৌকিক মতে আরাধনা। কুমারগ্রামে শিব রাজাঠাকুর আবার দিনাজপুরে মহারাজা ঠাকুর। ব্যক্তি দেবতা কখনও কখনও দেবতা হয়েছে, শেষে শিবের প্রতিরূপে মান্যতা পেয়েছে। উত্তরবঙ্গে শিবের ব্যাপক প্রসারে শিবের বহু লৌকিক রূপ। বর্ণহিন্দুদের মত নিছক শিবরাত্রি ব্রত কিংবা জল ঢালার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং নাম, প্রকৃতির সঙ্গে লৌকিক বিশ্বাস সংস্কারে সম্পৃক্ত হয়ে ঘরের দেবতা, গ্রামের দেবতা হয়ে পূজিত হয়। লৌকিক রূপের অনেকগুলির লোকান্তর ঘটলেও এখনও কিছু কিছু দেবতা আলাদাভাবে পূজিত হয়। সন্ন্যাসী ঠাকুর যেমন জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ সন্ন্যাসী হাট এলাকায় সাড়ম্বরে সম্পন্ন হয়। উত্তরবঙ্গের অন্য জায়গায় সন্ন্যাসী ঠাকুরের ব্যাপকতা হ্রাস পেয়েছে। অতীতে কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ মহকুমায় মহা সমারোহে হত। জামালদহ এলাকায় শিব 'পাইলাভাসা' হিসাবে আখ্যায়িত। দিনহাটা এলাকাতেও হয়। দার্জিলিং জেলাতে সন্ন্যাসী ঠাকুরের পূজার প্রচলন দু-এক জায়গায় আছে। উল্লেখ্য এখনও রাজবংশী সমাজের ঠাকুরের পাটে কিংবা গ্রাম থানে সন্ন্যাসী ঠাকুরের পূজা দেওয়ার রীতি প্রচলিত। তবে যেহেতু অর্থনৈতিক কারণে রাজবংশীদের পূজা-পার্বণের সংখ্যা কমেছে স্বাভাবিকভাবে সন্ন্যাসী ঠাকুরের অস্তিত্ব বিলুপ্ত প্রায়। উত্তরবঙ্গের মাত্র কয়েকটি জায়গাতেই সন্ন্যাসী ঠাকুরের নাম শোনা যায়। উপাচারের ক্ষেত্রেও লৌকিক দুধ, চিনি কলা (বিচিযুক্ত) সঙ্গে ধুতুরা ফুল, গাঁজা দেওয়া প্রচলিত হলেও মদ দেওয়ার প্রথা উঠে গেছে। এছাড়া শিবের আরও বহু লৌকিক রূপ। বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন ভাবনা ও আকাঙ্ক্ষায় রাজবংশী সমাজ পূজা করে। শিবের অনুষঙ্গী

জল্পেশ্বর, বাণেশ্বর, জটেশ্বর, জটিলেশ্বর শুধু নয় রাজাঠাকুর, গ্রামঠাকুর, সন্ন্যাসী, ধূমবাবা, মহারাজ, মদনকাম, মাশান মহাকাল, সোনা রায়, গমীরা, বুড়াঠাকুর, ডাংধরা, যখা বিভিন্ন লৌকিক আধারে শিবেরই বিভিন্ন রূপ। শৈবদেশে শিবের বিচিত্র বিহার, বিভিন্ন উপাচার। রাজবংশী সমাজে অতীতে পাঁঠা, খাসি, হাঁস, পায়রা এমনকী শূকরও উৎসর্গ করা হত। কখনও বলি দিয়ে, কখনও মোচড় দিয়ে কখনওবা উছরণ অর্থাৎ শুধুমাত্র উৎসর্গ করে। বিভিন্ন রূপের সঙ্গে বিভিন্ন ভঙ্গি, বিচিত্র সব রীতিনীতি। সেটা বাণেশ্বরে যেমন দেখা যায়। খাসি মুচড়ে আছাড় দিয়ে মেরে উৎসর্গ করা হয়। আবার কুমারগ্রাম দুয়ারে রাজা ঠাকুরকে শূকরের মাথা দিয়ে পূজা দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। আরও উল্লেখ্য বিষয় এখন এইসব পূজাতে হরিনাম সংকীতনের ব্যবস্থাও করা হয়। অদ্ভুত সমন্বয়। অনেক প্রথার রীতির পরিবর্তন হচ্ছে রাজবংশী সমাজে। কালীও বহু নামে পূজিত। অতীতে তো তন্ত্রসাধনায় কালী মুখ্য দেবতা হিসাবে পরিগণিত হত রাজবংশী সমাজে। উত্তরবঙ্গের তরাই ডুয়ার্সে তন্ত্রসাধনার কয়েকটি ক্ষেত্রও ছিল। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে বহু নামে কালীর সমারোহ, মুখোশেই পূজিত হয়। বাঁশুলি কালী, চামুন্ডা, বসন্ত কালী, মাশান কালী, সুর কালী, বাউ কালী, মাটি গুড়াইও কালীরই রূপভেদ। হাঁস, পায়রা, পাঁঠা বলিও হয়। মালদহ জেলায় চণ্ডী দেবীর ছড়াছড়ি - বুলবুল চণ্ডী, পাটাল চণ্ডী, রণচণ্ডী, রাইহোরনী, বাঁশরাণী, গোছিলা চণ্ডী রাজবংশী লোকজীবনে ছড়িয়ে আছে। নকশালবাড়ি এলাকার মহাকাল ঠাকুরানী কালীর লৌকিকরূপ আবার আলিপুরদুয়ার জেলার গাবুর ঠাকুর কালীরই ভিন্ন নাম। পূজার ক্ষেত্রেও ভিন্ন ভিন্ন লৌকিক আচার। অনেক সময় গৃহকর্তাই দুধ, দই, কলা, চিনি দিয়েই পূজার কাজ সম্পন্ন করেন। উল্লেখ্য রাজবংশী সমাজে পূজার নৈবেদ্য হিসাবে (একমাত্র কলা ছাড়া) ফল ফলাদি বিশেষ ব্যবহার করা হয় না। ইদানীং প্রচলিত হয়েছে তবে সেটাও বেশি দিনের নয় কয়েক দশক আগের। অদ্ভুত শোনালেও আরেকটি বিষয় বর্তমানে অনেক পরিবারের সদস্যই পরিবারের ঠাকুরের পাটে সমস্ত দেবতার নাম জানে না। বংশ পরম্পরায় ঠাকুরের পাটে মাটির টিপিতেই বিভিন্ন ঠাকুরের পূজা সময়ে সময়ে সম্পন্ন হয়। স্বাভাবিকভাবে অনেক দেবতাই রাজবংশী সমাজ জীবন থেকে লোকান্তরিত হচ্ছে ধারাবাহিক বিচ্ছিন্নতার কারণে। উত্তর দিনাজপুর জেলায় বসুমতী ঠাকুরের পূজা যেমন প্রচলিত তেমনি রান্নাঘরের দেবী মেথিনীদেও। বিয়ের সময়ও পূজিত হয়। সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে বাড়ির মালিক রান্না ঘরে এই দেবীর পূজা সম্পন্ন করেন।

'দুয়ারী', 'কুয়ারী', 'মহামারী' দেবীর পূজা এখনও গ্রামাঞ্চলে সম্পন্ন হয়। তবে বেশিরভাগ লৌকিক দেবদেবীর কোন মূর্তি নেই। মাটির বেদি, থান, বাঁশ, কলাগাছ, তুলসী ইত্যাদি প্রতীকেই দেবতার রূপ। এছাড়াও আরও কিছু লৌকিক দেবদেবী পূজা পান বছরের নানা সময়ে। যেমন ভুইরাজা, মাটি মড়াই, ছেপুয়ান, গোয়ালচণ্ডী, তিন বাড়া, ভেদাই, আটঘটি, অথাই পথাই, মুরলা কনকালী। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে এইসব লৌকিক দেবদেবীর অস্তিত্ব এখনও আছে। গ্রামাঞ্চলে নিয়মাচারে পালিত হলেও মফস্বল শহরাঞ্চলে অনেক দেবদেবীর অস্তিত্ব বিলীন। মাশানের রীতি সংস্কার, বেশ কিছু উপলক্ষ এখনও ঘিরে আছে। কিন্তু বিষহরি, সত্যপীর, চোরচুরনী নাচ গান এখন শুধুমাত্র গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত। তবে মুখোশকে বিভিন্ন দেবদেবীর প্রতীকে পূজার রীতি এই দুই জেলার আলাদা বৈশিষ্ট্য।

কাতি পূজা রাজবংশী সমাজে একদা বহুল প্রচলিত থাকলেও বর্তমান মুষ্টিমেয় কিছু পরিবারের মধ্যেই মাত্র সম্পন্ন হয়। ব্রতের গানের পরিসরও হারিয়ে গেছে বলা যায়। পুত্র সন্তান কামনায় এই ব্রতানুষ্ঠান করত। এই পূজাকে ঘিরে নিম্ন আসামে নাচ, গান থাকলেও উত্তরবঙ্গ থেকে হারিয়ে গেছে বলা যায়।

উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও দার্জিলিং জেলাতে একসময় গমীরা ঠাকুর পূজা ও ভক্তিয়ার খেলার গান প্রচলিত ছিল। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহেও গম্ভীরার অনুষঙ্গে গমীরা ঠাকুরেরই উপাসনা। এই গমীরা ঠাকুর পূজা, ভক্তিয়ার খেলা ও গান এবং চড়ক সবগুলিই রাজবংশী সমাজের বিষুয়া পরবের সঙ্গে যুক্ত। বস্তুত বিষুয়া পরবের অনেক রীতি সংস্কারের মত এই অনুষ্ঠানগুলি সংকুচিত হয়েছে। বর্ণহিন্দুদের অংশগ্রহণ এবং রাজবংশী সমাজের নব্য প্রজন্মের অনীহায় আজ ভক্তিয়ার খেলা, গান বা চড়ক, গমীরা ঠাকুর পূজা খুব কমই দেখা যায়। তবে এখনও বিশুয়া পরবকে ঘিরে রাজবংশী সমাজ বেশ কিছু ব্যতিক্রমী নিয়মাচার পালন করে। বিশেষ করে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলায়। এই দিনটির গুরুত্ব রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের ভিন্ন মাত্রার। নানাবিধ নিয়মাচার যুক্ত এই বিষুয়া পরবের গুরুত্বও হ্রাস পেয়েছে রাজবংশী সমাজে। কান্দির জল প্রস্তুত করার রীতি অবলুপ্ত হয়েছে। তুলসী গাছে 'ঝরা' (স্থানভেদে 'ধরা' দেওয়ার রীতিকে অনেকে 'ঝরা' দেওয়াও বলেন) দেওয়ার রীতিও এখন প্রায় অনেক পরিবারে পালন করা হয় না। শিকার করার প্রথা

তো উঠেই গেছে। ২২ প্রকার শাক খাওয়ার প্রথাও এখন আর দেখা যায় না। দুপুরবেলা ভাতের পরিবর্তে 'ভাজাভুজা' ('ফাটাফুটা'ও বলে অনেক অঞ্চলে) খাওয়ার রীতি অনুসৃত হয় না। গ্রামাঞ্চলে কিছু কিছু পরিবার এই রীতির কিছু কিছু অনুসরণ করলেও শহরবাসী রাজবংশী ক্ষত্রিয়রা বিশেষ কোন নিয়ম রীতি অনুসরণ করে না। করার মানসিকতাও নষ্ট হয়েছে বিভিন্ন ভাবে।

সামগ্রিকভাবে বলা যায় রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের পূজা-পার্বণ ও আচার সংস্কৃতির পরিসর অনেকটাই সংকুচিত। চার-পাঁচ দশক আগেও যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল। লৌকিক দেবদেবীর পূজা-অর্চনার সাথে সাথে আচার-সংস্কারগুলি পালন করত। আর্থ-সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন একটা কারণ বটে তবে মানসিকতা পরিবর্তন, বৃত্তি ও পরিবেশগত বিষয়গুলিও গুরুত্বপূর্ণ কারণ। স্বাভাবিকভাবে রাজবংশী সমাজের পূজা-পার্বণ ও আচার-সংস্কৃতি বিবর্তনের পথে। অনেক কিছুই লোকান্তরের পথে। বিশেষ করে পূজা কেন্দ্রিক গান। সেইসঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে কিছু বাদ্যযন্ত্র। নীচের সারণীতে পূজাকেন্দ্রিক গানের তালিকাটি থেকে স্পষ্ট হয় যে অনেক কিছু আজকে বিলুপ্তির পথে। সেইসঙ্গে আমোদপ্রমোদ ভিত্তিক গান বাজনার প্রসঙ্গটিও নীচের তালিকায় উত্থাপিত হল। [১২]

রাজবংশী সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন গান-বাজনার বর্তমান পরিস্থিতি

পূজা-পার্বণ ও আমোদপ্রমোদভিত্তিক গান-বাজনা	বর্তমান পরিস্থিতি
১। উদাসী গান।	১। বিলুপ্ত।
২। কোরক পূজার গান (song of rain inducing)	২। প্রায় বিলুপ্ত।
৩। বিরুয়া গান (ওঝা - song of exorcist)	৩। প্রায় বিলুপ্ত।
৪। দোতারা গান (love song)	৪। প্রায় বিলুপ্ত।
৫। গোমীরা গান (religious song)	৫। প্রায় বিলুপ্ত।
৬। তিস্তা বুড়ির গান অথবা ভাদই খেলার গান (song of goddess of Tista River)	৬। জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে।
৭। মেচেনি খেলার গান (song of goddess of Tista River)	৭। জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে।
৮। বাঁশ খেলার গান।	৮। জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে।

৯। শিবের বিয়াও গান (song of marriage of God Siva)	৯। জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে।
১০। গোলাপী শরীর গান (song of a grown up unmarried girl)	১০। বিলুপ্ত।
১১। ভোট গান (song of the spirit of vote Thakur)	১১। বিলুপ্ত।
১২। বিয়াও-এর গান (marriage song)	১২। বিলুপ্ত।
১৩। কুশান যাত্রা (song of Ramayan)	১০। জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে।
১৪। বিষহরী গান (song of goddess of snake)	১১। জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে।
১৫। পালা গান বা পালাটিয়া (one kind of theatre)	১২। জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে।

রাজবংশী সমাজে প্রচলিত বাদ্যযন্ত্র সমূহের বর্তমান পরিস্থিতি

বাদ্যযন্ত্রসমূহ	অবলুপ্ত বা অবলুপ্ত প্রায়
১। সারিন্দা (like a violin)	১। অবলুপ্ত।
২। বেণা বা ব্যায়েনা।	২। অবলুপ্ত।
৩। উপাঙ্গো (wooden made)	৩। অবলুপ্ত।
৪। তাসি (wooden drume)	৪। অবলুপ্ত প্রায়।
৫। আকরাই (small tasi)	৫। অবলুপ্ত প্রায়।
৬। দোতারা (four stringed harb)	৬। অবলুপ্ত প্রায়।
৭। মোখা (flute made by bamboo)	৭। অবলুপ্ত প্রায়।
৮। সানাই (a flute)	৮। অবলুপ্ত প্রায়।
৯। ঝিল্লী (bamboobsheet)	৯। অবলুপ্ত প্রায়।
১০। রাম তাল (big cymbal made of brass or bell metal)	১০। অবলুপ্ত প্রায়।
১১। রাম শিংগা (horn of buffalo or bamboo or wood blow as a flute)	১১। অবলুপ্ত প্রায়।

• লোকায়ত সংস্কৃতি

স্বাধীনতার সময়কাল থেকে রাজবংশী সমাজের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন শুরু হয়। পরবর্তীকালে বিপুল অভিবাসনে সেটা দ্রুত এবং ব্যাপক হয়। রাজবংশী গ্রাম সমাজের বিন্যাস পাল্টে যায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ ও ১৯৫৩ সালের জমি অধিগ্রহণ আইন উত্তরবাংলার আর্থ সামাজিক কাঠামোর ক্ষেত্রে এক নতুন রূপ নেয়। উত্তরবাংলার এক বিশাল সংখ্যক জোতদার বিশেষ করে রাজবংশী জোতদার তাদের জমি হারায়। এর ফলে জোতদাররা যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হয় তেমনি রাজবংশী সমাজের কৃষক শ্রেণিও বিপুল ক্ষতির স্বীকার হয়। এদের মধ্যে এক বিরাট অংশ ছিল ভাগচাষি-আধিয়ার। আবার ভূমি সংস্কার আন্দোলনের বিলিবন্টন ব্যবস্থায় স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায় বিশেষ উপকার পায়নি। জমির ঊর্দ্ধসীমা বেঁধে দেওয়ার ফলে যারা পুরোপুরি ভূমি নির্ভর ছিলেন তারা দিশেহারা হয়ে পড়েন। বিশেষভাবে রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল সবচেয়ে বেশি। শুরুতে তারা এর তাপ যথেষ্ট অনুভব করতে না পারলেও ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথম যুক্তফ্রন্টের সময় এর তাপ পেতে শুরু করে। অর্থাৎ বেনামি জমি বা খাসজমি উদ্ধার একটি সংকটের সৃষ্টি করে। জমিদারি প্রথার বিলুপ্তি ও ভূমিসংস্কারের মতো প্রগতিশীল কার্যসূচি উত্তরবঙ্গের ভূমি নির্ভর রাজবংশী সমাজের মধ্যে এক অস্থির সমস্যার সৃষ্টি করে। কারণ ছয়ের দশক অবধি রাজবংশী সমাজ ভূমির বাইরে অন্য কোন পেশায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করার কথা কখনও ভাবেননি। বরং ঘোরতর বিমুখ ছিল। ফলত: উদ্ভূত সমস্যায় তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। স্বাভাবিকভাবে সমাজ সংস্কৃতির মধ্যে দোলাচল শুরু হয়। অত্যধিক উদ্বাস্তুর অনুপ্রবেশ ও স্থায়ীভাবে বসবাসের ফলে জমির উপর চাপ বাড়ে এবং চাষবাসের ক্ষেত্রে একপ্রকার প্রতিযোগিতা শুরু হয়। সেইসঙ্গে অভিবাসন উত্তরবঙ্গের জনসংখ্যার পরিসংখ্যানে অনেক পরিবর্তন আনে। রাজবংশী জাতির জীবনযাপন ও অভ্যাসের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হয়। সর্বোপরি স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ক্রমাগত বর্ণহিন্দুদের অভিবাসনের ফলে এতদঞ্চলের বাসিন্দাদের স্থায়ী আধিপত্যের উপর আঘাত আসে। আবার বর্ণহিন্দুদের সংস্পর্শে এবং একত্রে বসবাসের ফলে রাজবংশীদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির উপর চাপ বাড়তে থাকে। রাজবংশী সমাজের একাংশের মধ্যে বর্ণহিন্দু সংস্কৃতির গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং নিজের সংস্কৃতির মধ্যে যেন অজান্তেই পার্থক্য সৃষ্টি হতে থাকে। অবস্থাপন্ন রাজবংশীরা শহরে অভিবাসিত হতে থাকে, ছেলেমেয়েদের

উচ্চশিক্ষায় পাঠাতে আগ্রহী হয় ও পরিবারের ঐতিহ্যশালী পেশা কৃষিকাজ ছাড়া অন্যান্য পেশা গ্রহণেও আগ্রহী হয়। ক্রমাগত রাজবংশীরা তাদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি ও জীবনশৈলীর পরিবর্তনের প্রতি আগ্রহী হতে বাধ্য হয়। তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী পোষাক-পরিচ্ছদের পরিবর্তে বর্ণহিন্দু সমাজের পোষাক-পরিচ্ছদ গ্রহণ করতে থাকে। আচার আচরণের পরিবর্তন ঘটায়। নিজের সমাজের তথাকথিত অনগ্রসর দলের কাছে নিজেদের উন্নততর ভাবতে থাকে। এর ফলে রাজবংশী সমাজের মধ্যে যে সাম্যতা ছিল তার অভাব ঘটতে থাকে এবং সমাজে অদৃশ্য এক উচ্চ ও নিম্নশ্রেণির উদ্ভব হয়।[১৩] সামাজিকভাবে অগ্রসর এইসব মানুষেরা তাদের অনগ্রসর রাজবংশীদের সঙ্গে মেলামেশাও বন্ধ করে দেয়, ফলে রাজবংশী সমাজের মধ্যে একপ্রকার সামাজিক বিভেদের জন্ম হয়।[১৪] অন্যদিকে জমিহারা, সর্বহারা রাজবংশীরা টিকে থাকার লড়াইয়ে দিনমজুর, ঠেলাওয়ালা, রিক্সাওয়ালা থেকে শহরাঞ্চলে কিংবা অন্যান্য প্রদেশে স্থানান্তরিত হয়। পাশাপাশি অভিবাসিত জনগণ বিভিন্ন ভাবে কৃষিকার্য, ব্যবসা বাণিজ্য কিংবা চাকরি করে মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে পরিণত হওয়ার ফলে চিরাচরিত গ্রামীণ কাঠামোটি বদলে যায়। অভিবাসিত জনগণের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এতদঞ্চলের রাজবংশীরা কোন দিক থেকেই পেরে ওঠে না বরং আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে এক সংকটের আবর্তে অবতীর্ণ হয়। বলা যায় ক্রমশ পিছিয়ে পড়ে। ফলে রাজবংশী সমাজ জীবন ও লোকায়ত সংস্কৃতির পরিসরটি ক্রমশ সংকুচিত হতে থাকে।

সময়ের স্রোতে শিক্ষা, যোগাযোগ তথা আধুনিকতার বিস্তার ঘটেছে। নগরায়ণও প্রসারিত হয়েছে। সংঘবদ্ধ জীবন গ্রামীণ জীবন থেকেও উধাও হয়েছে। বিশ্বায়িত বিজ্ঞাপনী প্রচারেও জনজীবন আর আবদ্ধ নয়। আবার বর্তমান প্রজন্মের কাছে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের দৌলতে মিশ্র সংস্কৃতির হাতছানি। রাজবংশী সমাজও তার বাইরে নয়। দ্রুত পরিবর্তনের সাপেক্ষে রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির লোকায়ত রূপটিও দ্রুত পরিবর্তমান। এমনি গ্রামীণ জীবনের কাঠামোর বদল ঘটেছে, জনবিন্যাসের চরিত্রও পালটেছে, রাজবংশী অধ্যুষিত গ্রামের সংখ্যাও এখন হাতে গোনা। সর্বোপরি রাজবংশী সমাজের মনন মানসিকতাও আর আগের মত নেই। বিভিন্ন কারণে, বিভিন্ন ভাবে সময় ও সংকটের আবর্তে আবর্তিত। জীবনযাপনের অভিমুখও আর আগের মত নেই। স্বাভাবিকভাবে লোকায়ত পরিসরটি অক্ষুণ্ণ থাকবে না এটাই স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও বলা যায়

রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির লোকায়ত পরিসরটি শত সমস্যায়ও একেবারে হারিয়ে যায়নি। অনেক পরিবর্তন ও গ্রহণ বর্জনের মধ্য দিয়ে বজায় আছে। এখনও তাই গ্রামে গঞ্জে লোকায়ত সংস্কৃতির বিষয়গুলি নজরে আসে। রাজবংশী মানুষেরা সাধ্যমত পালনের চেষ্টা করে যাচ্ছে। শহর ও গ্রামের রাজবংশী মানুষের মধ্যে বিভেদরেখাও তৈরি হয়েছে। তা সত্ত্বেও লোকায়ত পরিসরটির বিষয়ে সবাই কমবেশি সচেতন। রাজবংশীদেরও একটা মধ্যবিত্ত সমাজ তৈরি হয়েছে। তাদের মধ্যে উন্নাসিকতা কিংবা বর্ণহিন্দুদের মত মনোভাবও তৈরি হয়েছে। কিন্তু বৃহত্তর রাজবংশী সমাজ আজও অনেক পরিবর্তনকে মেনে নিয়েও লোকায়ত পরিসরে স্বচ্ছন্দ এবং সাধ্যমত যত্নবান। সেটা রাজবংশী সমাজের একটা অংশ নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করে। রাজবংশী সমাজের ঘরবাড়ির চেহারা পাল্টেছে। ডারিঘরের সেই অবস্থান এখন খুঁজেই পাওয়া যাবে না। ঘরোয়া চলাফেরায় এখন অতীতের সেই ছবি নেই। পুরুষ মহিলা সবাই এখন জীবন-জীবিকার স্বার্থে বাইরে ছুটছে। সেরকম কোন বিধিনিষেধ নেই। অবসর এখন উধাও। খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, ক্রিয়া-কর্ম, বিনোদন থেকে পূজা-অর্চনা লোকায়ত আচার-সংস্কার সবেতেই এখন পরিবর্তন এসেছে। বর্ণহিন্দু সমাজের অনেক কিছুই তারা গ্রহণ করেছেন পরিস্থিতির চাপে। বর্ণহিন্দুদের পূজা-অর্চনায় এখন রাজবংশীরা সমানভাবে অংশ নেন। লক্ষ্মীপূজার রেওয়াজ এখন রাজবংশী সমাজে সংযোজিত হয়েছে। শারদীয়া দুর্গোৎসব এখন ভাণ্ডানী দেবীর বিকল্প হয়ে রাজবংশী সমাজে গৃহীত। যদিও ভাণ্ডানী দেবীর পূজা ময়নাগুড়ি (জলপাইগুড়ি জেলা), কামাখ্যাগুড়ি (আলিপুরদুয়ার পূর্বাংশ) কিংবা কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা মহকুমার কিছু জায়গায় সম্পন্ন হয়। সরস্বতী পূজাও নয়া সংযোজন। যাত্রা পূজা, যা ছিল সরস্বতী পূজার নামান্তর তার পরিসর কমেছে। খুব কম পরিবারেই এখন যাত্রা পূজা করে। স্বাভাবিকভাবে গবাদি পশুর পরিচর্যা কিংবা হাল যাত্রার রেওয়াজও হারিয়ে যাওয়ার পথে। জামাইষষ্ঠীর মত অনুষ্ঠানও বর্ণহিন্দুদের সংস্পর্শেই আজকে রাজবংশী সমাজে অন্তর্ভুক্ত। বরং এখন অষ্টমঙ্গলার বিষয়টি গৌণ হয়েছে। দলবেঁধে কন্যা পক্ষের বাড়ির লোকের যাওয়ার ছবি এখন নস্টালজিক মাত্র। এমনকী দেশীয় বাজনা পার্টির (সানাই, কড়কা, বাঁশি সহ) সংখ্যা এখন কমেই গেছে। সানাই-র করুণ সুর এখন রাজবংশী মানুষের স্মৃতির কোঠায়। বিয়ের শুরুতে মাড়েয়া গানের আসরও আর সেভাবে বসে না, নিয়ম রক্ষার্থে পূজা-অর্চনা কিংবা নমঃ নমঃ করে অল্পক্ষণের

আসর বসানো হয়। অন্নপ্রাশন কিংবা নামকরণের পুরোনো ঐতিহ্য আর নেই। এমনকী নামকরণের ক্ষেত্রে বর্ণহিন্দুদের প্রভাব লক্ষণীয়। আগের মত বস্তুভিত্তিক কিংবা সময়ভিত্তিক নামকরণ এখন করে না রাজবংশী পরিবারগুলো। আগে যেমন বুরুং, ধদলং, বালিয়া কিংবা ফাগুয়া এসব নামের সংস্কার এখন উঠে গেছে। আগে মাসের নামে, ঘটনার নামে কিংবা চেহারা স্বভাব দেখেও নামকরণ করা হত। বিয়েতে 'পানিছিটা' বাপ কিংবা 'মিস্তর' ধরার রীতি শহরাঞ্চলের রাজবংশী ভাবনা থেকে উধাও হয়েছে। যদিও গ্রামাঞ্চলে রাজবংশীরা এখনও এই রীতিটি ধরে রেখেছে। আগে আশীর্বাদের সঙ্গে টাকা পয়সা দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল, এখন দেখা যায় না। বিয়ের গান নাচের পর্ব হারিয়েই গেছে বলা যায়। গুয়াকাটা, নারদের ভার এখন নেই। ভাটাইত/ফারুয়া (ঘটক) কমেছে। কলা পাতায় কিংবা খোলে খাওয়া দাওয়ার রেওয়াজ ক্যাটারার কেড়ে নিয়েছে। দই, চিড়ে খাওয়ার বিষয়টি একেবারে সংক্ষিপ্ত হয়েছে। আগে তো রাজবংশীরা রোজ চিড়ে কুটে খেত। সঙ্গে বহু প্রকারের দই। পানসা দই, ট্যাঙ্গা দই, ঝাল ট্যাঙ্গা দই, ছাচি দই, কাচা দই প্রভৃতি বিচিত্র নামের বিচিত্র স্বাদের দই। বউভাতের সময় গ্রামের পাঁচ দেওয়ানীর মান্যতা প্রদান এখন আর ততটা জরুরি নয়। সর্বোপরি বর্ণহিন্দু ছেলে মেয়েদের সঙ্গে বিয়েও সম্পন্ন হচ্ছে এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সংযুক্তি ঘটেছে। অধিকারী পুরোহিতের গুরুত্ব কমেছে। তাদের সংখ্যাও কমেছে, গ্রামাঞ্চলে যাও বা আছে শহরাঞ্চলের রাজবংশীরা এখন বলা যায় সম্পূর্ণ ভাবে বর্ণহিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গেই অভ্যস্ত। বিষুয়া পরবের নিয়মকানুন তারা জানেন না, গ্রামাঞ্চলেও সংক্ষিপ্ত হয়েছে। বিষুয়া উপলক্ষে শিকারের পর্বটি অনেকদিন আগেই বর্জিত হয়েছে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইনের বিধিনিষেধে। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় মাছ মারার বিষয়টি কোথাও কোথাও থাকলেও নিয়ম রক্ষা মাত্র হয়েছে। কিন্তু লোকায়ত সংস্কারের যেমন - কান্দির জল তৈরি, দুপুরে 'ভাজাভুজা' খাওয়া, ২২ প্রকার শাক খাওয়ার যে রীতি অনেকক্ষেত্রেই সেটা নেই। দার্জিলিং, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে একসঙ্গে শাক রান্না করে খাওয়ার রীতি ছিল। যদিও মালদহ জেলাতে রাজবংশীদের মধ্যে ভাজাভুজা কিংবা শাক খাওয়ার রীতি বহুদিন আগেই লুপ্ত হয়েছে। পান্তাভাত খাওয়ারও রীতি (সংক্রান্তির রাতে রেখে পরের দিন পয়লা বৈশাখে) এখন আর মানা হয় না। মালদহ জেলার রাজবংশীরা 'ছাতু বাড়ান' (চণ্ডীমণ্ডপে ছাতু উৎসর্গ করে দুপুরে খায়) প্রথা অনুসরণ করে। বাস্তুঠাকুরকে পূজার প্রথাটি এখন সংকুচিত। সেইসঙ্গে ঘরের

চালে গাঁজা, বিস্তি, বিষ ঢেকিয়া, ময়না, পানিমুথারি, পাতা গুজে রাখা ইত্যাদি প্রথাও এখন হারাতে বসেছে। তুলসী গাছে 'ঝরা' ঝুলিয়ে দেওয়ার প্রথাটি খুব বেশি দেখা যায় না। তবে অসমের গোয়াল পাড়া জেলার রাজবংশীরা বিষুয়া পরবে এখনও এই আচারগুলি নিষ্ঠাভরে পালন করেন। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার কিংবা দার্জিলিং জেলার রাজবংশী অধ্যুষিত গ্রামে বিষুয়া পরবে নিয়মরক্ষার জন্য সামান্য কিছু অনুষ্ঠান করা হলেও লোকায়ত পরিসরটি অনেকটাই লোকান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। এর মূল কারণ জীবন-জীবিকায় ব্যস্ততা সেইসঙ্গে প্রবীণ-প্রবীণাদের সংখ্যা কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিয়মাচারের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের সমস্যা এবং অপ্রতুলতা। বর্তমান সময়ে গ্রামাঞ্চলের রাজবংশীরা বিষুয়া পরবকে মাথায় রাখলেও শহরে বসবাসকারী রাজবংশীরা অধিকাংশই স্মৃতির পাতায় রেখে দিয়েছেন। গ্রামাঞ্চলেও বাস্তু ঠাকুরের পূজা দেবার বিষয়টিও এখন সর্বস্তরে পালিত হয় না। অথচ এই বিষুয়া পরবকে ঘিরে চার-পাঁচ দশক আগে রাজবংশীদের বাড়িতে সারাদিনই বহু লোকায়ত আচার-সংস্কার পালিত হত। আজকে বিশ্বায়ন ও ভুবন যুগের সন্ধিক্ষণে রাজবংশী সমাজ জীবনের এই অন্যতম বিষুয়া পরবের গুরুত্ব হারাতে বসেছে। একইভাবে আমাতি (অম্বুবাচী) পরবের বিষয়টিও গুরুত্ব হারাচ্ছে। নিয়ম আচার পালনে শিথিলতা এসেছে। অতীতে রাজবংশী সমাজে এই আমাতি পরবটির সঙ্গে কামাখ্যা বসুমতীর যোগাযোগের ভাবনা সক্রিয় ছিল। বসুমতি রজঃস্বলা অশুচ হিসাবে ঠাকুরবাড়িতে সান্ধ্যপ্রদীপ না দেওয়া, পূজা পার্বণ বন্ধ করা, মাটি না খোঁড়া, চাষবাস বন্ধ রাখা ইত্যাদি পালনীয় কৃত্যাদি ছিল। বর্তমানে ভূমিহীন রাজবংশীদের কাছে এই 'আমাতি' শুধু নামমাত্র। ভূমির সঙ্গে সংযুক্ত রাজবংশীরাও এই লোকায়ত পরিসরটিতে অনুসরণ করেন মাত্র। মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার রাজবংশীরা বর্ণহিন্দুদের মতই অম্বুবাচী পালন করেন। এখানে অম্বুবাচী 'আমৈৎ' হিসাবে পরিচিত।[১৫] রাজবংশী মহিলারা উপবাস করে কচুপাতায় দুধ, খৈ, আম ইত্যাদি ফল বাস্তুদেবতা, তুলসী মণ্ডপ অন্যত্র শুদ্ধ জায়গায় রেখে দেন সর্প দেবতার উদ্দেশ্যে। মূলত: এই আমাতি পরবটি প্রজনন শক্তির পূজা এবং তৎসংক্রান্ত ধ্যান ধারণা বটে। রাজবংশী সমাজ এই কৌম পরিসরটিকে অনুসরণ করে। যদিও এখনও ভূমি নির্ভর রাজবংশী সমাজের এই পরবটি আজকে নানাভাবে সংকটাপন্ন। প্রবীণ-প্রবীণারা এই আমাতি বা অম্বুবাচী পরবটিকে অনুসরণ করলেও বর্তমান প্রজন্মের কাছে মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। সংকীর্ণ হচ্ছে

লোকায়ত সংস্কৃতির পরিবৃত্তটি। মূলত: ভূমি নির্ভর সমাজ সংস্কৃতির পরিবর্তনটাই মুখ্যত দায়ী। রাজবংশীদের অনেকের কাছে এই পরবটি আজকে বাহুল্য মাত্র। রাজবংশী সমাজের কৃষি কৃত্যাদির অনুষ্ঠানগুলি সংক্ষিপ্ত হয়েছে, 'গচিবুনা' অনুষ্ঠানটি করা হলেও বাস্তু ঠাকুরের পূজা ও অন্যান্য কৃত্যাদি সংক্ষিপ্ত হয়েছে। তবে অনুষ্ঠানটি এখনও উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই রাজবংশীরা সম্পন্ন করেন। তামাক চাষের ক্ষেত্রে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলার রাজবংশীরা অনেক সময় 'গচিবুনা' পালন করেন। তবে গচিবুনার পূর্বে গ্রাম ঠাকুরের পূজার বিষয়টি অবলুপ্ত হয়েছে। কর্ষিত ভূমিতে নৈবেদ্যর সঙ্গে ৫/৭টি বিছনের থোক রোপণ করে পাট, কলা, কচু, দূর্বা ঘাস রোপণ করে গচিবুনার পর্বটি সম্পন্ন করে গৃহকর্তা। অধিকারীর দরকার পড়ে না। তামাক চাষের ক্ষেত্রে মানকচুর পাতা ও পানের পিক ফেলার রীতি সংস্কার প্রচলিত। আরও বিবিধ নিয়ম থাকলেও সংক্ষিপ্ত হয়েছে। আবার জেলাভিত্তিক সংস্কার রীতিও আলাদা আলাদা হয়েছে। ড. চারুচন্দ্র সান্যালের মতে গচিবুনা আসলে লক্ষ্মী পূজা নয় 'মা ধত্তির' অর্থাৎ ধরিত্রীদেবীর পূজা।[১৬] গচিবুনাকে কেন্দ্র করে রাজবংশীদের কৃত্যাদি এই ভাবনাকেই প্রতিষ্ঠিত করে। ভূমি নির্বাসনের সাথে সাথে গচিবুনার কলেবরও কমেছে বলা যায়। রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজে 'ধানের ফুল আনা' ও 'নয়া খৈ' অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। কিন্তু 'নয়া খৈ' অনুষ্ঠানটির কলেবর কমেছে। আগে নতুন ধানের চাল, চিড়ে প্রথমে নৈবেদ্য হিসাবে ঠাকুর দেবতাকে তুলে দেওয়া হত। ধানের ফুল আনা বা আগ নেওয়া অনুষ্ঠানটি গৃহকর্ত্রী নিষ্ঠা সহকারে করেন। হৈমন্তিক বা হেউতি ধানের ক্ষেত্রে এই রীতি আজও প্রচলিত। তবে মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে যেহেতু বোরো ধানের চাষ বহুল পরিমাণে হয় সেক্ষেত্রে নিয়মাচারে ধানের ফুল আনার বিষয়টি অন্যভাবে পালিত হয়। মনসা, লক্ষ্মী বা বুড়িকালীর উদ্দেশ্যে পূজা প্রদান করে ধানের ফুল আনার নিয়ম রক্ষা করা হয়। থানছিরি দেবীর কাছে ধানের শিষ রাখার নিয়ম মানা হয় না। তবে নবান্ন বা নয়া খৈ হৈমন্তিক বা আমন ধানের ক্ষেত্রেই সম্পন্ন হয়। উল্লেখ্য ধানের ফুল আনা এবং নয়া খৈ অনুষ্ঠান পালন না করে রাজবংশীরা নতুন ধানের ভাত গ্রহণ করেন না। অগ্রহায়ণের শুরুতেই 'নয়া খৈ' অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। অবস্থাপন্ন পরিবারগুলি জাঁকজমকপূর্ণ করে এই 'নয়া খৈ' বা নবান্ন অনুষ্ঠানটি করলেও সংখ্যানুপাতে গরিব প্রান্তীয় রাজবংশীদের অভাবী সংসারে ঠাকুর দেবতাকে উৎসর্গ করেই 'নয়া খৈ' অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। বাইরে লোকজনকে ডেকে খাওয়ানোর সুযোগ থাকে

না। অতীতে পাড়া-প্রতিবেশীকে ডেকে খাওয়ানোর রেওয়াজ ছিল সেইসঙ্গে শেয়াল ঠাকুরের নামেও ভাত তরকারী উৎসর্গ করা হত। এই নিয়মটি কোচবিহার জেলায় এখন পালিত হয় না। জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায় অতীতে ২১টি কলার ঢোনা (কলার খোল দিয়ে তৈরি ছোট পাত্র বিশেষ) কিংবা পাতায় নৈবেদ্য সাজিয়ে সঙ্গে পুঁটিমাছ পুড়িয়ে বাইরে রেখে দিয়ে আসা হত। আবার কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায় রাজবংশী পরিবারগুলি 'নয়া খৈ'র দিন মহাবারিক নামে এক দেবতাকেও নৈবেদ্য দেওয়ার সংস্কার ছিল। সাধারণত ঘরের চালে রেখে দেওয়া হত। অদ্ভুত ভাবে এক্ষেত্রেও পোড়া পুঁটিমাছ কাঠিতে গেঁথে দেওয়ার সংস্কার প্রচলিত ছিল। তবে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ জেলায় শিয়াল ঠাকুর, নিশা বা মহাবারিক কোন দেবতাকেই পূজা দেওয়ার সংস্কার নেই। ধান কাটাই, মাড়াই এর পর গোলাজাত করার আগে 'বুড়াবুড়ি' অনুষ্ঠানটিও কৃষিকৃত্যাদির মধ্যে পড়ে। শিশুদেরকে দিয়ে এই বুড়াবুড়ি অনুষ্ঠান মাথায় এবং বাংকুয়ায় ধানের আঁটি নিয়ে তিনবার প্রদক্ষিণ করার পর পুকুরের জলে নিক্ষেপ করার এই বুড়াবুড়ির অনুষ্ঠানটি এখন প্রায় লুপ্ত। কারণ আগের মত খোলান বাড়িতে ধান জমিয়ে রেখে অনুষ্ঠানের সুযোগ নেই। প্রতিদিনই কাজ করে বস্তাবন্দি করা হয়। অথচ এই অনুষ্ঠানটির মধ্যে লোকায়ত বিশ্বাস ছিল। ভাবনার কিছু বিষয় সুদূর অতীত সময় থেকে যুক্ত ছিল। সময়ের কালস্রোতে এবং সামাজিক কাঠামো বদলের ফলে এই বুড়াবুড়ি অনুষ্ঠান লুপ্তপ্রায়। আরেকটি বিষয় অতীতে দলবেঁধে কোন গৃহস্থের জমিতে চাষ করার ব্যবস্থা করা হত। খাওয়া দাওয়ার বিনিময়ে যা ছিল যৌথ শ্রমের আদিম রীতি। যা 'হাউলী' নামে পরিচিত। আবার 'গাতা' পদ্ধতিতে একে একে সবার জমি দলবদ্ধভাবে চাষ করার রীতিও প্রচলিত ছিল। এই সমবায় সমন্বয় মানসিকতার বিরাট প্রভাব ছিল রাজবংশী সমাজে। বর্তমানে এই প্রথা উঠে গেছে। আগে এভাবে সবার জমি চাষের বিষয়টি সময়মত সম্পন্ন হত। নিজেদের মধ্যে এক সমৃদ্ধ সম্পর্ক স্থাপিত হত। আরেকটি বিষয় আগে কারো পাঁঠা বা খাসি সবাই মিলে ভাগ করে খাওয়ার রীতি ছিল। যা 'ভাগন' নামে পরিচিত ছিল। সেটাও রাজবংশী সমাজ ভাবনা থেকে অপসৃত হয়েছে। দল বেঁধে মাছ মারার 'বাহো' উৎসবও লুপ্তপ্রায়। আগে শিঙা ফুকিয়ে গ্রামবাসীকে আহ্বান করা হত। রাজবংশী সমাজে মাছ মারাও ছিল একটি উৎসব। হাল আমলে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার সংযোজন ঘটেছে বর্ণহিন্দুদের সংস্পর্শে। মূলত ক্ষেতিলক্ষ্মীর পূজাটি রাজবংশী

সমাজের আদি পূজা। আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিন বৃহস্পতিবার না হলে কার্তিক মাসের প্রথম বৃহস্পতিবারে ক্ষেতিলক্ষ্মীর পূজা হত।[১৭] বর্ণহিন্দুদের সংস্পর্শে ক্ষেতিলক্ষ্মীর পূজাটি ত্যাগ করে ব্রাহ্মণকে দিয়ে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজাতেই অভ্যস্ত হয়েছে কিছু পরিবার বিশেষ করে শহরাঞ্চলের অধিকাংশ রাজবংশীরাই এটা করছেন। ক্ষেতি লক্ষ্মী পূজার অপর নাম ডাকলক্ষ্মী পূজা। আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি অর্থাৎ ডাক সংক্রান্তিতে পূজা দেওয়ার কারণে 'ডাকলক্ষ্মী' হিসাবে পরিচিতি পায়। এইদিনে ক্ষেতে, ঘরে, ঠাকুরের পাটে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের বিশেষ রীতি আছে। ক্ষেতে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন 'ভোগা' দেওয়ার সময় চিৎকার করে ছড়া বলা হয় ''আগ শোর হাট, পোকামাকড় দূর হউক।'' মূলত কীটপতঙ্গ দূর করার প্রয়াসে এই প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করা হয়। অনেকে কাঠিতে করে কাঁঠাল পাতায় সরষে তেলের প্রদীপ বানিয়ে প্রজ্জ্বলন করেন। আবার অনেক রাজবংশী পরিবার এই দিনে আকাশ প্রদীপ জ্বালানো শুরু করেন। এখন আকাশ প্রদীপের প্রচলন কমেছে। তবে এখনও গ্রামে গঞ্জে দেখা যায়। ধান ক্ষেতে 'ভোগা' দেওয়া (ঘিয়ের প্রদীপ) রীতি আজও পালন করে রাজবংশী সমাজ। বিশেষ করে যারা এখনও চাষবাসের সঙ্গে যুক্ত। আলিপুরদুয়ার জেলার পূর্বাংশে 'চালতা'য় করে পাঁচকোল বাতি দেওয়ার রীতি এই দিনেই প্রচলিত। 'চালতা' রাজবংশী সমাজে 'পাঁচকোল' নামে পরিচিত। বাতি দেওয়ার সময় চিৎকার করে বলা হয় 'সগারে ধান টোনা মোনা, আমার ধান সিদায় সোনা' অর্থাৎ অন্যদের ধান দুর্বল কিন্তু আমার ধান যেন সোনার দানা হয়ে ওঠে। পাঁচকোল বাতি দেওয়ার উদ্দেশ্য ক্ষেতের দুষ্ট পোকামাকড় বিনষ্ট করা। কারণ এই সময় পোকার উপদ্রব শুরু হয়, ধানও তখন হয়ে ওঠার পথে, আলোতে প্রচুর পোকার মৃত্যু হয়। কৃষিকৃত্যাদির এইসব অনুষ্ঠানগুলি আজও রাজবংশীরা পালন করেন কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশ সংক্ষিপ্ত হয়েছে। আর এই ধরনের কৃষিকৃত্যাদির অনুষ্ঠানের মধ্যে জড়িয়ে আছে রাজবংশী সমাজের লোকায়ত সংস্কৃতি।

পুষুনা অর্থাৎ পৌষ পার্বণের পর্বটি এখন সংক্ষিপ্ত। অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও সামাজিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের ফলে পুষুনার সেই উন্মাদনা আর নেই। শহরের রাজবংশীরা তো কোন নিয়ম সংস্কারই পালন করেন না। অতীতে চার-পাঁচ দশক আগেও রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজে এই পুষুনাকে ঘিরে বেশ কিছু লোকায়ত উৎসব প্রচলিত ছিল। সকালে গরুকে স্নান করিয়ে পিঠা খাওয়ানো, বাস্তু ঠাকুর ও অন্যান্য দেবদেবী উৎসর্গ করে রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজ পিঠা খেত।

অধিকারী ব্রাহ্মণ দিয়ে পূজাও করা হত। বহু আগে শিকারের প্রথাও প্রচলিত ছিল। মহাবারিকের (বৌদ্ধিয় রীতি) উদ্দেশ্যেও পিঠা উৎসর্গ করার রীতি রাজবংশীরা একদা অনুসরণ করতেন। বর্তমানে বলা যায় কোন নিয়মই সঠিকভাবে পালন করা হয় না। গিরিজাশংকর রায়ের ভাষায় "উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজে কোন প্রকারে প্রথাটি টিকিয়া রহিয়াছে।"[১৮] পৌষ পার্বণের দিন বালকেরা সারারাত জেগে থেকে 'ভ্যাড়া ঘর' পুড়িয়ে স্নান করত। সেদিন বাড়ির গবাদি পশুকে স্নান করিয়ে তাদের গায়ে চালের পিটুলী গুলিয়ে কলাপাতার ডাঁটি দিয়ে গায়ে লাগিয়ে দেওয়া হত। বর্তমানে গ্রামগঞ্জে কিছু সংস্কার এখনও পালিত হয়। কিন্তু শহরের রাজবংশীরা বর্তমানে কোন সংস্কারের প্রতি বশবর্তী নয়। আর সুযোগও নেই এই অজুহাতে ভুলে থাকেন।

কয়েক দশক আগেও রাজবংশী সমাজে বন্ধুত্ব স্থাপন সূচক নানাবিধ অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। বিয়েতে 'মিস্তর ধরা' গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত আছে। এই মিস্তর ধরার মধ্য দিয়ে সম্পর্কের সম্প্রসারণ ঘটত দুই বন্ধু ও পরিবারের মধ্যে। 'সখা হালা'র মধ্য দিয়ে দুই বন্ধু ও পরিবারের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হত। আজীবন সেই সম্পর্ক বজায় থাকত। আবার মেয়েদের মধ্যে সখি পাতানো অনুষ্ঠান 'ভাদাভাদি' নামেও পরিচিত। ধর্ম ঠাকুরকে সাক্ষী করে সই পাতানোর বিষয়টি রাজবংশী সমাজে আত্মীয়তা সম্প্রসারণের উদাহরণ। মূলত এই তিন ধরনের অনুষ্ঠানের মধ্যেই রাজবংশী সমাজের উদারতার ছবিই ধরা পড়ে। যার জন্য রাজবংশী অধ্যুষিত গ্রামে একটি কথা প্রচলিত 'গ্রামের সবাই সবার আত্মীয়', কোন না কোন সম্পর্কে আত্মীয়তার বন্ধন বিস্তৃত হয়েছে। এই সখি পাতানোকে ঘিরে কোচবিহার জেলার দিনহাটার নগরভাংনী গ্রামে চৈত্র মাসের বারুনী তিথিতে 'সখীর মেলা' বসে। এখনও সেখানে সই পাতানোর ছবি দেখা যায়। অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গেও অনেকে এই সই পাতানোয় আবদ্ধ হয়। এই অনুষ্ঠানগুলি রাজবংশী সমাজে এক বিশেষ সামাজিক গুরুত্ব বহন করত। বর্তমান বিশ্বায়িত সময়ে এইসব সম্পর্কের গুরুত্ব অনেকটাই হারিয়েছে। রাজবংশী সমাজের মধ্যে এই লোকায়ত সম্পর্কের কিছু বিষয় এখনও লেগে আছে বইকি। তবে সেটা কতদিন, সেটাই প্রশ্নের। কারণ ইতিমধ্যে এই সম্পর্কগুলির গুরুত্ব যথেষ্ট কমেছে।

লোকায়ত সংস্কারে 'বট-পাখিরীর বিয়া' কিংবা 'জিগা গাছের সঙ্গে সই পাতানো'র বিষয়টি এখন বিশেষ নজরে আসে না। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলায় অপুত্রক ব্যক্তি

বট-পাকুড়ের বিয়ের আয়োজন করতেন। অনুষ্ঠান করেই অধিকারী পুরোহিত দিয়ে এই বিয়ে সম্পন্ন হত, এই প্রথা বহু প্রাচীনকালের বৃক্ষ ভাবনার পরিচায়ক। জিগা গাছের সঙ্গে সই পাতানোও বিষয়টি বৃক্ষ ভাবনারই আরেকটি দৃষ্টান্ত। মূলত: মৃতবৎস্যা নারী সন্তান কামনায় এই জিগা গাছকে সই পাতানোর সংস্কারে আবদ্ধ হন। গাছটির সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হতে। জিগা গাছটি এখানে নারী হিসাবে প্রতিপন্ন হত। জিগা গাছ যেহেতু দীর্ঘজীবী সেখানে সন্তানের বেঁচে থাকাকে প্রাধান্য দিয়ে জিগা গাছ রাজবংশী সমাজে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরনের লোকায়ত সম্পর্কগুলির প্রভাব এখন কমেছে। সচরাচর 'বট-পাখিরীর বিয়া' কিংবা 'জিগা গাছের সঙ্গে সই পাতানো'র বিষয়টি নজরে আসে না। তবে কয়েক দশক আগেও এই বিষয়গুলি প্রায়শই নজরে আসত। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রাজবংশী সমাজের প্রাচীন ভাবনাগুলিরও অবলুপ্তি ঘটছে এটা যেমন বলা হয় তেমনি লোকায়ত সংস্কৃতির পরিসরটিও ছোট হচ্ছে।

মালদহ জেলা গাঙ্গেয় সভ্যতার অধিকারী বলে এই অঞ্চলের রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের সংস্কৃতির মধ্যে অরাজবংশী বর্ণহিন্দুদের আচার অনুষ্ঠানের প্রভাব পড়েছে এবং সেটা উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরেও কিছুটা সম্প্রসারিত হয়েছে। আবার অপরদিকে রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের সভ্যতা সংস্কৃতি মূলত কোচবিহারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। স্বাভাবিকভাবে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং জেলাগুলিতে এখন রাজবংশী আচার অনুষ্ঠানের সমতা দেখা যায়।[১৯]

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহে রাজবংশীদের মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। বলা যেতে পারে এই কয়েকটি জেলার রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের প্রায় সবাই এখন বৈষ্ণব ভাবাপন্ন। বিশেষ করে গ্রামীণ সমাজের রাজবংশীরা। শহরের ভিন্ন ভিন্ন পেশায় যুক্ত থাকায় রাজবংশী মানুষজন বাইরে থাকলেও তারা সংস্কৃতিগত দিক থেকে বর্ণহিন্দুদেরই কাছাকাছি। ফলত: উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ জেলায় রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের লোকায়ত সংস্কৃতির পরিসরটিও দ্রুত পরিবর্তমান। অনেক কিছুই লোকান্তরিত। আবার পালিত হলেও নিয়ম সংস্কারের পরিসরটি একেবারে সংক্ষিপ্ত হয়েছে।

সমীক্ষায় উঠে আসে কৃষিকৃত্যাদির অনেক অনুষ্ঠানই এখন পালিত হয় না। এখন অবশ্য শস্য বৈচিত্র্যের ফলে চাষবাসের প্রকৃতি পালটে গেছে, শুধুমাত্র হৈমন্তিক (হেউতি) চাষাবাদে

সীমাবদ্ধ নয়। গচিবুনা-গোচরপনা, ক্ষেত বাড়ানো (নতুন ধানের ভাত ও অন্যান্য উপকরণ পাথার বাড়ি অর্থাৎ বাইরে উৎসর্গ) এখন নেই। নতুন ধানকে ঘিরে ধানের ফুল আনা, বুড়াবুড়ি অনুষ্ঠানও নেই। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ জেলায় এই বিষয়টি লক্ষণীয়। দু'একটি পরিবারের মধ্যে কিছু নিয়ম সংস্কার থাকলেও অতীতে খোজাগর (কোজাগরি) মাগন বহুল প্রচলিত ছিল। ছেলেরা ছুক্রি সেজে নাচগান করত বাড়ি বাড়ি, মাগন তোলা হত। এখন যা নজরে আসে না। 'হালুয়া হালুয়ানীর গান'ও বিলুপ্তির পথে। খন গান এখন সরকারি প্রচারেই বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। প্রেম পিরিতি কিংবা সামাজিক ঘটনায় সীমাবদ্ধ নয়। উত্তর দিনাজপুর জেলায় আগে বাউল এর প্রভাব ছিল না। ছিল কিছু গেরুয়া পোষাক পরিহিত সাধু-বোষ্টম মানুষ বাড়ি বাড়ি গিয়ে দেহতত্ত্ব, মনঃশিক্ষার গান শুনিয়ে বেরাতো। সাধুমেলা হত। সেটাই কয়েক দশকে বাউল সমাবেশে পরিণত হয়েছে। হারিয়ে গেছে দেহতত্ত্ব, মনঃশিক্ষা গানের ভাণ্ডার। মূলত দেশীয়া তথা রাজবংশী সমাজেই এইসব গান বহুল প্রচলিত। অবশ্য অন্যান্য জেলা আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলাতেও এইসব গানের ব্যাপক প্রচার ছিল। ময়নাগুড়ি এলাকায় তন্ত্র সাধনার গান হিসাবে গানের প্রসারও কমেছে। অতীতে ধূপগুড়ি, রাজগঞ্জ, ময়নাগুড়ি (জলপাইগুড়ি জেলা) এলাকায় গানের বহুল প্রচার ছিল। অতীতে পূজা-পার্বণেও এই গানগুলি গাওয়া হত। পার্শ্ববর্তী দার্জিলিং জেলার লাহাংকারী গানের ধারা এখনও বজায় আছে। তবে প্রতিবন্ধকতা অনেক। কারণ অনুষ্ঠান বা গানের আসরের সংখ্যা কমেছে। বেসরকারি উদ্যোগে আগের মত অনুষ্ঠানের আয়োজন এখন হয়না। কারণ আগের মত পৃষ্ঠপোষকের অভাব রাজবংশী সমাজে। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় কুশমণ্ডি, তপন এলাকায় মনসামঙ্গলের আসর বসে বিভিন্ন বাড়িতে। সত্যপীরের গানের আসরও বসে, লক্ষ্মীর গানও প্রচলিত। তবে সবেতেই পরিবর্তনের ধারা। ভাষা, ভঙ্গীমায় পোষাক-আশাকের মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে। দর্শক শ্রোতারও সংখ্যাটা কমেছে। তাদের রুচিও পাল্টেছে। এটা বলা যায় ধারাগুলি হারায়নি। দিনাজপুরের জনবিন্যাস ও অন্যান্য প্রেক্ষিতে আজও এই ধারাটি রাজবংশী সমাজ ধরে রেখেছে।

বর্তমানে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ জেলায় দেশীয়া, পলিয়া কিংবা কোচদের মধ্যে এখন তেমন বিভেদ নেই। অতীতে গোষ্ঠী মানসিকতা থাকলেও বর্তমানে সবাই মেনে

নিয়েছে সমস্ত গোষ্ঠীই বৃহত্তর রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজেরই অংশ। আবার বর্ণহিন্দুদের অনেক কিছুই গ্রহণ করে নিয়েছে। সেইসঙ্গে রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখায় যে বৈচিত্র্য ও সংস্কৃতিগত বিশ্বাস এবং পালনীয় আচার-সংস্কারের মধ্যে যে ঐক্যগত সাদৃশ্য সেখানে বর্তমানে আলাদা করে ভাববার অবকাশ কমেছে। তবুও সামান্য কিছু ক্ষেত্রে বিভিন্ন গোষ্ঠী নিজস্ব আচার সংস্কারগুলি পালন করার চেষ্টা করে। কিন্তু বৈষ্ণবায়ন অনেক কিছুকেই মুছে দিয়েছে। মালদহ জেলার গাজল, হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার সবাই বৃহত্তর রাজবংশী ক্ষত্রিয় মানুষ। একলাখি পাণ্ডুয়া অঞ্চলের রাজবংশীদের মধ্যে দেহবাদী, তান্ত্রিকতার ব্যাপক প্রসার ছিল। আজকে সেই ধারা বৈষ্ণবায়নে পর্যবসিত। বিয়ের পরের দিন থেকে তুলসীর মালা গলায় ধারণ করে। আবার বিয়েতে চণ্ডী পূজার প্রচলন আজও আছে। অদ্ভুত বৈচিত্র্য, সেখানে কোন বিরোধ তৈরি হয়নি। আবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন ব্লকে পুরোহিত দিয়েই সমস্ত পূজা-অর্চনার কাজ করে রাজবংশী সমাজের দেশীয়া, পলিয়ারা। কোচ গোষ্ঠীর মধ্যে যেমন মনসামঙ্গলের প্রভাব তেমনি দেশিয়া, পলিয়াদের মধ্যেও দেখা যায়। গঙ্গারামপুর, হিলি, বালুরঘাট এলাকায় পলিয়ারাও মনসামঙ্গলের অনুসারী। আসলে বৃহত্তর রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজে বহু শাখাপ্রশাখার সম্মীলন হয়েছে যুগ ও সময়ের স্রোতধারায়। বৈষ্ণবায়ন এই কয়েকটি জেলার রাজবংশী লোকায়ত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মনস্কতা এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও অনেক উদারীকরণ ঘটেছে। স্বাভাবিকভাবে বর্ণহিন্দুদের প্রভাব বেড়েছে। রাজবংশী লোকায়ত সংস্কৃতির পরিসরটি সংকুচিত হয়েছে।

মালদহ ও দিনাজপুর (উত্তর ও দক্ষিণ) দেশীয়া ও পলিয়াদের মধ্যে নিয়ম আচার ও সংস্কারের মধ্যে একটা শিথিলতা এসেছে। ফলত: সবাই এখন বৃহত্তর রাজবংশী সমাজেরই অংশ। অনেকে উপবীত ধারণ করলেও বৈষ্ণব ভাবাবেগে এখন সবাই তুলসীর মালা ধারণ করেন বিয়ের পরেই। অতীতের অনেক কিছুই এখন বিবর্তমান। আবার বর্ণহিন্দুদের প্রভাবে অনেক কিছুই গ্রহণ বর্জনের মধ্য দিয়ে এই জেলাগুলির রাজবংশী সমাজ এখন বৃহত্তর হিন্দুধর্মের অংশ। বরং বলা যেতে পারে মালদহ জেলার রাজবংশী সমাজ অনেক বেশি গাঙ্গেয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রবাহে পরিপুষ্ট। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার রাজবংশী সমাজের লোকায়ত সংস্কৃতির পরিসরটিও স্বাভাবিকভাবে প্রভাবিত হয়েছে। সেখানে উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলির

সাংস্কৃতিক বিবর্তন কিংবা লোকায়ত অঙ্গন কোচবিহার জেলার রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত এবং আবর্তিত হয়। দার্জিলিং জেলার তন্ত্রভাবনার সংকোচন ঘটেছে। জলপাইগুড়ি জেলার প্রান্তবর্তী ময়নাগুড়ি এলাকার শৈব ভাবনার পাশাপাশি তন্ত্রসাধনা সহ বৌদ্ধিয় সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটেছে বিভিন্ন লোকায়ত দেবদেবীর মধ্যে। যেখানে ভোট-তিব্বতি প্রভাবও লক্ষণীয়। সেটা আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম ব্লকের ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য। কুমারগ্রাম দুয়ার এলাকার রাজাঠাকুর কিংবা গাও বুড়ার পূজায় এখন শূকর বলি দেওয়া হয় না। তবে নিশান, শালু কাপড় বেঁধে দিয়েই মানত পূরণ করার রীতি আজও বর্তমান।

আবার মনসা বিষহরিকে হাঁস বলি দেওয়ার প্রথাও এই এলাকায় আর বর্তমান নেই। কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ জেলায় হাঁস বলি দেওয়ার রীতি আজও প্রচলিত। অবশ্য এটা সবার মধ্যে নেই — বিশেষ করে তথাকথিত কোচ-রাজবংশীরাই এটা করে। মুখোশকে বিভিন্ন দেবদেবীর প্রতীক হিসাবে পূজার রীতি উত্তর দিনাজপুরের তপন, কুশমণ্ডি এলাকায় প্রচলিত। মুখোশ নৃত্যও অতীতে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলার ভুটান সন্নিহিত এলাকায় প্রচলিত থাকলেও বর্তমানে নেই। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে মুখোশ নৃত্যের বিভিন্ন আঙ্গিক আজও বর্তমান। আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার জেলার পূর্বাংশে কামরূপী ব্রাহ্মণের অগ্রাধিকার থাকলেও উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ জেলাতে রাজবংশীরা বর্ণহিন্দু ব্রাহ্মণ দ্বারাই সমস্ত ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করেন। বর্ণহিন্দু ব্রাহ্মণরা গৃহীত হয়েছে সম্পূর্ণভাবে। প্রান্তীয় জেলা আলিপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং জেলাতে এখন দেশীয় কামরূপী মৈথিলী ব্রাহ্মণদের অগ্রাধিকার রাজবংশী সমাজে। চণ্ডী পূজার প্রচলন উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ জেলাতে যথেষ্টই কিন্তু আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার কিংবা জলপাইগুড়ি জেলাতে কম। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন ব্লকে কোচ-রাজবংশীরা অধিকারীর বদলে পুরোহিত দিয়ে লৌকিক সেবা নৈবেদ্যর কাজ সম্পন্ন করে। তবে উল্লেখ্য প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গে যেমন কামরূপী ব্রাহ্মণের সংখ্যা কমেছে তেমনি বর্ণহিন্দুদের প্রভাব বৃদ্ধি পেলেও অধিকারী পুরোহিতরা বাড়ির সেবা নৈবেদ্যর কাজে যুক্ত। তাছাড়া রাজবংশী সমাজেও যখন লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতী পূজার প্রচলন শুরু হয়েছে স্বাভাবিকভাবে বর্ণহিন্দুদের অনুগমন ঘটেছে। তবে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহে বৈষ্ণবীয় প্রভাবে লোকায়ত সংস্কৃতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। দেশীয়দের মধ্যে

মাটির মূর্তির প্রচলন বেশি ঘটেছে। কালী, মনসা, বাস্তুদেবতা, চামুণ্ডা, লক্ষ্মী ঠাকুর, হনুমান, কোরাকুরী, হুদোম দ্যাও ইত্যাদির পূজা কয়েক দশক আগে হলেও বর্তমানে বিশেষ প্রচলিত নয়। অনেক দেবদেবী লোকান্তরের পথে। দক্ষিণ দিনাজপুরে বুড়ি ঠাকুরের পূজা গ্রামঠাকুরের পূজার মতই রাজবংশী সমাজের কাছে এখনও গুরুত্বপূর্ণ। মুখোশই দেবীর প্রতীক হিসাবে পূজিত হয়। মালদহ জেলার বামনগোলা থানার নিমডাঙ্গা, নালাগোলা, হবিরপুর থানার আতলা, দোতনা, সিঙ্গাবাদ, গাজল থানার রাণীগঞ্জ, ওল্ড মালদার বানিয়া, নবাবগঞ্জ ও কালিয়াচক থানার গোলাপগঞ্জ, সুকুনাপুর, চকবাহাদুর, চাঁচল থানার দৈভাণ্ডা ইত্যাদি অঞ্চলে রাজবংশী সম্প্রদায়ের অধিক সংখ্যায় বসবাস। অতীতে বিভিন্ন ধরনের লৌকিক সংস্কৃতি ও লোকাচারের উৎসব অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে পালিত হত। পূজা-পার্বণ, লৌকিক ছড়া, প্রথা-প্রবাদ-প্রবচন, রূপকথা এসবের মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের চালচিত্র ফুটে উঠত। এছাড়াও ছিল গম্ভীরা, আলকাপ, লবকুশ, খন বা মিশা ও গ্রামীণ যাত্রা গান। এর মাধ্যমে সামাজিক অন্যায় অবিচারের কথা, নীতিশিক্ষা ও লোকশিক্ষা প্রচারিত হত। স্বাধীনোত্তর সময়কাল থেকে এই চিরায়ত ছবি দ্রুত পালটে যেতে থাকে। গাঙ্গেয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও বর্ণহিন্দুদের প্রভাব যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে রাজবংশী সমাজ সংকটাপন্ন হয়। আচার - সংস্কার থেকে পূজা-পার্বণ সবেতেই পরিবর্তনের হাওয়া লাগে। অর্থনৈতিক দিক থেকেও পিছিয়ে পড়তে থাকে ফলে সামগ্রিকভাবে লোকায়ত সংস্কৃতির পরিসরটি সংকুচিত হয়।

দেশীয়া, পলিয়াদের মধ্যে দেশীয়াদের নিয়ম রীতি বেশি ছিল। আবার পলিয়াদের মধ্যে নিজস্ব কিছু রীতি সংস্কারে সমাজ পরিচালিত ছিলেন। পলিয়াদের মধ্যে সম্মানীয় কিছু ব্যক্তি ‘পোচাম’ এবং ‘মোহত’ নামে পরিচিত ছিল। তারা ‘দশ’ হিসাবে সমাজের রীতি ব্যবস্থা নির্ধারণ করত। আবার ১২ অথবা ১৮টি ‘পোচাম’ মিলে তৈরি হত ‘পটি’। এই ‘পটি’ পলিয়াদের সামগ্রিক ভালোমন্দের বিচার করত। প্রয়োজনে পোচামদের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পলিয়া সমাজে দিত। বর্তমানে এই ব্যবস্থা নেই, এখন পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার মাধ্যমেই সবকিছু নির্ধারিত হয়। দেশীয়া, পলিয়া সবাই এক।

দেশীয়াদের বিয়েতে আগে ‘কলাতলা’ নামে একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অনুষ্ঠান ছিল। জলপূর্ণ কলসী ও কলাগাছ দিয়ে ‘কন্যামন’ ও বরামন’ ইত্যাদি সাজানো হত। বরাতীরা (যে চারজন

সধবা স্ত্রী ও বরের পরিচর্যার দায়িত্ব থাকে) বিয়ের অন্যান্য আচার-সংস্কারগুলি পালন করত। এখন সেইসব অনুষ্ঠান অনেক সরলীকৃত হয়েছে বর্ণহিন্দুদের নানা অনুষ্ঠানের প্রভাবে। গানের বিষয়টিও এখন সংকুচিত হয়েছে। অতীতের বাল্য বিবাহের রীতিটিও এখন প্রচলিত নয়।

বৌদ্ধ, হিন্দু ও পাঠান শাসকরা গৌড়কে রাজধানী হিসাবে ব্যবহার করার ফলে বিভিন্নমুখী সংস্কৃতির ধারাপ্রবাহ গড়ে ওঠে। সুলতান আমলে বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার ঘটে। ষোড়শ শতকের গোড়ায় (১৫১৪-১৫) খ্রিস্টাব্দে চৈতন্যদেবও আসেন। স্বাভাবিকভাবে ধর্মের বহুমুখী ধারায় লোকায়ত সংস্কৃতিও বৈচিত্র্যময়। মালদহ জেলায় শিবের লৌকিক রূপের ছড়াছড়ি। তার মধ্যে গম্ভীরা অন্যতম। উর্বরতা কৃষির দেবতা হিসাবে লোকবৃত্তে শিবের অবস্থান। সেটা শুধু রাজবংশী সমাজে নয়, অন্যান্য জনগোষ্ঠীর কাছেও সমানভাবে মান্য। চৈত্র সংক্রান্তির নানাবিধ লোকাচার (গোরুর স্নান, পূজা, ছাতু সংক্রান্তি, বিশুয়া, দর্পণ সংক্রান্তি) সাথে গম্ভীরার মহা সমারোহ শুরু হয়। সোনা রায় তো শিবেরই প্রকারভেদ, সোনা রায়ের পূজা হারিয়ে যায়নি গৌড় এলাকা থেকে। এতদঞ্চলে সাঁওতালদের মধ্যেও শিবপূজা প্রচলিত। এরা মনসা পূজা করেন কচুপাতায় দুধ ও ঘি দিয়ে। মনসা বিষহরির পূজায় রাজবংশীরা হাঁস বলি দেয়। বিয়ে ও কোন শুভানুষ্ঠানের আগে মনসা পূজার রীতি রাজবংশীরা অনুসরণ করে তবে চণ্ডী পূজারও ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। অতীতে এই চণ্ডী পূজা রাজবংশীদের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত না থাকলেও বিগত কয়েক দশকে চণ্ডী পূজার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। শুধু মানিক দত্তের জন্মস্থান বলেই নয়, রাজবংশী সমাজে চণ্ডী পূজার প্রচলন বৃদ্ধি পাওয়ার পেছনে আরও কিছু কারণ আছে। তার মধ্যে জাতি অন্বেষণে কোচ মহারাজা বিশ্বসিংহের চণ্ডী পূজার বিষয়টি নিয়ে ভাবার অবকাশ আছে।

পঞ্চদশ শতকে দিনাজপুরের রাজা যদু, ইসলাম ধর্মগ্রহণ করায় রাজবংশী সমাজের একটা বৃহৎ অংশ ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হন। তা সত্ত্বেও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার রাজবংশী মানুষের বসবাস প্রায় সব গ্রামেই কম বেশি। বর্তমানে দক্ষিণ দিনাজপুরের প্রায় ত্রিশ শতাংশ গ্রামে শুধু রাজবংশী জাতি পরিচয়ের মানুষ বসবাস করেন। ধর্মান্তকরণ প্রক্রিয়া সুলতান আমলে শুরু হয়। বহু রাজবংশী মানুষ বৌদ্ধ ধর্ম থেকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হন। আবার রাজবংশী জাতির মধ্যেও বিভিন্ন জাতির আগমন ঘটে। রাজবংশী বর্তমানে হিন্দু কিন্তু সংস্কৃতির দিক থেকে মিশ্র। কেউ শৈব্য, কেউ বৈষ্ণব, জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য প্রভাব যেমন দৃশ্যমান তেমনি আদিম সংস্কৃতির

নিদর্শনও খুঁজে পায়। মৈথিলী-মাগধি সংস্কৃতিও প্রভাবিত করেছে। স্বাভাবিকভাবে লৌকিক দেবদেবীর মধ্যেও বহু সংস্কৃতির যেমন সমন্বয় ঘটেছে তেমনি প্রাকৃতিক বিভিন্ন শক্তিকে আশ্রয় করেও দেবদেবীর সংযুক্তি ঘটেছে রাজবংশী সমাজ জীবনে। শিব প্রধান দেবতা হলেও কালির বহু প্রকারভেদ বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে পূজিত হয়। যেমন - বিন্দ্যেশ্বরী দেবী (পতিরাম গ্রাম, বালুরঘাট) পূজায় লাল শাড়িই প্রধান উপাচার, হিলির চামুণ্ডা দেবী নিম কাঠে মুখায়বে পূজিত হয়। ডাকরা চণ্ডী, দাপট কালী শিব বিগ্রহের উপর মায়ের মুখোশ পড়িয়ে মাতৃ পূজা সম্পন্ন হয়। বোল্লা কালী দক্ষিণ দিনাজপুরের বহু প্রাচীন পূজা। এছাড়াও বাশুলি কালী, বসন্ত কালী, মাশান কালী, সুরকালী আরও বহুরূপে কালীর পূজা প্রচলিত। দক্ষিণ দিনাজপুরে 'বুড়িমা' খুব বিখ্যাত দেবী। তাকে ঘিরে গাছের তলায় বিভিন্ন দেবতার আশ্রয়, অনেকটা গ্রামঠাকুরের মত। হরিরামপুর থানার বৈরাটের বুড়ি অনেকগুলি জিহ্বা বের করে কালী মুখাদেবী বহালে পূজিত হয়। এছাড়াও ছাঁচিকা দেবী, বাঘেরাই চণ্ডী, চামার কালী, উত্তরে কালী, উগুলিয়া চণ্ডী বিভিন্ন নামের লৌকিক দেবদেবী নিয়েই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার লোকায়ত সংস্কৃতি বিশ্বায়নের ভুবনগ্রামে অনেক দেবদেবীর গুরুত্ব হ্রাস পেলেও এখনও কিছু গ্রামগঞ্জে অস্তিত্ব আছে। তবে পরিবর্তন ও নতুন ভাবনার প্রভাব তো পড়েছে। বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। উত্তর দিনাজপুর জেলায় দেশীয়া, পলিয়া রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজেও লৌকিক দেবদেবীর ছড়াছড়ি। লোকায়ত ভুবনে এই দেবদেবীর আচার-বিচার, সমাজ ও ধর্মীয় জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। বৃহত্তর রাজবংশী সমাজ জীবনের সঙ্গে বলা যায় অতিরিক্ত কিছু লৌকিক দেবদেবীর অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে সময় পরিবেশকে প্রাধান্য দিয়ে। যেমন - গো-চুমার সঙ্গে দাগা পূজা। মহিষকে স্নান করিয়ে মাথায় তেল সিঁদুর মাখিয়ে পূজা করার রীতি প্রচলিত। দলছিটা, কাঁঠাল পাতায় ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালানো কৃষিভিত্তিক অনুষ্ঠান আশ্বিনের শেষ কিংবা কার্তিক মাসের প্রথমে করা হয়। এই পূজা শেষে একটি হাঁসের মাথা ছিড়ে রক্ত ছিটিয়ে দেওয়া হয় ধানের গোলায়। ছেঁপুয়ান অর্থাৎ কাকতাড়ুয়াও পূজা পায় রাজবংশী সমাজের কাছে। কার্তিক মাসের অমাবস্যায় এখানে জলমাঙ্গা অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ভিন্ন এক অনুষ্ঠান হতে দেখা যায়। অতিবৃষ্টির হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার আশায় রাজবংশীরা 'হরি লাঙ্গল কোদাল খিল চুনি চোখাই' অনুষ্ঠান। অতিবৃষ্টির হাত থেকে ফসল বাঁচানোর উদ্দেশ্যে রাত্রে পুরুষেরা উলঙ্গ হয়ে লাঙ্গল, কোদাল

খিলে তেল সিঁদুর লাগিয়ে গোবরের টিপির সামনে পূজা করে। কালীপূজার রাত্রে কৃষি পূজাও অনুষ্ঠিত হয় লাঙ্গল আর কাদা দিয়ে। শিশুর সুস্থতা ও মঙ্গলার্থে হয় ভেদাই ঠাকুরের পূজা। 'মেথিনী দ্যাও'র পূজায় রান্নাঘরে বাড়ির মালিক সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে রান্না করা খাবারকে উপাচার হিসাবে উৎসর্গ করে। নবান্নে হয় মহামারী ঠাকুরের পূজা। দুয়ারী কুয়ারীও রান্নাঘরের দেবতা, দরজায় তার অবস্থান। অনেক বাড়িতে দরজায় দুয়ারী ঠাকুরের বেদীও দেখতে পাওয়া যায়। গ্রামঠাকুর, বিষহরি দেবী, সইত্যপীর, বাবাঠাকুরের পূজাগুলি এখনও কলেবরে হলেও অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীর অনেকগুলি আজকে অন্তরালে। তবে গ্রামীণ এলাকার রাজবংশীরা এখন পাল পরবে এইসব দেবদেবীকে স্মরণ করে সামান্য দুধ কলা দিয়ে কিংবা কিছু আচার সংস্কার পালন করে। লোকায়ত ভুবনের অনেক অনুষঙ্গই আজকে অনেক কিছুর গ্রাসে হারিয়ে গেলেও এখনও কিছু কিছু আছে।

মালদহ জেলাতেও বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীকে ঘিরে রাজবংশী সমাজ জীবন আবর্তিত হয়। চণ্ডী, বিষহরি, মনসা তো আছেই গম্ভীরাকে ঘিরে নীলকণ্ঠ শিবের আরাধনা মহা সমারোহে সম্পন্ন হয়। এছাড়াও কালীর কিছু প্রকারভেদ আছে। তবে মালদহ জেলায় রাজবংশী সমাজের পূজা-পার্বণ ও লোকায়ত ভুবন অনেকটাই বিক্ষিপ্ত। শুধুমাত্র গাঙ্গেয় সভ্যতা, বর্ণহিন্দু সংস্কৃতি নয় পার্শ্ববর্তী রাজ্যের প্রভাবও অনেকাংশে প্রভাবিত করেছে। ফলতঃ রাজবংশী লোকায়ত সংস্কৃতির অঙ্গনে লৌকিক দেবদেবীর পূজা-অর্চনাও অন্তর্লীন হয়েছে।

সামগ্রিকভাবে বলা যেতে পারে বিস্তীর্ণ উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের লোকায়ত সংস্কৃতির বৃত্তটি বিবর্তিত, পরিবর্তিত কিংবা সংকুচিত হলেও এখনও লোকায়ত পরিসরটি ছোট নয়। অনেক কিছুর অভাব ঘটলেও অতীতের লোকায়ত বৃত্তেই রাজবংশীরা নিজেদেরকে স্বচ্ছন্দ ও নিরাপদ মনে করেন। যার মধ্যেই লুকিয়ে আছে আদি-অনাদিকালের কৌম ভাব ও মানসিকতা।

• ধর্মীয় সংস্কৃতি

ধর্ম মানবজীবন ও গোষ্ঠীজীবনে অপরিহার্য একটি বিষয়। কারণ আচার-সংস্কার, বিশ্বাস, রীতিনীতির সবকিছুই গড়ে ওঠে ধর্মীয় বোধ ও ভাবনা থেকে। আবার ধর্মবোধ ও বিশ্বাসের বিভিন্নতার জন্য একই ভূখণ্ডে পাশাপাশি বসবাসকারী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জীবনাচারণে পার্থক্য দেখা যায়। রাজবংশী সমাজ সুদীর্ঘকাল বিভিন্ন জনজাতির সঙ্গে পাশাপাশি বসবাস এবং বর্ণহিন্দুদের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কৃতিকে আধার করে রেখেছেন। অনেক বাধা-বিপত্তি, যোগাযোগের প্রসার, শিক্ষা, আধুনিকতার মিশ্র সংস্কার, বৈদ্যুতিন মাধ্যমের গতি সমস্ত কিছুকে অধিগ্রহণ করেও নিজস্ব ঐতিহ্য ধর্ম বিশ্বাসকে অনেকাংশে ধারণ করে রেখেছেন। পরিবর্তনকে সাপেক্ষ করেও বিবর্তনের উত্তরাধিকারে নিজস্ব ধর্মাচরণের আচার সংস্কারে তাই এখনও ব্যতিক্রমী। এখনও তাই আদি জনজাতির চিহ্ন বৈশিষ্ট্য অনেকক্ষেত্রে সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়।

কোচ-রাজবংশ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সমন্বিত জাতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ। রাজ আখ্যান থেকে কথিত বিশ্বসিংহ নিজে অভিষেকের সময়ে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন এবং শিব পার্বতীর উপাসক হন। তিনি দেবী দুর্গাপূজা সম্পন্ন করে কোচ-রাজ্যে হিন্দুদের বিভিন্ন দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই সব মন্দিরে পূজার জন্য মিথিলা থেকে ব্রাহ্মণ নিয়ে আসেন।[২০] বিশ্বসিংহের পুত্র নরনারায়ণও সিংহাসনে আরোহন করেই পিতার অনুসরণে শৈবধর্মে দীক্ষা নেন। নরনারায়ণ হিন্দুধর্মের ও সংস্কৃতির উন্নতিকল্পে অহমদের সঙ্গে যুদ্ধেও অবতীর্ণ হন।[২১] বলা যায় নরনারায়ণ হিন্দুধর্ম প্রসারের গতিকে আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যান। বৃহৎ রাজবংশ তার ধর্মনীতিকে অনুসরণ করে। রাজ্যের সমস্ত অধিবাসীদের পুরাণ ও হিন্দুধর্ম শাস্ত্রাদি নির্দেশিত জাতপাতের ভাগাভাগি মেনে চলার এবং সেই নির্দেশমত নিজ নিজ কর্তব্য এবং আচরণবিধি অনুসরণ করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।[২২]

মহারাজা নরনারায়ণের রাজত্বকালে রাজ্যের উত্তরার্ধে উপজাতীয় ধর্মাচার-অনুষ্ঠান প্রধান ছিল অপরদিকে দক্ষিণার্ধে হিন্দুধর্মীয় পূজা ও আচার এত প্রসারিত ছিল যে সেখানে ব্রাহ্মণকে পুরোহিতের পদে বরণ করে নেওয়া হয়েছিল। ফলে রাজশক্তির প্রশ্রয় এবং প্রবল সমর্থন পাওয়া সত্ত্বেও কোচ রাজত্বের প্রথমাংশে উপজাতীয় অধিবাসীগণের হিন্দুকরণ (Hinduization)

প্রক্রিয়া মাত্র অর্ধপথে অগ্রসর হয়েছিল।[২৩] এদের মধ্যে যারা প্রায় সম্পূর্ণভাবে হিন্দু সামাজিক ব্যবস্থা ও আচার ব্যবহার গ্রহণ করেছিলেন, তারা কোচদের সাথে সামাজিক সম্পর্ক বজায় না রেখে নিজেদের রাজবংশী হিসাবে পরিচয় দিয়ে স্বতন্ত্র জাতিসত্তা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। মহারাজা নরনারায়ণের আমলে যারা এই রাজবংশী নাম ধারণ করেছিলেন তাদের জন্য অনেক মন্দির নির্মিত হয়েছিল এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আরও অনেক মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৪] তবে বহু মন্দির নির্মিত হলেও পূর্বে রাজবংশীদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে বাঙালি তথা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের পৌরহিত্য করার ঘটনা বিরল ছিল।[২৫] অর্থাৎ রাজবংশী সমাজে হিন্দুধর্মের প্রসার রাজানুকূল্যে ঘটানোর প্রয়াস হলেও রাজবংশী সমাজ তাদের লোকায়ত ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি নিবিষ্ট ছিলেন। হিন্দুধর্মের সার্বিক প্রসার ঘটে অনেক পরে এবং বিভিন্ন ধাপে ধাপে তা সম্পন্ন হয়। এ প্রসঙ্গে ডোম্বরু নাথের মন্তব্যটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ‘কোচবিহার রাজ্যে হিন্দুধর্মের যে প্রভাত রবি মহারাজা বিশ্বসিংহ ও মহারাজা নরনারায়ণের হাত ধরে উদিত হয় তা মধ্যগগনে আসতে বেশ সময় লাগে। রাজা এবং কতিপয় প্রজার হিন্দুধর্ম গ্রহণের মধ্যে দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সমগ্র রাজ্যে হিন্দুধর্মের সম্প্রসারণ ঘটানো সম্ভব হয়নি’[২৬] সম্প্রসারিত হয় অনেক পরে এবং বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে বিশ্বসিংহ ও তার পুত্র নরনারায়ণের সময়কালে রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু বিশ্বাস ছড়িয়ে পড়ে। বলা যেতে পারে রাজবংশীদের অনেকেই ঐ সময়কালে হিন্দুধর্মাবলম্বী হয়ে পড়েন। কিন্তু উপজাতীয় নামধাম, চাষবাস, আচার বিশ্বাস সংস্কার, রীতিনীতি ইত্যাদি ত্যাগ করেননি। ষোড়শ শতাব্দীর পর একটু একটু করে তাদের উপজাতীয় নামধাম ত্যাগ করে হিন্দুভাবাপন্ন হয়ে পড়েন।[২৭]

সামগ্রিক বিচারে বলা যায় যে তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে নিজস্ব আচার সংস্কার বিশ্বাসের পাশাপাশি প্রাচীন বৌদ্ধ প্রভাব, শৈব প্রভাব, শাক্ত প্রভাব যেমন - মনসা, চণ্ডী, শীতলা, ষষ্ঠী প্রভৃতির প্রভাব পড়েছে। এছাড়া পরবর্তীকালে বর্ণহিন্দু ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ফলে পৌরাণিক প্রভাব, বৈষ্ণব প্রভাব, গৌরাঙ্গ প্রভাবের সন্ধান পাওয়া যায়।[২৮]

আসলে প্রাচীনকাল থেকে সভ্যতার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী এই জনপদে এসে বসতি স্থাপন করেছে এবং কালক্রমে ধীরে ধীরে এক ‘মিশ্র’ জাতির উদ্ভব হয়েছে — তাই

এদের ধমনীতে কমবেশি পরিমাণে অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, মঙ্গোলীয় প্রভৃতি গোষ্ঠীর সব রক্তই প্রবাহিত। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, তান্ত্রিকতা, সুফী ধর্ম, পীর ধর্ম প্রভৃতি সকল বিশ্বাসে আস্থাবান এই জনগোষ্ঠী সারা ভারতবর্ষের মত এখানেও হয়েছে আর্যীকরণ, হিন্দুকরণ, ব্রাহ্মণীকরণ। বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠী ব্রাহ্মণীকরণের মাধ্যমে ধর্মভুক্ত হয়েছে হিন্দু ব্রাহ্মণদের প্রয়োজনে ও প্রত্যক্ষ মদতে। মুসলমান প্রভাব ঠেকাতে গিয়ে এ-ছাড়া তাদের কোন উপায়ও ছিল না।[২৯] এই সাংস্কৃতিকরণ ব্রাহ্মণীকরণ অর্থাৎ হিন্দুকরণ চলেছে ধীরে ধীরে এবং দীর্ঘদিন ধরে। যারা পার্বত্য এলাকা থেকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় এসে বসবাস শুরু করেছেন তাদের অনেকে হয়েছেন এই হিন্দুকরণের শিকার। কয়েক শতাব্দী ধরে চলে আসা এই সাংস্কৃতিকরণ পঞ্চদশ-ষোড়শ দশকে শংকরদেব, মাধবদেব, গোপালদেব, দামোদর দেব, অনিরুদ্ধ দেব প্রমুখ মহাপুরুষদের নেতৃত্বে সহজিয়া বৈষ্ণব আন্দোলনের মাধ্যমে ব্যাপক রূপ ধারণ করে, যা সমগ্র অঞ্চলের সামাজিক, সাংস্কৃতিক মঞ্চে এনে দেয় সুদূর প্রসারী পরিবর্তন।[৩০] তবে এতদঞ্চলে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধারার প্রভাব পড়ে আরও অনেক পরে। তার আগে শংকরদেবের 'একশরণ' বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব বৃহত্তর রাজবংশী সমাজের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। আরেকটি বিষয় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ে এতদঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারিত হয়েছে কিনা বলা মুশকিল কিন্তু নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবী দেবী এবং তৎপুত্র বীরভদ্রের প্রচেষ্টায় যে বঙ্গদেশের উত্তরখণ্ডে ব্যাপক বৈষ্ণব আন্দোলন আরম্ভ হয় তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।[৩১] এডওয়ার্ড গেইট বলেছেন যে, Bisu assumed the name of Bisva Singh, and his brother Sisu became Sib Singh, while many of his followers discarded their old tribal designation and called themselves Rajbansis.

Bisva Singh now became a great patron of Hinduism. He worshipped Siva and Durga, and gave gifts to the disciples of Vishnu and also to the priests and astrologers. He revived the worship of Kamakhya, rebuilt her temple on the Nilachal hill near Gauhati, and imported numerous Brahmans from Kanauj, Benares and other centres of learning.[৩২] মহারাজা নরনারায়ণের সময়কালে মহাপুরুষীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবক্তা শ্রীমন্ত শংকরদেব কোচ-রাজ্যে 'একশরণ' বৈষ্ণব

ধারার সমন্বয় ঘটান। শৈব, শাক্ত ভাবের সঙ্গে বৈষ্ণব ভাবেরও প্রসার ঘটে। অন্যদিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমশ স্থিমিত হয়ে পড়ে শংকরীয় বৈষ্ণব ধারা।[৩৩] গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় ধারায় প্রভাবিত হওয়ার সূত্র ধরে রাজবংশী সমাজের সামগ্রিক ধর্মীয় ভাবনার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। মনীষী পঞ্চানন বর্মার সংস্কার আন্দোলন, ক্ষত্রিয়ত্বের মর্যাদার স্বীকৃতি আদায় রাজবংশী আচার-সংস্কারে বর্ণহিন্দুর প্রভাব সামগ্রিকভাবে এসে পড়ে। রাজবংশী সমাজের লোকায়ত ধর্মীয় বৃত্তেরও পরিবর্তন ঘটে। পরবর্তীকালে আরও অনেক তথাকথিত ধর্মগুরুদের প্রভাব পড়তে শুরু করে এবং রাজবংশী সমাজের সামগ্রিক লোকায়ত কৌম বৈশিষ্ট্যেরও পরিবর্তন সূচিত হয়। বৈষ্ণব আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে অধিকারী সম্প্রদায়ের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। গুরু ভাবনা এবং সাধু গোঁসাইদের বৈষ্ণব ভাবের প্রসারে রাজবংশী সমাজ বিপুলভাবে অনুরক্ত হয়। সেইসঙ্গে পৌরোহিত্যের কাজের মাধ্যমে সমাজের ধর্মীয় বোধের আধার হিসাবে পরিগণিত হয় অধিকারী সম্প্রদায়। পাশাপাশি বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে স্বাধীনতার মুহূর্তে অভিবাসী বর্ণহিন্দু মানুষের আগমন রাজবংশী সমাজের ধর্মীয়বোধকে প্রভাবিত করে বইকি। রাধাকৃষ্ণের প্রভাব, কীর্তন, সন্ধ্যা আহ্নিক, তুলসী তলা, গায়ত্রী মন্ত্র, দীক্ষা নেওয়া, তুলসী মালা ধারণ ইত্যাদি বিষয়গুলি রাজবংশী সমাজে বিশেষ গুরুত্ব পেতে থাকে। বৃহত্তর রাজবংশী সমাজের ধর্মীয়বোধে বর্ণহিন্দুদের প্রভাব বিপুল বৃদ্ধি পায়। শৈব, শাক্তর পাশাপাশি বৈষ্ণব ভাবনার সাথে সাথে বৌদ্ধিয় ভাবনারও অবসান ঘটে। দেউসি-ওঝা কিংবা ভওরীয়ার প্রভাব কমতে থাকে। রাজবংশী সমাজের ধর্মীয় চেতনায় নতুন ধারার সূচনা হয়। স্বাভাবিকভাবে লোকায়ত ধর্মীয় বৃত্তের বিবর্তন শুরু হয়। বলা যায় কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি জেলার এই প্রভাব সামান্য কম হলেও মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের রাজবংশী সমাজ সম্পূর্ণভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনায় প্লাবিত হয়। এদিকে বর্ণহিন্দুদের প্রভাবে অধিকারী পুরোহিত সম্প্রদায়ের গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে। গুরুকর্তার রীতি রেওয়াজও কমে যায়। কিন্তু অন্যভাবে বর্ণহিন্দুদের প্রভাবে বৈষ্ণব ভাবনার প্রসার বাড়তে থাকে। সাত-আট দশকে রাজবংশী সমাজেও অধিকারী পুরোহিত গুরুগিরি 'কর্তা'-র সংখ্যাও কমতে থাকে। তাঁরাই একদা রাজবংশী সমাজে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনার প্রসার ঘটায়। তাঁরা দীক্ষা দিতেন তাঁদের বিভিন্ন গ্রামে শিষ্য পরিবার ছিল। বছরে একবার করে 'কর্তা'-গুরু হয়ে উপস্থিত হতেন।

ধর্ম-শাস্ত্রাদি বিষয়ে আলোচনাও। হরি সেবার ব্যবস্থা হত। বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে তাদের সংখ্যা কমতে থাকে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবধারার প্রসার ঘটতে থাকে সামগ্রিকভাবে। সীমাবদ্ধ ও পরিবর্তিত হতে থাকে লোকায়ত কৃষ্টি-আচার-সংস্কারের বিভিন্ন পর্বগুলি। রাজবংশী সমাজের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনা সম্পূর্ণভাবে বর্ণহিন্দুদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। একদা দেহতত্ত্ব, মনঃশিক্ষা গানের প্রসার, ঝোলাধারি গোঁসাই, সাধুদের সংখ্যাও কমতে থাকে। তান্ত্রিক ভাববোধের অন্তর্ধান ঘটে। আবার আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় দুর্বল হয়ে যাওয়ার ফলে বৃহত্তর রাজবংশী সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশ একপ্রকার হতাশাবোধ থেকেও এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবাসক্ত হয়ে পড়ে। তার ফলে লোকায়ত ধর্মীয় অংশটি সংকুচিত হয়। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের রাজবংশী সমাজে এই ভাবনায় সবাই বৈষ্ণব ভক্ত, মালদহ জেলার ক্ষেত্রেও তাই। সেখানে বিয়ের পরই তুলসীর মালা পড়া অনুষঙ্গ হয়ে পড়ে। জন্ম-মৃত্যু সবেতেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবের অন্তর্ভুক্তি ঘটে। লোকায়ত আচার-সংস্কার সহ লোকশিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্র, লোকনাটক, পাঁচালী, কথন, গল্প সবেতেই বৈষ্ণবীয় ভাবনার সংযোজন ঘটে। এমনকী কোচবিহার জেলায় মদনমোহনকে মাথায় রেখেও রাধাকৃষ্ণের মাহাত্ম্য, লীলাকীর্তন, পদাবলি ভাবনায় শংকরদেব নয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবভাবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। বৈষ্ণবীয় রীতি পদ্ধতিও অনুসরণ করতে সংঘবদ্ধ হয় রাজবংশী সমাজের একটা বৃহৎ অংশ। মালদহ জেলায় চৈতন্যদেবের প্রভাব সুদীর্ঘকাল ধরে রামকেলীকে ঘিরে আবহমান হয়েছে, স্বাভাবিকভাবে নিকটবর্তী উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের রাজবংশী সমাজও সমানভাবে প্রসারিত হয়। আবার কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ মহকুমা কিংবা দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমার রাজবংশী মানুষজনের মধ্যেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবভাবের প্রভাব যথেষ্টই বেশি। তুলনামূলকভাবে আলিপুরদুয়ার জেলায় কম। কিন্তু শংকরদেবের বৈষ্ণবীয় ভাবের কোন লক্ষণ আজ আর বিশেষ দৃশ্যমান হয় না। এমনকী মধুপুরধাম (কোচবিহার) এলাকাতেও নয়। যেখানে শংকরদেবের সত্র আজও বর্তমান। এখানেই বর্ণহিন্দুদের প্রভাব অনস্বীকার্য। রাজবংশী সমাজের মধ্যে এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনা প্রসারের অন্যতম কারণ অবশ্যই হতাশাবোধ। অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া, বর্ণহিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে না ওঠা এবং ক্ষত্রিয়ত্ব লাভের পর একশ্রেণির বর্ণহিন্দুদের কাছে মর্যাদা না পাওয়া ইত্যাদি কারণে সমভাবাপন্ন জাতপাতহীন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি

পায়। সেখানে খানিকটা মানসিক স্বস্তি এবং শান্তির খোঁজেও বৃহত্তর রাজবংশী সমাজের একটা বড় অংশ সামিল হয়। অনেকে তিলকধারী আদ্যোপান্ত বৈষ্ণব জীবনযাপন করছেন। বৈষ্ণবীয় রীতিনীতি সংস্কার কর্ম সম্পন্ন করছেন আর এর ফলে রাজবংশী সমাজের নিজস্ব লৌকিক পরিসরটি পরিবর্তিত হয়েছে বিক্ষিপ্তভাবে। এতদসত্ত্বেও দেখা যায় একটা প্রভেদরেখা অদৃশ্যভাবে দৃশ্যমান, সেটা কীর্তনের দলগুলোকে দেখলেই বোঝা যায়। সেখানে এখনও সূক্ষ্মভাবে সম্প্রদায়, গোষ্ঠীবোধ সক্রিয়। ফলত: রাজবংশী সমাজের মধ্যেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবভাবের নিজস্ব বৃত্ত তৈরি হচ্ছে। তবে সামগ্রিকভাবে এটা বলা যায় যে রাজবংশী সমাজের মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। কিন্তু পুরোনো হরিবাড়ির গৌরব এখন আর নেই, হরি বাড়িগুলির সামগ্রিক ছবিটা এখন বলা যায় বর্ণহিন্দুদের ধর্মীয় বোধভাবনাতেই আবর্তিত। রাজবংশী সমাজের কিছু মানুষের উদ্যোগে স্থাপিত হলেও অতীতের সেই ধর্মীয় পরিসর এখন হরিবাড়ির বাইরে। মহানাম সংকীর্তনে সেটা এখন প্রতি বছর মুখরিত হয়। সেখানে রাজবংশী সমাজও অংশীদার বর্ণহিন্দুদের অনুসারী হয়ে। অতীতে এই হরিবাড়িকে ঘিরে রাজবংশী সমাজের সামগ্রিক ধর্মীয় বৃত্তটি আবর্তিত হত। হরিমন্দিরে শিব কালী থেকে গ্রামঠাকুর ও অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীর থান ছিল। বিভিন্ন সময় পরবে এই হরিবাড়ি মুখরিত হত। নামে ছিল হরিবাড়ি কিন্তু হরিবাড়িকে ঘিরেই গ্রামের সব পরিবারের ধর্মীয় সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটত। রাজবংশী সমাজ জীবনে হরিবাড়ি, কীর্তন, তুলসী তলা সবই ছিল এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং বিভিন্ন সংস্কারের ফলশ্রুতি। রাজবংশী ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি উর্বর হয়েছে এই নবধর্ম ধারায়। হরি লুঠ, খই ছিটানো, বাঁশ পূজা, মদনকামের গান, গোরখনাথের মাগনের গান সবেতেই নাম কীর্তনের সংযোজন হয়। হরিবাড়ির গুরুত্ব অন্যভাবে বৃদ্ধি পায়। সেখানে সমস্ত পূজা পরবের বিষয়গুলিও আবর্তিত হয়।

রাজবংশী সমাজে কীর্তনের সূত্রপাত ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই। শংকরদেব বৈষ্ণবীয় ভাবনায় রাজবংশী সমাজের বৃহত্তর অংশ যখন অনুরক্ত হয়। তুলসীতলা, সন্ধ্যাপ্রদীপ, ডাকনাম সংকীর্তন ইত্যাদি রাজবংশী ধর্মীয় আচার-সংস্কারের অঙ্গীভূত হয়। কিন্তু লোকায়ত মূল সংস্কৃতি বিশেষ প্রভাবিত হয় না। কিন্তু চৈতন্যীয় প্রভাবে শ'দুয়েক বছর আগে এতদঞ্চল তথা রাজবংশী সমাজে প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে একটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। শাক্ত ভাবের

প্রভাব কমে। দেহতত্ত্ব, মনঃশিক্ষা গানের সংযোজন ঘটে। কীর্তনের শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত হয়। অধিকারী তুলসীধারী পুরোহিতরা নবদ্বীপ থেকে গান সংগ্রহ করে নিজেদের ভাষা-শব্দ ব্যবহার করে গান রচনা করতে থাকেন। ফলে রাজবংশী ভাষাতেও বহু কীর্তনের সন্ধান পাওয়া যায়। আবার বিভিন্ন পর্বের অনুষ্ঠানে সে গৃহপ্রবেশই হোক, ব্রত-তিথি পালন কিংবা শ্রাদ্ধশান্তি সবেতেই কীর্তন আবশ্যিক হয়ে ওঠে। এভাবেই রাজবংশী সমাজে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবধারার প্রসার ঘটে। পরবর্তীকালে বর্ণহিন্দুদের প্রভাবে সেটা আরও বেগবান হয়। লৌকিক দেবদেবীর প্রতি আস্থা, প্রভাব কমতে থাকে। চৈতন্যীয় প্রভাবেই অধিকারী নামক দেশীয় পুরোহিতদের প্রভাব বাড়তে থাকে। তারা নৈবেদ্য, সেবা দেওয়ার সাথে সাথে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনার প্রচারের কাজটিও সম্পন্ন করে যান। তুলসী মঞ্চ, তুলসী আসন, তুলসী সিংহাসন, গোপাল ঠাকুর ইত্যাদি কিছু বিষয় নিয়ম রীতি, মন্ত্রাদি যুক্ত হয়। অন্যান্য মন্ত্রাদিতেও এই ভাবনার অন্তর্ভুক্তি ঘটে সূক্ষ্মভাবে। সেটা অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়। বলা যায় বৈষ্ণবীয় ভাবনার সম্প্রসারণ ঘটে। সেটা লোকশিক্ষা, নীতিশিক্ষার বিভিন্ন মাধ্যম লোকনাটক, গান তথা প্রবাদ-প্রবচন থেকে বিভিন্ন ধর্মীয় গীতে, পাঁচালীতে ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামে গঞ্জে ভাষাতেও পার্থক্য তৈরি হয়। পালাগানের বিষয় বর্ণনে রাজবংশী শব্দের বদলে বাংলা শব্দের মিশ্রণ ঘটে। মান্যতাও পেতে থাকে। বর্ণহিন্দুদের প্রভাবে সেই প্রবণতা আরও বেড়ে যায়। আজকের সময়ে লোকনাটকগুলিতে যেটা রীতিমতো উল্লেখের বিষয়। গীদাল নামক মূল ব্যক্তি এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাংলাতেই ব্যাখ্যান করেন। পোষাক-আশাক, আঙ্গিক ও ভঙ্গিও পরিবর্তিত হতে থাকে। আর এভাবেই সমাজের ধর্মীয় ভাবাবেগের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ, ভাষা, ভঙ্গি এবং আচরিত রীতিনীতি বদলে যায়। ধর্মও সূক্ষ্মভাবে এই পরিবর্তনকে তরান্বিত করে। ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের অন্তর্ভুক্তির ফলে রীতি-পদ্ধতি, প্রকরণও পরিবর্তিত হয়। শুধু ধর্মীয় পরিবর্তন নয় সাংস্কৃতিক পরিবর্তনও বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। আর যেহেতু রাজবংশী সমাজের সংস্কৃতির পরিসরটি বলা যায় ধর্মীয় বৃত্তেই আবর্তিত, স্বাভাবিকভাবে তাই এই ধর্মীয় বিবর্তনের প্রক্রিয়া রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের অন্যতম একটি কারণ বটে।

ক্ষত্রিয়করণ এবং বৈষ্ণবীয় প্রভাবে রাজবংশী সমাজের লোকসাংস্কৃতিক পরিসরটি বিবর্তিত হয়। এছাড়াও আরও কিছু ধর্মগুরুর মত বিশ্বাসেও রাজবংশী পরিবারগুলির জীবনচর্যা, ধর্মীয়বোধ

ও সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটে। বৈষ্ণবায়নে যেমন বৈষ্ণবীয় কৃত্যাদি সংযুক্ত হয় তেমনি বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দের অনেকের জন্ম, মৃত্যু ও অশৌচের ক্ষেত্রে ৪০-৪২ দিনের নিয়ম রীতি পালনের পর ছয় গোঁসাই অর্থাৎ বৈষ্ণব এনে বিশুদ্ধিকরণ, কীর্তন, ভাগবত পাঠের ব্যবস্থা ইত্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। সেখানে লৌকিক আচার বিচারের কোন গুরুত্ব থাকে না। বিয়ের ক্ষেত্রে ‘কণ্ঠি বদল’ নিজস্ব ধর্ম ও লোকাচারকেও নস্যাৎ করে।

বিভিন্ন ধর্মগুরুদের ধর্মীয় বোধ ভাবনাতেও বহু রাজবংশী মানুষ যুক্ত হয়েছেন। বহু মানুষ যেমন তুলসীর মালা, কপালে তিলক ধারণ করেছেন তেমনি অনেকেই গুরুভাই, অনুকূল ঠাকুর, স্বামী স্বরূপানন্দ, বালক ব্রহ্মচারীর শিষ্য পথিক। যেকোন ধর্মাচরণ মানুষকে উন্নত করে, পরিশীলিত করে। কিন্তু যেটা উদ্বেগের বিষয় সেটা হল জনগোষ্ঠীর নিজস্ব লোকায়ত ধর্মীয়, সামাজিক, সংস্কৃতির আমূল বদল ঘটছে। বিশেষ করে অনুকূল ঠাকুরের শিষ্যদের মধ্যে এটা লক্ষণীয়। বহু রাজবংশী পরিবার অনুকূল ঠাকুরের শিষ্য হয়েছেন। জন্ম থেকে বিয়ে, মৃত্যুর পারলৌকিক ক্রিয়াদি অবধি অন্য ধারায় নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। সকাল সন্ধ্যার নিত্য কৃত্যাদির মধ্যে তারা আবদ্ধ হচ্ছেন। সামাজিকভাবেও তারা স্বাতন্ত্র্যতা বজায় রাখছেন। বালক ব্রহ্মচারীর শিষ্যদের মধ্যেও কিছু নিয়মাচার রাজবংশী পরিবার গুলির ঘরোয়া ভাবে যা ভাষা-সংস্কৃতি ও মানসিক স্তরের ক্ষেত্রে বিবর্তনকে তরান্বিত করছে। জাতি সত্তা কিংবা নৃ-গোষ্ঠীগত স্বাতন্ত্র্যের ক্ষেত্রেও যা অক্ষুণ্ণ থাকা জরুরি। সংস্কৃতির বিবর্তন স্বাভাবিক যা এক পদ্ধতির মধ্যে ঘটে, সংস্কৃতির ধর্মও তাই। রাজবংশী সমাজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আনুষঙ্গিক বিষয় ও প্রভাব ভিন্নতর এক বিবর্তনকে আহ্বান করছে।

রাজবংশী সমাজের ধর্মীয় বিবর্তন ধারাবাহিক প্রেক্ষিতে ঘটে। আদিম সংস্কৃতির ধারক বাহক হিসাবে রাজবংশী জনগোষ্ঠীও সর্বপ্রাণবাদ (animism) জড়বাদী প্রাকৃত বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিল। পরবর্তীকালে ধাপে ধাপে রাজবংশী সমাজ সংগঠনের পরিবর্তনের সাথে সাথে দেবদেবীরও সংযোজন ঘটে। অস্থায়ী জীবনবৃত্তির পরিবর্তনের সাথে সাথে স্থায়ী পরিবার, সমাজ ও কৃষি ভাবনার সম্প্রসারণ ঘটে। ব্যক্তি মালিকানা থেকে পরিবার সমাজ সংগঠন গড়ে ওঠে। রাজবংশী সমাজের অন্যতম দেবতা হয়ে ওঠে শিব। কৃষকের প্রতিভূ, জগৎ সংসারের নিয়ন্ত্রক। এই শৈব ভাবনার পরবর্তীকালে কোচ-রাজবংশের ভিত্তি স্থাপিত হয়। শৈব ভাবনার হাত ধরে হিন্দুধর্মের

পৃষ্ঠপোষকতা শুরু হয়। আদিম ঐতিহ্য জড়বাদী ভাবনা, তান্ত্রিক আচার-বিচার ও শাক্ত ভাবনারও সম্পৃক্তায়ন ঘটে। বর্ণহীন, ভেদাভেদ বর্জিত রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির কৌম চিহ্নগুলি সম্পূর্ণ মাত্রায় বজায় থাকে। এই ধর্মীয় সংস্কৃতি আধারে রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতি সুদীর্ঘকাল আধারিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি শংকরদেবের আগমন ঘটে। পরবর্তীকালে বর্ণহিন্দুদের প্রভাব পড়তে শুরু করে। ভেদাভেদ তৈরি হয়। যদিও রাজপৃষ্ঠপোষকতায় শংকরদেবের 'একশরণ' ধর্মের প্রসার ঘটলেও রাজবংশী জনজীবনের আদিম ঐতিহ্যভিত্তিক আচার সংস্কারগুলি অব্যাহত থাকে। তবে হ্যাঁ, শংকরদেবের আবির্ভাবের ফলে রাজবংশী সমাজের বৃত্তি, কৃষিভাবনার উন্নতি হয়, সম্প্রসারণ ঘটে বলা যায়, ঝুম চাষ বা পরিবর্তিত চাষের পরিবর্তন ঘটে। লাঙ্গলের ব্যবহার শুরু হয়। কৃষি প্রক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটে। ভিত যুক্ত বাড়িঘর নির্মাণের প্রচলন ঘটে। পরিবার, সমাজের ভাবনাও কার্যকরী হয়। ধর্মীয় কাঠামোয় সামান্য কিছু পরিবর্তন ঘটে। শৈব ভাবনার সাথে সাথে বৈষ্ণব ভাবনায় রীতিনীতি, আচার-বিচার, সংস্কার প্রক্রিয়ার সূচনা হয়। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনার সংস্পর্শে রাজবংশী সমাজ-সংস্কৃতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। বলা যেতে পারে শৈব ভাবনার সঙ্গে বৈষ্ণব ভাবনার সূক্ষ্ম এক বিভেদ রেখাও সূচিত হয়। যদিও রাজানুকূল্যে মদনমোহন বাড়িতে শৈব ও বৈষ্ণব ভাবনার সমন্বয় সাধনেরই চেষ্টা হয়। এই সম্পৃক্তায়নও অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ঘটানো হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণের সময়কালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনার ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে। রাজবংশী সমাজে 'হরিবোলা ঠাকুর' ডাকনামের সূচনা হয়। নবদ্বীপ থেকে শিক্ষালাভ করে অধিকারী পুরোহিতরা পূজা-অর্চনার অধিকার পায়। শিষ্যত্ব প্রদান ও গুরু সেবার মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ভাবনার প্রচার করতে থাকে। সূক্ষ্ম এক ভেদাভেদী শুদ্ধাচার, ছুঁৎ, অচ্ছুত ভাবনার অন্তর্ভুক্তি ঘটে। বর্ণভেদ, গোত্রভাগ ইত্যাদি বিষয়গুলিও গুরুত্ব পেতে থাকে। বর্ণহিন্দুদের বেশ কিছু রীতি আচার অনুকরণের প্রবণতা তৈরি হয়। ভেদাভেদ শ্রেণিবিন্যাসের বিষয়গুলি গুরুত্ব পায়। রাজবংশী সমাজের আদিম সংস্কৃতি, তন্ত্রাচার, গুহ্য সাধনার সঙ্গে সরাসরি বিরোধ তৈরি হয়। শৈব, শাক্ত ভাবনার সঙ্গে বৈষ্ণব ভাবনার সমন্বয় নয় সম্প্রসারণ ঘটতে থাকে। রাজবংশী পরিবার, সমাজ পুরোহিত নিয়ন্ত্রিত এবং গুরু শিষ্যের পরম্পরার বশবর্তী হয়। সমাজে ধর্মীয় বিষয়ে অধিকারী পুরোহিতের প্রাধান্য বাড়তে থাকে। রাজবংশী ভাষা শব্দের বদলে বর্ণহিন্দুদের ভাষা শব্দের ব্যবহার শুরু হয়। মন্ত্র পালটে যায়।

লোকসংগীতে ‘কালা’ কৃষ্ণ হয়ে উপনীত হয়। পালাগানের আসর বন্দনায় রাম, কৃষ্ণ গুরুত্ব পেতে থাকে। কুশানে রামায়ণ কাহিনি কথার, রামমঙ্গল, কৃষ্ণকথার অন্তর্ভুক্তি ঘটে। সেই হিসাবে বলা যায় কুশান গান দোতরা পালাগানের তুলনায় অনেক পরবর্তী সংযোজন। শ’দুয়েক বছর আগের সংযোজন বলা যায়। দোতরা পালাগানে যেখানে সামাজিক, ঐতিহাসিক ঘটনার পরম্পরা সেখানে কুশান সম্পূর্ণরূপে রামায়ণ ভিত্তিক হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে শংকরদেবের প্রভাব যথেষ্টই অস্তায়মান হয় এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনায় রাজবংশী সমাজের প্রায় সবাই বশবর্তী হয়। আচার-বিচার, সংস্কার, শুচি-অশুচি ইত্যাদি ভাবনায় পরিবর্তন শুরু হয়। এরকম এক সন্ধিক্ষণে রাজবংশী সমাজ পুনরায় সংস্কারের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বর্ণহিন্দুদের আধিপত্য, তাদের রীতিনীতির প্রভাব, তাদের রাজবংশী সমাজকে অবহেলা, ঘৃণার চোখে দেখা ইত্যাদি বিষয়গুলির জন্য একপ্রকার হীনমন্যতাবোধ রাজবংশী সমাজে দেখা দেয়। তথাকথিত বর্ণবাদী ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থা জাতিভেদ প্রথার বশবর্তী হয়ে বর্ণ বিভাজনে শ্রেণি বিষয়টি গুরুত্ব পেতে থাকে। পাশাপাশি কৃষি নির্ভর রাজবংশী সমাজকে বর্ণহিন্দুদের তথাকথিত উচ্চশ্রেণির শিক্ষিত উকিল, মোক্তার, বুদ্ধিজীবীরা হেয় প্রতিপন্ন করতে (নগেন্দ্রনাথ বসুর বিশ্বকোষে রাজবংশী জনগোষ্ঠীকে ‘ম্লেচ্ছ’, বর্বর হিসাবে প্রতিপন্ন করা হয়)শুরু করে। এই সময়ে জমিদার হরিমোহন খাজাঞ্চি ‘ক্ষত্রিয় জাতির উন্নতি বিধায়নী সভা’ এবং ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে রংপুরের জোতদার ও জমিদারগণ ‘ক্ষত্রিয় সমিতি’ তৈরি করেন। পঞ্চানন বর্মার নেতৃত্বে দীর্ঘ আন্দোলন সূচিত হয়। কোচ ও রাজবংশী আলাদা জাতি এবং রাজবংশী জাতি ‘ক্ষত্রিয়’ এই দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে স্বীকৃতি আদায়ের জন্য দীর্ঘ আন্দোলন সংগঠিত হয় এবং ব্রিটিশ সরকার রাজবংশী জনগোষ্ঠীকে ক্ষত্রিয় পরিচয় দিতে বাধ্য হন। পণ্ডিত মহলও রাজবংশী জাতিকে স্বতন্ত্র এবং ‘ব্রাত্য ক্ষত্রিয়’ হিসাবে সম্মতি প্রদান করেন। তারপরেই শুরু হয় সমাজ সংস্কার আন্দোলন। জাতির উন্নতি, পদবি পরিবর্তন, উপবীত ধারণ, খাদ্য বিচার, ক্ষাত্রোচিত আচরণ, নিয়ম-রীতি সংস্কার (মৃত্যু অশুচ ৩০ দিনের বদলে ১২ দিন) ইত্যাদি বিবিধ বিষয় রাজবংশী সমাজে অন্তর্ভুক্ত হয়। শুরু হয় বর্ণহিন্দুদের অনুকরণে সমাজ সংস্কৃতির সংস্কার। বলা যেতে পারে ধর্মীয় সংস্কৃতির উপাদানগুলি পরিবর্তিত হতে থাকে।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ক্ষত্রিয় সমিতির আন্দোলন, কোচ ও রাজবংশী গোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্যতার

স্বীকৃতি আদায় ও ক্ষত্রিয় হিসাবে রাজবংশী সমাজের নথিভুক্তকরণ রাজবংশী সমাজ-সংস্কৃতির পক্ষে এক চূড়ান্ত সন্ধিক্ষণ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধারার প্রসারের পর রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এই আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ক্ষত্রিয় সমিতির উদ্যোগে আচার বিধি প্রচার, শাস্ত্রীয় রীতি আচার অনুসরণ, ধর্মীয় বিষয়ে কিছু বিধিনিষেধের পাশাপাশি সামগ্রিক উন্নয়নের বার্তা দেওয়া হয়। বলা যেতে পারে এর ফলে বর্ণহিন্দুদের আচার-সংস্কার রীতিনীতির অনুগ্রহণ প্রবণতা বৃদ্ধি পায় রাজবংশী সমাজে। একটা বৃহৎ অংশ বর্ণহিন্দুদের অনুকরণের বশবর্তী হয়। আবার একটা অবস্থাপন্ন অংশ শহরবাসী হয়ে গ্রাম সমাজ বিমুখ হয়ে ওঠে। আরেকটি অংশ প্রতিযোগিতার ভাগীদার হয়ে ব্যবসা, চাকুরি ও বিভিন্ন পেশায় যুক্ত হয়ে সংস্কৃতি বিমুখ হয়ে পড়ে। স্বাধীনোত্তর পরবর্তীকালে জমিদারি উচ্ছেদ আইন ও ভূমি সংস্কার আইনের ফলে এই প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। কারণ অনেকে জমি হারিয়ে প্রান্তিক হয়ে পড়ে। একটা বড় অংশ কৃষি থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্যান্য পেশায় ছড়িয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে একটা শ্রেণি তৈরি হয় যারা মধ্যবিত্ত সমাজ হিসাবে নিজেদের প্রতিপন্ন করে তারাও সংস্কৃতিগত দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। গ্রাম সমাজ পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে জীর্ণ হতে থাকে। গান বাজনা থেকে পাল পরবের বিষয়গুলি সংকুচিত হতে থাকে। রাজবংশী সমাজের সংস্কৃতি যেহেতু বৃত্তি পেশা কৃষিকে ঘিরে এবং পৃষ্ঠপোষকতা নির্ভর আচারগত, সংস্কারগত পূজা-অর্চনা, পাল-পরবকে ঘিরে শুধু ধর্মীয় নয় সামগ্রিক সংস্কৃতির বিষয়টি সম্পৃক্ত থাকায় সাংস্কৃতিক বলয়টি ছিন্ন ভিন্ন হয়। অনেককিছুই লুপ্তপ্রায় হতে থাকে। কিছু হারিয়ে যায়। আবার ভৌগোলিক যোগাযোগ, শিক্ষা, প্রযুক্তি সর্বোপরি মননভাবনার পরিবর্তনেরও রাজবংশী সমাজের লোকায়ত সংস্কৃতির পরিসরটি সংকীর্ণ হতে থাকে। তদুপরি বিনোদনের উপকরণ টিভি, সিনেমা সহ আকাশ সংস্কৃতির প্রভাবে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিবর্তন অপেক্ষা সংকটাপন্ন হয় বলা যায়। এটা ঠিক ক্ষত্রিয়করণ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে রাজবংশী সমাজের একটা বৃহৎ অংশের মধ্যে বর্ণহিন্দুদের সমাজ সংস্কৃতি ধর্মের প্রতি অনুকরণাত্মক ঝোঁকটাই মুখ্য হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি উদাসীনতা এমনকী হীনমন্যতাবোধের বিষয়টিও কার্যকরী হয়। ফলে সাংস্কৃতিক বিবর্তন নয় বলা যেতে পারে সাংস্কৃতিক সংকট। ইতিমধ্যে বর্তমান প্রজন্মের একটা বড় সংখ্যায় যুবক-যুবতী কাজের সন্ধানে ভিন দেশে পাড়ি দেওয়ার ফলে সাংস্কৃতিক সংকট তরান্বিত হয়েছে। জাতিসত্তা, আত্মউন্মোচন, আত্মঅধিকার

প্রতিষ্ঠার মতো স্পর্শকাতর বিষয়গুলির পাশাপাশি ভিন্ন এক সাংস্কৃতিক সংকটের জন্ম হয়। যে ক্ষত্রিয়করণ আন্দোলন রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক বলিষ্ঠ নবতম ধারার সূচনা ঘটাতে পারত সেখানে রাজবংশী সমাজ সুসংগঠিত হলেও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বলা যায় অনেকটাই সংকটাপন্ন হয়। অথচ মনীষী পঞ্চানন বর্মার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল জাতিসত্তার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নিজস্ব সমাজ, ঐতিহ্য, ভাষা, সংস্কৃতি তথা ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করা। সেই জায়গাটায় বিশেষ করে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রটিকে যথাযথ বিবর্তনের ধারায় সমৃদ্ধ করা যায়নি। স্বাভাবিকভাবে সমীক্ষণ ও বিশ্লেষণে সাংস্কৃতিক বিবর্তন অপেক্ষা সাংস্কৃতিক সংকটের বিষয়টি উঠে আসে। বিশেষ করে এটা উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। অন্যান্য প্রদেশে প্রাদেশিক চাপ ও প্রভাব বিভিন্ন ভাবে কার্যকরী কিন্তু উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে বিবর্তন অপেক্ষা সংকটই মুখ্যত লক্ষমান। আবার কোচবিহার জেলাকে রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির পৃষ্ঠভূমি হিসাবে যেহেতু ধরা হয় স্বাভাবিকভাবে কোচবিহার জেলাতেই সামগ্রিকভাবে এই পরিবর্তন বেশি ঘটেছে বলা যায়। অন্যান্য জেলাগুলিতেও এই পরিবর্তন ঘটেছে যা অপেক্ষাকৃত কম হলেও উল্লেখযোগ্য। তা সত্ত্বেও কোচবিহার জেলাকে এখনও সামগ্রিকভাবে রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতি তথা ভাওয়াইয়া সমাজ সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি বলা যায়। কিন্তু অন্যান্য জেলাগুলিতে এখনও ভাওয়াইয়া সংস্কৃতির অনেক উপাদানই অক্ষত অবস্থায় বর্তমান। সাংস্কৃতিক বিবর্তনের অঙ্গ হিসাবে অনেক গ্রহণ বর্জনের মধ্য দিয়েও রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির এই বহমানতাই নৃতত্ত্বের বিচারে উল্লেখযোগ্য। আর এখানেই প্রমাণ হয় রাজবংশী জনগোষ্ঠী একটি স্বতন্ত্র কৌম জনগোষ্ঠী এবং এক ধারাবাহিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে নিজস্ব গোষ্ঠী পরিচয়ের অনেক কিছুকে বহন করে চলেছে। যাকে আমরা সাংস্কৃতিক বিবর্তনের অনুষঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করতেই পারি।

• সাহিত্যে সংস্কৃতির বিবর্তন

সাহিত্যে রাজবংশী সমাজ-সংস্কৃতির উপাদান ও বিবর্তনের পর্যায়গুলিও ধরা পড়েছে। সেটা যেমন রাজবংশী সমাজের বিস্তৃত মৌখিক সাহিত্যে (oral literature) তেমনি বাংলা সাহিত্যের কাব্য, আখ্যান ও গল্পেও। পরবর্তীকালে রাজবংশী ভাষায় সাহিত্য-সৃজনে সমাজ, সংস্কৃতি, মনন ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। সর্বোপরি সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক উপর্যুপরি রাজনৈতিক ক্ষমতা পরিবর্তনের ছবিও আমরা পেয়ে যাই। রাজবংশী সমাজের লোকসাহিত্য অর্থাৎ মৌখিক সাহিত্যের ভাণ্ডারটি সুবিস্তৃত। আদি কৌম চিহ্ন যেমন বিভিন্ন উপাদানে ছিটিয়ে ছড়িয়ে আছে তেমনি তা সমৃদ্ধ সুদৃঢ় সমাজ কাঠামোর ইঙ্গিত দেয়। প্রবাদ-প্রবচন একটি জাতি-গোষ্ঠীর সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার সঞ্জাত ফসল। এরকম অজস্র প্রবাদ-প্রবচন রাজবংশী সমাজ জীবনের অনুষঙ্গে প্রতিনিয়ত উচ্চারিত হয়। কথায় কথায় শ্লোক-প্রবাদ উচ্চারণ প্রবীণ-প্রবীণাদের মধ্যে এখনও দেখা যায়। উপমা-ব্যঞ্জনাময় কথার মধ্যে জীবনরসেরও সন্ধান পাওয়া যায়। সহজ সরল প্রকৃতি নিবিড়তায় সম্পৃক্ত জীবনযাপনের ছবিই ধরা পড়ে লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানগুলিতে। সেটা ভাওয়াইয়া সঙ্গীতে যেমন তেমনি পূজা-পার্বণকেন্দ্রিক গান কিংবা আমোদপ্রমোদের গানেও। ভাওয়াইয়া সঙ্গীতের সম্ভারে রাজবংশী সমাজ জীবনের আদ্যপান্ত বিষয়গুলি নির্মলভাবে ধরা পড়েছে। সেইসঙ্গে সমাজ, অর্থনীতি, জীবন-জীবিকার যাবতীয় বিষয়গুলি গানের কথাভাষ্যেই প্রতিফলিত হয়েছে। বস্তুত রাজবংশী লোকসাহিত্যের উপাদানগুলির মধ্য দিয়েই এই জনগোষ্ঠীর জীবনচর্যা, উত্তরণ, সমাজ-সংগঠন, মননদর্শন, চাওয়া-পাওয়া, জীবন আভাস, ধর্ম, পরিসর, অভিব্যক্তি সবই ধরা পড়েছে। এই লোকসাহিত্যের উপাদানের মধ্যেই রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক পরিচয় ও জাতিসত্তার বিষয়গুলি আবদ্ধ হয়েছে যুগ যুগান্তের ধারাবাহিক প্রবহমানতায়। তার সঙ্গে গ্রন্থিত হয়েছে বিবর্তনের প্রক্রিয়াগুলিও।

রাজবংশী সমাজের লোকসাহিত্যের উপাদানগুলি সুদীর্ঘকাল মৌখিক সাহিত্য হিসাবে মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। কোচ-মহারাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় কোচ রাজ্যে সাহিত্যচর্চার ধারাটি প্রথমাবধি সমৃদ্ধ থাকলেও মূলত পুরাণ-শাস্ত্রাদির অনুবাদ কর্মই সম্পাদিত হয়। তুলনায় মৌলিক রচনার পরিসরটি যথেষ্ট সীমাবদ্ধ ছিল। তার মধ্যেই হরেন্দ্রনারায়ণের সময়কালে (১৭৮৩-১৮৩৯ খ্রি:) দু'একজন প্রতিভাধর লোককবি তাঁদের সৃজনকর্ম নীরবে নিভৃতে সম্পন্ন করেন। এ'রকমই

একজন কবি রাঁধাকৃষ্ণদাস বৈরাগী, তিনি মঙ্গলকাব্যের অনুকরণে গোসানীদেবীর প্রচলিত আখ্যানকে ভিত্তি করে রচনা করেন 'গোসানীমঙ্গল' কাব্য, সময়কাল আনুমানিক ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দ। এই গোসানীমঙ্গল কাব্যে ধরা পড়েছে খেন বংশীয় রাজা নীলধ্বজ, চক্রধ্বজ, নীলাম্বরের কাহিনি সহ তৎকালীন সময়কালের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিভিন্ন চিত্র। 'গোসানীমঙ্গল' কাব্যটিকে ইতিহাসের উপাদান হিসাবে সর্বার্থে গুরুত্ব না দেওয়া গেলেও এই কাব্যের মধ্যে তৎকালীন অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থার চিত্র যেমন পাওয়া যায় তেমনি সে সময়কার গৃহনির্মাণের প্রকার পদ্ধতি, আনুষঙ্গিক অস্ত্রশস্ত্রাদি, বাস্তুভাবনার ছবিও প্রতিফলিত হয়েছে। বন কেটে বসতিস্থাপন, হাট, বাজার-নগর-বন্দর পত্তন সেইসঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের কথাও জানা যায়। আবার সামাজিক বিন্যাস, ভয়-ভীতি, দুঃখ-কষ্টের কথা, জীবনচর্যার বিষয়াদি সবই কাব্যের কাহিনিতে স্থান পেয়েছে। শিকারের কথা, জ্যোতিষশাস্ত্রের কথা, ভগবান তথা দেবতার প্রতি আস্থার কথা, ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাস কোন কিছুই বাদ যায়নি। ওজা-কবিরাজের প্রভাব, তাদের রোগ সারানোর পদ্ধতি, তন্ত্রমন্ত্রের প্রভাব ইত্যাদি বিষয়গুলি তৎকালীন সমাজজীবনের অবস্থা ও অবস্থানকে চিহ্নিত করে। নারীর গর্ভধারণের বিষয় ও গর্ভধারাণীর সময় পর্যায়গুলি অঙ্গনার গর্ভে কান্তেশ্বরের জন্মবৃত্তান্তে বর্ণনা করতে গিয়ে তৎকালীন গ্রামবাংলার সমাজচিত্রই তুলে ধরেছেন কবি রাঁধাকৃষ্ণদাস বৈরাগী। পোষাক-আশাক (বুক বান্ধানা, আগরণ, ফোতা) থেকে স্বর্ণালংকারের (নূপুর, মতিহার, টোপর) বর্ণনাও তিনি করেছেন। বাঁশের চোঙ, থুরি, মাটির তৈরি হাড়ি, কলসি, ঘটি ইত্যাদির উত্থাপন করে রাজবংশী সমাজজীবনের সামগ্রিক চিত্রটিকে তিনি স্পষ্ট করেছেন। খাদ্যাভ্যাসে তিনি যেমন বিভিন্ন খাবারের (শুকটা, সিদল) উল্লেখ করেছেন তেমনি রাজবংশী সমাজে দই-এর বাহুল্য, ক্ষার ব্যবহার, মজাগুয়া খাওয়া ইত্যাদিও বাদ দেননি। ছেলেধরার বিষয়টিকে উল্লেখ করে তৎকালীন সময়ে 'নরবলি' দেওয়ার প্রথাটি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সর্বোপরি ধর্মীয় গোঁড়ামি, কুসংস্কার, প্রথা বিষয়গুলি প্রকারান্তরে উত্থাপন করেছেন। বাদ দেননি তৎকালীন সময়ে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র এমনকী লোকক্রীড়াগুলির নাম উল্লেখ করতেও। স্বাভাবিকভাবে এই কাব্যের ব্যাখ্যান থেকে তৎকালীন সময়ে রাজবংশী সমাজের জীবনযাত্রা তথা সমাজ জীবনের বিস্তৃত বিবরণ পেয়ে যাই। যা পরবর্তীকালের সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার ক্ষমতা রাখে। ঊনবিংশ শতাব্দীর রাজবংশী

সমাজ জীবনের অন্যতম দলিল হিসাবে এই কাব্যটিকে আমরা বিবেচনা করতে পারি কারণ ইতিহাসগতভাবে কান্তেশ্বর জন্মবৃত্তান্তকে সত্যাসত্যের বিচার বিবেচনায় রাখলেও সমাজ জীবনের ছবির ক্ষেত্রে প্রশ্নের কোন অবকাশ নেই যা রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের সমীক্ষণ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি এবং অন্যতম লিখিত উপাদান।

'গোসানীমঙ্গল' কাব্যে খেন বংশের রাজা কান্তেশ্বরের জন্মবৃত্তান্ত, তার খেন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা এবং নীলাম্বরের আমলে সেই বংশের অবসান ইত্যাদি বিষয়গুলি লৌকিক ও অলৌকিক কাহিনির বিন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। কাব্যের আরাধ্য দেবী গোসানী অর্থাৎ চণ্ডী। গোসানীমঙ্গল একটি স্বতন্ত্র মঙ্গলকাব্য হিসাবে স্বীকৃত। প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ে ভীত ও শাসন-শোষণে সন্ত্রস্ত জাতি অত্যাচারের বিপদের হাত থেকে মুক্তি পাবার আশায় বিভিন্ন দেবদেবীর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে। এর ফলে লৌকিক দেব দেবীরা মেয়েলি ব্রতকথার জগৎ ছেড়ে মঙ্গলকাব্যের দেব দেবীতে পরিণত হয়। রাষ্ট্র বিপ্লব, দুঃখ-কষ্ট, সংকট থেকে মুক্তি পেতে নতুন দেবভাবনার সৃষ্টি হয় — এই দৃষ্টিকোণ থেকে গোসানীমঙ্গলের দেবী গোসানীকে চণ্ডীর নতুন রূপ হিসাবে কবির কল্পনায় ধরা পড়েছে। সময় প্রেক্ষিত বিচারে মঙ্গলকাব্য রচনার চিহ্নিত সময়কাল (ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শকত অবধি) উত্তীর্ণ হলেও অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে কিংবা উনিশ শতকে কোচ রাজ্যের অবস্থার প্রেক্ষিতে এই কাব্যের রচনা ধরা যেতে পারে। রাজা কান্তেশ্বরের আবির্ভাবের পূর্বে কামতাপুর তথা কোচবিহার রাজ্যের জীবনযাত্রা এবং রাষ্ট্রিয় অবস্থা পর্যালোচনায় বিষয়টি পরিষ্কার হয়। এই ব্যাখ্যানই তাঁর রচনায় ধরা পড়েছে —

... ...

"বেহারে নাহিক রাজা ব্যাকুল হইল প্রজা
অরাজক কত কাল।।
হইল আকাশ বাণী, পূজা কর মা ভবানী,
পূন্য হবে রাজ্যের ঈশ্বর।।
গোসানী করহ পূজা, সুখে রবে যত প্রজা,
রাজা হবে কান্তেশ্বর।।"

এই উক্তি সে সময়কালের জনজীবনের ধর্মীয় ভাব-অনুভবকে স্পষ্ট করে। হিন্দু ধর্মীয় সংস্কৃতির

অনুসরণে গোসানী অর্থাৎ চণ্ডীর প্রাধান্য ঘোষিত হয়েছে। গোসানী দেবী এখানে অন্য মঙ্গলকাব্যের দেবীর মত নন। প্রকৃতপক্ষে মঙ্গলকাব্য রচনার সাধারণ রীতি অনুসরণ করে রাঁধাকৃষ্ণদাস বৈরাগী ‘গোসানীমঙ্গল’ কাব্যটি রচনা করেছেন। রাঁধাকৃষ্ণদাস বৈরাগী নামের মধ্যেই ধরা পড়েছে সে সময় বৈষ্ণব ধর্মের যথেষ্ট সম্প্রসারণ ঘটেছে এই এলাকায় এবং সেটা শংকরদেবের ‘একশরণ’ বৈষ্ণব ভাবনা নয় সেটা গৌড়িয় বৈষ্ণব ভাবের। সে সময় এইসব অঞ্চলে বৈরাগী উপাধি ধারণ করে অনেক বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী গ্রামে গঞ্জে ঘুরে ঘুরে গান করে বেড়াতেন অনেকটা রংপুরের নাথ যোগী বা যুগীদের মত। তাঁরাও লৌকিক-অলৌকিক কাহিনি গেয়ে ধর্মেরই প্রচার করতেন। এই বৈরাগী সম্প্রদায়রা তখন ছিলেন ভ্রাম্যমান লোককাহিনির ধারক ও বাহক। তাঁদের মাধ্যমেই সমসাময়িক ঘটনা গ্রাম-গঞ্জে প্রচার পেত। লোকশিক্ষার পাশাপাশি লোক সাংবাদিকতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তাঁরা পালন করতেন। আরেকটি বিষয় খেন রাজারা কামতেশ্বর উপাধি গ্রহণ করেন। এই ‘কামতেশ্বর’ উপাধির সঙ্গেই যুক্ত হয়ে আছে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব। কামতেশ্বর শব্দটি এসেছে কামদেশ্বর শব্দ থেকে এবং কামদেশ্বর সংক্ষিপ্ত হয়ে দাঁড়ায় কামতেশ্বর বা কান্তেশ্বর। কালিকাপুরাণ মতে কামদা হল ‘মা কামাখ্যা’। মাতৃকা দেবী পৃথিবীর আদিমতম প্রতীক যোনী। কালিকাপুরাণে এই অঞ্চলে যে নয়টি যোনী পীঠের উল্লেখ আছে সিদ্ধপাঠ বা সিদ্ধেশ্বরী এবং কামপীঠ বা কামতেশ্বরী তার মধ্যে অন্যতম। বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে তান্ত্রিকধর্মের প্রভাব অপসৃত হয়ে কামতেশ্বরী হয়ে ওঠেন কামতাপুরের গোসাঞী দেবী-গোসানী দেবী-দেবী চণ্ডিকা।

রাজবংশী সমাজে বৌদ্ধিয় প্রভাব অতীতে যথেষ্টই ছিল। তন্ত্রমন্ত্র থেকে তন্ত্র সাধনার কিছু বিষয়ও রাজবংশী সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়। অনেক দেবদেবী ও মন্ত্রেরও সংযোজন ঘটে। বৌদ্ধিয় প্রভাবের চিহ্ন আজও কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়। যেমন - জল্পেশ, বাণেশ্বরের শিব বৌদ্ধিয় মহাকাল আবার মদনমোহন মন্দিরের কালী বৌদ্ধিয় চামুণ্ডা কালী। এই চামুণ্ডা কালীকেই বৌদ্ধতন্ত্রে উগ্রতারা বলা হয়। অনেক প্রথা রীতি রাজবংশী সমাজ আজও অনুসরণ করে। মাতৃকা দেবীর প্রভাব রাজবংশী সমাজে আজও বিদ্যমান। মা কামাখ্যা দেবী তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বসুধা বা মেথিনী (মেদিনী) দেবীর পূজাও রাজবংশী সমাজে প্রচলিত। সামগ্রিকভাবে ‘গোসানীমঙ্গল’ কাব্যে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির বিষয়াদি শুধু নয় ধর্মীয় ভাবনার বিষয়গুলিও আমরা পেয়ে যাই।

মৌলিক রচনার পরিসরে আমরা পেয়ে যাই আরেক লোক কবি রংপুর জেলার ইটাকুমারী

গ্রাম নিবাসী রতিরাম দাসের নাম। তিনি রচনা করেন জাগ গান। যা কানাই ধামালী বা কৃষ্ণ ধামালী হিসাবে সমধিক পরিচিত। কবি রতিরাম দাসের রচিত জাগ গান সংগ্রহ ও সংকলিত করে যাদবেশ্বর তর্করত্ন 'রঙ্গপুরের জাগ গান' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। টীকা যোগ করে রাজবংশী সমাজের নবজাগরণের প্রধান পঞ্চানন সরকার (বর্মা) রংপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশ করেন ১৩১৫ বঙ্গাব্দের দ্বিতীয় সংখ্যায় (১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ)। যাদবেশ্বর তর্করত্ন যিনি তথাকথিত 'অশ্লীলতা দুষ্ট' এই গান ও পালাগুলিকে লোক সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ হিসাবে গণ্য করেছিলেন এবং সংগ্রহ করতে দ্বিধা করেননি। পঞ্চানন বর্মা যিনি টীকা যোগ করে এই গানগুলির সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ঐতিহাসিক প্রতিবেশকে স্পষ্ট করে তুলেছিলেন।

জাগ গান বস্তুত জাগরণের গান, রাজবংশী সমাজের বাঁশ পূজার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এটি মূলত ধর্মাচারের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও সমস্ত ব্যাপারটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে আর্থ-সামাজিক কিছু অনুষঙ্গ। মদনকাম পূজার সূত্রেই জাগ গানের প্রচলন। মদনকাম বা প্রেমের উপাসনা হিসাবে এই পূজা গৃহীত হলেও অনুষ্ঠানটি আসলে অতিপ্রাচীন ধর্মীয় সংস্কারের বিবর্তিত রূপ ব্যতীত কিছু নয়।

রাজবংশী জনগোষ্ঠী ইন্দো-মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর একটি শাখা। আদিম ধর্মবিশ্বাসে মূলত সর্বপ্রাণবাদে (animism) বিশ্বাসী। তাই বৃক্ষপূজার সঙ্গে নদী, পাহাড়-পর্বতকেও দেবতাজ্ঞানে পূজা করে। মাটির ঢিপি কিংবা পাথরই দেবতার প্রতিভূ হয়ে ওঠে। মদনকামের অনুষ্ঠানে মূলত বাঁশের প্রতীকে পূজা করা হয়, বাঁশ এখানে মদনকামের প্রতীক। এই বাঁশ পূজার মাধ্যমে আদিম বৃক্ষপাসনা, যৌন প্রতীক অর্চনা, অশুভ অলৌকিক শক্তিকে প্রতিরোধ করা এবং রোগ-ব্যাধি দূর করা ইত্যাদি বিশ্বাস সংস্কারগুলির প্রচ্ছায়া নিহিত আছে। তাছাড়া ইন্দো-মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠী প্রথমত বাঁশের ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তাই তাদের জীবনচর্যার সঙ্গে বাঁশ শুধু অন্বিত নয় ধর্ম বিশ্বাস ও আচার-সংস্কারের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। মদনকামের পূজা উর্বরাতন্ত্রের প্রতীক। বাঁশকে পুরুষ চিহ্নের প্রতীকে রাজবংশী সমাজের মদনকামের পূজা বিষয়টি সম্পূর্ণ আদিম সংস্কৃতির একটি দৃষ্টান্ত বটে। রাজবংশী সমাজে বাঁশ পূজার মাধ্যমে উর্বরতা ও সৃষ্টি সংশ্লিষ্ট বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যা আদিম কৌম সংস্কৃতির পরিচায়ক। যেমন সানি ঢাকের গানে উর্বরতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বস্তুত অতীতের প্রতিকূল পরিবেশে বংশবৃদ্ধির বিষয়টিকে

গুরুত্ব দেওয়া হত গোষ্ঠীবদ্ধতার শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। যা উর্বরতা সংস্কৃতির (Fertility Culture) পরিচায়ক। রাজবংশী সমাজে বাঁশ গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সম্পদ কারণ বাঁশ দৈনন্দিন জীবনজীবিকার সর্বক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হত। সেটা বাড়িঘর থেকে কৃষিকার্য, ব্যবহার্য দ্রব্যাদি থেকে শিকারের যন্ত্রপাতি সবেতেই বাঁশের ব্যবহার। তাই প্রতীক রূপ বাদ দিয়ে ব্যবহারিক বিচারে বাঁশের গুরুত্ব ছিল অত্যধিক। স্বাভাবিকভাবে বাঁশ দেবতার প্রতীক হিসাবে রাজবংশী সমাজে গৃহীত হয়েছে। বাঁশকে ঘিরে বিভিন্ন সংস্কারও রাজবংশী সমাজে প্রচলিত। অমাবস্যা-পূর্ণিমার দিনে কিংবা বৃহস্পতিবার বাঁশ কাটা যেমন নিষেধ তেমনি চৈত্র সংক্রান্তির দিন বাঁশের গোড়ার মাটি দেবার নিয়মও রাজবংশী সমাজে প্রচলিত। প্রকৃতি ভাবনারও প্রতীক। আবার বাস্তুশাস্ত্রের সঙ্গেও অন্বিত। "পুবে হাঁস পশ্চিমে বাঁশ/উত্তরে গুয়া দক্ষিণে ধুয়া" অর্থাৎ পশ্চিমে বাঁশ বাগান থাকবে যাতে পশ্চিমী ঝড়কে প্রতিহত করে। জাগ গানের বিষয়ে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা সম্পৃক্ত হয়েছে মানবিক জায়গা থেকে। স্বাভাবিকভাবে দৈনন্দিন জীবনের বিষয় ভাবনা অন্বিত হয়েছে। রাধাকৃষ্ণ এখানে দেবদেবী নয়, মাটির মানুষ — গ্রাম্য যুবক-যুবতী। তাই কৃষ্ণ বড়শিতে মাছ ধরে ও রাধা শাক তোলে। রাজবংশী সমাজের ভাওয়াইয়া গানে তারই প্রভাব, গানের কানাই, কানু, কালার মধ্যে দেবত্বের চেয়ে মানব গুণের প্রকাশ। লক্ষণীয় বিষয় জাগ গানে শংকরীয় বৈষ্ণব ভাব নয় শ্রীচৈতন্যীয় বৈষ্ণব ভাবনারই প্রকাশ ঘটেছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে অবলম্বন করেই মদনকামের গানগুলি রচিত হয়েছে এবং গানে উর্বরতা ভাবনাই প্রাধান্য পেয়েছে। অন্যান্য দেবীর মত মদনকামের কাছেও তাই আর্তি ধ্বনিত হয়েছে —

> "ওরে নারীটার নাই ছাইলা, হায়রে নারীটা যদি মনচেৎ করিয়া ধরে,
> হায়রে আটকুড়া নাম ঘুচিয়া যাইবে মদনকামের বরে।"[৩৪]

জাগ গানে রাস পর্বে তৎকালীন সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রীয় অবস্থার ছবিও ধরা পড়েছে। প্রতিবাদের ভাষাও উচ্চারিত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে এই কাব্যগানের মধ্যে থেকে একটা সময়ের সমাজ ও সংস্কৃতির আভাস পাই। রাজবংশী সমাজের দৈনন্দিন ভাব-বিভাব সহ ভাষা-শব্দ পেয়ে যাই। নিজের পরিচয় প্রদানের সাথে তিনি রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির পরিচয়, উপবীত ধারণ, পুরাণ-শাস্ত্রাদি ইত্যাদির বিষয়গুলিকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। নিজের জাতি ও দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা বর্ণনে তিনি গ্রামের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থার নিপুণ

ছবি এঁকেছেন। ইংরেজ সরকার নিযুক্ত ইজারাদার দেবীসিংহের অত্যাচার, জমিদার শিবচন্দ্রের প্রজা বাৎসল্য ও দেবীসিংহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, কারাবরণ ইত্যাদি বিষয়গুলিও তুলে ধরেছেন।

পেশা বৃত্তির বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের কথা, বামুন, কায়েত, ধোপা, নাপিত, কুমোর, কামার, কৃষক, শ্রমিক, গোয়ালা, তাঁতি প্রভৃতি সকলকে নিয়ে গ্রামগুলির পারস্পরিক আত্মনির্ভরতার খবর দিয়েছেন। রাজবংশী, মুসলমানদের জমিদারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনাও দিয়েছেন। মূলত কবি রতিরাম দাস তাঁর জাগ গানে কামরূপ, পৌণ্ড্রবর্ধন, কামতাপুর, কোচবিহার রাজ্যের অর্থাৎ ইংরেজ রাজত্বের পূর্ব পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের ইতিহাস ও সেখানকার প্রধান জনগোষ্ঠী রাজবংশীদের ইতিহাসের সূত্র ধরিয়ে দিয়েছেন। কবি রতিরাম দাস ১৭৮১-৮২ খ্রিষ্টাব্দে রংপুরের ইজারাদার দেবীসিংহের খাজনা আদায়ে নির্মম অত্যাচারে প্রজা-কৃষককূলের নিদারুণ অবস্থার নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন

কোম্পানীর আমলেতে রাজা দেবীসিং।
সে সময়ের মুল্লকেতে হৈল বার ঢিং।।
কত যে খাজনা পাইবে তার নেকা নাই।
যত পারে তত নেয় আরো বলে চাই।।
দেও দেও চাই চাই এই মাত্র গেল।
মাইরের চোটেতে উঠে ক্রন্দনের রোল।।[৩৫]

১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সরকারের খাজনার হাত অত্যধিক বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে প্রজাকূলের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে ওঠে। ফতেপুরের জমিদার শিবচন্দ্র ও জমিদার জয় দুর্গা চৌধুরানী এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজাকূলকে সংঘবদ্ধ করে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। প্রজাকূল সাধারণ অস্ত্র, কৃষিকার্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। রংপুরের এই প্রজা বিদ্রোহ প্রথম বৃহত্তম কৃষক আন্দোলন এবং এই আন্দোলনই পরবর্তীকালে ইংরেজ সরকারের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভিত হিসাবে কাজ করে। রতিরাম দাসের ‘জাগ গান’ নিছক কাম উদ্দীপনার গান নয় যথার্থই জাগরণের গান। তাই এই গানের ছত্রে ছত্রে ইতিহাস, ভূগোল, সময়কালের অবস্থান বর্ণিত হয়েছে নিখুঁত ভাবে। বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সমাজ জীবন, ধর্মীয় সংস্কৃতি, বোধ ভাবনার সঙ্গে প্রতিবাদী সংঘবদ্ধ চেতনার স্ফূরণ ঘটেছে। পরবর্তীকালের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের আভাসও

চিহ্নিত হয় কারণ তার পরেই রাজবংশী জনগোষ্ঠী জাতিসত্তার প্রশ্নে 'ক্ষত্রিয় আন্দোলন'-এ সংঘবদ্ধ হয় এবং যথার্থ জাগরণের মধ্য দিয়ে জাতি সংস্কার সাধনে উদ্যোগী হয়। নেতৃত্বে উঠে আসেন পঞ্চানন বর্মা এবং তার 'ক্ষত্রিয় সমিতি'। বলা যেতে পারে রাজবংশী সমাজের নবজাগরণ তথা সাংস্কৃতিক বিবর্তনের সূচনাকাল সূচিত হয়।

লোক সাহিত্যের অন্যতম একটি শাখা হল গাথা বা গীতিকা। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় 'ময়নামতীর গান'-এর কথা। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন রংপুর থেকে গান, কবিতা, পাঁচালী সংগ্রহ করে 'মানিকচান্দ রাজার গান' নাম দিয়ে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশ করেন। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে আরও কিছু গান সংগ্রহ করে বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-এর পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ড. দীনেশ চন্দ্র সেন এবং বসন্তরঞ্জন রায় সংকলন করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে 'গোপীচন্দ্রের গান' নাম দিয়ে প্রকাশ করে সাহিত্যের মর্যাদা দেন। এরপর ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে তিনটি ভাগে প্রকাশিত হয় গোপীচন্দ্রের গান। এই গোপীচন্দ্রের গান মূলত নাথ ধর্ম সাধনার কথা — নাথ যোগীদের গান, ধর্ম প্রচারের কথা। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় এই গান লোকসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হয় বিদ্বজ্জন-পণ্ডিতবর্গের উদ্যোগে। নাথ গীতিকার দুটি পর্যায় - একটি গোর্খনাথ মীননাথের কাহিনি অপরটি ময়নামতীর আখ্যান। তৎকালীন সমাজ সংস্কৃতির কথা। এই আখ্যানে যুক্ত হয়েছে রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতি তথা ধর্মীয় বিশ্বাসের কথা। রাজবংশী সমাজে এই ময়নামতীর গান 'যুগীর গান' হিসাবে পরিচিত। ড. দীনেশ চন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে ময়নামতীর গানগুলিকে বৌদ্ধযুগের রচনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ময়নামতীর গানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ময়নাগুড়ি (জলপাইগুড়ি) এলাকার এবং অধিবাসীদের প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা। উল্লেখ্য রাজবংশী সমাজে এখনও যুগীরা 'লাউয়ের বস' নিয়ে গান করে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে করে। অতীতে গান করা লোকের সংখ্যাটি উল্লেখযোগ্য থাকলেও বর্তমানে সংখ্যাটি হাতে গোনা। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমুণ্ডি এলাকায় এখনও শোনা যায়। আবার ময়নাগুড়ি অঞ্চলের নামের সঙ্গে ময়নামতী মাও-র নাম আজও জনশ্রুতিতে জড়িয়ে আছে। রাজবংশী সাহিত্যের বিশেষ ব্যক্তিত্ব ধর্মনারায়ণ বর্মা উল্লেখ করেছেন যে ''ময়নামতীর গানত আমরা ত্রয়োদশ শতাব্দীর কামতাপুরের ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, রাজনীতি, সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা জানির পাই।''[৩৬] ময়নামতীর গান বা যুগীর গানে তান্ত্রিক প্রভাবে

স্ফূর্তি লক্ষণীয়। সেইসঙ্গে গানটির ভাষা আধুনিক রাজবংশী, আরবী, ফারসী শব্দের উপস্থিতি মুসলমান প্রভাবকে সুস্পষ্ট করে —

ভাটী হাতে আইল বাঙ্গাল লম্বা লম্বা দাড়ি
সেই বাঙ্গাল আসিয়া মুল্লুকত কৈলে কড়ি।
দেড় বুড়ি আছিল খাজানা তিন বুড়ি নিল,
রাম লক্ষণ দুইটা গোলা দুয়ারত বান্ধিল।

ময়নামতীর গানে অতীতের সামাজিক পরিস্থিতি উত্থাপিত হয়েছে। সমাজজীবনে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল। মানিকচন্দ্রের রাজ্যে প্রজাগণ যথেষ্টই শান্তিতে ছিল। জমির খাজনা ছিল এক হালে দেড় বুড়ি কড়ি। খেতে ধান শস্যের প্রাচুর্য ছিল। সেইজন্য প্রজাগণ ‘‘আথাইলের ধান করি পাথাইলে শুকায়। সোনার ভাটা দিয়া রাইওয়াতের ছাওয়ালে খেলায়।’’[৩৭] এই অবস্থার পরিবর্তন হয় রাজকার্যে বাঙাল (পাঠান) দের আগমনে। খাজনার ভারে দেশের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। ময়নামতীর গানে ত্রয়োদশ শতকের সমাজজীবনের ছবিটা স্পষ্ট হয়। বাংলা তথা উত্তরবঙ্গে মুসলমান শাসকদের আগমনকেও চিহ্নিত করে। যা সাংস্কৃতিক বিবর্তনকেও ত্বরান্বিত করে সেইসঙ্গে সমন্বয়ের বিষয়টিকেও নির্দেশ করে। যার জন্য ময়নামতীর গানেও আরবী, ফারসী শব্দের সমাহার ঘটে। ময়নামতীর গান, কথা, গল্প-গাঁথা রাজবংশী সমাজে বহুল প্রচলিত। ময়নামতী গানের বহু ছড়া শ্লোক আজও শোনা যায়। নাথ গীতিকার দুটি আখ্যানেই রাজবংশী ভাষার বাগ্‌ভঙ্গি, রচনা রীতি এবং উপযুক্ত ভাব প্রকাশের বাহনরূপে প্রচুর শব্দের ব্যবহারে ধর্মীয় বোধ ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। আবার গোর্খবিজয়ের গানের সঙ্গে রাজবংশী সমাজে প্রচলিত গোরখনাথের গান অর্থাৎ গোন্নাথ মাগার গানও সংশ্লিষ্ট। সেখানেও রাজবংশী সমাজ জীবনের সামগ্রিক চিত্র ধরা পড়েছে। এইসব ছড়া, প্রবাদ-প্রবচনের মধ্যে রাজবংশী সমাজের সমাজ ভাবনা তথা তৎকালীন সময়কালের মনন চেতনারও ছবি ধরা পড়ে। ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন যে ‘‘উত্তরবঙ্গের কৃষক সমাজে রাজা গোপীচন্দ্র ও তাঁর মাতা রাণী ময়নামতীর সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনী, ছড়া, পাঁচালী আকারে এখনও প্রচলিত।’’[৩৮] যেখানে মধ্যযুগের স্থানীয় রাজবংশী সমাজের সমাজ চিত্র ধরা পড়েছে। স্বাভাবিকভাবে সুদূর অতীতে রাজবংশী সমাজ জীবনের ছবি সহ সংস্কৃতির পরিচয়ও ধরা পড়েছে ময়নামতীর গানে।

যা রাজবংশী সমাজের সমাজ ও সংস্কৃতি বিবর্তনের পর্যালোচনায় গুরুত্বপূর্ণ।

মধ্যযুগে রাজবংশী ভাষায় রচিত লোকসাহিত্যের উপাদানগুলিতে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সমাজ জীবনের ছবি, সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয়েছে। ছাওয়া ভুর্‌কা ছড়া অর্থাৎ শিশু ভুলানো ছড়া, হেঁয়ালি বা ধাঁধা (যা রাজবংশী সমাজে ছিলকা, ফাকিরি হিসাবে পরিচিত), শিল্লুক, শিলুক অর্থাৎ প্রবাদ-প্রবচন, রসিকতা, গীতি-গীতিকা সর্বোপরি লোকসঙ্গীত ইত্যাদির রচনা রীতি বাগ্‌বৈগদ্ধতা শুধুমাত্র রাজবংশী ভাষার বিশিষ্টতার ক্ষেত্রে ও বিষয় ভাবনার মধ্যে সমাজ মননের গভীরতাও প্রকাশ পায়। ছড়া, ধাঁধায় রাজবংশী সমাজের জ্ঞানদীপ্ত সহজ সরল জীবন ভাবনার সঙ্গে জীবন রসের পরিচয় বহন করে। আবার পরিশীলিত মননবোধের বিষয়টিকেও প্রতিষ্ঠিত করে। প্রবাদ-প্রবচন একটি জাতির সুদীর্ঘকালের সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয়কে বহন করে। রাজবংশী সমাজের প্রবাদ-প্রবচনের মধ্যে বিষয়-ঘটনা-অভিজ্ঞতার সমন্বয় শুধু নয় কল্পনা ও মেধাশক্তির পরিচয়ও নিষিক্ত হয়েছে। সেইসঙ্গে রাজবংশী সমাজের নৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় শিল্পভাবনার বিষয়গুলি সম্পৃক্ত হয়েছে। আধুনিক যুগেও এই প্রবাদ-প্রবচনগুলির প্রাসঙ্গিকতা বিদ্যমান। এখনও গ্রামের বয়স্করা কথায়-কথায় প্রবাদ বলেন। ‘বাপের থাকি ব্যাটা সিয়ান, পুছি পুছি নেয় গিয়ান’ (শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে অনুসন্ধিৎসা থাকলেই জ্ঞান লাভ সম্ভব)। কিংবা ‘কাচাতে না নোঙালে বাঁশ, পাইকলে করে টাস্ টাস্’ অর্থাৎ সময়ের কাজ সময়ে করা দরকার, এরকমই সুখে দুঃখে অবিচল থাকার প্রসঙ্গে ‘অধিকো ধনী হয়া না হই চিতোর/অধিকো কাঙ্গাল হয়া না হই কাতোর।’

এরকম অজস্র প্রবাদে রাজবংশী কথা শুধু আকর্ষণীয়, চিত্তাকর্ষকই শুধু নয় অর্থবোধে গভীর ও ব্যঞ্জনাময় হয়ে সমৃদ্ধতর। ভাষা বিজ্ঞানের ব্যাখ্যায় যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও পরবর্তীকালে রাজবংশী ভাষার ক্ষেত্রে পরিবর্তন চোখে পড়ার মত। বর্ণহিন্দুদের প্রভাবে শুধু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নয় ভাষার ক্ষেত্রেই সবচাইতে বেশি পরিবর্তন ঘটেছে। ভাষার গৌরব অনেকক্ষেত্রেই অস্তমান। বর্তমান প্রজন্মের বেশিরভাগই আজকে এই ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন, যা অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার বিবর্তনকেই সূচিত করে।

রাজবংশী সমাজের লোকসঙ্গীতের ভাণ্ডারটি তো সুবিশাল। পূজা-পার্বণভিত্তিক অজস্র গানের পাশাপাশি তথাকথিত ভাওয়াইয়া গানে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক জীবনচর্যা, সমাজ-

ধর্ম, অর্থনীতি সবই ধরা পড়েছে। প্রকৃতির নিবিষ্টতার পাশাপাশি ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়া, সুখ-দুঃখ, পেশা-বৃত্তির যন্ত্রণা সমস্ত কিছুই ভাওয়াইয়া গানে উচ্চারিত হয়েছে। প্রতিবাদ, ক্ষোভ-বিক্ষোভ, আহ্বান, উত্তরণের কথাও ধ্বনিত হয়েছে। মূলত ভাওয়াইয়া গানের মধ্যেই রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক পরিচয়, প্রতিবেশ, অবস্থান, অতীত-বর্তমান পরিস্ফুট হয়। পূজা-পার্বণ-এর গানে যেমন ধর্মীয় বৃত্ত, সংস্কৃতি, বিশ্বাস-ভাবনার প্রকাশ ঘটে, লোকায়ত বৃত্তের বলয়টিকেও চিহ্নিত করে। এই ভাওয়াইয়া সংস্কৃতির মধ্যেই রাজবংশী সমাজের গোষ্ঠী পরিচয়, উত্থান-পতন, ঘাত-প্রতিঘাত, লড়াই-সংঘাত সহ বর্তমান অবস্থার বিবর্তনের পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ ঘটেছে। ভাওয়াইয়া সঙ্গীতে বৌদ্ধিয় প্রভাব যেমন পড়েছে তেমনি বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব বিপুলভাবে পড়েছে। কিন্তু লোকায়ত ভাবনায় দেবদেবীরাও মানবিক হয়ে উঠেছে ভাওয়াইয়ার গান ও কথায়। ভাওয়াইয়া গানের মধ্যেই সাংস্কৃতিক পথ পরিক্রমণের একটি ধারাভাষ্য আমরা পেয়ে যাই। সেখানে সমাজ অর্থনীতির বিষয়গুলির ছায়াপাতও ঘটেছে সুর, কথা ও ব্যঞ্জনায়। আধুনিকতার বিচারেও ভাওয়াইয়া সঙ্গীত যুগোপযোগী। সময়কালের বিষয় তাই অনুষঙ্গগুলিকে ধারণ করেছে। আবার রাজবংশী সমাজের মননদর্শন বোধবীক্ষাকেও ভাওয়াইয়ার সুরে প্রতিফলিত করেছে — তাই তো আজকের সময়ে রচিত ভাওয়াইয়া গানেও ধ্বনিত হয়।

রাজবংশী সমাজ সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রসঙ্গে বাড়ে বাড়ে রাজবংশী সমাজের নবজাগরণের প্রাণপুরুষ মনীষী পঞ্চানন বর্মার নামটি আসে। তিনি রংপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার সম্পাদক থাকাকালীন উত্তরবঙ্গের ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে সচেতন হয় ছড়া, কবিতা, প্রবাদ, গান, পাঁচালী সংগ্রহ করা ও প্রকাশের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। নিজেও কবিতা, প্রবন্ধ রচনার মধ্যে দিয়ে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সুসংঘবদ্ধ ও সচেতন করার বিষয়ে প্রয়াসী হন। ক্ষত্রিয়করণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সমাজ সংস্কারের বিষয়টি তো ছিলই। স্বাভাবিকভাবে বলা যায় তিনি রাজবংশী ভাষায় (তিনি অবশ্য রাজবংশী ভাষাকে 'কামতা বিহারী' ভাষা হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন) সাহিত্য-সৃজনের ক্ষেত্রেও নবযুগের সূচনা করেছেন। সমাজ সংস্কারের হাত ধরে রাজবংশী জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করার পাশাপাশি শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রসারে তিনি প্রথমাবধি অভ্যস্ত সচেতন ছিলেন। তারই জনশ্রুতিতে ছয়-এর দশকে রাজবংশী ভাষায় সাহিত্য সৃজনের স্বতন্ত্র একটি ধারার সৃষ্টি হয়। কোচ-রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুবাদ

সাহিত্যচর্চার ধারায় যেমন ধর্মীয় সংস্কৃতির প্রসার ঘটে তেমনি পঞ্চানন বর্মার এই উদ্যোগে রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি নবতম ধারার সংযোজন ঘটে। যদিও রতিরাম দাসের 'জাগ গান'-এ রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির বিষয়গুলি প্রাধান্য পেয়েছে কিংবা রাঁধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগীর 'গোসানীমঙ্গল' কাব্যে কিন্তু রাজবংশী ভাষায় সাহিত্য সৃজনের ধারায় ব্যক্তিগত ভাবনা চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। যা রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ভাষ্যলিপি হয়ে ওঠে। স্বাধীনতার সময় পর্বে সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজবংশী সমাজের মননদর্শন, চেতনাবোধ তথা শ্রেণি চেতনার উন্মেষ ঘটে। প্রতিফলন ঘটেছে রাজবংশী গল্প, কবিতা, উপন্যাসে। পরিসরটি বিস্তৃত না হলেও স্বাধীনোত্তর সময়পর্বের এই সাহিত্য সৃজনে আত্ম পরিচয়ের সংকট, ক্ষোভ-বিক্ষোভ, চাওয়া-পাওয়া, দাবি-আন্দোলন, সমাজ রাষ্ট্রের ভূমিকা, সামগ্রিক অবস্থান, সম্ভাবনা, উত্তরণের অভীপ্সা সবকিছুই সাহিত্যে প্রতিফলিত থাকে। স্বাভাবিকভাবে সাংস্কৃতিক বিবর্তনের পট পরিবর্তন বিষয়টি লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। কবিতা, গল্পে আধুনিকতা অনুসরণের সাথে উত্তর আধুনিক চেতনাবোধ, বোধবীক্ষার অভিক্ষেপ সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। সাহিত্যেই প্রতিফলিত হতে থাকে জাতিসত্তার কথা, অবস্থানের কথা, ক্ষোভ-বঞ্চনার কথা, দাবি-আন্দোলনের কথা এবং সর্বোপরি সংস্কৃতির কথা। লিখিত সাহিত্য বিস্তৃত হতে থাকে। আত্ম সচেতনতার প্রকাশ ঘটতে থাকে। ছয়-সাতের দশক থেকে রাজবংশী সমাজের এই সাংস্কৃতিক বিবর্তন অবশ্যই উল্লেখ্য কারণ একটি জাতি-গোষ্ঠী ধারাবাহিকভাবে উত্তরণের মধ্য দিয়ে আধুনিক সময়ের শরিক হয়ে ওঠে। অনেক গ্রহণ-বর্জন-আত্তীকরণের মধ্যে দিয়ে ধাপে ধাপে এই জায়গায় পৌঁছয় এবং মৌখিক সাহিত্য লিখিত সাহিত্যের রূপ পায়। যা সাংস্কৃতিক বিবর্তনের অনুষঙ্গ হিসাবেই বিষয়টি সূচিত হয়।

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বাংলা সাহিত্যের বেশ কিছু উপন্যাস ও গল্পে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির বিষয়গুলি সময় প্রেক্ষিতে গ্রন্থিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় অমিয়ভূষণ মজুমদারের নাম। তাঁর বেশ কয়েকটি উপন্যাসে রাজবংশী সমাজ জীবনকে আখ্যান করে রচিত হয়েছে। তবে তাঁর উপন্যাসে প্রতিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, তিনি সময়কে ধরেছেন ব্যাখানে চরিত্রগুলিকে আধার করে। তাঁর 'দুখিয়ার কুঠি' ও 'মহিষকুড়ার উপকথা' উপন্যাস দুটি মূলত উত্তরবঙ্গের প্রান্তবর্তী এলাকাকে ভিত্তি করে এতদঞ্চলের রাজবংশী সমাজ

জীবন প্রাধান্য পেয়েছে। অমিয়ভূষণ মজুমদার ইতিহাস চেতনাকে গুরুত্ব দিয়েছেন নিয়ত নির্মাণ-বিনির্মাণ করেছেন। উত্তরবঙ্গের প্রান্তবর্তী আরণ্যক জীবনে আধুনিকতার আগ্রাসন, অরণ্য ধ্বংস, আধুনিকতার হাতছানি, আদি কৌম চরিত্রের বিক্ষেপ প্রকৃতিকে চরিত্রের দ্বন্দ্বে প্রস্ফুটিত করেছেন। সভ্যতার অগ্রগতি, যোগাযোগ স্থাপন, জীবনধারায়, জীবিকা নির্বাহ প্রণালীর রূপান্তরে মাতালুর মত মানুষের 'ফান্দৎ পড়া', শান্ত নিঃস্তরঙ্গ জীবনে গতির প্রবেশে মানবিক সংকটকে ভিন্ন মাত্রায় ধরেছেন লেখক অমিয়ভূষণ মজুমদার। অনেকটা সময় এগিয়ে কোচবিহারের এক প্রান্তীয় গদাধর এলাকার জনজীবনের সামগ্রিক পরিবর্তনকে তিনি উপন্যাসে উপস্থাপিত করেছেন। পোষাকের পরিবর্তন, বিনিময় — সমাজ পদ্ধতির পরিবর্তন, আধুনিকতার প্রতি মোহ, লোভ-আকর্ষণে চরিত্র-আচরণের বদলের মধ্য দিয়ে সময়কে ধরেছেন। আধুনিকতা সভ্যতার নানাবিধ উপসর্গ গ্রাম জীবনে অন্তর্ভুক্ত হয়। ঠগ-মাফিয়া শ্রেণির উদ্ভব হয়। ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। ভাইয়ে-ভাইয়ে মামলা মোকদ্দমা, লখাই চক্রবর্তীর মত চোরাকারবারীর আগমন, অবিশ্বাস, ভয়ের জন্ম হয়। শান্ত-সরল জীবনে জটিলতার আগমন ঘটে। চিরায়ত জীবনযাপনের পরিবর্তনে কৌম চরিত্র ক্ষতবিক্ষত হয়।

'দুখিয়ার কুঠি' উপন্যাসের মূল উপজীব্য পাকা সড়ক নির্মাণ করে যোগাযোগ স্থাপন, গ্রামীণ প্রকৃতি সন্নিবেশ জীবনে আধুনিকতার প্রবেশ, জটিলতার বিস্তার, উপসর্গের আমদানি, কৌম জীবনচর্যার পরিবর্তন প্রভৃতি বিষয়গুলি পারস্পরিক হয়ে ওঠে। সভ্যতার সংস্পর্শে প্রান্তীয় জনগোষ্ঠীর লোকায়ত ভুবন, জীবনচর্চার প্রতিবেশ এক লহমায় পাল্টে যায়। নতুন সংকটে আবর্তিত হতে শুরু করে সমাজ জীবন। এই উপন্যাসের বিস্তারে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে মূলত রাজবংশী সমাজজীবনই আলোকিত হয়েছে। ঘটনার বিন্যাসে সময়কালটি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে এই সময়ে যোগাযোগ স্থাপন, অরণ্য ধ্বংস, রিজার্ভ ফরেস্ট তৈরি করে অরণ্যের অধিকার হরণ, ব্রিটিশ সরকারের চূড়ান্ত উপস্থিতি, তাদের বিভিন্ন আইন কানুন প্রণয়ন, জমি জরিপ ও রাজস্ব ব্যবস্থার পরিবর্তন, সরকারি দাক্ষিণ্যে কিছু মানুষের বিত্তশালী হয়ে ওঠা আবার কিছু মানুষের অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন অভিবাসী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি, আদি অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্ব নতুন এক সন্ধিক্ষণের জন্ম দেয়। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের পরিস্থিতি তৈরি হয়। জীবন-জীবিকা থেকে পরিবেশ, সামাজিক ব্যবস্থা, মনন বোধ ভাবনা সবেতেই এই

পরিবর্তন সক্রিয় হয়ে ওঠে। বস্তুত এই উপন্যাসের বিস্তার ও ঘটনা বিন্যাসে রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের এক বিবরণ পেয়ে যাই। সময়কালের নিরীক্ষণে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়কালে ব্রিটিশদের আগমনে এতদঞ্চলের কৌম জনগোষ্ঠী রাজবংশী সমাজের ধারাবাহিক পরিবর্তনের বিষয়গুলি স্পষ্ট হয়। তাঁর 'মহিষকুড়ার উপকথা' উপন্যাসেও রাজবংশী সমাজজীবন প্রাধান্য পেয়েছে। নস্য শেখ মুসলিম সমাজের প্রতিনিধিকে চরিত্রে চিত্রণ করে রাজবংশী সমাজের পরিবর্তনকেই চিহ্নিত করেছেন। অরণ্য ধ্বংস করে সভ্যতার বিকাশ — জাফরুল্লার আগ্রাসী ক্ষমতা বিস্তার সরকারি লোকজনের সঙ্গে যোগসাজস করে 'পায়োর' (পাওয়ার) বৃদ্ধি — তার পঞ্চায়েত হয়ে সামন্ততন্ত্রের প্রতীক হয়ে ওঠা। বন্য পশু মোষকে নিয়ন্ত্রণ করার মত আসকাফকে নিয়ন্ত্রণ করা — ব্যক্তি বনাম ব্যক্তি সমাজ প্রকৃতির দ্বন্দ্ব। প্রকৃতি বনচারী মানুষ ও পশুর পাশাপাশি ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা উপনিবেশ-নগর-যন্ত্র-সভ্যতা-পঞ্চায়েত নির্বাচন-সরকারি অফিসারদের যোগসাজস ইত্যাদি বিষয়ের সংস্থাপনে সভ্যতার সংকট প্রকৃতির কোলে নিরিবিলি থাকা কৌম চরিত্রগুলির পরিবর্তনকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হিসাবে চিহ্নিত করে যেটা আসকাফের মননভঙ্গিতে বিশ্লেষিত হয়েছে। সে জাফরুল্লার ব্যাপারির ক্ষমতা বুঝতে পারে — মোষের বদলে যন্ত্র দানব ট্রাকের মধ্যে সে বুঝে যায় পরিবর্তনের ঝড়। পরাজিত আসকাফের 'অ্যাঁ-আঁড়' শব্দে ক্ষোভ উচ্চারিত হলেও সে মেনে নিতে বাধ্য হয়। এখানেই পরিবর্তনকে মেনে নেওয়া, শিরোধার্য করে নেওয়া। আসকাফ নিতান্তই উত্তরবঙ্গ তথা প্রান্তীয় কোচবিহার এলাকার কৌম জনজাতির প্রতিনিধি। ভাষা ব্যবহারে রাজবংশী সমাজের প্রতিনিধিত্বই সে করছে। ঘটনার বিস্তারে মুঘল-তাতার-তুর্কীদের আগমনের ইতিহাস আছে, আছে মীর জুমলার প্রসঙ্গ। ইংরেজ সরকারের পদচারণাও ঘোষিত হয়েছে স্বাভাবিক এতদঞ্চলের কয়েকশ বছরের ধারাবাহিক পরিবর্তনের ব্যাখ্যানই উপন্যাসের পর্যায়ে ধরা পড়েছে। সেইসঙ্গে এতদঞ্চলের নস্য শেখ মুসলমান সম্প্রদায় তথা বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠীর ধারাবাহিক সাংস্কৃতিক বিবর্তনের আখ্যানও বর্ণিত হয়েছে। আমরা পেয়ে যাই সাংস্কৃতিক বিবর্তনের কালক্রম, হেতু এবং পর্যায়ক্রম। ইতিহাস-ভূগোলের সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিবর্তন যে গুরুত্বপূর্ণ অংশ তা প্রকৃতি পরিবেশের পরিবর্তনে ধরা পড়েছে। জগৎ ও জীবনের রূপকে অঙ্কন করতে গিয়ে অমিয়ভূষণ মজুমদার কৌম রাজবংশী জনগোষ্ঠীর মনন জগৎ তথা সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ছবিটিকেও সুন্দরভাবে

এঁকেছেন।

দেবেশ রায়ের তিন তিনটি উপন্যাসে (মফঃস্বলি বৃত্তান্ত, তিস্তা পুরাণ ও তিস্তাপারের বৃত্তান্ত) স্পষ্টতই তিনি রাজবংশী সমাজ জীবনের ছবি এঁকেছেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগের রাজবংশী সমাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ ছবি তিনি বিষয় ঘটনার বিস্তারে তুলে ধরেছেন। তিনটি উপন্যাসেই বর্ণিত হয়েছে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার রাজবংশীদের সমাজ জীবন সংস্কৃতির কথা। মফঃস্বলি বৃত্তান্ত, তিস্তাপারের বৃত্তান্ত দুটি উপন্যাসেই জোতদার-আধিয়ারদের কথা এসেছে। ভূমি সংস্কার আইনে সর্বস্বান্ত হওয়া, খাস জমির প্রসঙ্গ এসেছে। তিস্তা পুরাণে রাজবংশী সমাজ জীবন সংস্কৃতি বিবরণ তিনি বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। বাড়িঘরের বর্ণনা থেকে ডারিঘর, ঠাকুরবাড়ি, খাদ্যাভাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, লোকায়ত সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় সেইসঙ্গে সমবায়িক মানসিকতার 'হাউলি' যাওয়ার বিষয়টি তিনি তুলে ধরেছেন। আবার সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিভিন্ন পেশা বৃত্তি গাড়িয়াল মৈষাল-মাহুতদের কথাও তুলে ধরেছেন। বৃত্তিগত দিক থেকে পান -সুপারি বেচা, কলা বেচা, গুয়া সবকিছুই তিনি ব্যাখানে তুলে ধরেছেন। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী রাজবংশী সমাজ জীবনের ছবি পাওয়া যায়। আর্থ-সামাজিক কাঠামো থেকে লোকায়ত বৃত্ত সেইসঙ্গে অভিবাসী মানুষের আগমনে সমাজ জীবনের পরিবর্তনের বিষয়গুলি তিনি সুন্দরভাবে বর্ণনায় তুলে ধরেছেন। ভূমি সংস্কার, অপারেশন বর্গা, তেভাগা আন্দোলন কোন কিছুই বাদ যায়নি। তার ফলে রাজবংশী সমাজ জীবনে অভিঘাত ক্ষোভ-বিক্ষোভের কথা সবই তিনি বিষয় প্রেক্ষাপটে আলোচনায় স্থাপিত করেছেন। স্বাভাবিকভাবে স্বাধীনোত্তর পরবর্তী কয়েক দশকে আর্থ-সামাজিক কাঠামো বদলানোর সঙ্গে রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতি পরিবর্তনের বিষয়টিকে অনুধাবন করা যায়। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী কয়েক দশক আগে রাজবংশী সমাজ জীবনের সংকট এবং সেইহেতু পরিবর্তনের পর্যায়ক্রম বিষয়গুলি সম্পর্কে সম্যক পূর্বাভাস তার উপন্যাসে পাওয়া যায়।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের উপন্যাসে যেমন আরণ্যক সমাজ সংস্কৃতির পরিবর্তনের বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে তেমনি অরণ্য ধ্বংস, কৃষিজমির সম্প্রসারণ, সেটেলমেন্ট ব্যবস্থা, সরকারি আইনকানুন-বিধিব্যবস্থা, রাস্তাঘাট নির্মাণ, যোগাযোগ স্থাপন, আধুনিকতার আগমন, শান্ত-সরল মানুষের মধ্যে জিজ্ঞাসা দ্বন্দ্বের বিষয়গুলি উত্থাপন করে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর আর্থ-

সামাজিক সাংস্কৃতিক কাঠামো তথা সমাজ সংস্কৃতির বিষয়টি তুলে ধরেছেন। সামন্ততান্ত্রিক আগ্রাসনের বিষয়টিও তিনি আখ্যানে ধরেছেন।

দেবেশ রায়ের অনেক গল্পে রাজবংশী মানুষ ও সমাজ জীবনের কথাই ধরা পড়েছে। 'লাঙ্গল যার জমি তার' ভাবনা প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর 'দখল' গল্পে। সেখানে প্রজাসত্ত্ব আইন পাশ হওয়ার ফলে অনেক আধিয়ার ভূমিহীন হয়ে পড়ে। সেই ভূমিহীনতার সংকটে রাজবংশী সমাজ জীবনের সমস্যা গল্পে উপজীব্য হয়েছে। 'বানা' গল্পে যেমন নদী নির্ভরতা কিভাবে অনেককে সর্বস্বান্ত করে দেয় তার আখ্যান বর্ণিত হয়েছে। 'রাখী পূর্ণিমার রাত' গল্পে যেমন রাজনৈতিক নগ্নতার প্রকাশ ঘটেছে। দলীয় স্বার্থে কিছু মানুষের অসহায়তা সেখানেও রাজবংশী বুধারুর মত মানুষের কাহিনি বিবৃত হয়েছে। তিস্তা নদীকে উপজীব্য করে গল্প 'অনৈতিহাসিক'-এ মানুষের উদ্বাস্তু হওয়ার করুণ কাহিনি, ছিন্নমূল হয়ে ভেসে যাওয়ার কাহিনি। 'মূর্তির মানুষ' গল্পটিতে তিনি গ্রাম্য লোকশিল্পীর টটাই-র উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে তৎকালীন রাজবংশী সমাজ সম্পর্কে নাগরিক সমাজের ধারণাকে তির্যকভাবে উপস্থাপন করে ব্যঙ্গ করেছেন। এভাবেই তাঁর অন্যান্য গল্প 'জোত জমি', 'গীতাল যুগীনের টেকনোলজি গ্রহণ' রাজবংশী জীবন যন্ত্রণার বিষয়গুলিকে তিনি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে চিহ্নিত করে ভূমিচ্যুত রাজবংশী মানুষের সাংস্কৃতিক সংকটের বিষয়টির উপর জোরালো আলোকপাত করেছেন।

দেবেশ রায় মূলত বিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী পর্বের জলপাইগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতির সংকটকে তাঁর আখ্যান বিশ্বে তুলে ধরেছেন। সেখানে রাজবংশী সমাজ জীবন সংস্কৃতি অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। অভিবাসন সমস্যা, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সম্পর্কের বিন্যাস, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সরকারি বিভিন্ন আইনকানুন, সমাজ অর্থনীতির নতুন সমীকরণে এতদঞ্চলের কিছু মানুষের করুণ অবস্থাকে তিনি যেমন তুলে ধরেছেন তেমনি সামন্ততান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে একজোট হয়ে লড়াই-র আভাসও দিয়েছেন। আবার কিছু মানুষের সমাজ পরিস্থিতির বাস্তবতায় ক্রিড়ানকে পরিণত হওয়ার বিষয়টিকেও ইঙ্গিত করেছেন। তাঁর গল্প উপন্যাসে জলপাইগুড়ি এলাকায় ৬৮ সালের বন্যা, প্রজাসত্ত্ব আইন, বর্গা অপারেশন, নকশাল আন্দোলন, ভোট জমি দখল, তিস্তার বাঁধ, জোতদার আধিয়ার সম্পর্কের বিন্যাস, অভিবাসী মানুষের চাপ, ভূমিচ্যুত হওয়া রাজবংশী কৃষক সমাজ সংস্কৃতির সংকট। ক্ষোভ-বিক্ষোভ-লড়াই মনস্তাত্ত্বিক

দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তুলে ধরে সময়কালের নিরিখে সমাজ সংস্কৃতির বিবরণের বৃত্তান্তকেই লিপিবদ্ধ করেছেন। আমরা তাঁর আহ্বান বিশ্ব থেকে স্বাধীনতার আগে ও পরের কয়েক দশকের সমাজ সংস্কৃতির বিবর্তনের কারণ, যুক্তি ও অবস্থানকে অনায়াসে চিহ্নিত করতে পারি।

আরও বেশ কিছু লেখকের লেখনীতে সমাজ, সংস্কৃতি ও বিবর্তনের কথা ধরা পড়েছে। পীযূষ ভট্টাচর্যের 'বোধন পর্ব' গল্পে যেমন বাংকার-এর চালাক হওয়ার বিষয়টি বোঝা যায় তেমনি বর্গা অপারেশন, তেভাগা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে পরিবর্তিত পরিস্থিতি, সম্পর্কের অবনতি, সংকট এবং সাংস্কৃতিক বিবর্তনের বিষয়গুলি ধরা পড়ে। বিপুল দাসের 'লাল বল' উপন্যাসেও এই বিষয়গুলি ছায়াপাত হয়ে উত্তরবঙ্গের জনজীবনে রাজবংশী সমাজ জীবনের সংকট-পরিস্থিতি, আধিপত্যহীনতা উত্তরণের বিষয়ভাবনাগুলি চরিত্রের কাঠামোয় যুক্ত হয়ে আর্থ-সামাজিক বিবর্তনের ছবিটি ধরা পড়েছে। অভিজিৎ সেনের 'দেবাংশী' গল্পে যেমন কৌম জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস, সংস্কার সেই সঙ্গে পাঁচ-ছয় দশকে সহজ-সরল রাজবংশী মানুষের দাবি আদায়ে সোচ্চার হওয়ার বিষয়টি উঠে আসে তেমনি সামন্ততান্ত্রিকতার কায়েমী স্বার্থের বিচ্ছেদ, সংঘবদ্ধ লড়াইয়ের পাশাপাশি ধর্মীয় সংস্কার-বিশ্বাসেও সচেতনতার আভাস ধরা পড়েছে। মানবিক দ্বন্দ্বের অবকাশে উত্তরণের পথ ধরে দেবাংশী হয়ে ওঠে পুরোহিত নয় যুগ পরিবর্তনের যুগ পুরুষ। যা রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তনেরই আখ্যান হিসাবে প্রতিপন্ন হয়।

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে রাজবংশী সমাজে মাশানকে ঘিরে ভয় সংস্কার সেই সঙ্গে তন্ত্র মন্ত্র, তুকতাক, দেউসী, ভৌরিয়াদের আধিপত্য, ধান্দাবাজি ইত্যাদি বিষয়গুলি উঠে এসেছে। পাশাপাশি নাগরিক সভ্যতার আগমন, উপনিবেশিক জীবন, পরিবর্তমান সময় পরিস্থিতির উদ্ভূত সমস্যা, ক্ষোভ-বিক্ষোভ, জঙ্গী আন্দোলন ইত্যাদি বিষয়গুলির প্রেক্ষাপটে সংস্কৃতি সংকট ও অপসৃয়মানতাকে আখ্যানে বিস্তৃত করেছেন। বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে রাজবংশী সমাজের সামগ্রিক বিবর্তনের ছবিটিকে তিনি পক্ষান্তরে তুলে ধরেছেন।

প্রসঙ্গক্রমে ড. চারুচন্দ্র সান্যালের 'দ্য রাজবংশীস অব নর্থবেঙ্গল' গ্রন্থটির উল্লেখ করতে হয়। সাংস্কৃতিক বিবর্তনের প্রেক্ষাপটে এই গ্রন্থটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শুধু নয় আকরগ্রন্থও বটে। কারণ তিনি এই গ্রন্থে নৃ-তত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের সামগ্রিক জীবন ও সংস্কৃতির যাবতীয় বিষয়গুলিকে ক্ষেত্র সমীক্ষার ভিত্তিতে গ্রন্থিবদ্ধ করেছেন। স্বাভাবিকভাবে

পরবর্তী সময়কালের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের পর্যালোচনায় গ্রন্থটির বিষয়বস্তু অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও যুক্তিপূর্ণ হয়ে ওঠে। পাশাপাশি নাম করতে হয় উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জনগোষ্ঠীর আরেক কৃতীপুত্র উপেন্দ্রনাথ বর্মনের নাম, তাঁর 'উত্তর-বাংলার সেকাল ও আমার জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রাজবংশী সমাজ জীবন, অবস্থান, অর্থনৈতিক অবস্থা, ব্যবসা বাণিজ্য, পারস্পরিক সম্পর্ক, মেলা-উৎসব, জীবন-জীবিকার যাবতীয় বিষয়গুলি ধরা পড়েছে অভিজ্ঞতা ও চোখে দেখার ভিত্তিতে। জীবন্ত উপাদান হিসাবে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গিরিজাশংকর রায়ের 'উত্তরবঙ্গের ক্ষত্রিয় জাতির পূজা-পার্বণ' গ্রন্থটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বিংশ শতাব্দীর রাজবংশী সমাজের দেবদেবী, পূজা-পার্বণ, তথা ধর্মীয় প্রভাব ও সংস্কৃতির বিষয়গুলি আখ্যায়িত হয়েছে। যার অনেকগুলি পরবর্তীকালে অপসৃয়মান হয়েছে। আর্থ-সামাজিক কাঠামো পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর লোকসাহিত্যের সংগ্রহ (১ম ও ২য় খণ্ড) এবং উপেন্দ্রনাথ বর্মনের 'রাজবংশী ভাষায় প্রবাদ-প্রবচন ও হেঁয়ালী' গ্রন্থগুলিও রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির পর্যালোচনায় গুরুত্বপূর্ণ দলিল। কারণ সেইসব প্রবাদ-প্রবচন, ছিল্কা, ছড়াগুলি পরবর্তী সময়কালে বেশিরভাগই হারিয়ে যায়। সাংস্কৃতিক বিবর্তনের প্রেক্ষিতে সে বিষয়গুলি আলোচনার নিরিখে গুরুত্বপূর্ণ।

পরবর্তীকালে বিংশ শতাব্দীর ছয়-সাত দশকে রাজবংশী ভাষা সাহিত্য চর্চা শুরু হয়। বেশ কিছু লেখক- লেখিকা কবি-সাহিত্যিক গল্প, উপন্যাস, কবিতা রচনায় উদ্যোগী হন। সে-সব গল্প, উপন্যাসে ধরা পড়তে থাকে রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির কথা, মননভাবনা, স্মৃতিচারণা সেইসঙ্গে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অভিঘাত অতীত গৌরব, জাতিসত্তার কথা। উপন্যাসে ধরা পড়েছে বঞ্চনার কথা, ক্ষোভের কথা, প্রতিবাদ-আন্দোলন, জঙ্গি হয়ে ওঠা ইত্যাদি বিষয়গুলি প্রাধান্য পেয়েছে মূলত এই সময়কালের উদ্ভূত সমাজ অর্থনীতির প্রেক্ষিতে। রাজবংশী জনমানসের ছবি ধরা পড়ে উপন্যাসের বিস্তারে। সেটা ভগীরথ দাসের 'সেন্দুকের ছোড়ানি' কিংবা তারামোহন অধিকারীর 'আসামী' উপন্যাসে পরিলক্ষিত হয়। অতীত গৌরবের কথা, কোচ-রাজার কথা, পরবর্তী সময়ে জমি হারানোর দুঃখ, আধিপত্যহীনতা, অভিবাসনের চাপ, বর্ণহিন্দুদের বিদ্বেষ, তাদের লোভ-লালসা ইত্যাদি বিষয়গুলি উপন্যাসের বিষয় হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক আগ্রাসন, ভাষার দাবি, জাতিসত্তার সংকট, সমাজ সংস্কৃতির সংকট ইত্যাদি বিষয়গুলি উত্থাপন করে রাজবংশী জনজীবনের কথা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। পরেশ চন্দ্র রায়ের 'বাতাসীর বাসিয়া

কাথা' উপন্যাসে যেমন রাজবংশী জীবন-জীবিকার প্রসঙ্গে রাজবংশী মানুষের সহজ-সরলতা বিপ্রতীপে ধান্দাবাজি ধূর্ত হয়ে দালালি করার বিষয়টি উত্থাপন করেছেন। আদপে অভিবাসনের চাপে, ভূমিচ্যুত হয়ে, সমাজ সংস্কৃতি বিবর্তনের হাত ধরে যেকোন পেশায় যুক্ত হওয়ার পরিস্থিতিকে তুলে ধরেছেন। পেনকেটু, খইরুল চরিত্রের মধ্য দিয়ে আট-নয়ের দশকে রাজবংশী মানুষের জীবন-জীবিকার প্রশ্নে সংকট এবং পরিবর্তনকে নিখুঁত ভাবে তুলে ধরেছেন উপন্যাসের কাহিনি বিস্তারে। সমাজ অর্থনীতি পরিবর্তনের ছবিটিকে তিনি বাস্তব করে ধরেছেন। যা রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির বিবর্তনকে সূচিত করে। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে স্বাধীনোত্তর সময়কালের কয়েক দশকের মধ্যে রাজবংশী সমাজ বিন্যাস, অর্থনৈতিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন হয়। অভিবাসনের চাপে শহরের বিস্তার, আধিপত্যহীনতা, বর্ণহিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা সেই সঙ্গে ভূমিচ্যুত হয়ে কিছু মানুষের গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে যাওয়া, ভিন প্রদেশে কাজের সন্ধানে যুবকদের বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া, রাজনৈতিক চাপ, শিক্ষা-সচেতনতার অভাব একাধিক সমস্যার জন্ম দেয়। দ্বন্দ্ব হিংসার আড়ালে গ্রাম সমাজ ভেঙে যায়। তৈরি হয় সাংস্কৃতিক সংকট, জাতিসত্তার সংকট। এ-সবই উপন্যাসের আধার হয়ে সময় প্রেক্ষিতে সাংস্কৃতিক বিবর্তনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই উপন্যাসের ব্যাখ্যান থেকে আমরা সাংস্কৃতিক বিবর্তনের বেশ কিছু উপাদান পেয়ে যাই।

রাজবংশী উপন্যাসে মূলত এই বিবর্তনের ছবিটাই বিভিন্ন আঙ্গিকে লেখকের মনোভঙ্গিতে ধরা পড়েছে। রাজবংশী গল্পের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়কালের সামাজিক প্রক্ষেপ, রাজবংশী আর্থ-সামাজিক সংকট, সংস্কৃতির কথা, অভিবাসনের চাপ, রাজনৈতিক চাপ ইত্যাদি বিষয়গুলি ধরা পড়েছে। মূলত রাজবংশী সমাজের পিছিয়ে পড়ার ভাষ্যগুলি গল্পের বিষয়বস্তু হয়ে সময়কালকে চিহ্নিত করেছে। যা সাংস্কৃতিক বিবর্তনের সমীকরণ ও বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ। কবিতায়ও প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত হয়েছে। প্রকৃতির আবহে রাজবংশী সমাজের অবস্থান নির্ণয়ে চেতনাবোধ, অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়গুলি কাব্য রচনার আধার হয়েছে। আবার কবিতায় সময়কাল অবস্থাও ধরা পড়েছে উত্তর আধুনিকতার গুণ বৈশিষ্ট্যে।

শুধু গল্প, কবিতা, উপন্যাস নয় রাজবংশী ভাষায় সাহিত্য চর্চার অন্যতম অংশ হয়ে ওঠে প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে চেতনা-চিন্তার বিকাশ ঘটানোর প্রয়াস দেখা যায় সত্তর-আশির

দশকে। ভাষা নিয়ে, সংস্কৃতি নিয়ে সমাজ অর্থনীতি বিষয়ক বহু প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ পেতে থাকে। অনেকে প্রবন্ধ সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সাহিত্য চর্চায় ব্রতী হন। যা সামগ্রিক সাংস্কৃতিক বিবর্তনের একটি অংশ। গল্প, কবিতা, উপন্যাসের পাশাপাশি প্রবন্ধ সাহিত্য চর্চার মধ্যে রাজবংশী ভাষায় সাহিত্য চর্চার বিষয়টি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে বিংশ শতাব্দীর কয়েক দশকে।

স্বাভাবিকভাবে রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের সমীক্ষণ ও বিশ্লেষণে রাজবংশী ভাষায় সাহিত্য চর্চার পরিসরে আমরা পেয়ে যাই স্বাধীনতার পরবর্তীকালের বিস্তৃত ছবি। যে বিষয়গুলি সাংস্কৃতিক বিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে বিভিন্ন আঙ্গিকে। আবার উত্তরণের প্রসঙ্গে সমাজচেতনতা, সংঘবদ্ধ ঐক্য প্রয়াস এবং উদ্যোগের বিষয়গুলিও রাজবংশী ভাষায় সাহিত্যচর্চার মধ্যে সম্পৃক্ত হয়। সত্তর-আশির দশকে রাজবংশী সমাজের মধ্যে শোষণ-বঞ্চনা, ক্ষোভ-বিক্ষোভ, সংগঠন, প্রতিবাদ, আন্দোলন, অবরোধে অস্থির সময়ে রাজবংশী সমাজের কিছু মানুষ ভাষা নিয়ে সচেতনতা, সাহিত্য-সৃজনে ব্রতী হয় যা সাংস্কৃতিক বিবর্তনেরই অংশ। এর মধ্য দিয়ে রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির কথা শুধু নয় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়গুলি ভিন্ন মাত্রায় উচ্চারিত হয় লিখিত সাহিত্যের মধ্যে। বস্তুত বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির বিবর্তন ত্বরান্বিত হয় নানাবিধ কারণে। অভিবাসনের চাপ, অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া, আধিপত্যহীনতা, ভূমিচ্যুত হওয়া, একটা অংশের শহরমুখী হওয়া, মধ্যবিত্ত মানসিকতা, সাংস্কৃতিক ঔদাসীন্য এবং রাজনৈতিক কারণে গ্রাম সমাজের পরিবর্তন ঘটে। যা সাংস্কৃতিক বিবর্তনের পক্ষে সহায়ক হয়। বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত পরিসরে যেমন অতীত সময়ের আখ্যান, সমাজ সংস্কৃতির বিষয়গুলি উঠে আসে তেমনি রাজবংশী সাহিত্যে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পর্বের সময় প্রেক্ষিতে রাজবংশী সমাজ অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক পরিসরটি উঠে আসে। যার মধ্য থেকে রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের একটি দলিল তৈরি হয়। রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তনে এই সাহিত্য-সৃজন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যা সময়কালের নিরিখে বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠীর ধারাবাহিক বিবর্তন-পরিবর্তন-উত্তরণের ভাষ্যলিপি হিসাবে চিহ্নিত হয়। বস্তুত বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তন নানাবিধ কারণে ত্বরান্বিত হয় যা রাজবংশী সাহিত্যের উপন্যাসে ধরা পড়ে।

তথ্যসূত্র :

১. খাঁ চৌধুরী, আমানতউল্লা খান; কোচবিহারের ইতিহাস (১ম খণ্ড), ১৯৩৬

২. খাঁ চৌধুরী, আমানতউল্লা খান; কোচবিহারের ইতিহাস (১ম খণ্ড), ১৯৩৬

৩. রায়, হরিপদ; কোচবিহারে বহিরাগতদের আগমন ও আর্থসামাজিক বিবর্তন, উত্তরপ্রসঙ্গ, দেবব্রত চাকী (সম্পা), কোচবিহার জেলা সংখ্যা, ডিসেম্বর, ২০১৬, পৃষ্ঠা - ৫৯

৪. পাল, নৃপেন্দ্রনাথ; কোচবিহার রাজ্যের ইতিহাস (প্রবন্ধ), পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার জেলা সংখ্যা পৃষ্ঠা - ১১

৫. রায়, জ্যোতির্ময়; রাজবংশী সমাজ দর্পণ - ২, দি সী বুক এজেন্সী, কল, ২০১৬, পৃষ্ঠা - ১১৫

৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, ভগবতীচরণ; কোচবিহারের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭৩, ২০০৬, পৃ: ১৫৩

৭. অধিকারী, মাধব চন্দ্র; রাজবংশী সমাজ ও পঞ্চানন বর্মা, ১ম খণ্ড, রিডার্স সার্ভিস, পৃ: - ২৯

৮. মজুমদার, অরুণভূষণ; প্রত্যুষ ও প্রদোষকালের কামতা-কোচবিহার, নিউ দিল্লী, পৃ: - ১০২

৯. ঐ, পৃ: - ১০৮

১০. Sanyal, Charu Chandra; The Rajbanshis of North Bengal, Kolkata, 1965, Page - 149-50

১১. ঐ, পৃ: - ১৩৯

১২. মুখোপাধ্যায়, শিবশংকর; জলপাইগুড়ি জেলার সামাজিক কাঠামো, মধুপর্ণী, জলপাইগুড়ি, বিশেষ সংখ্যা, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা - ১৫৩-৫৪

মনিরাম কাব্যভূষণ 'রাজবংশী ক্ষত্রিয় দীপক', দিনাজপুর, ১৩১৮, পৃ: ৪০-৪১

১৩. ঐ, কোচবিহারের সামাজিক কাঠামো, মধুপর্ণী, কোচবিহার জেলা সংখ্যা, ১৯৯০, পৃ: ১১০

১৪. বসু, স্বরাজ; 'Dynamics of Caste movement : The Rajbanshis of North Bengal (1910-1947) New Delhi 2005, Page - 47

১৫. রায়, গিরিজাশংকর; উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জাতির পূজা-পার্বণ, এন. এল. পাবলিকেশন, ডিব্রুগড়, অসম, পৃষ্ঠা - ৭৯

১৬. সান্যাল, চারুচন্দ্র; রাজবংশীস অফ নর্থ বেঙ্গল, চারুচন্দ্র সান্যাল, দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৬৫, পৃষ্ঠা - ১৩৭

১৭. Sunder, D H; Survey of the Western Duars in the District of Jalpaiguri, Page - 56

১৮. রায়, গিরিজাশংকর, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির পূজা-পার্বণ, পৃষ্ঠা - ১৩০

১৯. ঐ, পৃষ্ঠা - ৩০

২০. Rajguru, Saktipada; Medieval Assam's Society 1224-1626 (Nowgoan) 1988 P - 94

২১. সাত্তার, আব্দুস; আরণ্য জনপদে, পৃ: - ৩৬১
Britinica Encyclopedia Ready Referrence USA; Britania Inc, 1985, P - 925-926
অশোক বিশ্বাস, বাংলাদেশের রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি, প্রাগুক্ত পৃ: ৩৩
২২. রাজগুরু, এস; বন্দ্যোপাধ্যায় শেখর ও দাশগুপ্ত , অভিজিৎ (সম্পা), জাতি, বর্ণ ও বাঙ্গালী সমাজ, দিল্লী, পৃ: ৯২
২৩. শিনকিচি তানিগুচি, উত্তরবঙ্গ ও অসমের রাজবংশী সম্প্রদায়, ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনশীল কাঠামো, শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিজিৎ দাশগুপ্ত (সম্পা), জাতি, বর্ণ ও বাঙ্গালি সমাজ, দিল্লী, পৃষ্ঠা - ১৬২
২৪. ঐ, শিনকিচি তানিগুচি, প্রাগুক্ত ১৬৯
২৫. সমর পাল, প্রাগুক্ত
'জেলার আদিবাসী ঃ নৃতাত্ত্বিক পরিচয়'
রংপুর জেলার ইতিহাস (সম্পাদনা), জেলা প্রকাশন, রংপুর, ২০০০, পৃষ্ঠা - ৯৯
২৬. Nath, D.; History of the Koch Kingdom 115-1615 (Delhi, 1989), P - 165
২৭. দেব, রণজিৎ; উত্তরবঙ্গের সমাজ জীবন ও সংস্কৃতি, রতন বিশ্বাস (সম্পাদিত), উত্তরবঙ্গের জাতি ও উপজাতি (কল, পুনশ্চ ২০০১), পৃ: ৬৯
২৮. বিশ্বাস, অশোক, বাংলাদেশের রাজবংশী জাতিগোষ্ঠীর সমাজ ও সংস্কৃতি, প্রসূন বর্মন (সম্পাদিত), নাইনথ কলাম-১৪, রাজবংশী কোচ-রাজবংশী (বিশেষ সংখ্যা), মালিগাঁও চারি আলি, গুয়াহাটি, ২০১৭, পৃ: ২৪১
২৯. বর্মা, সুখবিলাস; রাজবংশী সমাজের আত্মপরিচয় ঐতিহ্যে ও ইতিহাসে, ইছামুদ্দিন সরকার (সম্পা), এন, এল, পাবলিশার্স, ডিব্রুগড়, আসাম, ২০০২, পৃষ্ঠা - ১৭০
৩০. ঐ, পৃষ্ঠা - ১৬১
৩১. সেন, সুকুমার; বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ: ৩৪৩
৩২. Gait, Sir Edward; A History of Assam, 2005, (reprint) P - 50
৩৩. রায়, দীপক কুমার; তিস্তা বুড়ি, টেরাকোটা, বাঁকুড়া, পৃষ্ঠা - ১০
৩৪. বর্মা, সুখবিলাস; জাগ গান, পুস্তক বিপণি, কল - ৯, পৃষ্ঠা - ৫০
৩৫. বর্মা, সুখবিলাস; জাগ গান, পুস্তক বিপণি, কল - ৯, পৃষ্ঠা - ৭০
৩৬. পাল, ড. নৃপেন্দ্রনাথ (সম্পাদনা); রাঁধাকৃষ্ণ দাসবৈরাগীর গোসানীমঙ্গল, অণিমা প্রকাশনী, কল - ৯, পৃষ্ঠা - ৭০
৩৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার; বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, পরিবর্তিত সংযোজন অধ্যাপক ড. দিলীপকুমার মিত্র, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কল - ৭৩, পৃষ্ঠা - ১৪৪

উপসংহার

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পালটে যায় সমাজ। পালটে যায় ভৌগোলিক মানচিত্রও। একইসঙ্গে পালটায় আর্থ-সামাজিক কাঠামো সহ সমাজ মনন প্রক্রিয়া। শিক্ষা রুচির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জনগোষ্ঠীর লোকায়ত আচার পদ্ধতি পরিবর্তিত ও বিবর্তিত হয়। নব নব রূপে ধারাবাহিক গতিপ্রবাহে ভিন্ন সংস্কৃতি ভিন্ন ভাবনা ও বিশ্বাস আশ্রয় পায়। অন্য সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্তি ঘটে। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার জেলার জলপাইগুড়ি প্রান্তীয় অংশের উপর দিয়ে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন সংস্কৃতির আগমন ঘটেছে। অনন্তকাল ধরে নতুন নতুন জাতি-জনজাতি গোষ্ঠীর ঢেউ আছড়ে পড়েছে। তাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ সংস্কৃতির সঙ্গে অন্য সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে, লৌকিক ও অলৌকিক বিশ্বাসে ধর্মীয় ভাবধারাও পুষ্ট হয়েছে। এই ধর্মীয় সম্প্রীতি বিস্তৃত অঞ্চলকে প্লাবিত করেছে। বঙ্গদেশে আর্যীকরণের সূত্র ধরে রাজবংশী সমাজের হিন্দুত্বগ্রহণ, ভাষা-সংস্কৃতির আত্তীকরণ ঘটেছে। সামগ্রিক হিন্দু শাস্ত্রীয় ধর্মকর্মাদি গৃহীত হলেও আঞ্চলিকতা ভেদে রাজবংশী সমাজের দেবদেবী, বিশ্বাস ও আচার-ব্যবহারে একটা স্বতন্ত্র ধারা আজও লক্ষণীয়। তথ্য প্রযুক্তির বিস্তার, নাগরিক স্পর্শের বিশ্বায়নে গ্রামীণ জীবনের মূলধারাও একটা ব্যাপক পরিবর্তন কিন্তু স্পষ্ট। এ শুধু রাজবংশী সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, বলতে গেলে প্রায় সমস্ত সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেই প্রায় সমানভাবে প্রযোজ্য।

রাজবংশী সমাজের প্রার্থনীয় কামনা-বাসনা একান্তভাবে পার্থিব এবং নিতান্ত দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয়তা কেন্দ্রিক। কৃষিনির্ভর সমাজ জীবনেও বেশিরভাগ দেব-দেবী, পূজা-পার্বণ উপলক্ষাদি এবং তৎসম্পর্কীয় সংগীত, এমনকী মন্ত্রাদিও ক্রিয়াকর্মভিত্তিক। স্থান পেয়েছে নদী, বৃক্ষ, সময়, কখনও অলৌকিক ঘটনা কিংবা ভাবনা। আবার একই দেব-দেবী অঞ্চল ভেদে ভিন্ন নামে, ভিন্ন আচারে পূজিত হয়ে আসছে। লৌকিক বিশ্বাসের শিকড় বহুধা বিস্তৃত। আবার এই পূজা আচারকে ঘিরেই তৈরি হয়েছে অজস্র লোকগান, লোককথা, লোকসাহিত্য সর্বোপরি লোকবিশ্বাস। আবার আঞ্চলিক সহাবস্থানে একাধিক জনজাতির দেব-দেবী বিশ্বাসের মধ্যেও

সমান্তরাল মেলবন্ধন ঘটেছে। আবার আচার-বিচারেও যথেষ্ট একাত্মতার মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

রাজবংশী সমাজ সহজ-সরল নিরুপদ্রব জীবনে অভ্যস্ত ছিল। ছিল মূলত কৃষিজীবী। হাতে বোনা কাপড়-চোপড়। বাহুল্যবর্জিত খাবার-দাবার। বিনোদনপ্রিয়। ভাবনাচিন্তায় উদারতা, গোষ্ঠীবদ্ধতা এবং স্বাধীন খেয়ালের প্রকৃতি প্রেমিক। প্রাকৃত, অতিপ্রাকৃত শক্তির পূজারি। সহজ, সরল এবং অকপট। মাতৃতান্ত্রিক। এই ছিল এক সময়ের রাজবংশী জনগোষ্ঠীর ঘরানা-পরিবার-সমাজ। অধিকাংশ লোকদেবতাই বিমূর্ত। পূজাস্থলে লাল-সাদা নিশান, প্রস্তরখণ্ড, মাটির ঢিবিই দেব দেবীজ্ঞানে পূজিত হত। হাল আমলে বিশ্বাস আচারে বহু পরিবর্তন হলেও মূল বিশ্বাসের নিদর্শন এখনও গ্রামেগঞ্জে গেলে দেখা যায়। তুলসীমঞ্চ সব বাড়িতেই অধিষ্ঠিত, ব্রাহ্মণ্যধারায় পরবর্তীকালে একাধিক লৌকিক দেবতা শাস্ত্রীয় স্বীকৃতিও লাভ করে। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমদিকে শঙ্করীয় বৈষ্ণব ভাবধারায় এতদঞ্চলের প্রায় সমস্ত সম্প্রদায়ই প্রভাবিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবধারারও সম্প্রসারণ ঘটে। সেই বিশ্বাসের জায়গাটা এখনও অবিকল একই রকম রয়েছে, তবে পরিবর্তনের ছোঁয়া একটু-আধটু লেগেছে বইকি।

চাঁদোয়া টাঙিয়ে পূজা পদ্ধতি আজও প্রচলিত। বাড়ির যে কোনও কাজকর্মে সে মঙ্গল কিংবা অমঙ্গলই হোক, তুসলীতলায় অধিকারী পুরোহিত বোষ্টম দিয়ে সেবা (পূজা) দেওয়ার রীতি এখনও প্রচলিত। তবে তা গ্রামাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। আবার মৃতদেহ সৎকারের পর দাহস্থানেও চাঁদোয়া টাঙিয়ে দেওয়া রাজবংশী সমাজের রীতি। নবজাতক শিশু কিংবা মৃত ব্যক্তির শান্তি স্বস্ত্যয়ন বা অশৌচ কাটানোর জন্যও তুলসীতলায় সেবা দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। আবার তুলসী মঞ্চের পাশে দণ্ডে লাল নিশানের অবস্থান প্রাচীন ভারতীয় কপিধ্বজের ক্ষীণ স্মৃতি বলে ধরে নেওয়া যায়। অন্যদিকে রাজবংশী সম্প্রদায়ের এক বিরাট বিশেষত্ব শুধু হিন্দু সংস্কৃতি নয়, বৌদ্ধ থেকে ভুটানি এমনকী মুসলমান সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধর্মীয় লোকাচারকে মান্যতা দিয়ে আপন ধর্মাচারের অঙ্গীভূত করেছে। এক অসম্ভব ধর্ম সহিষ্ণুতা, উদারতার প্রতিভূ এই সমাজ অনেক কিছুকে আত্মস্থ করে আজকের বাঙালি তথা হিন্দু-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হয়েছে। শাস্ত্রীয় অথবা তথাকথিত উচ্চবর্গীয় বর্ণহিন্দুদের কাছে তাদের ব্রাত্যতা ঘুচুক বা না ঘুচুক রাজবংশী সমাজ আধুনিক বাঙালি ধর্ম ও সংস্কৃতির অন্যতম ধারক-বাহক, এই কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

অন্তরে ও বহিরঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নিয়েছে। এমনকী বিয়েতে গ্রহণ বর্জনের কোনও বিধিনিষেধ কিংবা সংরক্ষণ গোঁড়ামির মানসিকতা আর নেই। এই ব্যাপারে সমগ্র বাঙালি সমাজও বিশেষ কৃতিত্ব দাবি করতে পারে। মিলিবে আর মিলাবের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতি মিলেমিশে একাকার।

সময়ের স্রোতে শিক্ষা-সভ্যতা তথা আধুনিকতার বিস্তার ঘটেছে। নগরায়ণ প্রসারিত হয়েছে। সংঘবদ্ধ সমাজ জীবনের আদি ছবি উধাও। বিশ্বায়িত বিজ্ঞাপিত আহ্লাদ আহ্বানে নতুনের হাতছানি। চিরায়ত সংস্কৃতির ধারা, আচার ব্যবহারের পরিবর্তন অনেক ক্ষেত্রে বিকৃতি হচ্ছে। তবে সময়ের দাবি মেনে পরিবর্তনকে স্বীকার করলেও ঐতিহ্য পরম্পরাগত ধারা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা যেমন জরুরি, তেমনই প্রয়োজন ঐতিহ্যের বিস্তার ও সঞ্চরণ। শুধু রাজবংশী সমাজ নয়, ভারতবর্ষের অসংখ্য জনজাতি সমৃদ্ধ কৃষ্টি-সংস্কৃতির সম্ভারে ভারতাত্মার যথার্থ বার্তা ঘোষিত এবং বিবিধের মাঝে মহামিলনের সুর উচ্চারিত হয়। আমাদের মতো দেশে শত শত জাতির নিজস্ব সত্তা বিকাশের মধ্যে দিয়েই দেশ মাতৃকার আসল সত্তার বিকাশ নিহিত আছে। পরিবর্তনকে অস্বীকার করে নয়, সামগ্রিক গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে আত্মস্থ করতে হবে।

খাদ্যদ্রব্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘরবাড়ি, ক্রিয়াকর্ম, বিনোদন থেকে পূজা-অর্চনা, আচার-ব্যবহার — সর্বত্রই রাজবংশী সংস্কৃতিতে পরিবর্তন এসেছে। রাজবংশী সমাজে লক্ষ্মীপূজার রীতি সাধারণ বাঙালি সমাজের রেওয়াজ, ক্ষত্রিয়-রাজবংশী সমাজে সংযোজিত হয়েছে। ক্ষেতি বা ডাকলক্ষ্মী পূজাই রাজবংশী সমাজের আদি ও অকৃত্রিম লক্ষ্মীপূজা। সরস্বতী পূজাও আসলে নব সংযোজন। সরস্বতী পূজা আসলে শারদীয়া দুর্গোৎসবে দশমীর দিন যাত্রা পূজার নামান্তর। যাত্রা পূজাই রাজবংশী সমাজের প্রকৃত বাণীবন্দনা। জামাই ষষ্ঠীও রাজবংশী সমাজের নিজস্ব আচার পর্ব নয়। পরে সংযোজিত হয়েছে। বরং এখন বিয়ে বা অষ্টমঙ্গলার আনুষ্ঠানিক পর্ব হারিয়ে গেছে। হারিয়ে যাচ্ছে বিষহরা পালাগান। বিয়ের শুরুতে বিষহরা মাড়েয়া গান শুরু হয়ে অষ্টমঙ্গলায় শেষ হত। সে-পর্ব সংক্ষিপ্ত হতে হতে প্রায় উঠে যাবার উপক্রম হয়েছে। বর্তমানে শোলার চুঙি বানিয়ে সাধারণ ভাবে বা স্বহস্তেই পূজা সারা হয়। অন্যান্য গানের পর্ব একেবারেই অন্তর্হিত। কলাপাতা কিংবা কলাগাছের খোলে সারি সারি বসে খাওয়ার রেওয়াজও ক্যাটারার কেড়ে নিয়েছে। দই-চুড়ার (চিড়া) পর্বও অতি সংক্ষিপ্ত। অনেক ক্ষেত্রে পানিছিটা বাবা, মিস্তর ধরার

পর্বও বাদ। বউভাতের দিন গ্রামের পাঁচ দেওয়ানির বধূর মান্যতা প্রদান এখন আর ততটা জরুরি নয়।

বিয়েতে গোত্রবিচার আজকাল আর বিশেষ দেখা হয় না। ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিয়ে প্রায়ই ঘটছে। বিয়ে বিভিন্ন প্রকার — ফুল বিয়ে, ঘরজিয়া বিয়ে, ছত্রদানি বিয়ে, ভাউজ বিয়ে, ঘর সোন্দানি বিয়ে, গন্ধর্ব বিয়ে ইত্যাদি সব এখন কাগজের পাতায়। রীতিনীতিতে একদম বর্ণহিন্দুর প্রভাব। আগে বরপক্ষ কন্যাপক্ষকে পণ দিত। এখন বরপণ না দিলে বিয়ে হয় না। গরুর গাড়িতে কোনও বরযাত্রী যাওয়ার ছবি আর নেই। ডিজেল, পেট্রোল গাড়িতেই বরযাত্রীর প্রচলন ঘটেছে। কড়কা, সানাই-এর বাজনা পার্টিও উধাও।

একসময় কত রকমের দইয়ের ব্যবহার ছিল। গলেয়া দই, ট্যাঙা দই, ঝাল ট্যাঙা দই, নাথুয়া দই, গ্যারস্থ দই, ছাঁচি দই, কাঁচা দই, আম কাঁচা দই ইত্যাদি বিচিত্র নামের, বিচিত্র স্বাদের দই। তৈরিও হত বিচিত্র পদ্ধতিতে। সে সময় মানুষ খেতেও পারত। যে কোনও অনুষ্ঠানে দই-চিড়ে অবশ্যই থাকত। পূজা-পার্বণের প্রধান উপাচারও ছিল দই-চিড়ে। ধর্মীয় ব্যাপারেও ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষণীয়। লৌকিক দেবদেবীর প্রাধান্য গ্রামাঞ্চলে থাকলেও শহর, মফস্বল শহরে নেই বললেই চলে। বর্তমান প্রজন্ম এসব ঠাকুর-দেবতার নামই জানে না। যখা ঠাকুর, বিষ্টু ঠাকুর, জাখালা ঠাকুর, বুড়াঠাকুর, ধরমঠাকুর, গাবুরঠাকুর, ঠাকুরানী ইত্যাদি অসংখ্য ঠাকুরের থান অবশ্য গ্রামগঞ্জের কোথাও কোথাও চোখে পড়ে। বাড়ির পাশে সারি সারি মাটির ঢিপি অথবা পাথরে অধিষ্ঠিত দেব-দেবীর ছোট ছোট ঘর আর পাশে পাশে নিশান এখন কমই দেখা যায়। বছরে এক-আধবার পূজাও দেওয়া হয়, তবে আগের সেই উৎসবের মেজাজ নেই। সামর্থ্যেও টান পড়েছে। ধর্মভয়ও আগে যেমন ছিল, তা আর এখন নেই। ঠাকুর ধরেছে, ভূতে পেয়েছে বলে আগের মতো ওঝা, গুণীন, গোঁসাই-এর কাছে মানুষ ছুটে যায় না। ঝাড়ফুঁক, তন্ত্রমন্ত্রেও সে আস্থা নেই। জলকষা আর শান্তির জলে এখন শান্তি পায় না। বরং অ্যালোপ্যাথি নির্ভরতা ষোলো আনা। তবে কবিরাজি, আয়ুর্বেদিকে এখনও বেশ আস্থা আছে। মহিলাদের মধ্যে এখনও তুকতাকে একটু-আধটু ভীতি আছে। গৃহনির্মাণেও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। উত্তরমুখো-পশ্চিমমুখো শোবার ঘরে আপত্তি নেই। ‘পুবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ। উত্তরে গুয়া, দক্ষিণে ধুয়া’ সে রীতি মানার বিশেষ সুযোগ নেই। ডারিঘর (অতীতের বৈঠকখানা) উধাও। বাঁশ, কাঠের বদলে পাকা বাড়ির ঝোঁক।

পান সুপারির চাষ শুধু খাওয়ার জন্য নয়, রীতিমতো বাণিজ্যিক-অর্থনৈতিক ফসল। রাজবংশী সমাজ বাড়িভাড়া দেওয়ার কথা ভাবতেই পারত না, এখন বাড়ি ভাড়া দিতে যেমন আপত্তি নেই, তেমনই ভাড়া বাড়িতে থাকতেও কুণ্ঠা নেই।

খাদ্যাভাসের ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। সকালের খাবার এখন আর চিড়ে-মুড়িতে সীমাবদ্ধ নয়। লুচি পরোটাও চলে। তবে গ্রামাঞ্চলে পান্তাভাত এখনও জনপ্রিয়। ছ্যাঁকা, প্যালকা, শুটকা, সিদোলের ব্যবহার প্রায় উঠে যাওয়ার মতই। তবে এসব খাবারের জিনিসপত্র জোগাড় করাও বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। থালাবাটি কাঁসা-পিতলের বদলে স্টিলে গিয়ে ঠেকেছে। আচার-অনুষ্ঠানে কলাপাতার কিংবা খোলের ব্যবহারও উঠে যাওয়ার মতই। শালপাতার ব্যবহার সমানভাবে প্রচলিত হয়েছে। পিঁড়ি পেতে খাওয়ার চল গ্রামাঞ্চলে থাকলেও শহরে চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চিতে বর্তমান প্রজন্ম অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। বাড়িতে কেউ এলে এখন আর পিঁড়ি পেতে দেওয়া হয় না। চেয়ার, টুল, বেঞ্চিই দেওয়া হয়। ফাস্ট লাইফে ফাস্ট ফুডও বেশ জায়গা করে নিয়েছে। বিশেষ করে বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে।

চাষবাসের ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। এক ফসলে আর কেউ চুপচাপ বসে থাকে না। আধুনিক পদ্ধতিতে রাসায়নিক সারে একাধিক ফসল। দেওয়া নেওয়ার পর্বও উঠে গেছে। গরু-মোষের বদলে ট্রাক্টর দিয়েও চাষবাস হচ্ছে। উন্নতমানের বীজ, বেশি ফলনের জন্য সেচ, সার, কীটনাশক প্রয়োগে দ্বিধা নেই। একসময় এসব এলাকায় একশোর বেশি প্রজাতির ধান চাষ হত। মহারাজা, ভুসরা, পাখরি, লোহাজং, বোচি, হুজুরি, ধাউলি, যশোয়া, বামনভোগ, নুনিয়া, কালোজিরা ইত্যাদি বিভিন্ন জাতের ধান। এসব ধান কোথাও কোথাও দেখা গেলেও অধিকাংশই হারিয়ে যাচ্ছে। চাষের কাজে 'হাওয়ালি' পদ্ধতি (পাড়া প্রতিবেশী মিলে কারও কাজ করে দেওয়া। শুধু হাঁস, মুরগি, পায়রার মাংস দিয়ে একবেলা খাওয়া দিলেই হত) 'গাঁতা' নেওয়া (পালা করে সবাই মিলে এক এক করে সবার কাজ করা) একদম উঠে যাওয়ার মতো। আগে এই পদ্ধতিতে চাষের কাজও করে নেওয়া হত। এভাবে পাড়া প্রতিবেশীর মহিলারা চিড়ে, চাল কুটে নিত। গম, ভুট্টা, যবের গুঁড়োও করে নেওয়া হত এই ছামগাইনে। ছাতুর মতো খাওয়া হত। এখন আর হয় না। বাচ্চারাও বিস্কুটে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। ডাল ভাঙার চাকতি এখন তো গ্রামের বাড়িতেও দেখা যায় না। জিনিসপত্র গরু-মোষের গাড়ি কিংবা ঘাড়ে করেই

আনা-নেওয়া করত। এখন সে জায়গায় এসেছে ঠেলা, রিক্সা, ভ্যান। মাথায় করে জিনিসপত্তর নিয়ে যাওয়ার ছবি বিশেষ দেখা যায় না। আগে রাজবংশী সমাজের মানুষ হেঁটে হেঁটেই বহুদূর যেত। তখন অবশ্য যানবাহন বিশেষ ছিল না। যান বলতে ছিল গরুর গাড়ি। এখন কিন্তু হাঁটার অভ্যাসটাও কমে গেছে। বদলে সাইকেল, ভ্যান, রিক্সা, অটো, বাস। জিনিসপত্র থাকলে তো কথাই নেই।

পোশাক-পরিচ্ছদে আলাদা পার্থক্য নেই। কী ছেলে, কী মেয়ে। পুরো আধুনিক। মধ্য বয়স্করাও প্যান্ট, শার্ট, পায়জামায় অভ্যস্ত। ধুতি পাঞ্জাবিও ধোপদুরস্ত। 'ফোতা', 'পাটানী', 'বুকুনি' প্রবীণারা ছাড়া কেউ পরে না। লুঙ্গির বহুল চল হয়েছে। মহিলারা শাড়িই পরেন। তবে গ্রামাঞ্চলে মহিলারা কাজকর্মে ও বাড়িতে থাকাকালীন ব্লাউজ সবসময় ব্যবহার করেন না। মেয়েরা চুড়িদার এমনকী প্যান্ট-শার্টও পরে। আর শহরাঞ্চলে তো পোশাকের আলাদা কোনও পার্থক্যই নেই। আধুনিক প্রজন্মের সন্তানদের কাছে টিভি, সিনেমার বিজ্ঞাপনের পোশাকই বেশি গ্রহণযোগ্য। তবে বাড়িতে গামছা পড়ে থাকার অভ্যাস এখনও রাজবংশীদের মধ্যে দেখা যায়।

নামকরণের ক্ষেত্রে আধুনিকতার ছাপ। সোমবার জন্ম হয়েছে বলে সোম্বারু, বিষুদবারে হলে বিষাদু এখন আর রাখা হয় না। নামকরণের ক্ষেত্রে বাঙালি সমাজের ক্ষেত্রে যে প্রবণতা রাজবংশী সমাজের বেলাতেও তাই। অতি আধুনিক নাম। ছেলেমেয়েদের স্কুলে পড়ার সংখ্যা বেড়েছে। গানবাজনা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেও রাজবংশী সমাজের মেয়ে মহিলারাও অকপটে অংশ নিতে পারে। কোনও বিধিনিষেধ আরোপিত নেই। বিভিন্ন কাজকর্মেও মহিলা, মেয়েরা সমান এগিয়ে। তবে লক্ষণীয় যে পুরানো ধ্যানধারণা ঐতিহ্য অপেক্ষা আধুনিক নাগরিক ধ্যান-ধারণায় বর্তমান প্রজন্ম বেশি আকৃষ্ট হচ্ছে।

বিনোদন মানসিকতাও ব্যাপক বদলে গেছে। টিভি, ভিডিও, সিনেমামুখর বিনোদন এখন রাজবংশী সমাজেও। ভাষাভঙ্গী বদলে যাচ্ছে। দোতরাডাঙ্গা, কুশানগান কিংবা পদ্মপুরাণের গানের আসর বাড়িতে বা মহল্লায় সে ভাবে আর বসে না। তবে ভাওয়াইয়া সংগীতের যথেষ্ট প্রসার ঘটেছে। শুধু রাজবংশী সমাজ নয়, অন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষও ভাওয়াইয়ার সুর মাধুর্য উপভোগ করেন। তবে পালাগান-লোকনাটকের ধারা গতিরুদ্ধ হওয়ায় পুরানো বেশ কিছু বাদ্যযন্ত্র হারিয়ে যাবার পথে। বেনা, সারিন্দা, খমক ইত্যাদি। তথ্যপ্রযুক্তির দৌলতে ইদানীং

অবশ্য পালাগানগুলি সিডি, ফিল্মবন্দি হচ্ছে। সেটাও ভাল দিক। তবে মেঠো স্বরলিপি মাটিধুলোতেই যে ভাল শোনায় সে পরিসর আর ভাওয়াইয়ার ক্ষেত্রেও নেই।

বিনোদনের আরেকটি অনুষঙ্গ লোককথা, কিচ্চা, লোকগল্পের পরিবেশ উধাও। আগে দাদু-দিদিমা-ঠাকুমাদের গল্পগুজবদের মধ্য দিয়ে পরবর্তী প্রজন্মে বাহিত হত। সেটা এখন হয় না। বর্তমান প্রজন্ম পড়াশোনা আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে বড় ব্যস্ত। শীতের সন্ধ্যায় আগুনের পাশে গোল করে বসে ইতিহাস, ভূগোল, শৌর্যবীর্যের সে-গল্পগাছা আর নেই। টিভি, ক্যাবল, ডিশ অ্যান্টেনা এখন গ্রামগঞ্জেও। শৈশব-কৈশোরের লোকক্রীড়া উধাও। গোল্লাছুট, দাড়িয়াবান্ধা, হাডুডু, ডাংগুলি, চোরপুলিশের খেলার উদ্দাম বিনোদন আর নেই। টিভির ফুটবল আর ক্রিকেট

খেলাধূলা	বিলুপ্ত / প্রস্থান
১। বুড়ি ভাষা খেলা।	১। বিলুপ্ত।
২। কাঁদো খেলা বা নারিকেল খেলা।	২। বিলুপ্ত প্রায়।
৩। ধূলিয়া খেলা (part of holly, mud) plastering each other an intimacy with).	৩। বিলুপ্ত প্রায়।
৪। চোকোর চাল খেলা (a game of skill)	৪। বিলুপ্ত প্রায়।
৫। ষোলো পাইটের খেলা।	৫। বিলুপ্ত প্রায়।
৬। ডোর খেলা বা ধাই খেলা (like ha-du-du)	৬। বিলুপ্ত প্রায়।
৭। পাখি খেলা।	৭। বিলুপ্ত প্রায়।
৮। ধূপ খেলা (like cricket)	৮। ক্রিকেট খেলা এসেছে।

১

সময় কেড়ে নিয়েছে। মাঠে অবশ্য ছেলেরা ক্রিকেট চর্চাই করে। একসময় মাছ মারাও ছিল বিনোদন। বিশেষ করে মহিলারা দল বেঁধে হৈ হৈ করে মাছ ধরতে নামত। 'বাহো'-তে পাড়ার সবাই একযোগে মেতে উঠত। এখন সে রকম জলাশয়ও নেই, মাছ মারাও উঠে যাচ্ছে। ঝাখৈ, ঢোসকা, ট্যামাই, বুরুং নয়, এখন জাল দিয়েই মাছ ধরার মধ্যেও এসেছে আধুনিকতা। বিনোদন নয় নিতান্ত ইচ্ছের ব্যাপার। বিনোদনে একাধিক আধুনিক বিষয় সংযুক্ত হওয়ায় স্বাভাবিক লোকক্রীড়াগুলি পরিসর হারিয়েছে। হারিয়ে গেছে গ্রামীণ মেলা পরবগুলির নিজস্বতাও।

লৌকিক বিশ্বাসেও চিড় ধরেছে। বৃক্ষোপাসনা রাজবংশী সমাজের সুপ্রাচীনকালের ঐতিহ্য। শিশুর দীর্ঘজীবন কামনায় জিগা গাছের পূজা কিংবা তার সঙ্গে সখীপাতার রেওয়াজ উঠে

গেছে। বট-পাকুড়ের বিয়ে দেওয়ার রীতিও প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। উঠে যাচ্ছে সখাসখী, ভাদাভাদির মতো অনুষ্ঠানগুলি। আগে পূজা-পার্বণে বর্ণহিন্দু ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ জানানোই হত না। অসমিয়া ব্রাহ্মণরাই অধিকারী ব্রাহ্মণদের সহযোগিতায় গৃহস্থবাড়ির পূজা-অর্চনার কাজকর্ম সম্পন্ন করতেন। এখন তথাকথিত ব্রাহ্মণদের দিয়েই পূজা-পার্বণ সম্পন্ন করা হয়। তারাও আসেন এবং রাজবংশী সমাজেরও কোনও সংরক্ষণ মানসিকতা নেই।

জীবন-জীবিকা ব্যাপ্ত হয়েছে। একসময় রাজবংশী পরিবার জমিতে কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকত। মোটা ভাত, মোটা কাপড়, মেঠো স্বরলিপি নিয়ে সহজ-সরল জীবনে অভ্যস্ত ছিল। একসময় চাকুরি বিমুখও ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সময়ের দাবি মেনে বিভিন্ন বৃত্তিতে অংশ নিচ্ছে। এখন ব্যবসা-বাণিজ্য থেকেও যাবতীয় কাজকর্মে সক্রিয় অংশগ্রহণ চোখে পড়ার মতো। এমনকী শ্রমসাধ্য কাজ ঠেলা, রিক্সা চালানো থেকে ট্রাক লরির লেবার, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক সবেতেই চোখে পড়ে। পুরুষ-মহিলার সংখ্যাও চোখে পড়ার মতো। বাড়ির মহিলারাও পরিবারের স্বার্থে মাঠে-ময়দানে শ্রমিকের কাজ থেকে ঝিয়ের কাজও করে সংসারের দায়িত্ব ভাগ করে নিচ্ছে। বর্তমানে কাজের পরিধি যেমন বেড়েছে, তেমনই রাজবংশী সমাজের অংশগ্রহণও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজবংশী সমাজের জীবন বৃত্তি, জীবন-জীবিকার হাত ধরেই শহর গ্রামের দূরত্ব কমে এসেছে। ভাষা, ব্যবহার, আচার-সংস্কৃতি, এমনকী মনন ক্রিয়াও পালটে যাচ্ছে। আর এভাবেই ঘটে চলেছে রাজবংশী সমাজের নিজস্ব সংস্কৃতির রূপান্তর।

রাজবংশী সমাজের এই বিবর্তন, পরিবর্তনের আলো-আঁধারি তার পেছনে বহু কারণ — সমাজসম্পর্ক, শিক্ষাসংস্কৃতি, যোগাযোগ, অর্থনৈতিক কাঠামো, সময় প্রক্ষীপ্ত বহু বিষয় ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। এমনকী রাজনৈতিক কারণও অনেকাংশে যুক্ত। সমাজ সময় প্রেক্ষিতে এই পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী ছিল। প্রগতির সূচকও বটে। এক সময়ের গোষ্ঠীবদ্ধ ও সংরক্ষণশীল রাজবংশী সমাজ বৃহত্তর বর্ণহিন্দু সংস্কৃতির সুদীর্ঘ সহাবস্থানে ভাব, শিল্প, সংস্কৃতির আদানপ্রদান হয়। ঘরে বাইরে এক ব্যাপক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। শিক্ষার প্রসার, গ্রামীণ পরিবারতন্ত্রে ভাঙন, যোগাযোগ ব্যবস্থার বৃদ্ধি, রেডিও, টিভি, সিনেমার প্রভাব ইত্যাদির জন্য প্রাচীন সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ত্বরান্বিত হয়। শহরের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি, সামাজিক নৈকট্য, প্রতিযোগিতা ইত্যাদির জন্য সমাজ কাঠামোর অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটতে থাকে। আবার কিছু

রাজবংশী মানুষ শিক্ষার প্রসার, অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা তারই সঙ্গে শহরমুখী মানসিকতার জন্য রাজবংশী সমাজের চিরায়ত সংস্কার, কৃষ্টির কাঠামো থেকে খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। অন্যদিকে বিশাল জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশ অর্থনৈতিক দূরবস্থার কারণে প্রাচীন ধর্মকর্মানুষ্ঠানগুলি পালনে অক্ষম হয়ে পড়েন। জীবন-জীবিকার স্বার্থে তারাও নিজস্ব সংস্কৃতি আচারে খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। আবার ধর্মীয় উদারতা, আদর্শায়িত সাংস্কৃতিক প্রভাব, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব সহ জাতীয়তাবাদী মানসিকতায় প্রাচীন সাংস্কৃতিক ধারার প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তন ঘটতে থাকে। সামাজিক অবস্থান, বিভিন্ন ভাষা, ধর্মসম্প্রদায়গত পারস্পরিক বোঝাপড়া, লেনদেন, ভাববিনিময়ের মধ্য দিয়েও নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতির ঘেরাটোপ খানিকটা ছিন্ন হয়। রাজবংশী সমাজও দ্রুত বিভিন্ন মিশ্র সংস্কৃতি, মনন মানসিকতার সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে আজকের রাজবংশী সমাজে উন্নীত হয়েছে। এই মহামিলনে বর্ণহিন্দু বাঙালি সংস্কৃতির যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তেমনই রাজবংশী সমাজের উদার মননে তা আত্মস্থ করার ক্ষমতাও সমান উল্লেখ্য। আবার পরম্পরায় নিজস্ব ঐতিহ্য, চেতনায় নিজস্ব কৃষ্টি-সংস্কৃতিও শত অসুবিধা অভাব-অনটন সত্ত্বেও যথাসাধ্য ধরে রেখেছে। এটাই এই জনগোষ্ঠীর বিশেষত্ব, নিজস্বতা। এখনও বিবিধ পরিবর্তনকে আত্মস্থ করেও কৌম সমাজের অনেক কিছুই বহন করে এই রাজবংশী জনগোষ্ঠী।

গ্রাম আর গ্রামেতে নেই। সমাজের আনাচেকানাচে তথ্যপ্রযুক্তির প্রভাব। সামগ্রিক উন্নয়ন, প্রতিযোগিতা, আধুনিক বিশ্বের বাজারমুখী মনন ক্রিয়া, উন্নত পৃথিবীর সমন্বিত নৈকট্য, সবকিছুই সব জনগোষ্ঠীকে এক বৃহত্তর সামাজিক অঙ্গনে একত্রিত করেছে, ধর্মকর্মে ভাবনায় আর নিজস্ব ছোট গণ্ডি নেই। এক সার্বিক মাত্রা সংযোজিত হয়েছে। রাজবংশী সমাজও এর ব্যতিক্রম নয়। আর্যায়নের সুদূরপ্রসারী আত্মিক ও ধর্মীয় প্রভাব তো ছিলই, বর্ণহিন্দুত্ব, ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতি, পরবর্তীকালে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, মিশ্র আচার-বিহারের প্রভাবে রাজবংশী সমাজের ধর্মসংস্কৃতির কাঠামোয় প্রভাব ফেলে। ধীরে হলেও এই পরিবর্তন প্রক্রিয়া আজও চলছে। তবে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে ধর্মকর্ম, মন্ত্রশক্তি, আচার-বিচারে। এর জন্য তথাকথিত পুরোহিত সম্প্রদায়ের রক্ষণশীল মানসিকতা যেমন দায়ী তেমনই দায়ী পরবর্তী উত্তরসূরী অভাব কিংবা বিশ্বাসে ফাটল।

আজকের বিশ্বায়নের প্রগতির যুগে পৃথিবীর কোন জনগোষ্ঠী তার নিজস্ব বৃত্তে আবদ্ধ থাকতে পারে না। গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়েই পৃথিবীর প্রতিটি জনগোষ্ঠী আধুনিক হয়ে উঠেছে।

রাজবংশী সমাজও এর বাইরে নয়। একটা নিরন্তর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে বলেই একান্ত চেনা লোকসমাজ মাঝে মাঝে অচেনা ঠেকছে। তবে এই সমাজ বিবর্তনের ছবি নমুনার ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ যেমন দরকার তেমনই সংরক্ষণ, বিশ্লেষণও দরকার। কারণ সামাজিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বর্তমানের উপাদান ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখা জরুরি নতুবা সামাজিক ইতিহাস রচনাই দুঃসাধ্য এবং অসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে।

অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে রাজবংশী সমাজজীবন থেকে। রাজবংশী সমাজের লোকায়ত ভুবন যেমন সংকুচিত হয়েছে তেমনি জীবনচর্যার প্রতিটি ধাপে বিভিন্ন পরিবর্তনের স্রোত লেগেছে। সেখানে নানাবিধ কারণ — সময়, পরিবেশ, আর্থ সামাজিক কাঠামো, পারিপার্শ্বিক চাপ সহ মনন চেতনার ক্ষেত্রেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে। কর্ম পরিসরের ব্যাপ্তি ঘটেছে, অবসর যাপন কমেছে। বিনোদনের পরিসর ও উপাদানেরও সংকোচন ঘটেছে। বিবর্তমান রাজবংশী সমাজের এই পরিবর্তন স্বাধীনোত্তর সময়ে শ্লথগতির হলেও বিশ শতকের শেষ কয়েক দশকে অত্যন্ত কঠিনভাবে আঘাত করেছে। স্বাভাবিকভাবে রাজবংশী সমাজ এক নতুন সংকটে আবর্তিত। কিছু সংগঠন, কিছু আন্দোলনও রাজবংশী সমাজ জীবনকে নতুনভাবে আলোড়িত করে। পাশাপাশি রাজবংশী সমাজের একটা শ্রেণি অপেক্ষাকৃত উন্নতি করে ব্যবসা কিংবা চাকুরিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে শহরমুখী হয়। নিজস্ব ভাবনায় তৈরি করে নেয় মধ্যবিত্ত সমাজ। যাদের ভাবনায় সমাজজীবন শুধু নয় সংস্কৃতির অঙ্গন থেকেও তারা সম্পর্কহীন হয়ে পড়ে। অতীতে রাজবংশী সমাজ জীবনে গ্রাম ও শহরের যে নিবিড় বন্ধন ছিল তাও ছিন্ন হয়। গ্রামীণ জীবনে অভাব, অনটন, পিছিয়ে পড়ার গ্লানি, সর্বস্ব হারানোর কষ্ট, আধিপত্যহীনতার বেদনা সেইসঙ্গে গ্রামে গ্রামে নব্য অবস্থাপন্ন ও প্রভাবশালী একটা শ্রেণির উদ্ভব রাজবংশী সমাজ জীবনকে সাংঘাতিকভাবে আলোড়িত করে। রাজনৈতিক সংশ্রব ও ইন্ধনও একটা অদৃশ্য বিভেদরেখার জন্ম দেয়। সেখানে ক্ষমতায়ন গ্রাম সমাজের চিরায়ত ছবিটিকেও পাল্টে দেয়। আবার ভূমি নির্ভর রাজবংশী সমাজ জীবন জীবিকায় ব্যস্ত হয়ে বিভিন্ন পেশায় যুক্ত হয়ে পড়ে। একদা যে রাজবংশী সমাজ বাঁধ রাস্তা কিংবা রেল লাইনের মাটি কাটার কাজ করত না, চা বাগানের কাজে যারা যুক্ত হয়নি, শিক্ষার ব্যাপারে যারা অনাগ্রাহী ছিল, এক ফসলি হৈমন্তিক ধান চাষের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল তাদের সামনে তখন ভয়ঙ্কর সমস্যা। একপ্রকার জীবন যুদ্ধের লড়াই শুরু হয়। সামগ্রিকভাবে রাজবংশী সমাজ

এলোমেলো হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে জোতদাররা জমি হারিয়েছেন, দেওয়ানী, গিরি, আধিয়ার প্রজার সম্পর্ক নষ্ট হয়ে তাদের মধ্যেও এক ধরনের অবসাদ, বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়। অভিবাসী মানুষদের আগমন, জমি জায়গার মূল্যবৃদ্ধি, বাসস্থান, চাষাবাদ, কর্মসংস্থান ইত্যাদির মাঝে কৌম ভাবধারার রাজবংশী মানুষজন এক চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়ে। শান্ত রাজবংশী গ্রামীণ সমাজে একটা চোরাস্রোত বইতে শুরু করে। বলতে দ্বিধা নেই রাজবংশী মানুষজন ক্রমশ পিছু হটতে থাকে। অনেকে ক্ষমতা আধিপত্য হারিয়ে রাজনৈতিকভাবে যুক্ত হয়, অনেকে বিক্ষিপ্ত আন্দোলনে সামিল হয়, কিছু সংগঠনও তৈরি হয়। তবে সামগ্রিকভাবে বলা যায় এইসবের ফলে রাজবংশীদের আত্মসচেতনতা যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি একটা প্রচেষ্টাও শুরু হয় আর্থ-সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভের। বিভিন্ন পেশায় ছড়িয়ে পড়ে, শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়ে এবং কাজকর্মের মধ্যেও বর্ণহিন্দুদের ভাবধারার প্রভাব পড়ে। এই প্রচেষ্টায় অনেকে শহরমুখী হয়, কাজের সন্ধানে বহু যুবক যুবতী ভিন রাজ্যেও পাড়ি দেয়, কিছু মানুষ শহরাঞ্চলের বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম সেটা ঠেলা রিক্সা চালানো থেকে মুটে মজুর, অসংগঠিত ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। বাড়ির মহিলারাও বাদ যায় না, তারাও ঠিকে ঝি থেকে নির্মাণ শিল্পের যোগানদার শ্রমিক, আয়া বিভিন্ন কাজে ছড়িয়ে পড়ে। যদিও মাতৃতান্ত্রিক রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে নারীরা কৃষিকাজে পুরুষের সঙ্গে সমান তালে অংশগ্রহণ করতেন। কিন্তু বর্তমান এই অবস্থা পূর্বে ছিল না। ফলত: রাজবংশীদের সমাজজীবনে এক শূন্যতার সৃষ্টি হয় বিশ শতকের শেষ কয়েক দশকে। রাজনৈতিক কারণেও গ্রামগুলি ভিন্ন এক সমাজজীবনের আধার বিন্দু হয়ে ওঠে। সম্প্রদায়গত মনোভাবের সূক্ষ্ম বিভেদরেখাও ভেতরে ভেতরে সক্রিয় হয়। এই সুযোগে রাজবংশী সমাজের অনেকের মধ্যে হীনমন্যতা থেকে জাত্যাভিমানের (Superior Complex) বিষয়টি জাগ্রত হয়। অন্যদিকে অভিবাসী উদ্বাস্তু মানুষ আর্থ সামাজিকভাবে থিতু হওয়ার পর একপ্রকার আগ্রাসী মনোভাব পোষণ করতে থাকে। গ্রামের সহজ সরল স্বাভাবিক বিন্যাস বিঘ্নিত হয় এর ফলে। আর এই ডামাডোলে রাজবংশী সমাজের লোকায়ত ভুবন, পূজা-পার্বণ, আচার-সংস্কার, বিনোদন, সংস্কৃতির পরিসর ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অনেক কিছুই হারিয়ে যায়। বিবর্তিত হতে থাকে আরো অনেক কিছু। তার মধ্যে অন্যতম সাংস্কৃতিক পরিসর। কেননা রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি অনেকটাই পূজা পার্বণভিত্তিক এবং লোকায়ত ধর্মাশ্রয়ী। কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত। আবার তথাকথিত জোতদাররা

পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, তাদেরকে ঘিরেই পাড়া, টারি, গ্রাম, সমাজ, পাল-পরব, বিনোদন, ভালো-মন্দ ইত্যাদি ছিল। জমিদারি উচ্ছেদ আইনে তাদের অবলুপ্তি; বর্গাদার, তেভাগা আন্দোলনে আধিয়ার জোতদারের সম্পর্কের অবনতি চিরায়ত রাজবংশী সমাজজীবনের ছন্দকে বিনষ্ট করে। হারিয়ে যায় পালাগান, পাঁচালী, পালাটিয়া, দোতরা, কুশানের মত লোকশিক্ষার মাধ্যমগুলি। গীদাল, বৈরাগীরা নেমে পড়েন জীবন সংগ্রামে। পরবর্তী প্রজন্মও আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। এইভাবে চোরচুন্নী, সত্যপীরের গান, খ্যাপার গান, যুগীর গান, চার যুগের গান ইত্যাদি শ্রুতির বাইরে চলে যায়। পৃষ্ঠপোষকতার লোকজনও সরে যায় নতুন সময়ের দাবি মেনে। ইতিমধ্যে যোগাযোগ, শিক্ষা, বিনোদনের টিভি, রেডিও, ভিডিও বৈদ্যুতিন মাধ্যমের আগমন ঘটে। রাজবংশী লোকজীবনের অনুষঙ্গগুলি মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়। অপরদিকে বর্ণহিন্দুদের অবস্থান এবং তাদের উদ্যোগে গ্রামে গ্রামে মিশ্র সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে। নতুন প্রজন্ম আধুনিকতার বশবর্তী হয়ে পড়ে। সব মিলিয়ে রাজবংশী সমাজজীবন, তাদের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন দ্রুত ঘটতে থাকে। পালাগানের আসর বসে না, পূজা-পার্বণে সেই কলেবর থাকে না, জীবনচর্যায় বিভিন্ন আচার সংস্কারে শিথিলতা আসে। বিভিন্ন ভাবধারার অনুপ্রবেশ (বিভিন্ন ধর্মগুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ, বৈষ্ণব ভাবনা ইত্যাদি) ঘটে। লোকায়ত সংস্কৃতির বিষয়গুলি অন্তরালে যেতে থাকে। আমাতি, বৈশাখী, আষাঢ়ী, তেরেয়া, যাত্রা পূজার মত অনুষ্ঠানগুলির গুরুত্ব কমতে থাকে। বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীর লোকান্তর ঘটে। গোরখনাথ, সোনা রায়, ডাংধরা, রাখাল ঠাকুর ইত্যাদি বহু দেবদেবীর প্রভাব কমতে থাকে। নতুন নতুন কিছু পূজা-পার্বণ সংযোজিত হয়। যেমন — লক্ষ্মী পূজা, সরস্বতী পূজা, জামাইষষ্ঠী। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের গান, পূজা-পার্বণের গান হারিয়ে যেতে থাকে। এদিকে অধিকারী ব্রাহ্মণের সংখ্যা কমতে থাকায়, নতুন প্রজন্ম এই পেশায় না আসায় পূজা-পরবের অনুষ্ঠানগুলি সংকুচিত হতে থাকে। সর্বোপরি রাজবংশী কৃষিভিত্তিক অনুষ্ঠানগুলি বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কারণ জমি হারিয়ে গবাদি পশু অথবা কৃষিকৃত্যাদির অনেক অনুষ্ঠানই লোকান্তরিত হয়। যেমন — ভোগা দেওয়া, আশ্বিন মাসে ক্ষেতে প্রদীপ দান (পাঁচকোল বাতি) আগ নেওয়া, নয়াখাওয়া, বুড়াবুড়ি, হুদোম দ্যাও এরকম আরও বহু অনুষ্ঠানের প্রচলন কমে যায়। আগ্রহও হারিয়ে ফেলে। কারণ এই কৃষিকে ঘিরেই রাজবংশী সমাজ জীবন সামগ্রিকভাবে আবর্তিত হত। কৃষিকে ঘিরেই জীবনচর্যা, অনুষ্ঠানাদি, মননভাবনা সর্বোপরি বিনোদন। স্বাভাবিকভাবে ভূমি

বিচ্যুত হয়েই রাজবংশী সমাজ-সংস্কৃতি সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং এক বিবর্তনের মধ্যে নিমজ্জিত হয়। যে ধারা আজও অব্যাহত এবং বলা যায় আরও বেগবান হয়েছে। আজকের সময়ে রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক অঙ্গন বিবর্তমান এবং এটাই সংস্কৃতির ধর্ম, যুগে যুগে সময়ে সময়ে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বিবর্তিত হয়। সেখানে আক্ষেপের জায়গা থাকবে কিন্তু সাংস্কৃতিক বিবর্তন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, বিভিন্নভাবে তা সংগঠিত হয়। সেটা যদি বিকৃত কিংবা আগ্রাসনের শিকার অথবা অবদমিত হয় তাহলে সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে চিন্তার। যেকোন জাতি বা গোষ্ঠীর পক্ষে তো বটেই সামগ্রিক সমাজ ব্যবস্থা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বিপজ্জনক এবং অশুভ।

রাজবংশী মানুষের যে স্বাভাবিক স্বভাব সহজ, সরল, উদারতা, অতিথিপরায়ণ সেটা আজকে আর নেই। ভেতরে ভেতরে প্রতিযোগী এক ক্ষুব্ধ মানসিকতা ও প্রতিবাদী বোধ ভাবনার শরিক আজকের রাজবংশী সমাজ। সামগ্রিকভাবে নয় তবে বৃহৎ অংশের মধ্যে এই সূক্ষ্ম অনুভূতি সক্রিয় হয়েছে। যার ফলে বিভিন্ন সংগঠন, আন্দোলনে এরা ছুটে যান চাপা এক অভিমান নিয়ে। 'নিজভূমে পরবাসী'র যন্ত্রণা নিয়ে তারা সমবেত হন। বর্ণহিন্দু অভিবাসী মানুষের সঙ্গে এক অদৃশ্য বিভেদরেখার চোরাস্রোত বহমান। পারস্পরিক শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, মর্যাদা কিংবা সহমর্মিতার যে জায়গাটি ছিল সেটা বিগত কয়েক দশকে ক্রমশ নষ্ট হয়েছে। উভয় সমাজই এই বন্ধনের জায়গাটিকে উপেক্ষা করেছে। ফলত: সমাজের যে উপাদানগুলি (Ingradiant) সমন্বয় সাধনে কার্যকরী ছিল সেগুলিকে বিভিন্নভাবে নষ্ট হয়েছে। রাজনৈতিক কারণেও সেটা হয়েছে, বরং বলা যায় এই বিভেদকে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সমাজ বিন্যাসের উর্বর ভাবনায় এই উপাদানগুলিকে কাজে লাগানো হয়নি। বরং রাজনৈতিক স্বার্থে উপেক্ষা করা হয়েছে। ফলে আর্থ-সামাজিক কাঠামো পরিবর্তনের সাথে সাথে মনন ও সহনশীলতার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহমর্মিতার জায়গায় সামগ্রিক যে জায়গাটি ছিল বিগত চার-পাঁচ দশকে সেটা বিনষ্ট হয়। সেটার জন্য বর্ণহিন্দুরা যেমন দায়ী, রাজবংশী সমাজও সমান দায়ী। উভয় সমাজের কিছু মানুষের আগ্রাসী মনোভাব যেমন দায়ী তেমনি পিছিয়ে পড়ে মানসিকতারও বিবর্তন ও অবনতি ঘটেছে বৃহত্তর রাজবংশী সমাজের একটা বিশাল অংশের মধ্যে। রাজবংশী সমাজের নতুন সৃষ্টি হওয়া যে মধ্যবিত্ত সমাজ (চাকুরি, ব্যবসা

কিংবা অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাবলম্বী) তারাও নিজেদেরকে সরিয়ে রাখে। ফলত: বিভেদ রেখা কিংবা সমাজ বিন্যাসের ভাবনায় গ্রাম সমাজের চরিত্র বদলে যায়। সেটারই প্রতিফলন ঘটে বিভিন্ন সময়ের ঘটনা কিংবা সামাজিক প্রক্ষেপে।

তথ্য সমীক্ষণ ও বিশ্লেষণে রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তনে নানাবিধ কারণ উঠে আসে। অতীতে ব্রিটিশ সরকারের সময়কালে সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে উত্তরবঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী ছিল রাজবংশী সম্প্রদায় এবং এদের অর্থনৈতিক জীবনের মূল ভিত্তি ছিল কৃষি অর্থনীতি।[২] কৃষি বলয়ের প্রায় সব জমিই ছিল রাজবংশী ও কিছু মুসলমান সম্প্রদায়ের অধীনে। এই ব্যবস্থাটি স্বাধীনোত্তর সময়ে ভেঙে যায়। জমিদারী উচ্ছেদ আইন (১৯৫৩) ও জমির উর্দ্ধসীমা আইনের (১৯৫৫) আওতায় রাজবংশী জোতদার সমাজ জমি হারায়। পরবর্তীকালে অপারেশন বর্গা আইনে রাজবংশী সমাজের চিরায়ত ভূমি সমাজ ব্যবস্থাটি ছত্রখান হয়ে পড়ে। গিরি, আধিয়ার ব্যবস্থা লোপ পেয়ে সম্পর্কের অবনতি হয়। অনেক জোতদার নিজেই চুকানিদার ও আধিয়ারে (ভাগচাষি) পরিণত হয়। সামন্ত্রতান্ত্রিক মানসিকতার দিক থেকে সমাজ বিমুখ করে তোলে ভূমি হারানো জোতদারকে। সামাজিক বিন্যাসের ক্ষেত্রেও তার প্রভাব পড়ে। স্বাভাবিক ভাবে সাংস্কৃতিক বিবর্তনকে তরান্বিত করে। সম্পূর্ণ ভূমি নির্ভর সমাজ এক নতুন সংকটে আবর্তিত হতে থাকে। ভূমি ছেড়ে বিভিন্ন পেশায় ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলটিও সংকুচিত হতে থাকে। আবার সাতের দশকে বিপুল অভিবাসনের ফলে ভূমির উপর চাপ পড়ে। গ্রামগঞ্জের জনবিন্যাসের চেহারাও বদলে যায়। একটা অদৃশ্য প্রতিযোগিতাও শুরু হয়। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদহের ক্ষেত্রেও তাই। স্বাধীনতার আগে এই জেলাগুলিতে রাজবংশী, পলিয়া, দেশীয়াদের প্রতিপত্তি ও সংখ্যাধিক্য ছিল বলা যায়। কিন্তু দেশ ভাগ ও পরবর্তীকালে ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের আগমনে গোষ্ঠীবদ্ধ ও সংরক্ষণশীল রাজবংশী সমাজ বৃহত্তর বর্ণহিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে সহাবস্থানে বাধ্য হয়। স্বাভাবিকভাবে পরিবর্তনের প্রবণতাও তৈরি হয়। এই তিন জেলায় (উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ) তাই গাঙ্গেয় প্রভাব অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করে।

রাজবংশী জোতদারদের জীবন সংস্কৃতির আরেকটি ঋণাত্মক দিক (Negative) ছিল আধুনিক শিক্ষার প্রতি উদাসীন মনোভাব[৩] এবং ভবিষ্যতের চিন্তা না করে সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতার কিছু দিক। যেমন - ভোগবিলাস যুক্ত জীবন, পারিবারিক পরম্পরা, সামাজিক মর্যাদা, জোতদারি

ঐতিহ্য প্রভৃতি রক্ষায় আড়ম্বরপূর্ণ বেহিসেবি খরচ, মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদি কিছু বিষয়।[৪] যা পরবর্তীকালে পরিবারগুলিকে চরম বিপদের মুখে ঠেলে দেয়। সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোও এর ব্যতিক্রম ছিল না। পূজা-পার্বণ থেকে দান ধ্যান, গান বাজনা, খাওয়া দাওয়া সবেতেই বেহিসেবি খরচের বিষয়টি তথ্য সমীক্ষায় উঠে আসে। মামলা মোকদ্দমায় সর্বস্বান্ত হওয়ার ঘটনাও কম নয়। দেউনিয়া (দেওয়ানী) মানসিকতায় অনেক জোতদারের সর্বনাশ হয়েছে। পরবর্তীকালে তারা আধিপত্যহীনতাবোধ থেকে হতাশায় পর্যবসিত হয়েছেন। শিক্ষার বিষয়ে উদাসীন এবং অনাগ্রহী থাকার ফলে পরবর্তীকালে তাদের পরবর্তী প্রজন্ম অন্যান্য পেশাতে পিছিয়ে পড়ে। শিক্ষার বিষয়ে আগ্রহ ও সচেতনতা পরবর্তী সময়ে বৃদ্ধি পেলেও ততদিনে অনেক দেরি হয়ে যায়। আবার রাজবংশী সমাজের কিছু মানুষ শিক্ষালাভ করে চাকুরি বা অন্য পেশায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে শহরবাসী হয়ে সমাজ বিমুখ হয়। সাংস্কৃতিক বিবর্তনের শরিক হয়। আচার ব্যবহার থেকে সংস্কার এমনকী অসবর্ণ বিবাহের সম্পর্কেও আবদ্ধ হয়। আবার একটা শ্রেণির মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণি মানসিকতারও জন্ম হয়। স্বাভাবিকভাবে সংস্কৃতির পরিসরে তার সামগ্রিক প্রভাব পড়ে।

আবার আধুনিকতার অনুষঙ্গগুলিও গ্রামীণ সমাজে বিস্তার লাভ করে। শহরের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ, যোগাযোগের সম্প্রসারণ, দূরদর্শন, ভিডিও, সিনেমা, বিভিন্ন সমাজের সঙ্গে নৈকট্য, পেশাগত বৈচিত্র্য ইত্যাদি কারণেও রাজবংশী সমাজের নিজস্ব সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটে।[৫] এখানে হীনমন্যতা বোধ, কিংবা অনুকরণাত্মক মানসিকতাও কার্যকরী হয়। আর্থ-সামাজিক কাঠামো পরিবর্তন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাজবংশী সমাজের আর্থ-সামাজিক কাঠামো বিগত কয়েক দশকে বিশেষ করে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়কাল থেকে দ্রুত পরিবর্তিত হয়। শুধুমাত্র কৃষির উপর নির্ভরশীলতা যেমন কমে মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গিরও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। স্বাভাবিকভাবে অ-কৃষি কেন্দ্রিক অনুষ্ঠানগুলির গুরুত্ব একটা শ্রেণির কাছে কমে যায় আবার অন্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে সংশ্লেষণ ও আত্তীকরণের প্রক্রিয়াও চলতে থাকে। পাশাপাশি রাজবংশী সমাজের মধ্যে আচরিত ধর্মাকর্মানুষ্ঠানগুলির অনেকগুলি অবলুপ্তির পথে যায়।[৬] সেইসঙ্গে শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের সাথে সাথে ওঝা, গুনীন, ভৌরিয়া এদের গুরুত্বও কমে যায়। নির্দিষ্ট বিধিনিষেধ ও সংরক্ষণশীলতার জন্য পূজা পদ্ধতির মন্ত্রাবলী এমনকী অধিকারী পুরোহিত সম্প্রদায়েরও প্রভাব প্রতিপত্তি ও সংখ্যাও কমে যায়। স্বাভাবিকভাবে ধর্মীয় সংস্কৃতির জায়গাটিও

সংকুচিত হতে থাকে। এভাবেই লোকায়ত, ধর্মীয় পূজা-পার্বণ থেকে আচার ব্যবহার সংস্কার সর্বোপরি সামগ্রিক জীবনচর্যার বিষয়গুলিও পরিবর্তিত হতে থাকে। ফলশ্রুতিতে বৃহত্তর রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তন প্রক্রিয়াটি সামগ্রিকভাবে সংঘটিত হয়। উল্লেখিত বিভিন্ন কারণের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রক্রিয়া কার্যকরী হয়ে এই বিবর্তনকে বিগত চার-পাঁচ দশকে তরান্বিত করেছে। আরেকটি বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ্য যে স্বাধীনতা ও দেশভাগের ফলে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি বহুলাংশে ক্ষতিগ্রস্থ হয় কারণ বৃহত্তর রাজবংশী সমাজ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। একটা অংশ থেকে যায় পূর্ববঙ্গে, আরেকটা বৃহৎ অংশ ঢুকে যায় অসম প্রদেশে। ফলে প্রাদেশিক অধীনতা যেমন কার্যকরী হয় তেমনি অঞ্চলভিত্তিক বিভাজনেও রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়। ভাষাগত, সংস্কৃতিগত বিমিশ্রণের শিকার হয়। ভবিষ্যতেও হয়ত এই প্রক্রিয়া চলবে তবে এই পরিবর্তন নৃ-গোষ্ঠীগত প্রেক্ষাপটে সম্পন্ন না হলে এই জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব যেমন অনেক প্রশ্নের জন্ম দেবে তেমনি জাতিসত্তার সংকটে এই জনগোষ্ঠী আবারও আবর্তিত হবে। কারণ সাংস্কৃতিক পরিসরই যে কোন গোষ্ঠীর নৃ-গোষ্ঠীগত চিহ্ন বহন করে।[৭]

তথ্যসূত্র :

১. রায়, গৌরাঙ্গ চন্দ্র; কোচবিহারের রাজবংশী সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক রূপান্তরের রূপরেখা, কামরূপ থেকে কোচবিহার, আমজাদ হুসাইন (সম্পাদিত), সুহৃদ পাবলিকেশন, কল - ৭৩, ২০১৪, পৃষ্ঠা - ১৫৫

২. Gruning, J F; Eastern Bengal & Assam District Gazetteers, Jalpaiguri, Allahabad, 1911, reprinted N. L. Publisher, Siliguri 2008. Page - 102

৩. রায়, নির্মলচন্দ্র; জলপাইগুড়ি ডুয়ার্সের রাজবংশী জোতদার সমাজ ও তাদের জীবন (প্রবন্ধ) আনন্দগোপাল ঘোষ, নির্মলচন্দ্র রায় (সম্পা) ১৯৪৭ পরবর্তী উত্তরবঙ্গ। সংবেদন; বি এস রোড, মালদা - ২০১৪। পৃষ্ঠা - ১৫৪

৪. ঐ, পৃষ্ঠা - ১৫১

৫. রায়, গিরিজাশংকর; উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির পূজা-পার্বণ, ২য় প্রকাশ, এন. এল. পাবলিশার্স, শিলিগুড়ি, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা - XXXI

৬. রায়, গিরিজাশংকর; উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির পূজা-পার্বণ, ২য় প্রকাশ, এন. এল. পাবলিশার্স, শিলিগুড়ি, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা - XXXII

৭. রায়, জ্যোতির্ময়; রাজবংশী সমাজ দর্পণ, ভাষাবন্ধন, কল - ৩২, পৃষ্ঠা ২৫৮-২৬৪, ২০১২

পরিশিষ্ট - ১

।। বিষয় নির্দিষ্ট সাক্ষাৎকার ।।

(Focused Interview)

প্র: *আপনার নাম?*

উ: ক্ষীরেন্দ্রনাথ সরকার

প্র: *বয়স?*

উ: ৭৮ বৎসর।

প্র: *ঠিকানা?*

উ: পশ্চিম রামপুর, পো: রামপুর, জেলা - কোচবিহার

প্র: *পেশা?*

উ: প্রাইমারি শিক্ষকতা। তবে কৃষিকাজও করি।

প্র: *আপনার পরিবারে কে কে আছে?*

উ: তিন ছেলে ও দুই মেয়ে।

প্র: *তারা কে কী কাজকর্ম করেন?*

উ: তিন ছেলেই ব্যবসা করে। মেয়েদের বিয়ে হয়েছে।

প্র: *আপনার শৈশব-কৈশোরের কথা বলুন?*

উ: আমাদের ছোটবেলা ছিল খোলামেলা। একান্তবর্তী বড় বাড়ি। কাকা-জ্যাঠা সবাই মিলে এক সাথে থাকতাম। সব সময় বাড়ি গমগম করত। খাওয়া-দাওয়া, গল্পগুজব, গান বাজনা। আমরা মাঠেঘাটে খেলে বেড়াতাম। মেলা বাড়ি, গান বাজনা গ্রামে গ্রামে লেগে থাকত। আমি নিজে পদ্মপুরাণ গান করতাম। ধান কাটার পর তখন গ্রামে গ্রামে শুধু গান বাজনা হত। সেদিনকার দিক অন্যরকম ছিল, একদম অন্যরকম। একদম কেচাল ছিল না। রাজনীতিও ছিল না।

প্র: *তখন রাস্তাঘাট যোগাযোগ ব্যবস্থা কেমন ছিল?*

উ: রাস্তাঘাট মানে কাচা মাটির, পাকার কোন মিল নেই। গাড়ি ঘোড়াও বিশেষ ছিল না। সাইকেলই বেশি ছিল না। গাড়ি বলতে গরুর গাড়ি। মানুষ হেঁটে হেঁটেই অনেক দূর যাতায়াত করত।

প্র: তখন পড়াশোনার কী ব্যবস্থা ছিল?

উ: স্কুল দু-একটা। বারবিশায় একটা। সিঙ্গিমারী রামপুরে একটা। ছাত্র বেশি ছিল না। ছাত্রী প্রথমে ছিল না। বইপত্তর জোগাড় করাই মুশকিল ছিল। আমাদের বাড়ির বাবা-জ্যাঠারা বক্সিরহাট হয়ে মাঝে মাঝে কোচবিহার যেত। ওরাই নিয়ে আসত। তখন মাস্টার মশাইয়ের সংখ্যাও ছিল কম। আমার জেঠামশাই ছিল একটু শিক্ষিত, তিনি ছিলেন স্কুলের সেক্রেটারি — রামকান্ত সরকার।

প্র: আপনার বাড়িতে কে কে ছিল?

উ: একজন মাস্টার মশাই আমাদের বাড়িতেই থাকত। তিনি আমাদের পড়াতেন। স্কুলে ও বাড়িতে।

প্র: মানুষ তখন বাজার-ঘাট কোথায় করত?

উ: বারবিশার হাট, হাট, কুলকুলির হাট। সারা সপ্তাহের জিনিসপত্র ঐ একদিনেই সংগ্রহ করত। শাকসবজি মানুষ বেশি কিনত না। দেশলাই, চিনি, কেরোসিন তেল এসবই কিনত।

প্র: আপনাদের জমিজিরেত কত ছিল?

উ: আমাদের জমি ২০-২৫ হাল হবে। অনেক আধিয়ার ছিল। সবাই আমাদেরই আত্নীয়স্বজন।

প্র: এখন জমি কীরকম আছে?

উ: এখন বেশি নেই। ২০-২২ বিঘার মত আছে।

প্র: জমিগুলো কীভাবে হাতছাড়া হল?

উ: ভাগ বাটোয়ারা হল। অনেক জমি খাস হল। আমাদের জমিগুলো থাকলেও কাকা-জেঠারা ছেলেমেয়েরা ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়ে জমিগুলো আর ধরে রাখতে পারেনি। তাঁরা এখন অন্যান্য কাজে বাইরে চলে গেছে।

প্র: এখন কী করে সংসার চলে?

উ: আমার তো পেনশন আছে। ছেলেরা তিনজনই ব্যবসা বাণিজ্য করে। আর জমিগুলো আমি কামলা কিষান দিয়ে চাষ করি বছরে একবার।

প্র: গলায় পৈতা আছে?

উ: পৈতা আগে ছিল না।

প্র: কবে নিলেন?

উ: সাতের দশকের মাঝামাঝি।

প্র: তুলসীর মালা নিয়েছেন?

উ: না নিইনি।

প্র: আপনার বাড়ির পূজা কে করেন?

উ: অধিকারী পুরোহিত। বিয়ের সময় অসমীয়া বামুন আসে। দুই-তিনটা গ্রামের একজন ব্রাহ্মণ।

প্র: বিয়ের সময় কোন পুরোহিত কাজ করেন?

উ: অসমীয়া ব্রাহ্মণ। তবে

প্র: আগে বাড়িতে কী কী পূজা হত?

উ: শিব পূজা, মনসা পূজা, থানছিড়ি, যাত্রাপূজা আর ঠাকুর বাড়িতে গাবুর ঠাকুর, বুড়া ঠাকুর, কুবের, মাশান, মহাকাল, রাখাল, হরিপীর আরও অনেক ঠাকুর।

প্র: এখন বাড়িতে কী কী ঠাকুর আছে?

উ: মনসার মন্দির আছে। শিবঠাকুর।

প্র: পুরোনো দিনের খাবার কী কী খান?

উ: ছ্যাকা, প্যালকা, সিদোল, শুকটা, ঢিংসীমা, আদাকুটা এখন খাওয়াই হয় না। পাওয়াই যায় না। এক আধদিন ছ্যাকা খাই।

প্র: আগেকার পোশাক-আশাক কেমন ছিল?

উ: ওই গিলাপ, চাদর, গঞ্জি, মহিলারা ফোতা, পাটানী পড়ত। আগে আমরা গামছা পড়তাম।

প্র: আগে রাজবংশী মানুষরা কৃষি ছাড়া কী কী কাজ করতেন?

উ: কৃষিকাজই করত। অন্যান্য কাজের জন্য বাইরের লোক আসত। শীতের সময় বাইরে থেকে বিভিন্ন কাজ করার জন্য অনেকে আসত। কাঠের কাজ, রাস্তাঘাট এইসব কাজের জন্য লোক আসত।

প্র: ছোটবেলায় কী কী গান শুনেছেন?

উ: দোতারা ডাঙ্গা, কুশান, বিষহরা, পদ্মপুরাণ গান, দেহতত্ত্ব মনঃশিক্ষার গান। বিভিন্ন পূজার গান।

প্র: এখন এই গানগুলো কেন শোনা যায় না?

উ: লোকজনই নেই। সবাই পেটের দায়ে ব্যস্ত। আগে ধান কাটাই মাড়াই এর গানের আসর বসত। কত গীদাল দোয়ারী এই গ্রাম সেই গ্রাম করে টানা ৭-৮ দিন করে আসর বসাত। এখন সে পরিবেশই নেই। সত্তর সাল অবধি ঠিকঠাকই ছিল। তারপরে সব ছিন্ন ভিন্ন হল। আর দেহতত্ত্ব, মনঃশিক্ষা গানের গোঁসাইরাও হারিয়ে গেল। মানুষও এখন সবাই বিভিন্ন কাজে ছোটাছুটিতে ব্যস্ত, দল করাই মুশকিল। আমারপদ্মপুরাণের দলও আর নেই। অভাব, অনটন, দলাদলির কারণে হারিয়ে গেল। আর তেমন উদ্যোগী মানুষও নেই। আগে এক একজন জোতদার এক একটা দলের খরচ দিতেন। এখন কোথায়?

প্র: যাত্রাপূজা, বিষুয়া পরব পালন করেন কীনা?

উ: এখন করি তবে আগের মত অত নিয়মরীতি পালন হয় না। মা থাকাকালে অনেক নিয়ম ছিল।

প্র: গ্রামে এখন কী কী গান বাজনার আসর বসে?

উ: না। মাঝে মধ্যে কুশান গানের আসর বসে। এখন সেটা যাত্রার মত।

প্র: আশেপাশের গ্রামে মেলা-উৎসব কী কী হয়?

উ: আগে দোল সওয়ারীর বড় মেলা হত। এখন নেই। অষ্টমী স্নান মেলা হয়।

প্র: আগের দিনগুলো ভালো ছিল, না এখন?

উ: আগের দিনে সুখ ছিল। অনেক কিছু ছিল না কিন্তু মানুষগুলো খেয়ে পড়ে আনন্দেতে ছিল। এখন তো সুখ শান্তি অন্যরকম। সব মানুষজন ব্যস্ত। টাকা পয়সার পেছনে ছুটছে।

প্র: এখনকার মানুষজনকে কেমন মনে হয়?

উ: কেমন মনে হবে? সবাই ছুটছে। আধুনিকতা, শহরমুখী, আরাম-আয়েস, উন্নতির চেষ্টা। গ্রামে কেউ থাকতে চায় না। গ্রামে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা কমে যাচ্ছে।

প্র: এখনকার পরিস্থিতি এরকম কেন হল মনে হয়?

উ: রাজবংশী মানুষগুলোর সমস্যা হল জমি হারানো । গ্রামগুলোর চেহারা পাল্টে গেল। প্রচুর বাইরের মানুষ আসল। আগের জোতদার এখন লেবার। ছেলেরা অনেক বাইরে চলে গেল কাজের সন্ধানে। রাজনৈতিক কারণে ভাগাভাগি, দলাদলি বাড়ল। রাজবংশী সমাজটাই একেবারে অদল-বদল হল। সব পাল্টে গেল।

প্র: *সামনের দিনকাল কেমন হবে মনে হয়?*

উ: সামনের দিনে আর কি হবে! এরকমই থাকবে। মাঝখান থেকে রাজবংশী মানুষের অবস্থার পরিবর্তন হবে। গান বাজনা থেকে পোষাক আশাক সবই বদলে গেছে; আরও যাবে। পূজা-পার্বণ অনেক উঠে গেছে, আরও যাবে। সবাই পরিবর্তনের মধ্যে লড়াই করছে। ভবিষ্যতে রাজবংশী মানুষের অনেক কিছু আর দেখা যাবে না। যারা শিক্ষিত অবস্থাপন্ন হয়েছে তারা সুযোগ পাবে না আর গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষগুলো বেশিরভাগ পেটেভাতেই ব্যস্ত। অন্য কিছু করার আগে নিজেদের অস্তিত্বটাই গুরুত্বপূর্ণ এখন। এখন তো আবার চাহিদা বেড়েছে সব মানুষের।

সাক্ষাতের তারিখ : ১৫.০৫.২০১৭

।। বিষয় নির্দিষ্ট সাক্ষাৎকার ।।

(Focused Interview)

প্র: আপনার নাম?

উ: নরেন্দ্রনাথ অধিকারী

প্র: বয়স?

উ: ৮৪ বৎসর।

প্র: ঠিকানা?

উ: পূর্ব চকচকা, বারবিশা, কোচবিহার

প্র: পেশা?

উ: অধিকারী পুরোহিত।

প্র: আপনার পরিবারে কে কে আছে?

উ: দুই ছেলে, বউমা, নাতি-নাতনি সহ আমরা দু'জন।

প্র: তারা কে কী কাজকর্ম করেন?

উ: দুই ছেলেই প্রাইভেট স্কুলে পড়ায়। সাথে চাষবাস।

প্র: আপনার শৈশব-কৈশোরের কথা বলুন?

উ: আমাদের বাড়ি ছিল একান্নবর্তী। প্রচুর লোকজন। আমরা কাকা জেঠার ছেলেমেয়ে মিলে ৯-১০ জন। সে সময় তো খোলামেলা বেশি ছিল। সবাই সবার আত্মীয়। গ্রামে গান-বাজনা, মেলা-পরব লেগেই থাকত। বিভিন্ন তিথিতে বিভিন্ন রীতি আচার-সংস্কার। আমাদের বাড়িতে সব মানা হত। অনেক ঠাকুর দেবতার পূজা হত। কীর্তন, গানের আসর বসত।

প্র: তখন রাস্তাঘাট যোগাযোগ ব্যবস্থা কেমন ছিল?

উ: রাস্তাঘাট বিশেষ ছিল না। হাঁটা পথ। জঙ্গল। দিনে দিনে যাতায়াত। তাও দলবেঁধে।

প্র: তখন পড়াশোনার কী ব্যবস্থা ছিল?

উ: পড়াশুনার জন্য প্রাইমারি বোর্ড স্কুল। বারবিশা ভল্কা মিলে একটা মাত্র।

প্র: মানুষ তখন বাজার-ঘাট কোথায় করত?

উ: বারবিশার হাট, শামুকতলার হাট। দলদলির হাট। এই হাট থেকে সপ্তাহের জিনিসপত্র কেনা। দোকানপাট ছিল না।

প্র: আপনাদের জমিজিরেত কত ছিল?

উ: তখন বেশি ছিল ১০-১২ হাল।

প্র: এখন জমি কীরকম আছে?

উ: এখন আমার ৯-১০ বিঘা মাত্র।

প্র: জমিগুলো কীভাবে হাতছাড়া হল?

উ: আমার আত্মীয় স্বজনের অনেক জমি খাস হয়। কিছু রায়ডাক নদী ডাঙ্গায় চলে যায়। তারপর ভাগ বাটোয়ারা হতে হতে সবার ভাগে দু-তিন বিঘা। তার মধ্যে আবার বিক্রি।

প্র: এখন কী করে সংসার চলে?

উ: আমি পূজা করে বেড়াই। ছেলেরা চাষবাস করে কামলা কিষান দিয়ে করে।

প্র: গলায় পৈতা আছে?

উ: আছে।

প্র: কবে নিলেন?

উ: ১৪ বছর বয়সে।

প্র: তুলসীর মালা নিয়েছেন?

উ: আছে।

প্র: আপনার বাড়ির পূজা কে করেন?

উ: আমিই করি।

প্র: বিয়ের সময় কোন পুরোহিত কাজ করেন?

উ: নগেন দেবশর্মা। অসমীয়া ব্রাহ্মণ।

প্র: আগে বাড়িতে কী কী পূজা হত?

উ: সব পূজাই হত। অনেক ঠাকুর দেবতা ঠাকুর পাটে। রাজবংশী সমাজের সব ঠাকুরই আমাদের বাড়িতে ছিল। কালী, শিব, মনসা, বুড়া, রাখাল, কুবের, যখা, মহাকাল, পীর আরও অনেক।

প্র: এখন বাড়িতে কী কী ঠাকুর আছে?

উ: এখন এই ঠাকুরগুলাই আছে। বছরে একবার পূজা দিই।

প্র: পুরোনো দিনের খাবার কী কী খান?

উ: নাই। পুরোনো খাবার খাওয়ার সুযোগই নাই। ছ্যাকা, সিদোল মাঝে মধ্যে। দই চিড়া হয়।

প্র: আগেকার পোশাক-আশাক কেমন ছিল?

উ: পাটানী, ফোতা পড়ত মহিলারা। আমাদের ধুতি, গামছা, গেঞ্জি।

প্র: আগে রাজবংশী মানুষরা কৃষি ছাড়া কী কী কাজ করতেন?

উ: হাল কৃষিই করত। অন্য কাজে আগ্রহ ছিল না।

প্র: ছোটবেলায় কী কী গান শুনেছেন?

উ: ওই দোতরা, কুষান, পদ্মপুরাণ দেহতত্ত্ব মনঃশিক্ষা এসবই।

প্র: এখন এই গানগুলো কেন শোনা যায় না?

উ: মানুষগুলোই তো নাই। আগ্রহও কমে গেছে। আধুনিকতার দিকে ঝোঁক।

প্র: যাত্রাপূজা, বিষুয়া পরব পালন করেন কীনা?

উ: করি।

প্র: গ্রামে এখন কী কী গান বাজনার আসর বসে?

উ: নাই। বিষহরার পদ্মপুরাণের আসর বসে। তাও মানত থাকলে। বিয়ের সময়ও এখন নমঃ নমঃ করে।

প্র: আশেপাশের গ্রামে মেলা-উৎসব কী কী হয়?

উ: আগের মেলা নাই। দোল সওয়ারী মেলা আগে বারবিশায় বড় করে হত। এখন হয় না। এখন সব বড় বড় নতুন নতুন মেমলা। শ্রাবণী মেলাও শুরু হয়েছে আমার বাড়ির পাশে। গান বাজনা ভাওয়াইয়া। হিন্দি।

প্র: আগের দিনগুলো ভালো ছিল, না এখন?

উ: আগেকার দিনে অসুবিধে অনেক ছিল কিন্তু মানুষগুলো বেশি ভাল ছিল। নিজের কাজকর্ম, জমিজিরেতের কাজ, আনন্দ সুখ বেশি ছিল।

প্র: এখনকার মানুষজনকে কেমন মনে হয়?

উ: এখনকার মানুষজন আর কেমন? শিক্ষিতর সংখ্যা বেড়েছে, আধুনিকতা বেড়েছে। চারিদিকে ঝা চকচকে ব্যাপার। সবাই স্বাধীন। খোলামেলা। আগে বন্ধন একটা ছিল। মান্যিগণ্যিটা বেশি ছিল।

প্র: এখনকার পরিস্থিতি এরকম কেন হল মনে হয়?

উ: রাজবংশী সমাজটা স্বাধীনতার পর একেবারে অন্যরকম হল। জমি অনেকেই হারাল। নিজেদের অবশিষ্ট জমিও ধরে রাখতে পারল না। সম্পর্কগুলো খারাপ হওয়ার ফলে সবাই আলাদা আলাদা হয়ে গেল। স্বতন্ত্র চিন্তাভাবনা। কীভাবে একজন আরেকজনের থেকে এগিয়ে যাওয়া যায়। আর রাজবংশী মানুষরা সহজ সরল সাধাসিধে। জমি হারিয়ে কৃষ্টি সংস্কৃতি ধরে রাখতে পারল না। ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। খুব ক্ষতি হয়েছে রাজবংশী মানুষগুলির।

প্র: সামনের দিনকাল কেমন হবে মনে হয়?

উ: সামনের দিনে আরও অন্যরকম হবে। মানুষগুলো এখনই তো সব প্রতিযোগিতার মধ্যে ব্যস্ত। এখনকার ছেলেমেয়েদের মানসিকতাও আলাদা। তারা বাপ ঠাকুরদার মত গ্রামে থেকে রাজবংশী সমাজের সব কিছু মানতে পারবে না। আর গ্রামে গঞ্জে যারা থাকবে তারাই একটু-আধটু কৃষ্টি সংস্কৃতি ধরে রাখার চেষ্টা করবে। কিন্তু পারবে না। নিয়ম সংস্কৃতিও পাল্টাবে। আমারই তো ছেলেরা কেউ পুরোহিতের কাজ করবে না। "মুই মরিলে আর কায়, দুই তিনটা গ্রামত পুরোহিতই নাই হবে। পূজা করিবে অন্য কাহো, অন্য মতন করি। এই হইল আগিলা দিনের কথা।" নিয়ম করার বুড়াবুড়ির সংখ্যাও কমে যাচ্ছে।

সাক্ষাতের তারিখ : ১০.১০.২০১৫

।। বিষয় নির্দিষ্ট সাক্ষাৎকার ।।

(Focused Interview)

প্র: *আপনার নাম?*

উ: সুশীল কুমার দাস

প্র: *বয়স?*

উ: ৭৫ বৎসর

প্র: *ঠিকানা?*

উ: ভল্কা, বারবিশা, আলিপুরদুয়ার

প্র: *পেশা?*

উ: কৃষিকাজ

প্র: *আপনার জমিজমা কীরকম আছে?*

উ: বাপ-ঠাকুরদার আমলের জমি বেশ কিছু খাস হয়। তারপরেও দাদা ভাই ও আমার নিয়ে ১৫০ বিঘার মত জমি এখনও আছে।

প্র: *এত জমি কীভাবে চাষ করেন?*

উ: কিছু আধিয়ার আছে। বাকিটা আমরা বাড়ির সবাই কামলা কিষান নিয়ে নিজেরাই করি।

প্র: *আপনার ছেলেমেয়ে কতজন?*

উ: এক ছেলে, দুই মেয়ে।

প্র: *তারা কি করে?*

উ: মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। জামাইরা চাকরি করে। ছেলে কৃষিকার্যের সঙ্গে রেশন দোকান চালায়।

প্র: *আপনার শৈশব-কৈশোরের কথা বলুন?*

উ: আমাদের বাড়ি ছিল একান্নবর্তী। বাড়ি ভর্তি লোক। কাকা-জেঠার ছেলেমেয়ে মিলে আমরা ১৩-১৪ জন। কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য ৫-৭ জন হালুয়া, গোরু-মোষ দেখার জন্য আলাদা লোক। দিনে রাতে তখন প্রায় ২৫ কেজি চাল লাগত। সকালে লাগত প্রায় ১০ কেজি ধানের চিড়ে। সারাদিন রান্নাঘরে রান্না হত। আমরা ছেলেরা মাঠেঘাটে গোরু দেখতাম,

খেলতাম আবার মাঝে মাঝে বাড়ির কাজও করতাম। এই যেমন রোয়া লাগানো, ধান কাটা, ধান তোলা — এইসব কাজ।

প্র: *পড়াশুনার কী ব্যবস্থা ছিল?*

উ: বারবিশা-ভল্কা অঞ্চলে একটা মাত্র স্কুল ছিল। চারদিকে জঙ্গল। বেশি ছাত্র ছিল না। আমি ক্লাস ফোর অবধি পড়েছি। তারপরে আর পড়ার সুযোগ ছিলনা।

প্র: *আপনার ছেলেমেয়ের পড়াশুনা?*

উ: ছেলে গ্র্যাজুয়েট। এক মেয়ে শিক্ষকতা করে, আরেক মেয়েও গ্র্যাজুয়েট। চাকরি পায়নি। জামাই চাকরি করে।

প্র: *তখনকার দিনের গ্রামের পরিবেশ কেমন ছিল?*

উ: গ্রামের পরিবেশ ভাল ছিল। মানুষে মানুষে মিল ছিল। অবশ্য লোকসংখ্যা তখন বেশ কম ছিল। সবাই সবাইকে চেনে। বিপদে, আপদে সবাই সবার পাশে দাড়াত। চাষবাস হালকৃষি বাকি সময় গানবাজনা, পূজা-পার্বণ, রীতি আচার নিয়ে সবাই সবার আত্মীয় স্বজন। তখন মানুষ এত বেশি ছুটত না। সপ্তাহের হাটে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনত। শাকসবজি, মাছ কেনার প্রয়োজনই হত না। নদীনালা, ডোবাতে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। শাকসবজিও আদানপ্রদান হত। মেলা-পরব গানবাজনায় দু-তিন গ্রামের মানুষ একসাথে হত। চুরি-ডাকাতি বেশি হত না। তখন ভয় ছিল বাঘ-ভাল্লুকের। রাতে আমরা দলবেঁধে যাতায়াত করতাম। আর বাড়িতে ডারিঘরে গানবাজনার আসর বসত। আশেপাশে বাড়ি থেকে অনেকেই আসতেন।

প্র: *এখনকার দিনকাল সম্পর্কে বলেন?*

উ: চারদিকে হানাহানি। রাজবংশী মানুষের মধ্যেও হিংসা বিদ্বেষ, অভাব অনটন সব মিলিয়ে পূজা-পার্বণ, গানবাজনা সব উধাও। আজকালকার ছেলেমেয়েগুলো কাজের সন্ধানে বিভিন্ন জায়গায় চলে যাচ্ছে। গ্রামেও আর আগের মত সবাই কোন কাজে একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়ে না। পূজা-পার্বণেও নিজের নিজের আত্মীয় স্বজনকে নিয়েই ব্যস্ত। বিয়ে, অন্নপ্রাশন সব অনুষ্ঠানে এখন শহরের প্রভাব। ডারিঘর হাওয়া। বাড়ি বাড়ি যাতায়াতও কমে গেছে। এককথায় সব — বাড়িঘর, পোশাক আশাক, খাওয়া দাওয়া, রীতি আচার পাল্টে গিয়ে

এখন আধুনিকতার দিকে ঝোঁক।

প্র: *আপনি নিজে কোন গানবাজনা করেন কি?*

উ: ছোটবেলা থেকেই করি। জেঠা মশায়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে শিখে গেছি। এখন আমার দল আছে। বিষহরার দল। আমরা কীর্তনিয়া ঐ যা মরাখাওয়া গানও কয় সেটাও করি কয়েকজন মিলে। তবে এই দলটাই শেষ। নতুন দল আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

প্র: *কবে থেকে এই পরিবর্তন?*

উ: দেশভাগের পরও বেশ কয়েক বছর ভালই ছিল। পরিবর্তনটা বেশি হয় ৭১-এর পড়ে। প্রচুর মানুষ ঐ পাড় থেকে চলে আসে। জমির চাহিদা বেড়ে যায়। রাজবংশী পরিবারে ভাঙন শুরু হয়। আলাদা হতে গিয়ে জমির পরিমাণ কমে যায়। সেই জমিও শেষে বিক্রি করে অনেক রাজবংশী ভূমিহীন হয়ে পড়ে। অবশ্য সরকারি আইনকানুনের জন্য অনেকের জমি হাতছাড়া হয়। আধিয়ারী, ভাগ বাটোয়ারা, পাট্টা ইত্যাদির কারণে তখন জমি কেউ কাউকে চাষের জন্য দিতে চায় না। আর এইজন্য গ্রামের অবস্থা দিন দিন বদলে যেতে থাকে।

প্র: *সামনের সময় কেমন হবে মনে হয় আপনার?*

উ: যা হবার তাই হবে। এখন আধুনিক যুগ। শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ হয়েছে। মানুষ এখন দূর দূরান্তে চলে যাচ্ছে চাকরি করতে, কাজের সন্ধানে। কৃষিকাজে কেউ আর আটকে থাকতে চায় না। আমরা যতদিন আছি বাপ-ঠাকুরদার আমলের কৃষ্টি সংস্কৃতি, আচার বিচার সব ধরে আছি। এর পরে মনে হয় কেউ এই ধারাটা ধরে রাখতে পারবে না। এখনই যা অবস্থা। ভবিষ্যতে আমার চোদ্দ পুরুষের ঠাকুর দেবতারও কেউ খোঁজ রাখবে না। রাজবংশী সমাজের নিয়মকানুন এখনই তো অনেকটা নাই, নতুন বাচ্চাকাচ্চা এরা জানারই সুযোগ পাবে না। সবাই সবার মতনই হয়ে যাবে। ঐ যে কয় ‘ধান থাকি হইলোং খৈ, দিনে দিনে আরও কিবা হই।’

সাক্ষাতের তারিখ : ১৭.০৫.২০১৬

।। বিষয় নির্দিষ্ট সাক্ষাৎকার ।।

(Focused Interview)

প্র: আপনার নাম?

উ: আশারী দাস

প্র: বয়স?

উ: ৮৬

প্র: ঠিকানা?

উ: বাকলা, চিকলিগুড়ি, পারোকাটা, আলিপুরদুয়ার

প্র: পেশা?

উ: গৃহবধূ

প্র: বুড়াঙ্গী এলা কেমন আছেন?

উ: আছুং বাপো। চখুর নজর পড়ি গেইছে, মানসি ভাল করি চিনি বারে না পাং। তা বাবারে কোটে থাকি আসিলু?

প্র: তোমারে এটি আসিলুং। কয় কিনা কাথা পুছিবার চাং।

উ: কি পুছিব্?

প্র: তোমার বিয়াও কোন বেলা হইছে?

উ: আঃ তোর আরো আশ কাথাতে ভাস কথা (হেসে) এমুন তেপুরানিয়া কাথা নিকলালু, স্যালা মোর ভাল করি বোদে হয় নাই।

প্র: তোমাক য্যালা বিয়াও করি আনিছে স্যালা কি এলাকার নাকান বিয়াও আছিল্?

উ: না হয় বাপো। এলা তো বেটিক ব্যাচে খাবার গেইলে এক হালের মাটি নাগে। স্যালা মোরে বাপু'ক তিন কুড়ি খালতি (কন্যাপণ) দিছে।

প্র: তোমাক য্যালা বিয়াও করিছে আজু ঘরের আবস্থা ক্যামন?

উ: এই বাড়ির? ম্যালা জাগা-জমি। স্যালাও ৮ হালের মাটি। বাড়িত কতলা কামলা কিষ্যান্। একটা খাসি ইমাকে নাগে।

প্র: তোমার ছাওয়া-পোওয়া কয়জন?

উ: ছাওয়া, মোর দুই ব্যাটা দুই বেটি।

প্র: তোমার কি সতীন আছিল্‌ নাকি?

উ: নিছে না মরাটা আর একটা। স্যালা মোর বড়বাবু আর মাইনো। একদিন ব্যালাভাটি কোটে থাকিবা আসিয়া হাজির। থাউক, ওইলা কাথা কবার গেইলে ম্যালা। তারপরে মোর ছোটবাবু আর বাচ্চা মাইনো। উয়ার পরে দুকুনা বেটি। এইলা করি যায় সম্পত্তিলা শ্যাষ।

প্র: এলা কতলা মাটি আছে?

উ: এলা ম্যালা। ব্যাটার বউ মানসির বাড়িত কামলা খাটে। ব্যাটা নাজ মিস্তিরি (রাজমিস্ত্রি) বড়বাবু মিলিটারি চাকরি পাইল, গেইলেকে না। উয়ার বাপ কয় আমারে বাড়িত মানসি কামলা ঘাটে তুই যাবু অইন্যটে খাটির বাদ দে। আর এলা গাঞ্জা খায়া কোটে পড়ি রয় খবরে পাং না। মাটিলা মানসিয়ে রেকর্ড করি নিল। পাছোত্‌ ব্যাটা-বেটিক ভাগ করি দিয়া। মোর ভাগত এলা এক বিঘা। নাতিনির এলা বাড়িচালায় সার ছোটটার কয় বিঘা আছে উয়ার তা ৪টা বেটি।

যাং বাপো কমড়টা মটমটায়।

যা বুড়াঈ ভালে থাকিস।

সাক্ষাতের তারিখ : ০৯.০১.২০১৭

।। বিষয় নির্দিষ্ট সাক্ষাৎকার ।।

(Focused Interview)

প্র: *আপনার নাম?*

উ: নৃপেন সিংহ

প্র: *বয়স?*

উ: ৮২ বৎসর।

প্র: *ঠিকানা?*

উ: গ্রাম : রবীন্দ্র সরণী, পো: কদমতলা, জেলা : দার্জিলিং

প্র: *পেশা?*

উ: অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারি

প্র: *আপনার পরিবারে কে কে আছে?*

উ: আমরা স্বামী-স্ত্রী, এক মেয়ে ও এক ছেলে

প্র: *তারা কে কী কাজকর্ম করেন?*

উ: ছেলে বেসরকারি অফিসের কর্মী, মেয়ে স্কুলে চাকরি করে, গৃহিণী গৃহকর্ম করে।

প্র: *আপনার শৈশব-কৈশোরের কথা বলুন?*

উ: তখন তো অন্যরকম পরিবেশ ছিল; পড়াশুনার অত চাপ ছিল না। অভাব অনটন ছিল না এত। খোলা পরিবেশে হেসে খেলে মানুষ হয়েছি। শৈশবে মা-হারা হওয়াতে খুব কষ্ট পেয়েছি জীবনে। বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করেন। তবুও শৈশব কৈশোর কাল বড় সুন্দর ছিল।

প্র: *তখন রাস্তাঘাট যোগাযোগ ব্যবস্থা কেমন ছিল?*

উ: আমার আদি বাড়ি গাইঞ্জোত। ওখানেই বড় হওয়া। তখন রাস্তা বলতে বড় আল ছিল। এক দুইটা বড় কাঁচা রাস্তা ছিল। বর্ষায় কোথাও হাঁটুজল, কোথাও কম।

প্র: *তখন পড়াশোনার কী ব্যবস্থা ছিল?*

উ: তখন এত স্কুল ছিল না। আমাদের পাশেই একটা স্কুল ছিল। গাইঞ্জোত প্রাইমারি স্কুল। প্রাথমিক স্কুলটিতে দূর দূরান্তের ছেলেমেয়েরা আসত। প্রাথমিকটুকু পাস করে নকশালবাড়ি যেতে হত উচ্চ ক্লাসে পড়ার জন্য।

প্র: *আপনার বাড়িতে কে কে ছিল?*

উ: বাবা, মা, পরে সৎমা, তিন ভাই ও এক বোন।

প্র: *মানুষ তখন বাজার-ঘাট কোথায় করত?*

উ: বাজার আমরা করতাম খড়িবাড়ি, গলগলিয়া, ভদ্রপুর। কাছে পিঠে তখন কোন হাটবাজার ছিল না আমাদের।

প্র: *আপনাদের জমিজিরেত কত ছিল?*

উ: ৮০-৯০ বিঘের মত জমি ছিল।

প্র: *এখন জমি কীরকম আছে?*

উ: এখন জমি নেই তেমন। ভাইদের কাছে ৫-৬ বিঘা করে আছে এখন।

প্র: *জমিগুলো কীভাবে হাতছাড়া হল?*

উ: বাবা সংসারী ছিল না। সংসার বাড়ার সাথে সাথে ধীরে ধীরে বিক্রি করতে শুরু করে। নানান অনাচার করে সব শেষ করে দিয়েছিল।

প্র: *এখন কী করে সংসার চলে?*

উ: আমি একটা চাকুরি করতাম। এখন পেনশন পাই। ভাইরা মাঠে কাজ করে, বিদেশ খেটে সংসার চালায়।

প্র: *গলায় পৈতা আছে?*

উ: পৈতা আছে কিন্তু পরি না। বিয়ে বা ঐ জাতীয় অনুষ্ঠানে অধিকারী বা ব্রাহ্মণ দেয়, তখন ২/৪ দিন পড়ি।

প্র: *কবে নিলেন?*

উ: বিয়ের সময় নিয়েছি।

প্র: *তুলসীর মালা নিয়েছেন?*

উ: না।

প্র: *আপনার বাড়ির পূজা কে করেন?*

উ: অধিকারী, ব্রাহ্মণ, কুলগুরু।

প্র: *বিয়ের সময় কোন পুরোহিত কাজ করেন?*

উ: ব্রাহ্মণ ঠাকুর।

প্র: *আগে বাড়িতে কী কী পূজা হত?*

উ: তুলসি, গঙ্গাসাগর, বিষহরি, কালি, শিব

প্র: *এখন বাড়িতে কী কী ঠাকুর আছে?*

উ: সবই আছে যা ছিল।

প্র: *পুরোনো দিনের খাবার কী কী খান?*

উ: ভাত, চিড়া, দই, সিদোল, ছ্যাকা, ফোকতই, প্যাল্কা, শুটকি মাছ এইসব। চখো চিড়া, চাল ভাজা, গুজুরি, দুব্বার মাংস।

প্র: *আগেকার পোশাক-আশাক কেমন ছিল?*

উ: আগে পোশাক এত ছিল না। হাঁটু পর্যন্ত ধুতি, গায়ে একটা জামা, ছেলেরাও তাই পড়ত। মায়েরা বুকুনি পড়ত।

প্র: *আগে রাজবংশী মানুষরা কৃষি ছাড়া কী কী কাজ করতেন?*

উ: কৃষিকাজ ছাড়া কেউ কেউ াচকরি করতেন, তবে দুই-চারটা গ্রামে একজন। অন্য পেশায় রাজবংশী লোক দেখিনি।

প্র: *ছোটবেলায় কী কী গান শুনেছেন?*

উ: পালাটিয়া, লাহাঙ্কারি, চোরচুরনি, রাবান

প্র: *এখন এই গানগুলো কেন শোনা যায় না?*

উ: কালের পরিবর্তনে ওগুলো শেষ। ঐ পরিবেশও নেই। নিজের সংস্কৃতির প্রতি দরদও নেই। এত অবসর যাপনের ব্যবস্থাও ছিল না। নানা চটকদারি গানবাজনার সাথে সেই পুরানো জিনিস এঁটে উঠতে পারল না। তাছাড়া যারা গান করত তারা এখন পেটের দায়ে নানা স্থানে নানা কাজ করে ঘুরে বেড়ায়। চর্চা নেই, শ্রোতাও নেই।

প্র: *যাত্রাপূজা, বিষুয়া পরব পালন করেন কীনা?*

উ: হ্যাঁ, এগুলো হয়।

প্র: *গ্রামে এখন কী কী গান বাজনার আসর বসে?*

উ: পালাটিয়া, বিষহরি, রাজধারী, লবকুশ, লাহাঙ্কারী

প্র: *আশেপাশের গ্রামে মেলা-উৎসব কী কী হয়?*

উ: মাতা মেলা, চুল্লি মেলা, বাতাসী মেলা/শ্যামলাল মেলা

প্র: *আগের দিনগুলো ভালো ছিল, না এখন?*

উ: ভালো মন্দ সব কালেই আছে, তবে তখন বড় শান্ত জীবন ছিল। এত কামড়াকামড়ি ছিল না।

প্র: *এখনকার মানুষজনকে কেমন মনে হয়?*

উ: এখন মানুষে মানুষে বিশ্বাস তলানিতে ঠেকে গেছে। হিংস্র হয়ে উঠেছে। জীবনের কোন নিশ্চয়তা নেই এখন।

প্র: *এখনকার পরিস্থিতি এরকম কেন হল মনে হয়?*

উ: লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, বাইরের মানুষের এখানে এসে ভিড় করা, নীতিশিক্ষার অভাব, সবকিছু মিলিয়ে এখন ভয়ংকর অবস্থা।

প্র: *সামনের দিনকাল কেমন হবে মনে হয়?*

উ: মানুষ নিজেকে সংযত না করলে আগামী দিন আরও খারাপ হয়ে যাবে। জীবনের মূল্য আরও কমে যাবে।

সাক্ষাতের তারিখ : ১১.০১.২০১৭

।। বিষয় নির্দিষ্ট সাক্ষাৎকার ।।

(Focused Interview)

প্র: *আপনার নাম?*

উ: নিমাই চন্দ্র সরকার

প্র: *বয়স?*

উ: ৫৫ বৎসর।

প্র: *ঠিকানা?*

উ: গ্রাম + পো: দুর্গাপুর, থানা - কুশমুণ্ডি, জেলা : দক্ষিণ দিনাজপুর

প্র: *পেশা?*

উ: কৃষিকাজ। গানও শেখাই ছেলেমেয়েদের।

প্র: *আপনার জমিজমা কীরকম আছে?*

উ: মাত্র চার-সাড়ে চার বিঘা।

প্র: *আপনার পরিবারে কে কে আছে?*

উ: দুই মেয়ে, আমার মা আর বউ।

প্র: *তারা কে কী কাজ করে?*

উ: মেয়েরা পড়াঢুনা করে।

প্র: *আপনার শৈশব-কৈশোরের কথা বলুন?*

উ: তখনকার পরিবেশই অন্যরকম ছিল। মানুষজনের সংখ্যা কম। চাহিদাও বেশি ছিল না, সবাই কৃষিকাজই করত। আমরা খেলাধুলা করতাম। চাষবাসের কাজেও হাত লাগাতাম। পড়াশুনায় বিশেষ চাপ ছিল না। গানবাজনা করতাম। সেখান থেকেই তো গানবাজনার প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়। দোত্‌রা, হারমোনিয়াম বাজাতে শিখি। খন গানের ভক্ত ছিলাম। অভিনয়ও করেছি। গ্রামে গঞ্জে বিভিন্ন গানের দলও ছিল। চোরচুরনী, বিষহরা খোজাগরি গান। যুগীর গান, গীত-কাহিনি, সাধুমেলার গান আরও অনেক কিছু।

প্র: তখন রাস্তাঘাট যোগাযোগ ব্যবস্থা কেমন ছিল?

উ: রাস্তাঘাট মানে মাটির রাস্তা। মাঠঘাট দিয়েই মানুষ এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে হেঁটেই যেত। বাসের ব্যবস্থা একেবারে কম। গ্রামে সাইকেলই ছিল না। অনেকে গরুর গাড়ি করে যেত। জিনিসপত্র নিয়ে যেত।

প্র: তখন পড়াশোনার কী ব্যবস্থা ছিল?

উ: গ্রামের প্রাইমারি স্কুল। চার-পাঁচটা গ্রামের মধ্যে একটা। হাইস্কুল সুখদেবপুরে একটা।

প্র: মানুষ তখন বাজার-ঘাট কোথায় করত?

উ: ঐ হাটে। সুখদেবপুরে। দোকানপাট ঐ হাটের দিনই বসত।

প্র: আপনাদের জমিজিরেত কত ছিল?

উ: ছোটবেলায় বাবা কাকা জেঠা সবার একসাথে বিঘা পঞ্চাশেক ছিল। তারপরে ভাগ হয়। সবাই আলাদা আলাদা হতে গিয়ে এখন ৪-৫ বিঘায় ঠেকেছে।

প্র: জমিগুলো কীভাবে হাতছাড়া হল?

উ: ভাগ বাটোয়ারা হল। অভাবের ঠেলায় কিছু বিক্রি। তারপরে কিছু হাতছাড়া হয় নিবুর্দ্ধিতার জন্য।

প্র: এখন কীভাবে সংসার চলে?

উ: ঐ কৃষিকাজ সাথে গানের টিউশনি।

প্র: গলায় পৈতা আছে?

উ: আছে।

প্র: কবে নিলেন?

উ: আমার বয়স যখন ১৩-১৪ বছর। তখন অনেকের সঙ্গে আমাকেও দেওয়া হয়।

প্র: তুলসীর মালা নিয়েছেন?

উ: বিয়ের সময় নিয়েছি। সেটা বছর পঁচিশেক আগে।

প্র: আপনার বাড়ির পূজা কে করেন?

উ: বোষ্টম গোসাই আছে আমাদের গ্রামে। কয়েক পুরুষ ধরে তারা নাকি এই কাজ করেন।

প্র: বিয়ের সময় কোন পুরোহিত কাজ করেন?

উ: চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ।

প্র: আগে বাড়িতে কী কী পূজা হত?

উ: আগে অনেক দেবদেবী বাড়িতে ছিল। এখন সেইসব নেই। মেথিলা দেবী থেকে লক্ষ্মী, চামুরা (চামুণ্ডা), বাচ্চা ঠাকুর আরও অনেক। নামই বলা মুশকিল। মা জানবে হয়ত।

প্র: এখন বাড়িতে কী কী ঠাকুর আছে?

উ: বলরাম, বিষহরি, দোয়ারী বাচ্চা ঠাকুর, লক্ষ্মীনারায়ণ, চামুরা এই কয়টি মাত্র। আগে আরও অনেক ঠাকুর ছিল।

প্র: পুরোনো দিনের খাবার কী কী খান?

উ: প্যালকা খান। সিদোল উঠে গেছে।

প্র: আগেকার পোশাক-আশাক কেমন ছিল?

উ: পাটালী, ফোতা ছিল। অনেকে ধুতি পড়ত। গামছা তো ছিলই। ছোটবেলায় লুঙ্গির বিশেষ চল ছিল না।

প্র: আগে রাজবংশী মানুষরা কৃষি ছাড়া কী কী কাজ করতেন?

উ: হাল কৃষি ছাড়া অন্য কাজ বিশেষ করত না।

প্র: ছোটবেলায় কী কী গান শুনেছেন?

উ: কৃষ্ণ যাত্রী, কংসবোধ, কবি গান, সাধু গান, চোরচুরনী, বিষহরা, সত্যপীর আরও অনেক। তখন বাউল ছিল না। সাধু মেলাই এখন বাউল মেলায় রূপ পেয়েছে। লক্ষ্মীর গান, খোজাগরি গান, যুগী পরবের গান, খন গান তো ছিলই।

প্র: এখন এই গানগুলো কেন শোনা যায় না?

উ: বর্তমান প্রজন্মের বিশেষ আগ্রহ নেই। সেই মানুষগুলোও আর নেই। যুগী পরবের গান তো এখন আমাদের একজনই করে। উনি মারা গেলে শেষ। অনুষ্ঠানে রীতি রেওয়াজ কমে গেছে ফলে দলগুলোও হারিয়ে গেছে। আটের দশকের পর পরিবর্তন ঘটতে থাকে। পূর্ববাংলার মানুষজনের আগমনে সব পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এখন তো কীর্তনের রমরমা। পশ্চিমী সংস্কৃতি টিভি সিনেমার প্রভাবে অতীত দিনের সংস্কৃতি এখন অস্তমান।

প্র: *যাত্রাপূজা, বিষুয়া পরব পালন করেন কীনা?*

উ: নবমীর দিন হাল যাত্রা করি। বিষুয়া পরব চৈত্র সংক্রান্তির দিন পয়রার ছাতু ।

প্র: *গ্রামে এখন কী কী গান বাজনার আসর বসে?*

উ: ঐ যে বাউল মেলা, হরিনাম সংকীর্তন তবে বিষহরি খোজাগরি গানের প্রচলন আছে এখন। চোরচুরনী নাচ, বুড়াবুড়ির মাগন এখনও চালু আছে। সত্যপীরের গান কোথাও কোথাও হয়। গল্প করার লোক নেই এখন। আগে গল্প বলার আসর বসত।

প্র: *আশেপাশের গ্রামে মেলা-উৎসব কী কী হয়?*

উ: বুড়াবুড়ি মেলা, কালী মেলা, চড়ক মেলা, লক্ষ্মীপূজার মেলা, নতুন লীলা মেলা শুরু হয়েছে। গান বাজনার আসর সেভাবে বসে না। তবে জুয়া চললে গান বাজনাও বসে।

প্র: *এখনকার মানুষজনকে কেমন মনে হয়?*

উ: সবাই আধনিক। শহরে মানসিকতা। গ্রামের ভাবনা, সংস্কৃতির ভাবনা কোথায়? পশ্চিমী সংস্কৃতির প্রতি ঝোঁক ছেলে মেয়েদের। লোক সংস্কৃতির বারোটা বাজছে।

প্র: *এখনকার পরিস্থিতি এরকম কেন হল মনে হয়?*

উ: জোতদারদের জমি গেল, আধিয়ার বিপদে পড়ল। বর্গা অপারেশনে পূর্ববঙ্গের মানুষ জমি পেল। আর রাজবংশী মানুষ অভাব অনটনে জমি বাড়ি বেঁচে এখন সর্বহারা। অনেকে শহরে, বাইরে চলে গেল কাজের সন্ধানে। অনেকে রিক্সাওয়ালা, ভ্যানওয়ালা, ডেইলি লেবার।

প্র: *সামনের দিনকাল কেমন হবে মনে হয়?*

উ: রাজবংশী মানুষের বিপদ বাড়বে। ভাষা সংস্কৃতির সংকট বেশি হবে। গ্রাম ছাড়া, বাড়ি ছাড়া হয়ে শহুরে মন মানসিকতায় মিশে যাবে। রাজবংশী আলাদা করে নিজস্ব কিছুই ধরে রাখতে পারবে না। বিশেষ করে এই প্রজন্মের যে ঝোঁক দেখা যাচ্ছে।

সাক্ষাতের তারিখ : ২০.০৬.২০১৪

পরিশিষ্ট - ২

তথ্য সহায়ক ব্যক্তিবর্গ ও বিশেষ কৃতজ্ঞতা :

ওঁড়াও, পুনিত (৫২)	শামুকতলা, আলিপুরদুয়ার, চা-বাগানে সাক্ষাৎ ১৫.০৫.২০১৭, ১৪.০১.২০১৮
দাস, অনিল (৭১)	ভল্কা, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ১১.০১.২০০৪
দাস, অভিজিৎ (৪৫)	ভাটিবাড়ি, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ২১.১১.২০১০
দাস, উদয়কুমার (৫৩)	পাগলারহাট, কুমারগ্রাম, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ০৯.০৩.২০১০
দাস, কেটু (৬৭)	বড় দলদলী, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ২৯.০৩.২০১০
দাস, জয়চাঁদ (৬১)	বড় দলদলী, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ২৯.০৩.২০১০
দাস, জীবনকুমার (৭০)	চেংমারী, কুমারগ্রাম, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ১৭.০৩.২০০৬
দাস, জীবনানন্দ (৪০)	ভল্কা, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ১১.০১.২০০৪
দাস, জীবনানন্দ (৭১)	ভল্কা, বারবিশা, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ২৭.০১.২০০৬
দাস, নরেন (৬৫)	বড় দলদলী, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ১৪.০৬.১৯৮৯
দাস, পখিরাম (৬৭)	ভল্কা, বারবিশা, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ২৭.০১.২০০৬
দাস, পরবানন্দ (৬১)	নাটাবাড়ি, কোচবিহার, সাক্ষাৎ ২৫.০১.২০০২
দাস, প্রসন্নকুমার (৬৭)	সাহেবপাড়া, চেংমারী, কুমারগ্রাম, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ০৭.০২.১৯৯৯
দাস, বুদ্ধেশ্বর (৬৬)	কদমতলা, চেংমারি, কুমারগ্রাম, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ০৭.০২.১৯৯৯
দাস, ভীষ্মনাথ (৭২)	ভল্কা, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ১১.০১.২০০৪
দাস, লখিচন (৫৫)	ভল্কা, বারবিশা, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ২৭.০১.২০০৬
দাস, লঙ্কেশ্বর (৬৯)	কাটাবাড়ি, লঙ্কাপাড়া, কুমারগ্রাম, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ১৫.০৭.১৯৯৯
দাস, সুকুমার (৪০)	ফাটাপুকুর, রাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, সাক্ষাৎ ১৭.০৩.২০১০
দাস, সুরেন্দ্রনাথ (৬৫)	বড় দলদলী, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ২০.০১.২০০৬
দাস, সুশীল (৭৫)	ভল্কা, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ১৩.০৩.২০১০, ১৫.০১.২০১২ ২৭.০৫.২০১৫, ১৭.০৫.২০১৬
দাস, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র (৫২)	খাঁউচাঁদ পাড়া (জলদাপাড়া), জলপাইগুড়ি, সাক্ষাৎ ২৬.০৩.২০০৮
রায়, প্রফুল্ল (৫৫)	সাতমাইল, ছোট শালকুমার, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ১৩.০৩.২০১৪
রায়, জ্যোতিষ (৫০)	সাতমাইল, ছোট শালকুমার, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ১৩.০৩.২০১৪

রায়, নগেন (৫৭)	সাতমাইল, ছোট শালকুমার, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ১৩.০৩.২০১৪
ধরচৌধুরী, নিতাইচাঁদ (৭০)	কুমারগ্রাম, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ২০.০২.২০০৬
নার্জিনারী, নিরন্তর (৪৫)	শামুকতলা, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ১২.০২.২০১০
বড়ুয়া পিন্টু (৫৫)	পুখুরীগ্রাম, কুমারগ্রাম, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ১২.০২.২০১০
বর্মা অক্ষয় (৫২)	তুফানগঞ্জ, কোচবিহার, সাক্ষাৎ ১৬.০৫.২০০৯
বর্মণ, ধীরেন্দ্রচন্দ্র (৬৫)	দক্ষিণ রামপুর, বারবিশা, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ০৯.০১.২০০১
বর্মণ, সুকুমার (৩৫)	লালচাঁদপাড়া, মারখাতা, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ১৮.১০.২০১১
রায়, ড. অমলকান্তি (৫৮)	উচ্চপদস্থ আধিকারিক, প: ব: সরকার, শিলিগুড়ি, (অসংখ্যবার আলোচনায় বিভিন্ন তথ্য দিয়েছেন)
রায়, ড. পুষ্পজিৎ	মালদহ, সাক্ষাৎ ২৭.০২.২০১৩, ১৩.০৩.২০১৬, ১৫.০৫.২০১৭, ২৩.০৩.২০১৮, ২৫.০৫.২০১৮
রায়, অমরেন্দ্র (৫৮)	ধওলীগুড়ি, কোকড়াঝার, অসম, সাক্ষাৎ ২৩.০৯.২০১১
রায়, অমরেন্দ্রনাথ (৭০)	বড় দলদলী, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ২১.০৪.২০০২ ২৭.০৫.২০০৩
রায়, অরবিন্দ (৪৮)	রসিকবিল, নাগুরহাট, কোচবিহার, সাক্ষাৎ ২০.০৭.২০০৮
রায়, অভিজিৎ (৪৭)	হাজরার হাট, মাথাভাঙা, কোচবিহার, সাক্ষাৎ ২০.০৭.২০০৮
রায়, আশুতোষ (৭২)	পঞ্চায়েত পাড়া, কামাখ্যাগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ২৫.০৫.২০১০
রায়, কালীমোহন (৭২)	বিজনিপাড়া, কোকড়াঝার, অসম, সাক্ষাৎ ২৪.০৯.২০১১
রায়, কুঞ্জবিহারী (৬৭)	ভল্কা, জলপাইগুড়ি, সাক্ষাৎ ১১.০১.২০০৪
রায়, গরেন (৬১)	ছোট দলদলী, খোয়ারডাঙা, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ১২.০৪.২০০৭
রায়, তপনকুমার (৩৫)	কামাখ্যাগুড়ি, পঞ্চায়েতপাড়া, সাক্ষাৎ ১২.০১.২০০২
রায়, দীনেশ (৬৫)	ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, সাক্ষাৎ ২৫.০৫.২০০৯, ৩০.০৩.২০১০, ১৩.০৪.২০১৫, ১৭.০৬.২০১৭
রায়, দীপক (৪৫)	মেখলিগঞ্জ, কোচবিহার, ফোনে তথ্য সংগ্রহ ১৭.০৭.২০০৯
রায়, নগেন্দ্রনাথ (৭০)	লালস্কুল, বারবিশা, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ১০.০১.২০০৪
রায়, প্রদীপকুমার (৪৭)	পেটলা, কোচবিহার, সাক্ষাৎ ০৩.০২.২০০৭
রায়, বিজয়কুমার (৬৩)	কামাখ্যাগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ২৭.০৪.২০০৭
রায়, মহিম (৬৩)	খাগড়াবাড়ি, কোচবিহার, সাক্ষাৎ ১৯.০৭.২০০৭
রায়, মানিক (৪০)	ভাওয়াইয়ার হাট, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার, সাক্ষাৎ ২১.০৭.২০০৮
রায়, মোহিনীকান্ত (৬৭)	শিববাড়ি, ঘাক্সাপাড়া, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ১০.০১.২০০৪
রায়, যোগেশচন্দ্র (৫৫)	পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার, সাক্ষাৎ ০৯.০৩.২০০৮

রায়, রত্নেশ্বর (৬০)	চন্দ্রপাড়া, কোকড়াঝার, অসম, সাক্ষাৎ ২৪.০৯.২০১১
রায়, ললিতচন্দ্র (৬০)	বাবুরহাট, সোনাপুর, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ১৭.০১.২০০৯
রায়, সবিতা (৬০)	ম্যাগাজিন রোড, কোচবিহার, সাক্ষাৎ ২৩.১০.২০০০
রায়, সবিনাথ (৪৮)	মধ্য হলদিবাড়ি, জলপাইগুড়ি, সাক্ষাৎ ২৮.০৯.২০১১
রায়, হেমেন্দ্রনাথ (৬২)	চিলকিরহাট, কোচবিহার, সাক্ষাৎ ১৩.০৮.২০০৫
রায়, হেমচন্দ্র (৬৩)	ধওলীগুড়ি, কোকড়াঝার, অসম, সাক্ষাৎ ২৩.০৯.২০১১
রায়লস্কর, প্রফুল্ল (৬৯)	লস্করপাড়া, বারবিশা, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ২৩.০১.২০০৫
সরকার, কল্যাণ (৪৫)	পচাগর, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার, সাক্ষাৎ ১৫.০৫.২০০৬
সরকার, নিমাই (৫৫)	দুর্গাপুর, কুশমুণ্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর, সাক্ষাৎ ২৪.০৫.২০০৭ ২০.০৬.২০১৪
সরকার, ক্ষীরেন্দ্রনাথ (৭৮)	সিঙ্গিমারী রামপুর, কোচবিহার, সাক্ষাৎ ৩০.০৫.২০০৭, ১৩.০৩.২০১৬, ১৫.০৫.২০১৭
বর্মন, আশুতোষ (৪৮)	গাজোল, মালদহ, সাক্ষাৎ ২০.১০.২০১৪
অধিকারী, অঞ্জু (৫০)	গাজোল, মালদহ, সাক্ষাৎ ২০.১০.২০১৪
বর্মন, বিপ্লব (৩৫)	দুর্গাপুর, কুশমুণ্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর, সাক্ষাৎ ২২.১০.২০১৪
রায়, নিরোদ (৬৫)	রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর, সাক্ষাৎ ১৮.১০.২০১৪
মণ্ডল, ধীরেন (৫০)	ভুতনির চর, মানিকচক, মালদহ, সাক্ষাৎ ২০.১০.২০১৪
রায়, ড. পুষ্পজিৎ (৬৮)	মালদহ, সাক্ষাৎ ১৯.১০.২০১৪
রায় চৌধুরী, তৃপ্তি (৬১)	বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর, সাক্ষাৎ ২২.১০.২০১৪
সিংহ, দেবলাল (৫০)	রাঙাপানি, দার্জিলিং, সাক্ষাৎ ১৫.০৫.২০১৫
রায়, নগেন্দ্রনাথ (৬৩)	চৈতন্যপুর, শিবমন্দির, দার্জিলিং সাক্ষাৎ ০৭.০৪.২০১৬
রায়, পরেশ (৬০)	শিবমন্দির, কদমতলা, দার্জিলিং সাক্ষাৎ ০৯.০৪.২০১৬
রায়, কৃষ্ণকান্ত (৫০)	খড়িবাড়ি, দার্জিলিং, সাক্ষাৎ ০৯.০৪.২০১৬
রায়, কৃষ্ণেন্দু (৪২)	পাণ্ডা পাড়া, জলপাইগুড়ি, সাক্ষাৎ ১৭.০৮.২০১৬
রায়, হরিশচন্দ্র (৬২)	পাণ্ডা পাড়া, জলপাইগুড়ি, সাক্ষাৎ ১৭.০৮.২০১৬
গিদাল প্যাচকাটা (৫৩)	শিবমন্দির, কদমতলা, দার্জিলিং, সাক্ষাৎ ০৯.০৪.২০১৬
অধিকারী, গুণেশ্বর (৬৬)	ভাটিবাড়ি, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ১২.১২.২০১৭
বর্মা, রমণীমোহন (৬৫)	দিনহাটা, কোচবিহার, সাক্ষাৎ ০৫.০৬.২০১৭
রায়, ধর্মনারায়ণ (৬৬)	ধুমপুর, দেওয়ানহাট, কোচবিহার, সাক্ষাৎ ০৪.০৬.২০১৭
দাস, মলিন (৫৭)	বলরামপুর, কোচবিহার, সাক্ষাৎ ০৫.০৬.২০১৭
সরকার, ক্ষিতীন্দ্রনাথ (৭০)	লম্বা পাড়া, তুফানগঞ্জ, কোচবিহার, সাক্ষাৎ ০৮.০৮.২০১৭

দাস, আশারী (৮৬)	বাকলা, চিকলিগুড়ি, পারোকাটা, আলিপুরদুয়ার, ০৯.০১.২০১৭
ডাকুয়া, অরবিন্দ (৬৮)	আমলা পাড়া, মাথাভাঙা, কোচবিহার, সাক্ষাৎ ০৯.১০.২০১৭
বর্মন, ধনেশ্বর (৭০)	মাথাভাঙা, কোচবিহার, সাক্ষাৎ ০৯.১০.২০১৭
রায়, গিরীন্দ্রনাথ (৬৬)	মাথাভাঙা, কোচবিহার, সাক্ষাৎ ০৯.১০.২০১৭
দাস, পর্বানন্দ (৬৮)	নাটাবাড়ি, কোচবিহার, সাক্ষাৎ ১১.০২.২০১৬
রায়, সবিতা (৭০)	ম্যাগাজিন রোড, কোচবিহার, সাক্ষাৎ ২০.০৩.২০১৬, ১৬.০৫.২০১৭, ২০.০৭.২০১৭
সিংহ, নৃপেন (৮২)	রবীন্দ্র সরণি, কদমতলা, দার্জিলিং, সাক্ষাৎ ১১.০১.২০১৭
সিংহ, অমর (৫০)	মেডিক্যাল মোড়, দার্জিলিং, সাক্ষাৎ ১১.০১.২০১৭
রায়, দ্বীপেন (৪৮)	মেখলিগঞ্জ, কোচবিহার, সাক্ষাৎ ২৮.০২.২০১৬
সরকার, কমলেশ (৬০)	নাটাবাড়ি, কোচবিহার, সাক্ষাৎ ১৪.০৫.২০১৫
রায়, সুখেশ্বরী (৭০)	পাটাকুড়া, কোচবিহার, সাক্ষাৎ ১৩.০৩.২০১৪, ১৮.০৫.২০১৫
দাস রাজেন্দ্রনাথ (৮০)	বারবিশা, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ২৬.০৬.২০১৫, ০৭.০৭.২০১৬
রায়, কমল (৫২)	দেওয়ানগঞ্জ, হলদিবাড়ি, কোচবিহার, সাক্ষাৎ ১৭.০৭.২০১৬
রায়, বিপ্লব (৪০)	কুশমুণ্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর, সাক্ষাৎ ০৩. ০৬.২০১৫
অধিকারী, রাজবালা (৭৫)	বাবুরহাট, সোনাপুর, আলিপুরদুয়ার, সাক্ষাৎ ২৩.০৫.২০১৮
বর্মন, শ্যামেন্দ্রনাথ (৫৮)	চিলকিরহাট, কোচবিহার, সাক্ষাৎ ২৫.০৩.২০১৭, ১৭.০৫.২০১৭

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি (Selected Bibliography)

প্রাইমারী তথ্য সূত্র :

'Census of India', 1911, Vol. V, Part I & II

'Census of India', 1931, Vol. V, Part I

'Census of India', 1901, Vol. VI, Part I

'Census of India', 1921, Vol. I, II, Part II, Vol. V, Part I

'Census of India', 1891, Vol. III

'Census Report of West Bengal', 1951, 1961, 1971, 1981, 1991

Hartley, A.C.; 'Final Report on the Rangpur Survey and Settlement Operations, 1931-38', Calcutta, 1940

Milligan, J.A.; 'Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District, 1906-16', Calcutta, 1920

Sunder, D.H.E.; 'Report on the Survey and Settlement of Western Duars in Jalpaiguri District 1889-1895', Calcutta, 1895

Majumdar, Durga Das; 'West Bengal District Gazeetteers, Koch Behar', 1977, West Bengal Govt. Press, Calcutta

Vas, J.A.; 'Eastern Bengal and Assam District Gazetteers : Rangpur' Calcutta, 1911, rpt. 1992, Indian Publishers & Distributors, Delhi

Hutchinson, R.H.S. ed. Eastern Bengal and Assam District Gazetteer : Chittagong Hill Tracts, Allahabad, 1909

Hunter, W.W.; A Statistical Account of Bengal, Vol. 1 to 10, London, Turbner and Co., 1876 and 1877

Hamilton, F. Bukanan; Account of the District or Zila Rangpur, M.S.S.E.U.R.D., India Office Library, nd.

Grierson, G.A.; Linguistic Survey of India, Vol. V., Part I, First ed. 1903, rpt. 1988, Delhi, Motilal Banarssidas

Risley, Herbert; Tribes and Castes of Bengal, Vol. I & II, Calcutta, 1891

Gait, E.A.; Census of India, Assam, Vol. 1901

Allen, B.C.; ed. Assam District Gazetteers, Vol. V & VII, Calcutta, City Press, 1905 and 1906

Dalton, Edward Tueir; Descriptive Ethnology of Bengal, Calcutta, 1872

Chatterji, Sunity Kumar; The Origin and Development of the Bengali Language, Delhi, Pupa & Co., 2002, 1st Print 1926

Gait, E.A.; History of Assam, Calcutta, 1906

Bose, N.N.; The Social History of Kamrup, 1st part, Calcutta, 1922

Frazer, James George; The Golden Bough Vol. I, II, III, Macmillan, London 1957, 1971, 1974

গ্রন্থাদি ও পত্র-পত্রিকাসমূহ :

বর্মন, উপেন্দ্রনাথ	রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস, জলপাইগুড়ি, ১৯৪১
	উত্তরবাংলার সেকাল ও আমার জীবনস্মৃতি, জলপাইগুড়ি, ১৩৯৩
	ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবনচরিত, জলপাইগুড়ি, ১৩৯৩
অধিকারী, হরিকিশোর	রাজবংশী কুলপ্রদীপ
সিংহ, পতিরাম	কামতা রাজ্যে পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় (ইতিহাস) ১ম খণ্ড, কোচবিহার, ১৩৭৯
বৈরাগী, রাধাকৃষ্ণ দাস	গোসানী মঙ্গল (সম্পা), নৃপেন্দ্র নাথ পাল, কলিকাতা, অনিমা প্রকাশন, ১৯৯২
ঘোষ, মুন্সি জয়নাথ	রাজপোখ্যান (সম্পা), বিশ্বনাথ দাস, মালা প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮৯
মীনহাজ-ই-সিরাজ,	তবকাত-ই-নাসিরী, (আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া অনূদিত ও সম্পাদিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ: ২৬৪
দাস, রিপুজয়	রাজবংশাবলী, এম এস এন বি এস এল এম এস নং ০৪
তর্করত্ন পঞ্চানন	বৃহৎধর্ম পুরাণ (সম্পা), বঙ্গবাসী ইলেকট্রো মেশিন প্রেস, ১৩১৪
আচার্য তর্করত্ন পঞ্চানন	কালিকা পুরাণ (সম্পা), নবভারতী পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৮৪
সরস্বতী স্বামী স্বরবেশ্বরানন্দ	যোগিনীতন্ত্র (সম্পা), কলকাতা, নবভারতী পাবলিশার্স, ১৩৮৫
দত্ত, এস. কে (সম্পা)	আসাম বুরুঞ্জী (১৬৪৮-১৬৮১) ২য় সংস্করণ, গৌহাটি, ডি এইচ এ এস, ১৯৯১

আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা

আজকাল, কলকাতা

বর্তমান, শিলিগুড়ি

প্রতিদিন, কলকাতা

উত্তরবঙ্গ সংবাদ, শিলিগুড়ি

জনমত, জলপাইগুড়ি

দৈনিক বসুমতী, শিলিগুড়ি

ডেগর, শিলিগুড়ি

ত্রিতোস্তা, জলপাইগুড়ি

কিরাতভূমি, জলপাইগুড়ি

বৈতানিক, শিলিগুড়ি

সেকেণ্ডারী তথ্য সূত্র :

ক : বাংলা

অধিকারী, মাধব চন্দ্র	রাজবংশী সমাজ ও মনীষী পঞ্চানন বর্মা, ১ম খণ্ড, রিডার্স সার্ভিস, কলকাতা ৭৫, ২০১৪
আডু, কেশব	লোকসংস্কৃতির পাঠ-ভবন, ধ্রুপদী, কল-৯, ২০১৩
আহমেদ, ড. ওয়াকিল	বাংলার লোকসংস্কৃতি, ঢাকা বাংলা একাডেমি, ১৯৭৪
আচার্য, সুজিত কুমার	কামতা কামাক্ষ্যা তথা কোচ রাজবংশীদের দ্রাবিড় উৎস, নিউজ প্রিন্ট, কলকাতা ২০০৭
আহমদ, খা চৌধুরী আমানতউল্লা	কোচবিহারের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, কোচবিহার স্টেট প্রেস, কোচবিহার ১৯৩৬, পুনঃপ্রকাশ মডার্ণ বুক এজেন্সি, ক্যালকাটা, ১৯৯০
আলি, ড. এ. এফ. ইমাম	সমাজতত্ত্ব, নভেল পাবলিশিং হাউস, ২/৩ পেরীদাস রোড, ঢাকা ১১০০, ২০০৬
করিম, মীর রেজাউল	উত্তরবঙ্গের ভাষা ও সংস্কৃতির সন্ধানে, সি এল এল সি, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
কর, পরিমল ভূষণ	সমাজতত্ত্বের রূপরেখা, কল, ১৯৮৯
কামিল্যা, ড. মিহির চৌধুরী	আঞ্চলিক দেবতা লোক সংস্কৃতি, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৯
কুণ্ডু মণীন্দ্রলাল	বঙ্গীয় রাজবংশী প্রবাদ প্রবচন ও ধাঁধা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯
কর্মকার, অমরচন্দ্র	অমিয়ভূষণের উপন্যাস আলোচনা ও পর্যালোচনা (১ম পর্ব), সূর্যাবর্ত, মালদা, ২০১৫
গুপ্ত, ড. পবিত্র	উত্তরবাংলার টোটো উপজাতি ও অন্যান্য প্রবন্ধ, রত্নাবলী, কলকাতা, ১৯৯৮
গঙ্গোপাধ্যায়, অশোক	উত্তরবঙ্গ পরিচয়, কল, ১৯৯৯
গেইট, ই. এ	কোচ কিংস অব কামরূপ, অনুবাদ ড. নৃপেন্দ্রনাথ পাল, অণিমা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৫

গোলাম, মুরশিদ — হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, কল, ২০০৬

গোস্বামী, ড. সনাতন (সম্পাদনা) — ছেঁড়াতার তুলসী লাহিড়ী, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, কল-৯, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ২০০৬

ঘোষ, বিনয় — বাংলার সংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব, প্রকাশ ভবন, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

ঘোষ, বিনয় — পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড, প্রকাশ ভবন, ১৯৮০

ঘোষ, সুধারঞ্জন — শিবপুরাণ, প্রত্যয় প্রকাশনী, কলকাতা-৯, জানুয়ারি, ২০০৪

ঘোষ, আনন্দগোপাল ও রায়, নির্মল চন্দ্র — ১৯৪৭-পরবর্তী উত্তরবঙ্গ, সংবেদন, মালদহ, ২০১৪

ঘোষ আনন্দগোপাল ও দাস, ড. নীলাংশুশেখর — উত্তরবঙ্গের ইতিহাস ও সমাজ/১, দীপালি পাবলিশার্স, শিলিগুড়ি ও মালদহ, ২০০৯

ঘোষ, আনন্দগোপাল ও সরকার, ড. অসীম কুমার — ভারততীর্থ উত্তরবঙ্গ, সংবেদন, মালদহ, ২০১১

চক্রবর্তী, রজনীকান্ত — গৌড়ের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩, ১৪০৫

চক্রবর্তী, ড. বরুণকুমার — বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা-৯ ১৩৯৫

* বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা-৯, ১৩৯৬
* প্রসঙ্গ লোকপুরাণ, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা-৯, ১৩৯৫
* লোকউৎসব ও লোক দেবতা প্রসঙ্গে, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৩৮৪
* লোক বিশ্বাস ও লোক সংস্কার, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৩৮৪
* লোকসংস্কৃতি ও নৃ-বিদ্যার অভিধান, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা-৯, ২০০৮

চক্রবর্তী, যাদব — কোচবিহারের ইতিহাস, নৃপেন্দ্রনাথ পাল (সম্পাদিত), বিস্ময় কোচবিহার, অণিমা প্রকাশনী ১৯৯৪ (পুনঃপ্রকাশ)

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার — সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস, জিজ্ঞাসা, ৪র্থ সংস্করণ, কল-২৯, ২০০৩

চট্টোপাধ্যায়, তুষার — লোকসংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ, কল, ১৯৮৫

চট্টোপাধ্যায়, ড. বিমলচন্দ্র — উত্তরবঙ্গের লোকসংগীত ভাওয়াইয়া ও চট্‌কা, গ্রন্থমন্দির প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯২

চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ — লোকায়ত দর্শন (১ম), নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৮/১, চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা-৯, পুনর্মুদ্রণ - ১৪১৬

চোমংলামা	চোমংলামার চোখে উত্তরবঙ্গ, চক্রবর্তী এন্ড কোং, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা - ১২
চৌধুরী, ড. দুলাল	বাংলার লোকউৎসব, কলিকাতা, ১৯৮৭
চৌধুরী, কমল	উত্তরবঙ্গের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩
চৌধুরী, প্রকাশ	জাতি-উপজাতির বিবর্তন, বাংলাদেশ, ১৯৬৯
চৌধুরী, হরেন্দ্রনারায়ণ পাল, ড. নৃপেন্দ্রনাথ (অনুবাদক)	রাজ্য কোচবিহারের রাজকাহিনী (১ম ও ২য়), অণিমা প্রকাশনী, কল-৯, ২০১৩
চক্রবর্তী, যাদব	কোচবিহারের ইতিহাস, নৃপেন্দ্রনাথ পাল (সম্পাদিত), অণিমা প্রকাশনী, কল-৯
চৌধুরী, কমল (সংগ্রহ ও সম্পাদনা)	উত্তরবঙ্গের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, দে'জ পাবলিশিং, কল - ৭৩, ২০১১
দাস, বিশ্বনাথ (সম্পাদিত)	কোচবিহারের সমাজ ও সংস্কৃতি, অণিমা প্রকাশনী, কল-৯, ১৪২১
দাস, অসীম	বাংলার লৌকিক ক্রিয়ার সামাজিক উৎস, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯১
দাস, যোগেশ	আসামের লোকসংস্কৃতি (অনুবাদ - ক্ষিতীশ দাস), ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া, নয়া দিল্লী, ১৯৮৩
দে সরকার, ড. দিগ্বিজয়	লোকায়ত দর্পণে উত্তরবঙ্গ, অণিমা প্রকাশনী, কলকাতা - ৯, ১৯৮২
দে সরকার, ড. দিগ্বিজয়	উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির পরিচয়, ছায়া পাবলিকেশন, কলকাতা ৭৩
দে, ড. দিলীপ কুমার	কোচবিহারের লোকসংস্কৃতি, অণিমা প্রকাশনী, কলকাতা - ৯, ২০০৭
দেব, সৌমেন	লোকসংস্কৃতি : তত্ত্বজিজ্ঞাসা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০৩
দে, কৃষ্ণেন্দু বিশ্বাস, নীরজ দে সরকার, ড. দিগ্বিজয় (সম্পাদিত)	কোচবিহার পরিক্রমা, কোচবিহার গ্রন্থ প্রকাশনা প্রস্তুতি সমিতি, কোচবিহার, ১৯৮৪
নাগ, ড. হিতেন	উত্তরবাংলার ভাওয়াইয়া গান, প্রকাশ ভবন, কলকাতা - ৭৩, ১৯৯৮ * কামতাপুর থেকে কোচবিহার, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কল-৭৩, ২০১০
পাল, অনিমেষ কান্তি	লোকসংস্কৃতি, ঊষা পাবলিশিং হাউস, কলকাতা - ৭৩, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৬
পাল, হরিশচন্দ্র	উত্তরবাংলার পল্লীগীতি (সম্পাদিত), ভাওয়াইয়া ও চট্কা-দরিয়া খণ্ড, সান্যাল এ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, ১৩৮০

	* উত্তরবাংলার লৌকিক ব্রতকথা, সম্পাদনা ১৯৮০
বর্মণ, কলীন্দ্রনাথ	রাজবংশী অভিধান, রাঙ্গালীবাজনা, জলপাইগুড়ি, ১৩৭৭
বর্মন, বিনয় ও রায়, নরেন্দ্রনাথ (সম্পাদনা)	উত্তরবঙ্গের ইতিহাস ও সংস্কৃতি-১, কল, ২০১২
বড়ুয়া, ড. প্রহ্লাদ কুমার	অসমীয়া লোকসাহিত্য, অসম সাহিত্যসভা, ডিব্রুগড়, অসম
বন্দ্যোপাধ্যায়, ভগবতীচরণ	কোচবিহারের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩
বাগচী (গুপ্ত), ড. জলি	ইতিহাস বীক্ষণে কোচবিহার ও গোয়ালপাড়ার লোকসংগীত, আধুনিক পর্ব, রক্তকরবী, কলকাতা - ২০০১
বসু, গোপেশকৃষ্ণ	বাংলার লৌকিক দেবতা, ২য় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭৩, ১৯৮৭
বসাক, ড. শীলা	বাংলার ব্রতপার্বণ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৮
বর্মা, ধর্ম নারায়ণ	কামতাপুরী ভাষা সাহিত্যের রূপরেখা, রায়ডাক প্রকাশনী, তুফানগঞ্জ, কোচবিহার, ১৪০৭
বর্মা, ড. সুখবিলাস	ভাওয়াইয়া লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ১৯৯১
বর্মা, ড. সুখবিলাস	জাগ গাণ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৭
	* ভাওয়াইয়া চটকা, সোপান, কলকাতা ২০১৩
বর্মন, উপেন্দ্রনাথ	উত্তরবাংলার সেকাল ও আমার জীবনস্মৃতি, প্রকাশক বিজয় কুমার বর্মন, জলপাইগুড়ি, ১৩৯২
	* রাজবংশী ভাষায় প্রবাদ প্রবচন, হেঁয়ালী, প্রকাশক নির্মলচন্দ্র চৌধুরী, জলপাইগুড়ি, ১৩৮৪
	* রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস, জলপাইগুড়ি, ১৪০১
বর্মন, পঞ্চানন	উত্তরবঙ্গীয় প্রাচীন জনগোষ্ঠীর ভাষা প্রসঙ্গ, ১৯৭৪
বিশ্বাস, রতন (সম্পাদিত)	উত্তরবঙ্গের লোকগান, বইওয়ালা, কোলকাতা - ২০০৪
বিশ্বাস, হেমাঙ্গ	লোকসঙ্গীত সমীক্ষা, বাংলা ও আসাম, এ মুখার্জী এ্যান্ড প্রা. লি., কলকাতা, ১৩৮৫
বর্মন, সুবল	কোচ রাজবংশী সংস্কৃতির রূপরেখা (সম্পাদিত) ১ম খণ্ড, দীপালি পাবলিশার্স, মালদহ ও শিলিগুড়ি
বর্মন, ধনেশ্বর	উত্তরবঙ্গের জনজীবন ও লোকাচার, দীপ প্রকাশন, কলকাতা-৬
বর্মা, হেমন্তকুমার	কোচবিহারের ইতিহাস, কোচবিহার, ১৯৮৮

বর্মন, পরিমল	উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের লোকপ্রযুক্তি, উপজন ভুই পাবলিশার্স, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার
	লোকউৎস (১ম বর্ষ) উপজন ভুই পাবলিশার্স, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার
বসুনিয়া, নারায়ণ চন্দ্র	লোকসংস্কৃতির অঙ্গণ, কল্যাণী, মালদহ, ২০১২
	* গোরক্ষনাথের গান : লোকপুরাণের আঙিনায় রাজবংশী জীবনকথা, গ্রন্থবিকাশ, কল, ২০১৪
বিশ্বাস, অশোক	বাংলাদেশের রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০০৫
বিশ্বাস, রতন	উত্তরবঙ্গের জাতি ও উপজাতি (সম্পাদিত), পুনশ্চ, কলকাতা-৯
বন্দ্যোপাধ্যায়, ভগবতীচরণ	কোচবিহারের ইতিহাস, মডার্ণ বুক এজেন্সি, ক্যালকাটা, ১৯৯০
বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর ও দাশগুপ্ত, অভিজিৎ	জাতি, বর্ণ ও বাঙালী সমাজ (সম্পাদিত), দিল্লী, আই. সি. বি. এস, ১৯৯৮
দাস, বিপুল	লালবল, পরশপাথর প্রকাশন, ২০০৯
বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমহান	সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞান, পারুল প্রকাশনী, কল - ৯, ২০১২
বর্মা, দেবেন্দ্রনাথ	উপনিবেশিক রাজবংশী জনগোষ্ঠীর জাতি পরিচিতি-প্রসঙ্গ — ক্ষাত্র আন্দোলন : একটি সমীক্ষণ, বিকাশ পাবলিকেশন, কল - ৯, ২০০৯
বর্মা, ধর্মনারায়ণ	কামরূপ কামতা কুচবেহার রাজ্যের ইতিহাস,
বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর	বর্ষাদুয়ার, করুণা প্রকাশনী, কল - ৯, ২০০৭
মান্তা, ধনেশ্যর (সম্পাদনা)	প্রকাশক - মিনতী অধিকারী, তুফানগঞ্জ, কোচবিহার, ২০০৫
ভৌমিক, ড. নির্মলেন্দু	প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৭
ভট্টাচার্য, ড. আশুতোষ	বাংলার লোকসংস্কৃতি, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নয়াদিল্লী, ১৯৯১
ভট্টাচার্য, ড. আশুতোষ	গোপীচন্দ্রের গান, পরিবর্ধিত ৩য় সংস্করণ, ক. বি. ১৯৬০
ভট্টাচার্য, ড. আশুতোষ	বাংলার লোকশ্রুতি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৩৯২
ভট্টাচার্য, ড. আশুতোষ	বাংলার লোকসাহিত্য ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ খণ্ড, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৩৫-৬৬
ভট্টাচার্য, গুরুদাস	বাংলাকাব্য শিব, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৫৬
ভট্টাচার্য, সুশীলকুমার	উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি, ভারতী বুক স্টল, কলকাতা, ১৯৭০
ভট্টাচার্য, হিমাদ্রি শঙ্কর ও ভট্টাচার্য, সুধীশঙ্কর	কোচবিহারের প্রাচীন ব্রতকথা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, ১৯৮৩

ভট্টাচার্য, পীযূষ	নির্বাচিত গল্প
মজুমদার, অরুণভূষণ	প্রত্যুষ ও প্রদোষকালের কামতা-কোচবিহার, নিউ দিল্লী
মজুমদার, শিশির	উত্তরগ্রাম চরিত, শিলালিপি, কলকাতা, ১৯৮০
মজুমদার, মানস	লোকঐতিহ্যের দর্পণে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭৩, ২য় সংস্করণ, ২০১০
মজুমদার, তুলিকা	বাংলার বনদেবতা, সম্পাদিত, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৭
মজুমদার, রমেশচন্দ্র	বাংলাদেশের ইতিহাস (১ম খণ্ড), কল, ২০০২
মণ্ডল, কাকলীধারা	বাংলার লোকসংগীত কোষ (সম্পাদিত), অমরভারতী, কলকাতা - ৯
মণ্ডল, তনয়	রাজবংশী লোকচিকিৎসা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
মণ্ডল, শীবেন্দ্রনারায়ণ	রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস, গৌরীপুর, ইন্ডিয়া প্রেস, ১৯৭২
মিত্র, অশোক	পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা (সম্পাদিত), ১ম খণ্ড, দি ম্যানেজার অব পাবলিকেশন, সিভিল লাইনস, দিল্লী,, ১৯৬৯
মুন্সী, জয়নাথ	রাজোপাখ্যান, বিশ্বনাথ দাস (সম্পাদিত), কলিকাতা, মালা প্রকাশনী, ১৯৮৯
মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ	গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি, কলকাতা, ১৯৭২
মিত্র, সনৎকুমার	বাঘ ও সংস্কৃতি, সম্পাদিত, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮০
.	* লোকসংস্কৃতির মেথলডিজ (সম্পাদিত), পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৯
মৈত্র, অলোক	বাংলার লৌকিক ধর্মাচারের ঐতিহ্য সন্ধানে, ২য় সংস্করণ, পুস্তক বিপণি, কল-৯, ২০০৮
মণ্ডল, বিপুল	উত্তরবঙ্গ চর্চা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কল - ৯, ২০১৫
মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র	গোষ্ঠী জীবনের উপন্যাস, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কল - ৯, ২০০৯
মজুমদার, অমিয়ভূষণ	মহিষকুড়ার উপকথা ও একটি খামারের গল্প, দে'জ, কল-৭৩, ১৯৮১
রায় প্রধান, অশোক	ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে উত্তরবঙ্গ ও রাজবংশী, রয়্যাল পাবলিশার্স, কলকাতা - ১৩, ২০০৬
রায়, ড. গিরিজাশংকর	প্রসঙ্গ : উত্তরবঙ্গ লোকসাহিত্য, উত্তরবঙ্গ প্রকাশনী, আলিপুরদুয়ার, ১৩৮৮
	* উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির পূজা-পার্বণ, ২য় প্রকাশ, এন. এল. পাবলিশার্স, শিলিগুড়ি, ১৯৯৯

	* সাতভাইয়া (রাজবংশী কবিতা সংকলন), শিলিগুড়ি, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ
রায়, অরুণকুমার	লোকায়ন চর্চার ভূমিকা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পুনর্মুদ্রণ ২০০৫
রায়, মোহিত	রূপে রূপে দুর্গা, অমরভারতী, কলকাতা, ১৯৯৫
রায়, দীপ্তিময়	পশ্চিমবঙ্গের কালি ও কালিক্ষেত্র, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা - ৯, ১৩৯১
রায়, ধনঞ্জয়	বঙ্গদেশের উত্তর প্রান্তীয় সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ধারা, অমরভারতী, কলকাতা-৯, ২০০৮
রায়, নীহাররঞ্জন	বাঙালির ইতিহাস (আদিপর্ব) দে'জ পাবলিশিং, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, কলকাতা - ৭৩, ১৪১৩
রায়, যোগেশ চন্দ্র বিদ্যানিধি	পূজা পার্বণ, কলকাতা, ১৩৫৮
রায় প্রধান, তপন	আব্বাসউদ্দিন, দীপ প্রকাশক, কলকাতা, ২০০২
রায়, জ্যোতির্ময়	রাজবংশী বৃত্তান্ত, অর্পিতা প্রকাশনী, কলকাতা - ১২, ২০০৮
রায়, পুষ্পজিৎ	মালদা জেলার লোকসংস্কৃতি, সুবনসিরি, মালদহ, ২০০৮
রায় জীতেশ ও রায় রতন	উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি (সম্পাদিত), সোপান, কলকাতা-৬
রায়, স্বপন	প্রাচীন কোচবিহারের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, বইওয়ালা, কল-৪৮, জানুয়ারি ২০০৭
	* প্রাচীন কোচবিহারের আর্থ-সামাজিক ইতিহাস, বইওয়ালা, কল-৪৮, ২০০৮
রায়, জ্যোতির্ময়	রাজবংশী সমাজ দর্পণ, ভাষাবন্ধন, কল-৩২, ২০১২
	* মৈষালের বাথাননামা, দি সী বুক এজেন্সী, কলকাতা, ২০১৬
রায়, ড. দীপককুমার	তিস্তাবুড়ি, টেরাকোটা, বিষ্ণুপুর, ২০১৬
রায়, ড. শচীন্দ্রনাথ	সাহিত্য সাধনায় রাজন্যশাসিত কোচবিহার, এন. এল. পাবলিশার্স, শিবমন্দির, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৪২০
রায়, ধনঞ্জয়	উত্তরবঙ্গ (উনিশ ও বিশ শতক), দীপ প্রকাশন, কল - ৬, ২০০২
রায়, স্বপনকুমার	কোচবিহারের রাজ দরবারের সাহিত্যচর্চা, বুকস্ ওয়ে, কলকাতা, ২০১১
রায়, গিরীন্দ্রনাথ	সাংস্কৃতিক রাজনীতি কামতাপুরী রাজবংশী ও বাংলা প্রবন্ধাবলী, পত্রলেখা, কল - ৯, ২০১৮

রায়, দেবেশ	তিস্তাপারের বৃত্তান্ত, দে'জ পাবলিকেশন, কোলকাতা, ১৯৮৮ * মফঃস্বলি বৃত্তান্ত (১ম), দে'জ সংকলন, কল, ১৯৮৯ * তিস্তাপুরাণ, দে'জ, কোলকাতা, ২০০০
লাহিড়ী, দীনেশ চন্দ্র	উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জাতির ইতিবৃত্ত (উত্তরবঙ্গের ইতিহাস ও সংস্কৃতি) কল
শাসমল, কার্তিক চন্দ্র	সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞান, বুকল্যান্ড, ১ শংকর ঘোষ লেন, কলকাতা-৬, ২০০৭
সরকার, ইছামুদ্দীন	ঐতিহ্যে ও ইতিহাসে উত্তরবঙ্গ (সম্পাদিত), এন. এল. পাবলিশার্স, ডিব্রুগড়, অসম, ২০০২
সান্যাল, ড. চারুচন্দ্র চক্রবর্তী কে কে রায়, প্রীতিধন লাহিড়ী, ড. আর. এম (সম্পাদিত)	জলপাইগুড়ি জেলা শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ, জলপাইগুড়ি, ১৯৯২
সিংহ, ক্ষেত্রনাথ	পঞ্চানন বর্মার জীবনী বা রঙ্গপুর ক্ষত্রিয় সমিতির ইতিহাস, অণিমা প্রকাশনী, কল-৯, ২০১৫
সুর, অতুল	হিন্দু সভ্যতার নৃ-তাত্ত্বিক ভাষ্য, সাহিত্যলোক, ৩য় প্রকাশ, কলকাতা - ৬, ১৯৯৮ * বাঙলা ও বাঙ্গালী সমাজ ও সংস্কৃতি, কল, ১৯৯০ * বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন, কল, ২০০৮
সূত্রধর, কার্ত্তিক চন্দ্র	সমাজ, ধর্ম ও অর্থনীতি : প্রসঙ্গ উত্তরবঙ্গ (সম্পাদিত), সংবেদন, মালদহ, ২০১৩
সূত্রধর, কার্ত্তিক চন্দ্র, ভাওয়াল, পৌলমী ও খাতুন, মারুফা (সম্পাদিত)	বিবর্তনের ধারায় উত্তরবঙ্গের সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি, দীপালি পাবলিশার্স, শিলিগুড়ি ও মালদহ, ২০১০
সেন, সুবোধ	উত্তরবঙ্গের লোকনাটক ও জনজীবন, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কল, ২০০২
সেনগুপ্ত, পল্লব	পূজাপার্বণের উৎস কথা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা - ৯, ২০০১ * লোকপুরাণ ও সংস্কৃতি, সম্পাদিত, পুস্তক বিপণি, কলকাতা - ৯ ১৯৫৪

সোম, সুস্মিতা	মালদহ : ধর্মীয় ঐতিহ্য ও লোকউৎসব, কল, ২০১৩
	মালদহ : ভাষা-শিল্প, সাহিত্য-সংস্কৃতি, সোপান, কল - ৬, ২০১৬
হালদার, শশিভূষণ	কোচবেহার হিতৈষিণী সভা বক্তৃতামালা, কলকাতা, ১৯৬৫
পাল, নৃপেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত)	
হালদার, গোপাল	সংস্কৃতির রূপান্তর, ৭ম সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৬৫

ইংরেজি গ্রন্থ :

Barma, Dr. Sukhabilas	Bhawaiya Ethnomusical Study, Global Vission Publishing House, N. Delhi - 2000
Basu, Swaraj	Dynamics of a Caste movement : The Rajbanshis of North Bengal (1910-1977), Dr. Manohor Publication & Distributor, New Delhi - 11
Bhattacharjya, Krishnapriya	Rajbanshi & Dhimal : Strggle Stories Contemporary Socio-economic survey of two Indegenous Community of North Bengal, Papyrus, Kolkata - 2005
Barman, Binay & Barman Kartick Ch.	History and Culture of North Bengal, Pragatishil Prakashak, Kol-73, 2015
Chatterjee, Dr. S. K.	The Origin and Development of the Bengali Language (1926) Part - I
Chatterjee Sunity Kumar	Kirata-Jana-Kriti (Indo Mongoloids), The Asiatic Society, 1 Park Street, Kolkata - 16 (1951), rpt. 2011
Chowdhury H. N.	CoochBehar state and its Revenue settlement, Edited by Nripendra Nath Pal, N. L. Publication, Siliguri, Derjeeling
Deb, Arabinda	Bhutan and India, A Study in Frontier Political Relation (1772-1865) Cal-1976
Dutta, Birendra Nath	A Study of the Folk Culture of the Goalpara Region of Assam, Cauhati University, 1995
Dalton, E. T.	Descriptive Ethnology of Bengal Rept. 1960
Debnath, Sailen	Essays on Culture History of North bengal, N L Publishers, Siliguri, 2008

Dasgupta, Ranjit — Economy, Society and Politics in Bengal, Jalpaiguri 1869-1947, Oxford University Press, 1992

Gruning, J. F. — Eastern Bengal & Assam District Gazetteers, Jalpaiguri, Printed at Pioneer Press, Alipore, Calcutta (1911)

Gait, Edward — A History of Assam (Thacker Spink & Co. 1993, PLT. Calcutta - 1963)

Grierson, G. S. — Linguistic Survey of India (Indo Aryan Family Eastern Group, Part I, vol. V, Motilal Banarasi Das, Delhi, Rept. 1963)

Kakati, B — The Mother Goddess, Kamakhya, Gouhati, 1961

Mukhopadhyaya, Rajat Subhra — The Rajbanshis of North Bengal : A Comparative Demographic Profile 1951-1981, Published by NBU, Siliguri 1990

* A Bibliography on the Rajbanshi and related Topics, N L Publishers, Siliguri, 2013

Mandal, Sekh Rahim & Begum Rokaiya — Status of Rajbanshi women in West Bengal : Problem and Prospects, Bulletin of the Cultural Research Institute, Vol. XIX, (19), No. 3, 1997, Page - 49-55

Nath, D — History of Koch Kingdom 1515-1615, Delhi, 1989

Rajguru, S — Medieval Assamese Society 1228-1826, Nao Gaon, 1988

Roy, Subhajyoti — Transformations of the Bengal Frontier, jalpaiguri, 1765-1948, London, 2002

Roy, Jyotirmay — Economic & Social Status of the Rajbanshi, Modern Review, Vol. 96, 1954, Page - 124-38

Sanyal, Dr. Charu Chandra — The Rajbanshis of North Bengal, The Asiatic Society, Kol-16 (1965), Rept. 2002

Sengupta, Sankar — Tree Symbol Worship in India (Indian Publication, Calcutta 1965)

Sunder, DHE — Final Report on Survey and Settlement of the Western Duars in the District of Jalpaiguri (1889-1895) Bengal Secretarial Press, Calcutta

Vasu, N. N. — Social History of Kamrupa, Calcutta, 1922

District Statistical Hand Book, Jalpaiguri, 1998, Durgadas Mazumder IAS, West Bengal District Gazetteers, Kochbehar, 1977

খ : রাজবংশী গ্রন্থ্

অধিকারী, ড. রমেন্দ্রনাথ	সাতশো বছরিয়া কামতা কোচ রাজ্যের ইতিহাস, ইন্ডিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৬
বর্মণ, কলীন্দ্রনাথ	রাজবংশী অভিধান, রাঙালীবাজনা, জলপাইগুড়ি, ১৩৭৭
বর্মণ, গুণধর	কামতাপুরের ভাষা কৃষ্টি, ইতিহাস, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি, ১৯৯৯
বর্মণ, অভিজিৎ	বাথান (উপন্যাস), ডেগর ৫-৮ সংখ্যা, শিলিগুড়ি, শিবমন্দির, ২০০৮
রায়, খগেন্দ্রনাথ	কামতাপুর ইতিহাসের আলোৎ (প্রাচীনযুগ), শালকুমার হাট, ফালাকাটা, জলপাইগুড়ি, ১৯৮৮
রায়, হরিপদ	আগিলা দিনের কথা, হরিপদ রায় (নিজে), ২০০২
	* পাছিলা ফিরি দেখা, হরিপদ রায় (নিজে), ২০০৫

গ : অসমীয়া গ্রন্থ্

আগরওয়াল, আনন্দচন্দ্র	গোয়ালপারার পুরণি বিবরণ, ধুবুরী, ১৯২৬
চৌধুরী, অম্বিকাচরণ	কোচরাজবংশী জাতির ইতিহাস আর সংস্কৃতি, বঙ্গাইগাও, ১৯৬৯
দত্ত, ধীরেন্দ্রনাথ	গোয়ালপাড়িয়া লোকসংস্কৃতি আরু অসমীয়া সংস্কৃতি লৈ ইয়ার অবদান, ধুবুরী, ১৯৮২
দাস, ধীরেন	গোয়ালপাড়িয়া লোক সংস্কৃতি আরু লোকগীত, গুয়াহাটি, ১৯৯৪
রায়, গৌরী মোহন ও শর্মা, গায়ত্রী	পশ্চিম অসমের লোকসংস্কৃতির আভাস, ভবানী বুক হাউস, আসাম, ১৯৯৭
ভকত, ড. দ্বিজেন্দ্রনাথ	অসমর কোচ-রাজবংশী জনজাতি রামকৃষ্ণ মিচন পথ, ধুবুরী, অসম, ২০০৮
	* রাজবংশী ভাষা প্রসঙ্গ, সি. ই. এস. আর, গোলকগঞ্জ, অসম, ২০০৪
	* কুশানগান, অসম সাহিত্য সভা, ধুবুরী, অসম, ২০০১
	* রাজবংশী লোকদেবতা মাশান, সম্পাদনা, সি. ই. এস. আর, ধুবুরী, অসম, ২০০৭
ভট্টাচার্য, প্রমোদচন্দ্র	অসমীয়া সংস্কৃতি, গুয়াহাটি, ১৯৮৯
বরুয়া বিরিঞ্চি কুমার	অসমর লোকসংস্কৃতি, গুয়াহাটি

বর্ম্মণ, বিশ্বনাথ	লোককৃষ্টির উৎস, গুয়াহাটি, ১৯৮২
নেওগ, মহেশ্বর	পুরাণি অসমীয়া সমাজ আরু সংস্কৃতি, পুনর্মুদ্রণ, গুয়াহাটি, ১৯৭১
শর্মা, ড. নবীনচন্দ্র	লোকসংস্কৃতি আরু অবিভক্ত গোয়ালপাড়া জিলার পরিবেশ কথা, অসম সাহিত্য সভা, ধুবুরী শাখা, ২০০৭
শর্মা, শিবানন্দ	গোয়ালপাড়া জিলা সংস্কৃতি সংরক্ষণ, ধুবুরী, ১৯৭১

ঙ : সহায়ক পত্র-পত্রিকা ও প্রবন্ধাবলী :

কর, অরবিন্দ (সম্পাদক)	কিরাতভূমি, জলপাইগুড়ি জেলার ১২৫ তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে জেলা সংকলন - ১, ১৮৬৯-১৯৬৮
কর, অরবিন্দ (সম্পাদক)	কিরাতভূমি, জলপাইগুড়ি জেলা সংকলন - ২
ঘোষ, ড. প্রভাত (সম্পাদক)	নকশিকাঁথা, ডিসেম্বর - ২০১০
মিত্র, সনৎকুমার (সম্পাদক)	লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা, ভাওয়াইয়া বিশেষ সংখ্যা, ১৩৯৯
রায়, গৌতম (সম্পাদক)	বৈতানিক, উত্তরবঙ্গের লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতি সংখ্যা, শিলিগুড়ি, ২০০৪
রায়, ড. নিখিলেশ (সম্পাদক)	ডেগর ১, ২, ৩, ৪, ৫-৮ সংখ্যা, নর্থবেঙ্গল আকাদেমি অফ কালচার, শিলিগুড়ি, কদমতলা, দার্জিলিং
মজুমদার, বিমলেন্দু	উত্তরবঙ্গের অধিবাসীদের লৌকিক স্থলযান (প্রবন্ধ) লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা, ১৮ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ২০০৬
মজুমদার, বিমলেন্দু	লোকগানের লোকজন, ১৯-তম রাজ্য ভাওয়াইয়া সংগীত প্রতিযোগিতা ও উত্তরবঙ্গ মেলা, ২০০৮
রায়, দীনেশ	ভাওয়াইয়া গানের তালতত্ত্ব, ১৮-তম রাজ্য ভাওয়াইয়া সংগীত প্রতিযোগিতা ও উত্তরবঙ্গ মেলা ২০০৭
বর্মণ, অভিজিৎ	বাথান (উপন্যাস), ডেগর, ৫-৮ জামটিয়া সংখ্যা, নর্থবেঙ্গল আকাদেমি অফ কালচার, সম্পাদক ড. নিখিলেশ রায়, শিলিগুড়ি, কদমতলা, দার্জিলিং, ২০০৮
বর্মা, ড. সুখবিলাস	রাজবংশী সমাজের আত্মপরিচয় (প্রবন্ধ), ইছামুদ্দিন সরকার সম্পাদিত ঐতিহ্যে ও ইতিহাসে উত্তরবঙ্গ, এন. এল. পাবলিশার্স, ডিব্রুগড়, অসম, ২০০২
বর্মন, প্রসূন	নাইনথ কলাম-১৪, রাজবংশী কোচ-রাজবংশী (বিশেষ সংখ্যা), মালিগাঁও চারি আলি, গুয়াহাটি, অসম, ২০১৮
মোহম্মদ, আবদুল হাফিজ	যাদুবিদ্যার দিগদিগন্ত, সাহিত্যিকী, বসন্ত সংখ্যা ১৩৭৪ * লৌকিক সংস্কার ও মানবসমাজ

রায় ড. দীপক কুমার	মৈষালী জীবনের খণ্ড চিত্র (প্রবন্ধ), ভাওয়াইয়া উৎসব স্মরণিকা, ২০১৩
	* রাজ্য ভাওয়াইয়া সংগীত প্রতিযোগিতা ও উত্তরবঙ্গ মেলা স্মরণিকা ২০০৬, ২০১৮
সরকার, ক্ষিতীন্দ্রনাথ	রায়ডাক, দেবীপূজা সংখ্যা ২০১১, তুফানগঞ্জ, কোচবিহার
(সম্পাদক)	রায়ডাক, দেবীপূজা সংখ্যা ২০১০, তুফানগঞ্জ, কোচবিহার
রায়, রমেন	গোয়ালপাড়িয়া লোকগীতে হাতি মাহুত তথা প্রেম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংখ্যা (শারদসংখ্যা), কলকাতা, ১৪১৪
দাস, মধুসূদন	মাশান চিত্রকলা, লোকশ্রুতি, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯নং সংখ্যা
মিস্ত্রি, সুভাষ	দক্ষিণবঙ্গের লোকসমাজের মন্ত্র, ২০০০
সেন, ড. সুকুমার	বিচিত্র নিবন্ধ, ১৯৬১
সরকার, উপেন্দ্রনাথ (সম্পাদক)	লোকনাট্য-কুশান গান (প্রবন্ধ), ৩য় সংখ্যা, সপ্তবিংশ বছর, অসম সাহিত্য পত্রিকা, ১৯৯১
শর্মা, ড. উপেন্দ্রজিৎ	লোককৃষ্টি মুখপত্র, প্রথম বছর, প্রথম সংখ্যা, ২০০৯
বর্মা, রমনীমোহন (সম্পাদক)	কালবৈশাখী, দিনহাটা, কোচবিহার, খণ্ড চিত্রে উত্তরের সাংস্কৃতিক ইতিহাস, বিশেষ সংখ্যা, ২০১০
	উত্তরের লোকসমাজ দর্পণ, ১৮১৬
	লোকায়ত লোকশ্রুতি ও লোকভাষা সংখ্যা, ২০০৭
রায়, হরিপদ (সম্পাদক)	বাঘধেনুক, জার সংখ্যা, পঞ্চম বছর, ২০০২, রাজবাড়িপাড়া, জলপাইগুড়ি, বাঘধেনুক বাইষ্যালী সংখ্যা, ১৪১০
দাস, ড. ধীরেন্দ্রনাথ (সম্পাদক)	সোতাল, ২০০৮
	কামতাপুরী ভাষা উন্নয়ন পরিষদ, দিনহাটা, কোচবিহার
সরকার, কমলেশ	ডাকনাম, তুফানগঞ্জ, কোচবিহার, ১৪১৩
সরকার, নিমাইচন্দ্র (সম্পাদক)	মেঠোপথ, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কুশমুণ্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর
ভট্টাচার্য, অজিতেশ (সম্পাদক)	মধুপর্ণী, কোচবিহার জেলা সংখ্যা
	মধুপর্ণী, দিনাজপুর জেলা সংখ্যা
	মধুপর্ণী, মালদহ জেলা সংখ্যা
	মধুপর্ণী, জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা
	মধুপর্ণী, দার্জিলিং জেলা সংখ্যা
	উত্তরবঙ্গ সংখ্যা
	মধুপর্ণী, জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা - ১৩৯৪

চক্রবর্তী, হরিপদ	উত্তরবঙ্গের বাংলা মন্ত্র প্রসঙ্গে, মধুপর্ণী, উত্তরবঙ্গ সংখ্যা, ১৩৮৪
চৌধুরী, আর্য	লোকশ্রুতি, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৌষ ১৪০৯, ডিসেম্বর ২০০2
মণ্ডল, অজিত (সম্পাদক)	পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা, জুন ২০০১, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
রায়, সুপ্রিয়া (সম্পাদক)	পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার জেলা সংখ্যা, জুলাই ২০০৬, বিশেষ সংখ্যা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বর্মন, ধনঞ্জয়	খর্গস্রোত, কোচ রাজবংশী সাহিত্যসভা
রায়, ভূপেন; রায়, উমাকান্ত ও রায়, ভাগিরথী (সম্পাদক)	কোকরাঝার, জিলা সমিতি, ২০০৯
বর্মন, ধনঞ্জয় (সম্পাদক)	বেনা, কোকড়াঝার জিলা বিজয়া উৎসব উদযাপন সমিতি, শক্তি আশ্রম, ২০০৯
রায়, বুদ্ধেশ্বর	ফুরুঙা-গোটায় বিটি এডি কোচরাজবংশী সমীশলীর ৪র্থ দ্বি-বার্ষিক অধিবেশন কোকড়াঝার, ২০০৮, অসম
রায়, ভূপেন রায়, উমাকান্ত (সম্পাদক)	ভূমকি, কোচ-রাজবংশী সাহিত্য সভা, কোকড়াঝার জিলা সমিতি, কোকরাঝার, ২০১১, অসম
বর্মন, ধনঞ্জয়	মাকচ্, কোকড়াঝার জিলা কোচ-রাজবংশী সাহিত্যসভা, কোকরাঝার, অসম, ২০০৮
রায়, হেমচন্দ্র রায়, ভূপেন (সম্পাদক)	পহলান, গোটায় কোচ রাজবংশী ছাত্রসংস্থার অষ্টম দ্বি-বার্ষিক কেন্দ্রীয় অধিবেশন, ২০০৮ * হাওরীয়া মণ্ডল বাখারা, কালিপুখরী, কোকড়াঝার/অসম
সাহা, বিপ্লব রায় বিশ্বজিৎ (সম্পাদক) রায় গোপেশ	হরিৎ বিষয় - বাংলা সাহিত্য : প্রেক্ষিত উত্তরবঙ্গ, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ২০১২
রায় বিশ্বজিৎ (সম্পাদক)	হরিৎ উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষাপটে নাটক ও নাটকচর্চা, ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২০১৫
ভোগা	রাজবংশী ভাষা আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৪২১ বঙ্গাব্দ

নির্ঘণ্ট

অ

অধিকারী ৮৯

অগান ৯২

অন্তজ ৯৮

অশুচ ১১৩

অপারেশন বর্গা ১২৯, ১৪০

অহম ১৪২

অনন্তকন্দলী ১৪৩

অস্ট্রিক ১৪৯

অমিয়ভূষণ মজুমদার ১৬৭

অভিজিৎ সেন ১৭৭

অভিজিৎ বর্মন ১৮৬, ১৮৭, ২১৮

অললই ঝললই মাদারের ফুল ১৯৮

অনুকূল ঠাকুর ২৩৩, ২৭৩

অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮৬

অনৈতিহাসিক ২৯৩

অমূল্য দেবনাথ ২১১

আ

আসাম ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার ২৯

আত্তীকরণ ৬

আঠোয়ারী ভাঙ্গা ৮

আমাতি ৮, ১১৭, ২৩৭, ২৫৩

আটো জাগা ১৫

আব্রাহাম গ্রিয়ারসন ২৯, ১৫০, ১৯১

আভং ফুলের মধু ১৯৪

আটিয়া কলা ৫০

আগরণ ৬২

আব্বাসউদ্দিন ৮৯

আলোয়া ৯০, ৯১

আষাঢ়ি সেবা ১১৭, ১১৮
আদিম ১৩৮
আওটা ১৬৬
আসামী ১৮৫, ২৯৫
আসোল ঘাটা ২০৪
আলো ২১৬
আকবরনামা ৪৯, ২২৪
আমাছামা চান ২১৮
আশুতোষ দাস ১৫৬
আরোপণ ২৩৪
আমৈত ২৫৩
আলমগীরনামা ৩৫
আর এইচ হাচিনসন ৪৬
আবুল ফজল ৪৯

ই

ই টি ডালটন ৩১, ৪৬
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ৭৩, ৭৪
ই বি টাইনর ২
ইস্টার্ন বেঙ্গল এন্ড আসাম ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার ৪৬

ঈ

ঈশ্বরবাদ ২

উ

উত্তরের গল্প ১৭৭
উত্তরবাংলার সেকাল ও আমার জীবনস্মৃতি ১৭৮
উঠানি বিয়ে ৮
উপেন্দ্রনাথ বর্মন ৩৪, ১১১, ১৭৮, ২৯৫
উপবীত ৯৭, ২২৮
উর্বরাসংস্কৃতি ১২২, ২৩৭

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার ১৩৬
উজানি ১৯২
উত্তরবঙ্গ ২০১, ২১৯
উত্তরবাঙ্লা ২০১
উদিস ২১৯
উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জাতির পূজা পার্বণ ২২

এ

একেশ্বরবাদ ২
একশরণ ৫৬, ৫৮, ৫৯, ২২৫, ২৬৮, ২৭৪
এফ ডব্লিউ স্ট্রোং ৮০, ৮৬
এ শিবে ১৫১
এ থুবে ১৫১
এগিনা ১৭০
এই নিলুয়া দ্যাওয়ার তলত ২১১
এডওয়ার্ড গেইট ৩০, ৪৬, ২৬৮
এইচ এইচ রিজলে ২৮
এইচ রেভারলি ২৮, ৩০
এ ই পার্টার ২৮
এসে অন দি কোচ, বোড়ো এবং ধীমাল ট্রাইবস ২৯
এইচ এন চৌধুরী ৬০
এন অ্যাকাউন্ট অফ দি ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার অর জিলা অফ রঙপুর ৫৪
অ্যাকাউন্ট অব দি ডিস্ট্রিক্ট রঙপুর - ১৮১০, ৪
এ নোট অন দি রাজবংশী অফ ইষ্টার্ন ইণ্ডিয়া উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু সোস্যাল মুভমেন্ট ১২৮

ও

ও ম্যালে ১৭, ২৯
ওয়াড্ডেন হজসন ৩০
ওয়ারেন হেস্টিংস ৭৩, ৭৭
ওঝা ১২০

ও ডোনেল ২৯
ওয়াড্ডেল ৩০

ক

কইনাপাত্র ১১৫
কতোয়াল ৪৫
কন্যাপণ ১১৫
কলাতলা ২৬২
কতলা ২৬৯
কণ্ঠী বদল ২৭৩
কথা ও ছিল্কা ১৫৮
কমলেশ সরকার ২১৩
কবিতা কুঙ্করার সুতা ২১৩
কলিন্দ্রনাথ বর্মন ২০০, ২০১
কামতা ৪৫
কামতেশ্বর ৪৫
কালাপাহাড় ৪৭
কাইয়া ৩৩
কাশ্যপ ৯৭
কারোয়া ১১৪
কান্তেশ্বর ২২৪
কামতেশ্বরী ২২৪
কালা ২৭৫
কালনাত্তির কবিতা ২১৫
কামতাপুরি অভিধান ২১১
কামতেশ্বর কুল কারিয়া ৩৫
কামতাবিহারী ৪০
কামতাপুরী ভাষা প্রসঙ্গ ৪০
কালিকাপুরাণ ৩৫, ৩৭, ১৪৯
কিচ্চা ১৯০
কিরাত জন কৃতি ৩২, ৩৪

কীর্তিনিয়া ১২১
কুলগুরু ৮৯
কুয়ারী ২৪৬
কুশান ৯০
কুলকারিকা ৩৫
কোচ ১১০
কোচবিহারের ইতিহাস ৩৬
কোচবিহার সাহিত্য সভা ১৩৬
কৃষ্ণভারতী ৫৮
কৃষ্ণধামালী ১৪৬

ক্ষ

ক্ষার ৬২
ক্ষত্রিয় ৫, ১১১, ১১৩, ২৭৩
ক্ষত্রিয়করণ ১০, ১৮০
ক্ষত্রিয় সমিতি ৩৩, ৮৭, ৯৭, ২৭৫
ক্ষত্রিয় ৯৮, ৯৯
ক্ষত্রিয় ছাত্র সমিতি ৯৯
ক্ষত্রিয় রেজিমেন্ট ১০১
ক্ষেতি লক্ষ্মী ২৩৭
ক্ষত্রিয় জাতি ৩৩

খ

খেন ১০, ১৩৭
খেলবিধি ৩৫
খোকরাভাত ১৭৩
খোজাগর ২৫৮

গ

গন্ধর্ব নারায়ণ ৪৬
গন্ধর্বনারায়ণ বংশাবলী ৪৬

গম্ভীরা ১১৭
গছা দেওয়া ১১৯
গছিবোনা ১১৭
গড় শ্রীখণ্ড ১৬৭
গারামঠাকুর ৮
গাওগছ ১১৬
গারো ১৩৭
গাবুরঠাকুর ৯
গাড়িয়াল বন্ধু ১৭৩
গুয়াকাটা ৮
গুয়া ৬৬
গিরি ১২
গিরিজাশংকর রায় ২২, ৩৬, ৩৯, ৪১, ১৭৯, ১৯২, ১৯৭, ২০৩
গোরখনাথ ৫৭
গোসানীমঙ্গল ৬০
গোঁহাই কমল আলী ১৪০
গীতাবলী ১৪৪
গোপীচন্দ্রের গান ১৫১
গোরক্ষবিজয় ১৪১
গোন্নাথ মাগার গান ১৪১
গিলাপ ১৫৩
গোকুল রায় ১৮৬
গাভুর চেঙেরীর খেদ ২০০
গোত্র ১২

ঘ

ঘরজেয়া বিয়ে ৮/১১৪
ঘর সোন্দানি ৮/১১৫
ঘরজেয়া ৯২

চ

চণ্ড ৬১

চর্যাপদ ১৪৫

চক্রধারী ১২০

চারুচন্দ্র সান্যাল ১৬, ২২, ৯২

চাকিন্দার ১৭৩

চণ্ডীপূজা ৯৭, ২২৮

চৈতন্যখোলা ৫৭

চোপর ৯৪

চোরখেলা ১২২

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ৭৮

চুকানীদার ৭৮

চোর চুরনি ৯৫

চ্যাং মাছ ১১৮

ছ

ছনুয়া ভিটা ১৯৫

ছত্র দানী ১১৪

ছাওয়া ভুলকা ১৯০

ছুয়া ঘর ১৫

ছেঁড়াতার ১৬৮

ছ্যাকা প্যালকা ১৭৩

ছিলকা ১৯০

ছাতু বারান ২৫২

ছেপুয়ান ২৬৪

জ

জটেশ্বর ১০

জল্পেশ্বর ১০

জটা বাবা ৪৯

জগজ্জীবন ঘোষাল ১৫৫

জগন্নাথী বিলাই ১৫৮
জলমাঙ্গা ২৪০
জলকাঙ্কাল ২৪০
জাগগান ১৪৫, ১৯৭
জাকই ১৬৬
জাতির চিকন ভাষা ২০০
জিগা গাছের সঙ্গে সই পাতানো ২৫৮
জাগরণী ২০১
জিগাঠাকুর ১১৯
জে এ ভাস ২৯
জোত ৭৬
জোতদার ৭৮
জোতদারি ৭৯
জোতজমি ১৭৬, ২৯৩

ঝ

ঝুম চাষ ৫০, ৫৪

ট

ট্রান্সফরমেশন অন দি বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার, জলপাইগুড়ি ৮১
টোল ৮৪
টোটো ১৩৭

ঠ

ঠাকুরানী ৬০
ঠাকুর ৬০

ড

ডব্লিউ. এইচ থমসন ৩২
ডব্লিউ. ডব্লিউ হান্টার ৫০
ডাংধরি ১৪

ডাঙ্গুয়া ৯২, ১১৫
ডাংগুয়ানি ১১৪
ডাংধরা ১১৬
ডাকলক্ষ্মী ১১৭, ১১৯
ডাকের গান ১৫৭
ডারিঘর ১৬৯, ১৭০
ডাঙর আঈ ১৮৩
ডাকলক্ষ্মী ২৫৬
ডি. এইচ. ই. সান্ডার্স ৯১
ডেগর ২২১
ডোকাভাঙা ৮

ত

তহশীলদার ১১৬
তবাকাৎ-ই-নাসিরী ২৯
তানশালা ৯৩
তাম্রশাসন ১৩৬
তারামোহন ১৮৫
তিস্তাবুড়ি ১১৭
তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ১৬৭, ১৭০
তিস্তাপুরাণ ১৬৭, ১৭০
তীর ১৬৮
তুষার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৮
তুলাকাটা ঠাকুর ১১
তেভাগা ১৭৩

থ

থারু ৪৮

দ

দখল ১৭৫

দধিকাদো খেসা ১৩৯
দর-দরচুকানিদার ৭৮
দর-চুকানিদার ৭৮
দশ ২৬২
দধি কাদো খেলা ১৩৯
দরঙ্গ রাজবংশাবলী ৪৯, ১৩৯
দামোদর দেব ৫৮
দামোদর চরিত ৫৮
দানীবুড়ি ৮
দি রাজবংশীস অব নর্থবেঙ্গল ১২, ১৭৮, ২৯৪
দি হিস্ট্রি, অ্যান্টিকুইটি, টোপোগ্রাফি এন্ড স্টাটিসটিকস অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া ৪
দি কোচবিহার স্টেট অ্যান্ড রেভিনিউ সেটেলম্যান্ট ৩০, ১৪৪
দি অরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অব দি বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ ৪০
দীনেশ চন্দ্র সেন ১৪৯, ২৮৫
দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া ১৭৭
দুখিয়ার কুঠি ১৬৭, ২৮৯, ২৯০
দুন্দ ১৯২
দুখাতিবুড়ি ১৯৫
দুয়ারি ২৪৬
দুখাতি ১৯৫
দুর্গাবর ১৫৩
দেওসী ১২০, ১৭৪
দেওধা ১২০
দেউনিয়া ১২৯
দেওধা ৮৯
দেবেশ রায় ১৬৭, ২৯২
দেবাংশী ১৬৮, ১৭৬, ১৭৭
দেউনিয়া ১২৯
দেবীবর মিশ্র ৩৫

দেওধরা ৬৪
দেবী সিংহ ৭৫
দোল সওয়ারী ৬৮
দোতরা ৮৯
দ্রাবিড় ১৪৯

ধ

ধর্মনারায়ণ বর্মা ৪০, ২২১
ধ্বজা ৫৩
ধানের ফুল আনা ১১৭
ধীমাল ৪৮
ধুমালী ৮
ধুমবাবা ২০, ৪৯
ধুয়া ১৫১
ধ্রুবানন্দ মিশ্র ৩৫
ধোকরা ১৫৩

ন

নগেন্দ্রনাথ বসু ৯৬
নয়নতারা ১৬৭
নরবলি ২৭৯
নগেন্দ্রনাথ রায় ১৯৫
নথিভুক্তকরণ ১২৯
নলিনীকান্ত ভট্টশালী ১৫০
নয়া খৈ ১৮, ১১৭
নয়া ডেগর ২০১, ২২১
নায়েব আলী ৮৯
নামঘোষা ২৩০
নাউয়াটারী ১৮৪
নারী রক্ষা বিভাগ ১০০
নিছালটিয়ার বাঁশি ১৮৩

নিখিলেশ রায় ২১৩, ২১৫
নিয়তি রায় ১৯৩
নীলাম্বর ৪৫
নীলেশ্বর ৪৯
নেংটি ৯৪

প

পণ্ডিত পুরুষোত্তম সিদ্ধান্ত বাগীশ ১৪২
পঞ্চানন বর্মা ৪০
পরশুকুন্ডা ৫৭
পশ্চিম দুয়ার ৭৭
পরক্ষেত্রি ১১৪
পত্রধারী ১২০
পছোয়া চাদর ১৭৩
পরেশ চন্দ্র রায় ১৮৭
পদ্মপুরাণ ৩৬
পটি ২৬২
পরী ধরা ১৬৯
পানিছিটা ৮, ১১৪, ১৬০
পাছুয়া ১১৫
পাঁচকোল ২৫৬
পাটানি ৮১, ৯২
পালাটিয়া ৮৯
পাগলা পীর ১২২
পূবালী ১৯২
প্রিমিটিভ কালচার ২
পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশ ১৪২
প্রেমানন্দ ২১২
পোদ ৫
প্যারামাউন্ট পাওয়ার ৭৪

প্রচারক ৯৯
পুযুনা ১২০
পোঁহাতী ১৯১, ২০৪
পৌরাণিক ১৪০
পোচাম ২৬২
পোঞা বেহুলী মঙ্গল ১৫৪
পোঞার পাঁচালী ১৫৪

ফ

ফালাকাটা ১১
ফারসী ১৪৯
ফান্দি ১৭০
ফুলরিয়া ৯২, ১১৪
ফোতা ৬২, ৯২, ১৫৩
ফ্রান্সিস হ্যামিলটন বুকানন ৪, ২৮, ৬১

ব

বর পণ ১১৫
বর্বর ৯৬
বর্ষাদুয়ার ১৭৪
বলি ১৩৮
বড়ো দেবী ১৪৩
বট-পাখিরীর বিয়ে ২৫৭, ২৫৮
বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য ২৮৫
বসন্তরঞ্জন ১৫০
ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ৩৫
বরামন ২৬২
বাহো ২৫৫
বামাচরণ ঠাকুর ৪৯
বাচ্চামোহন রায় ১৯২, ২০৪
বাউদিয়া ২০২

বানিয়া ৯৪
বানা ২৯৩
বাঙ্গাল খেদা ১২৮
বাথান ১৮৬
বাতাসীর বাসিয়া কাথা ১৮৭
বাঘধেনুক ১৯৩
বালক ব্রহ্মচারী ২৩৩, ২৭৩
বাঙ্গা ৫১, ৪৬, ৪৭
বামনীয়া ৫৮
বাঙ্লা ৬০
বাহে জীবন ১৮৩
বান্নি ১৩
বাঁশ পূজা ১৪৫
বাঁশ খেলার গান ২৪২
বিষমা ৮
বিষহরি ১১৬
বিপ্র বিশারদ ১৪২
বিষুয়া ২৩৭
বিছন ১২২
বিমান দাশগুপ্ত ১২৮
বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য ১৫০
বিপুল দাস ১৭৭
বি সি অ্যালেন ২৯
বি এইচ হজসন ২৯
বিশ্বসিংহ ৪৭
বিশ্বকোষ ৯৬
বীরেন্দ্রনাথ রায় ১৮৩
বুড়াঠাকুর ৮, ১০, ২০, ৫০
বুড়াবুড়ি ৮
বুক বান্ধনা ৬২
বুকুনী ৯৪

বুড়িমা ২৬৪
বুকানন ৪
বেটি ব্যাচে খাওয়া ১১
বেহারোদন্ত ১৪১
বৈরাতী ১২, ৯৪
বৈকুণ্ঠকুমার দত্ত ১৫০
বোড়া ৪
বোল্লার চাক ১৪৫
বোধনপর্ব ১৭৭
ব্যাপন ১
ব্রাত্য ক্ষত্রিয় ৬, ১১০
বৃন্দেশ্বরী ১৪১
ব্রজসুন্দর ১৪১
ব্রায়ান ৩০, ৩২

ভ

ভদ্রেশ্বর ৪৯
ভকোস ১৮৩
ভগীরথ দাস ১৮৪, ১৮৩, ২৯৫
ভান্ডানী ৮, ৯, ১১৭, ১৭৪
ভাত ১৪০
ভাজাভুজা ২৪৬, ২৫২
ভাগন ২৫৫
ভাদাভাদি ২৫৭
ভুটিয়া ৫৬
ভুলুয়া ১৬৯
ভোগা ১৯২, ২৫৬
ভোরের পখী ১৯৪
ভৌরিয়া ১০, ১৩
ভ্যাড়ার ঘর ছোবা ১১৯
ভ্যাড়া ঘর ২৫৭

ভ্রামরীতন্ত্র ৩৫, ৩৭

ম

মহাকাল ১০, ১৯, ৪৯, ১১৬
মল্লিক ঠাকুর ১১
মনসামঙ্গল ১৫৫
মঞ্জুষা ১৫৯
মহাপুরুষীয়া ৫৮
মধ্যস্বত্ত্বভোগী ৭৮
মণিরাম কাব্যভূষণ ৩৪
মহলওয়ারী ৭৮
মদনকাম ১১৯
মফঃস্বলি বৃত্তান্ত ১৫৭, ১৭২, ২৯২
মহিষকুড়ার উপকথা ১৬৭, ১৬৮, ২৮৯, ২৯১
মদনমোহন ১৩৮, ২২৫
মদ্য ১৪০
মদনকামের গান ১৪৫
ময়নামতীর গান ১৫০
ময়নামতী মাও ১৫১
মনঃশিক্ষা ১৫১
ময়নামতী ২০২
মনসূয়া ২২১
মহাকাল ঠাকুরানী ২৪৪
মন্টোগোমারী মার্টিন ৪
মণিরাম কাব্যভূষণ ৩৪
মনুসংহিতা ৩৮
মহাপুরুষ শংকরদেব এবং মাধবদেবের জীবনচরিত ৫৮
মজাগুয়া ৬৪
মাশান ৮, ৫০, ১৪৬, ১৭৪
মাড়েয়া ৮
মাও গুনে ছাও কুলা গুনে বাও ১৪

মাড়েয়ানী ১২২
মানিক চান্দ রাজার গান ১৫০
মানকর ১৫৩
মাহুত ১৭৩
মাটি মাও আর ভাষা ২১২
মানষিলা ২১৭
মা ধত্তির ২৫৪
মা কামাক্ষ্যা ২৮১
মিনহাজুল সিরাজ ৩৫
মিস্তর ধরা ৮, ১১৫, ১৬০, ২৫২, ২৫৭
মিনতি অধিকারী ১৯৫
মীন চেতন ১৫১
মুলনদার ৭৮
মূর্তির মানুষ ১৭৬, ২৯৩
মেচেনী ৯
ম্লেচ্ছ ৭৮, ২৭৫
মেচ ১৩৭
মেখলী ১৫৩
মেথেনী দ্যাও ২৬৫
মোরসেদ জাঁহানামা ৩৫
মোর গাঁও মোর মাও ২১৩
মোহত ২৬২
মৈষাল ১৭৩
ম্যাকাইভার ৯

য

যখা ঠাকুর ২০
যাদবেশ্বর তর্করত্ন ১৬, ১৪৬
যাত্রাপূজা ১১৭, ১২১
যোগী ৫৫, ১৫০

র
রমেশচন্দ্র মজুমদার ৩৮
রতিরাম দাস ১৪৫, ১৯৭, ২৮৪
রাধাকৃষ্ণ দাসবৈরাগী ৬০, ৬১, ৬২, ২৭৯
রাখাল ঠাকুর ১১৬
রাজা ঠাকুর ১১, ১১৬
রাম রায় ১৪৩
রাস ১৪৭
রাখোয়াল ১৭৩
রায়ডাক ১৯২
রাজবংশী অভিধান ২০০
রামশিংগা ২৪৮
রাখী পূর্ণিমা ২৯৩
রাজবংশী ভাষার প্রবাদ-প্রবচন ও হেঁয়ালী ২৯৫
রাজবংশী কুল প্রদীপ ৩৩
রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস ৩৪, ১১১
রাজবংশী ৩৫, ৩৬, ৪০
রাজবংশী ক্ষত্রিয় ৩৫
রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মা ৯৯
রিফুজি ১৯৩
রিজলী ৪
রিয়াজ সামাতিন ৩৫
রূপনারায়ণ ৩৫
রংপুর ক্ষত্রিয় সমিতি ১১১
রংপুরের উপকথা ১৫৮
র‍্যালফ ফিস ৩০

ল
লাউয়ের বস ১৫০
লিভারেট বিবাহ ১১৪
লিঙ্গুয়িসটিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া ৪০

লোক উৎস ২১৯

শ

শুভজ্যোতি রায় ৫৪, ৫৫, ৮১
শুকটা ১৫৫
শাক তুলিনু বেছি কুছি ২১৮
শালেশ্বরী ১০
শানশিরি ১১৯
শিয়ালঠাকুর ১১৭
শিল্লুক ১৫৭, ১৭৮
শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ ১৪৩
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ১৪৫
শীতলা ২৪০, ২৬৭
শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭৪
শৈলেন দেবনাথ ৫৪, ৫৫
শংকরদেব ৪৭
শংকর চরিত ৪৯
শ্যামাপদ বর্মন ২০৪
শ্রীশ্রীশিবচরণ কমলমধুকরস্য ২৪০

ষ

ষণ্ডেশ্বর ১০
ষাইটল ৮
ষাটপূজা ১১

স

সওয়ারী ৮
সর্বপ্রাণবাদ ২, ৯, ৪৮, ৫৪
সন্ন্যাসীঠাকুর ১১, ১৯, ১২৬
সতী বেগুলা ১৫৫
সতী কাথা ১৯৪

সন্তোষ সিংহ ২১৩, ২৯৩
সখা হালা ২৫৭
সখীর মেলা ২৫৭
সতী বেহুলা ১৫৫
সতী সুনীতি ১৭৬
সর্বেশ্বর ৪৯
সানি ঢাকের গান ২৮২
সাতভাইয়া ১৯৭
সার্ভে অ্যান্ড সেটেলম্যান্ট অব দি ওয়েস্টার্ন ডুয়ার্স ইন দ্য ডিস্ট্রিক্ট জলপাইগুড়ি, ১৮৮৯-৯৫ ৯১
সাংনা ১১৫
সিদল ১৫৫
সুবচনী ঠাকুর ১১, ১৪, ৪৮
সুনীতি কুমার ৮, ৩৪, ৩৬, ৩৯, ৪০
সুরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য ১৫৬
সুধীররঞ্জন বিশ্বাস ২০১
সুকুমার সেন ১৫৪
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৪, ৫, ৬, ২৭, ৩১
সেন্দুকের ছোড়ানি ১৮৩, ১৮৪
সোনা রায় ১০, ২৩৭
সোসাইটি ২
সংশ্লেষণ ৭
সংরক্ষণ ৯৯
সংমিশ্রণ ২৩৪
সাংস্কৃতিক অধিগ্রহণ ২৩৪
সাংস্কৃতিক অনুকরণ ২৩৪
স্মৃতিশাসিত ১৩৮
স্বামী স্বরূপানন্দ ২৩৩

হ

হনুমান ঠাকুর ১২০
হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ৩০, ১৪৪

হরিমাধব রায় ১৯৫
হরিবোলা ঠাকুর ২৩০
হরিমন্দির ২৩৩
হরিকিশোর ৩৩
হাইচাও গান ১৫১
হাউলি ১৭৩
হালুয়ার চিন ১৯৯
হান্টার ৩১, ৫০
হাড়িয়া মন্ডল ৪৫, ৪৯
হাটঘুরানী ৯১
হিন্দুধর্ম ১৪২
হিউয়েন সাঙ ৫
হিস্ট্রি অব বেঙ্গল ১ম খণ্ড ৩৮
হিমাংশু কুমার সরকার ৫৩
হুসেন শাহ ৪৫
হুদোম দ্যাও ৯, ১৪, ১১৭
হুলাশুর পেন্টি ১৯৫
হেমন্তকুমার বর্মা ৩৩, ৩৬
হ্যামিলটন বুকানন ৪, ২৮, ৩৬, ৪৯, ৫৪

ISSN 2229-6778

নাইন্থ কলামস ১৪

রাজবংশী
কোচ-রাজবংশী

নাইনথ কলাম ১৪

রাজবংশী
কোচ-রাজবংশী

সম্পাদনা

প্রসূন বর্মন

নাইনথ কলাম মালিগাঁও চারিআলি
গুয়াহাটি ৭৮১ ০১২

প্রচ্ছদ
বিপুল গুহ
সৌজন্য: CKRSD

অন্তর্গত চিত্র
মৈত্রেয়ী রায়চৌধুরী

প্রকাশক
বাসব রায়
তাপস পাল

প্রকাশনার স্থান
নাইন্‌থ কলাম
ফ্ল্যাট এ-১, দাস এনক্লেভ
মালিগাঁও চারিআলি ওভারব্রিজ (এক্সিস ব্যাঙ্কের পাশে)
উপপথ ২, গুয়াহাটি ৭৮১ ০১২, অসম

সম্পাদনা সমিতি, নাইন্‌থ কলাম
সৌমেন ভারতীয়া
প্রসূন বর্মন (অবৈতনিক)

বর্তমান সংখ্যার সম্পাদক
প্রসূন বর্মন

অক্ষরবিন্যাস ও মুদ্রণ
ভিকি কমিউনিকেশনস অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস্‌
১৯ বিবেকানন্দ পথ, উলুবাড়ি
গুয়াহাটি ৭৮১ ০০৭

মূল্য
₹২৫০.০০ টাকা

ISSN : 2229-6778

যোগাযোগ
সৌমেন ভারতীয়া সরস্বতী অ্যাপার্টমেন্ট চিলারায় নগর ভাঙাগড় গুয়াহাটি ৭৮১ ০০৫ অসম
প্রসূন বর্মন সহযোগী অধ্যাপক বাংলা বিভাগ কটন বিশ্ববিদ্যালয় গুয়াহাটি ৭৮১ ০০১ অসম
মোবাইল : +৯১ ৯৪৩৫০ ১০৬৩২/৯৮৬৪০ ৭১০৬৭/৭৩৯৯০ ০২৪৫১/৮৬৩৮৬ ৪১৬৯২
ই-মেল : column.ninth@gmail.com

নবেন্দু কলমে ২৪

কার্তিক ১৪২৪ ॥ নভেম্বর ২০১৭

রাজবংশী

কোচ-রাজবংশী

সূচি

প্রসঙ্গ-কথা ॥ ক-খ

কামরূপের ইতিহাসের একাংশ (কোচজাতি) ॥ আমানতউল্লা আহম্মদ ১১

উত্তরবঙ্গ ও অসমের রাজবংশী সম্প্রদায় এবং
ভূমি-ব্যবস্থার পরিবর্তনশীল কাঠামো ॥ শিনকিচি তানিগুচি ৪৭

কমতা-বিহারী সাহিত্য ॥ পঞ্চানন সরকার ৮২

রাজবংশীদিগের কথা ॥ আশুতোষ বাগচী ১০৪

মেঘপূজায় নগ্ননৃত্য ॥ নীহার বরুয়া ১১১

গোয়ালপাড়িয়া লোকগীতের অবস্থান ও গুরুত্ব: ঐতিহাসিক,
সমাজতাত্ত্বিক ও লোক-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিপাত ॥ বীরেন্দ্রনাথ দত্ত ১২০

মানাস থেকে করতোয়া ॥ শরৎচন্দ্র সিংহ ১৩৫

রাজবংশী বা কোচ-রাজবংশী পরিচিতির নির্মাণ:
শ্রুতি, স্মৃতি ও ইতিহাস ॥ বাণীপ্রসন্ন মিশ্র ১৪৩

ইতিহাসের পাতায় কামতাপুরের অন্বেষণ ॥ অরূপজ্যোতি দাস ১৮২

ভাইয়াইয়া: রাজবংশী জীবনের আয়না ॥ সুখবিলাস বর্মা ১৯৪
রাজবংশী সাহিত্যের ইতিহাস ॥ দ্বিজেন্দ্র নাথ ভকত ২২০
বাংলাদেশের রাজবংশী জাতিগোষ্ঠীর সমাজ ও সংস্কৃতি ॥ অশোক বিশ্বাস ২৩২
নেপালের কোচ-রাজবংশী জনগোষ্ঠী ॥ সুভাষ চৌধুরী ২৪৭
রাজবংশী ও অসমিয়া ভাষা: তুলনামূলক আলোচনা ॥ দিলীপ রাজবংশী ২৬৩
নিম্ন অসমের কোচ-রাজবংশীদের লোকচিকিৎসা ॥ অণিমা গুহ ২৮৫
কোচ-রাজবংশীদের বিষুয়া উৎসব ॥ রঘুনাথ চৌধুরী ২৯৯
পঞ্চানন বর্মা ও ক্ষত্রিয় আন্দোলন ॥ অরবিন্দ ডাকুয়া ৩০৫
রাজবংশী সমাজ-সংস্কৃতি ও বিবর্তনের প্রক্রিয়া ॥ জ্যোর্তিময় রায় ৩১৫
রাজবংশি বাঙ্গালী আসামী সংবাদ ॥ বিজয়া ৩৪৭
রাজবংশী, কোচ-রাজবংশী বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জি ॥ ৩৪৯
গ্রন্থের আখ্যাপত্র: প্রতিলিপি ॥ ৩৬৩
লেখক-পরিচিতি ॥ ৩৬৭

জ্যোর্তিময় রায়

রাজবংশী সমাজ-সংস্কৃতি ও বিবর্তনের প্রক্রিয়া

উত্তরবঙ্গ এবং নিম্ন অসমের অন্যতম জনগোষ্ঠী রাজবংশী জনসমাজ। অসমে এই জনগোষ্ঠী কোচ-রাজবংশী হিসাবে স্বীকৃত। আর, উত্তরবঙ্গে রাজবংশী-ক্ষত্রিয় হিসাবে সমধিক পরিচিত। বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলেও (রংপুর, দিনাজপুর, পাবনা, টাঙ্গাইল, রাজশাহী) এই জনগোষ্ঠীর বসবাস। পাশাপাশি নেপাল (ঝাপা, মোরং, ভদ্রপুর), ভুটানের বেশ কিছু অংশেও রাজবংশীদের অবস্থান। এছাড়াও বিহার, মেঘালয়, ত্রিপুরাতেও রাজবংশী জনগোষ্ঠীর লোক সুদীর্ঘ কাল ধরে বসবাস করছেন। সুপ্রাচীন ঐতিহ্য-পরম্পরা ও লোকায়ত ভুবনের অধিকারী এই জনগোষ্ঠী প্রাক্-ঐতিহাসিক কাল ধরেই এসব এলাকায় বসবাস করছেন।

রাজবংশী জনগোষ্ঠীর উৎপত্তি নিয়ে নানা বিতর্ক আছে। অনেকের মতে রাজবংশী জনসমাজ মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠী বা বৃহত্তর বোড়ো জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্গত। খ্রিস্টপূর্ব দশম শতাব্দীর কোনও এক সময়ে ইন্দো-মঙ্গোলয়েড জনপ্রবাহ ভারতে বিস্তার লাভ করে। এই জনগোষ্ঠী অসম, উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, উত্তর বিহার এবং হিমালয়ের সানুপ্রদেশ নেপাল অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বখতিয়ার খিলজির তিব্বত আক্রমণের সময় লক্ষ্মণাবতী ও তিব্বতের মধ্যবর্তী ভূখণ্ড পর্বতময় ও জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। আর এখানে সেই সময় ইন্দো-মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর কোচ, মেচ, থারু জনজাতির বসবাস ছিল। চ্যাপটা নাক, অপেক্ষাকৃত

দীর্ঘ চোয়াল, ক্ষুদ্র চোখ ও জ্র ইত্যাদির গড়ন দেখে তিনি এদের বৃহত্তর বোড়ো পরিবারের সদস্য হিসাবে আখ্যায়িত করেন। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, রাজবংশী জনগোষ্ঠী মঙ্গোলীয় নৃ-জাতির তিব্বত-ব্রহ্মদেশীয় ভাষা-শাখার অন্তর্ভুক্ত হলেও আর্যভাষা সংস্কৃতির প্রভাবে পরবর্তী কালে ভিন্ন ভাষা গ্রহণ করে। ত্রয়োদশ শতকে বৃহত্তর বোড়ো গোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে অসম সহ উত্তরবঙ্গে পাকাপাকি ভাবে বসবাস করতে শুরু করে এবং বিস্তৃত অংশ জুড়ে এক বিরাট রাষ্ট্রও গড়ে তোলে। অসমের পূর্বসীমা থেকে বাংলার উত্তর ভূ-খণ্ডের করতোয়া নদীর পূর্ব তীর অবধি এদের অবাধ বিচরণ ছিল। এদেরই একটি শাখা রাজবংশীতে আখ্যায়িত হয়।

কোচ-রাজবংশের উত্থান, তাদের আনুকূল্য-অনুগ্রহ, প্রভাব, ব্রাহ্মণদের আগমন, আর্যায়নের ঢেউ ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রক্রিয়ার ঘাত-প্রতিঘাতে রাজবংশী হিন্দু জাতিতে পর্যবসিত হয়। তবে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর উদ্ভব ও স্বতন্ত্রতা নিয়ে বিদ্বৎজ্জন, গবেষক, নৃতত্ত্ববিদেরা এখনও ঐক্যমতে পৌঁছতে পারেননি। অনেক বাদ-বিবাদ, যুক্তি-বিযুক্তি অতীতেও ছিল, এখনও আছে। বরং বলা যায়, রাজবংশী জনসমাজ তাদের জাতিসত্তার প্রকৃত পরিচয় উন্মোচনে যেমন উদগ্রীব, তেমনই নিজেদের এক স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে ভাবতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে ক্ষত্রিয়করণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়েও রাজবংশী সমাজ বৃহত্তর বাঙালি বা অসমিয়া সংস্কৃতির অংশীদার হয়েছে। হিন্দু আচার-আচরণ, রীতি-নীতিকে তারা যতই তাদের জীবনচর্যা বা সংস্কৃতিতে অঙ্গীভূত করেছে, ততই সম্পূর্ণ জাতি হিসাবে সচেতন হয়ে উঠেছে এবং নিজেদের জাতিসত্তার নৃতাত্ত্বিক অন্বেষণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় থেকেছে। কারণ সময়ের স্রোতে বিষয়টি আরোপিত হয়েছে। *অনেকের মতে, রাজবংশী জনগোষ্ঠী ইন্দো-মঙ্গোলীয়* নৃ-শাখা গোষ্ঠী নয়, দ্রাবিড় বা অষ্ট্রিক নৃ-গোষ্ঠীয় শাখা। আবার কারও মতে, মিশ্র সংকর জাতি, পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় প্রভাব রয়েছে। তবে উত্তর-পূর্ব ভারতে সুদীর্ঘ কাল মঙ্গোলীয় সংস্কৃতির আধিপত্য ছিল, দ্রাবিড় গোষ্ঠীর সঙ্গে রাজবংশী-জনগোষ্ঠীর সাদৃশ্য থাকলেও খাদ্যাভ্যাস, ভাষারীতি, আচার-বিশ্বাসে মঙ্গোলীয় বৈশিষ্ট্যেরই প্রাধান্য। আর, দ্রাবিড়ীয় মিশ্রণ ঘটেছে অনেক পরে। কারণ আর্য, দ্রাবিড় ও অষ্ট্রিক সভ্যতার মিলন পরবর্তী কালের ঘটনা। আর্য সভ্যতার ঢেউও সিন্ধু উপত্যকা থেকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় পৌঁছতে বেশ সময় লেগেছিল।

রাজবংশী জাতির উৎপত্তি নিয়ে গবেষক-পণ্ডিতদের মধ্যে ভিন্ন মতামত ও বিতর্ক আছে। ফ্রান্সিস হ্যামিলটন বুকাননই প্রথম ব্যক্তি, যিনি (১৮০৭—১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে) উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী নিয়ে তথ্যানুসন্ধান চালিয়েছেন। তাঁর মতে অধিকাংশ রাজবংশীই কোচ এবং একই বংশ থেকে উদ্ভূত। আর কোচ জাতিই বর্তমান রাজবংশীর পূর্বপুরুষ।[১] পরবর্তী কালে অধিকাংশ গবেষকই ফ্রান্সিস বুকাননের মতামত গ্রহণ করেছেন। এইচ. এইচ. রিজলের মতে কোচ, রাজবংশী, পলিয়া, দেশিয়া সমস্ত সম্প্রদায়ই একই শাখার অন্তর্ভুক্ত।[২] এইচ. বেভারলিও একই মন্তব্য করেছেন, 'The Koch, Rajbanshi and Paliya are of the most part one the same tribes'।[৩] এ. ই. পর্টারও রিজলের মতকে সমর্থন করেছেন।[৪]

১৮৮১ সালের আদমশুমারির প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে উইলিয়াম হান্টারও উল্লেখ করেছেন:

> আদমশুমারি প্রতিবেদনে অর্ধ-হিন্দু আদিবাসী হিসাবে উল্লিখিত কোচ, পালিয়া ও রাজবংশী জনগোষ্ঠীর লোকজন, যারা কুচবিহার রাজ্য ও রাজ্য-সংলগ্ন আদিবাসী, তারা মূলতঃ এই বংশোদ্ভূত উপজাতি।[৫]

১৯০৫ ও ১৯০৬ সালে প্রকাশিত বি. সি. অ্যালেনের 'Assam District Gazetter'-এ কোচ বা রাজবংশীদের মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর আদিবাসী উপজাতি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[৬] ১৮৪৯ সালে বি. এইচ. হজসন তাঁর 'Essay on the Koch, Bodo and Dhimal Tribes' শীর্ষক প্রবন্ধে রাজবংশী এবং কোচ জনগোষ্ঠীকে একই বংশোদ্ভূত এবং মঙ্গোলীয় জাতি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।[৭] পরবর্তী কালে স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন 'Linguistic Survey of India' গ্রন্থে এই একই মত পোষণ করেন। তাঁর মতে, কোচদের মধ্যে যারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী, তারাই রাজবংশী হিসাবে সমধিক পরিচিতি লাভ করেছে।[৮] ১৮৯১ সালের 'ভারতের আদমশুমারির বিবরণ'-এ মন্তব্য করা হয়েছে, "উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের জাতিগত অবস্থান বিতর্কযুক্ত হলেও বলা যায় যে তারা পূর্ব গিরিপথ ধরে আগত মঙ্গোলীয় জাতির তৃতীয় শাখার অংশ।"[৯] আবার বখতিয়ার খিলজির গৌড়-কামরূপ আক্রমণের বিবরণমূলক গ্রন্থ 'তবকাৎ-ই-নাসিরী'তেও 'কোচ-মেচ-থারু' সম্প্রদায়গুলিকে মঙ্গোলীয় শাখার লোক হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[১০] ও' ডোনেলও তাঁর ১৮৯১ সালের আদমশুমারির প্রতিবেদনে বলেছেন যে রাজবংশী বা কোচদের মধ্যে মঙ্গোলীয় রক্তের প্রভাব বেশি।[১১] রাজবংশীদের উদ্ভব সম্পর্কে ড. পিয়ের বেসাইনের মত, "তিব্বতি ও

ভারতীয়দের সংমিশ্রণের ফলে রাজবংশীদের উদ্ভব। এদের কেউ কেউ কোচ উপজাতি ত্যাগ করে নাম পালটে রাজবংশী হয়ে হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন।"[১১] আবার, জে. এ. ভাসের মতানুযায়ী, রংপুরের রাজবংশীরা কোচ জাতি থেকে উদ্ভূত এবং মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাদের মধ্যে দ্রাবিড়ীয় রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে, উত্তরাংশে সামান্য হলেও পশ্চিমাংশে তা যথেষ্ট; আর্য রক্ত তাদের ধমনীতে প্রায় নেই বললেই চলে।[১৩] কোচবিহারের তদানীন্তন ডেপুটি কমিশনার ক্যাপ্টেন লিউইন ১৮৭২ সালে মন্তব্য করেন যে ভুটান ডুয়ার্সের অধিবাসী মেচ উপজাতির সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় হিন্দুদের পারস্পরিক বৈবাহিক সংমিশ্রণের ফলে রাজবংশী জাতির উদ্ভব হয়েছে।[১৪] কিন্তু কোচবিহার রাজ-প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী তাঁর 'The Coochbehar State and its Land Revenure Settlement' গ্রন্থে বলেছেন, রাজবংশী কখনও দুটি জাতির সহমিশ্রণে উদ্ভূত নয়।[১৫] এ প্রসঙ্গে ও' ম্যালের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, কোচ, মেচ, বোড়ো তিব্বত বর্মী ভাষীরা একই উপজাতীয় উৎস থেকে এসেছেন।[১৬] পরবর্তী কালে (১৯৩১ সালে) রাজবংশীদের ক্ষত্রিয় আন্দোলনের প্রেক্ষিতে তিনি মন্তব্য করেন, 'কোচ হতে রাজবংশী জাতি ভিন্ন'— এ-দাবি অসঙ্কোচে মঞ্জুর করা হল। জাতির উৎপত্তি বিষয়ে যতই প্রশ্ন থাকুক, আজ থেকে কোনও সন্দেহ নেই যে রাজবংশী ও কোচ পৃথক জাতি।[১৭] র‍্যালফ ফিচ, ব্রায়ান, হজসন, বুকানন প্রমুখ পরিব্রাজকের মতে কামরূপ বা কামতার অধিবাসীরা (বর্তমান কালের অসম, কোচবিহার, রংপুর, দিনাজপুর এলাকা) মঙ্গোলীয়।[১৮] অ্যাডওয়ার্ড গেইটের মতেও "প্রকৃত কোচরা হল মঙ্গোলীয় এবং রাজবংশীরা সম্পূর্ণ আলাদা জাতি। দ্রাবিড়দের সঙ্গে এদের সংস্পর্শ আছে। প্রতিবেশী ছিল অসংখ্য হিন্দু। মানাস নদীর পশ্চিম তীরের কোচরা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করার পর রাজবংশী নাম গ্রহণ করে।"[১৯] হজসন সাহেবের বক্তব্য হল, বিশ্বসিংহ হাজোর পৌত্র, কোচ-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন ও রাজবংশী নামে পরিচিত হন।[২০] ওয়াড্ডেল হজসনের বক্তব্যকে সমর্থন করে তিনি বলেছেন:

> The Koches do not belong to the Dravidian stock, but are distinctly Mongoloid though some what heterogenous.[২১]

নৃতত্ত্ববিদ হার্বার্ট রিজলিও কোচ, পলিয়া, রাজবংশীদের একই বংশোদ্ভূত জাতি হিসাবে উল্লেখ করেন। তিনি রাজবংশীদের দ্রাবিড় জাতি হিসাবে চিহ্নিত করে মঙ্গোলীয়

সংমিশ্রণ ঘটেছে বলে মত প্রকাশ করেন।[২২] বেভারলির মতেও কোচ, রাজবংশী, পলিয়া এবং দেশি— এরা সকলেই দ্রাবিড় জাতি থেকে উদ্ভূত।[২৩] ই. টি. ডালটন কিংবা হান্টারও রাজবংশী-ক্ষত্রিয় জাতিকে দ্রাবিড় শাখার অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন।[২৪] ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রাজবংশী জাতিকে মঙ্গোলীয় নৃ-জাতির তিব্বত ব্রহ্মদেশীয় ভাষা শাখার গোষ্ঠী হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন এবং বলেছেন যে কোচেরা নিজেদের রাজবংশী হিসাবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেন।[২৫]

রাজবংশী জনগোষ্ঠীর উদ্ভব নিয়ে ব্রিটিশ আধিকারিক সহ নৃতত্ত্ববিদ, গবেষক ও পণ্ডিতমহল বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। অনেকের মতে এই গোষ্ঠী দ্রাবিড়-অস্ট্রিক নৃ-গোষ্ঠীর বংশধর, কারও কারও মতে মঙ্গোলীয় নৃ-শাখার অন্তর্ভুক্ত। আবার অনেকের মতে মিশ্র-সংকর জাতি। ভারতীয় গবেষক ও পণ্ডিতদের অনেকের মতে, রাজবংশীরা কোচদের বংশজাত। আবার অনেকের মন্তব্য, রাজবংশীরা মিশ্র জাতি।[২৬] স্বাভাবিক ভাবেই রাজবংশী জনগোষ্ঠীর উৎপত্তি নিয়ে বিতর্ক আছে। আজও এই ধারা অব্যাহত।

সমাজ-সংস্কারক মনীষী পঞ্চানন বর্মার ক্ষাত্র-আন্দোলনের ফলে পশ্চিমবঙ্গে বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠী আজকে রাজবংশী-ক্ষত্রিয় হিসাবে চিহ্নিত এবং কোচদের তুলনায় পৃথক জনগোষ্ঠী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। ব্রিটিশ সরকারের আদমশুমারির প্রতিবেদনেও (১৯৩১ সালে) এই ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। অসমে কোচ-রাজবংশী রূপে পরিচিত হলেও উত্তরবঙ্গের বৃহত্তর রাজবংশী সমাজ রাজবংশী-ক্ষত্রিয় হিসাবে পরিচয় প্রদানেই গর্ববোধ করেন। প্রথমদিকে কোচ ও রাজবংশীদের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য উল্লিখিত হলেও কোচ-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা এবং ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের মধ্য দিয়ে ব্যবধান দূরীভূত হয়ে ওঠে। প্রকৃত পক্ষে কোচ ও রাজবংশী জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বৈবাহিক সূত্রে রক্তের সংমিশ্রণ, সাংস্কৃতিক ও ভাষার আদান-প্রদানের মাধ্যমে নতুন এক সমাজের সৃষ্টি হয়। বলা যায়, বর্তমানে রাজবংশী ও কোচদের মধ্যে কোনও বিভেদ নেই। এ-প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'Kirata Jana Kiriti' গ্রন্থে বলেছেন যে কোচেরাও নিজেদের রাজবংশী হিসাবে পরিচয় দিতে গর্ব বোধ করেন।[২৭] ১৯৩১ সালে আদমশুমারির প্রতিবেদনে ডব্লিউ. এইচ. থমসনের মন্তব্য ছিল এমন:

> Rajbanshis are the indigenous people of Northern Bengal and the third largest Hindu Caste in the Province. In 1901, many Koches in North Bengal were

returned as Rajbanshis and many of the Rajbanshis have taken sacred thread and were prepared to use force in support of their claim to be returned as Kshatriya.[৬]

পণ্ডিত ও গবেষক মহলের মধ্যে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর উৎপত্তি নিয়ে বিভিন্ন মতামত থাকলেও অনেকেই (জে. এ. ডাস, ই. এ. গেইট, র‍্যালফ ফিচ, ব্রায়ান, হজসন, বুকানন, বি. সি. অ্যালেন, ওয়াডেল, ও' ডোনেল প্রমুখ) রাজবংশী জনগোষ্ঠীকে মঙ্গোলীয় নৃ-গোষ্ঠীর জনপ্রবাহ হিসাবেই আখ্যায়িত করেছেন। এছাড়া হিমালয়ের পাদদেশ সহ উত্তর-পূর্ব ভারত, মায়ানমার, নেপালের মঙ্গোলীয় নৃ-শাখার মানুষের সঙ্গে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর দৈহিক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্যও লক্ষণীয়। পরবর্তীতে, কালের স্রোতে এই জনগোষ্ঠীর সঙ্গে অষ্ট্রিক, প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড দ্রাবিড় গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ ও সমন্বয় ঘটে। তা সত্ত্বেও গবেষকদের অধিকাংশের মতো রাজবংশীদের মধ্যে মঙ্গোলীয় বৈশিষ্ট্যেরই প্রাধান্য এবং বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠী ইন্দো-মঙ্গোলীয় জাতির বৃহত্তর বোড়ো গোষ্ঠীর অন্যতম একটি শাখা রূপে চিহ্নিত। এসব নানা মন্তব্যে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক উৎসগত বিষয়টিও বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। তবে আধুনিক গবেষক, পণ্ডিত ও সমাজতাত্ত্বিকদের সকলেই একমত যে রাজবংশী জনগোষ্ঠী ইন্দো-মঙ্গোলীয় জনজাতিরই একটি শক্তিশালী শাখা।

কোচ ও রাজবংশী— এই শব্দ দুটি নিয়েও বিভ্রান্তি আছে। বিশেষ করে রাজবংশী-ক্ষত্রিয় সমাজ কোচদের তুলনায় ভিন্ন এবং উন্নত হিসাবে প্রতিপন্ন করতে পছন্দ করেন। উৎপত্তি বিষয়েও তারা ভিন্ন মতের অনুসারী। তাদের মতে, রাজবংশীরা বরাবরই ক্ষত্রিয় ছিলেন। পরবর্তী কালে তাদের পদমর্যাদার হানি ঘটে এবং তারা ভঙ্গ ক্ষত্রিয় হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। অনেক গবেষক, পণ্ডিতও এই ভাবনায় সহমত পোষণ করেন। তাঁদের মতে, কোচ ও রাজবংশী জনগোষ্ঠী স্বতন্ত্র, একই জনগোষ্ঠী নয়। এ-বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে 'ক্ষত্রিয় সমিতি'। রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মার নেতৃত্বে দীর্ঘ আন্দোলন সংঘটিত হয় এবং তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার আদমশুমারির রিপোর্টে (১৯৩১) রাজবংশী জনগোষ্ঠীকে পৃথক 'ক্ষত্রিয় জাতি' হিসাবে উল্লেখ করার পক্ষে সম্মতি প্রদান করেছিলেন। রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মা রাজবংশী ও কোচদের পৃথক জাতিগোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত করার পাশাপাশি রাজবংশীদের কোচদের থেকে উন্নত হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। রাজবংশীরা পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস,

সামাজিক আচার-আচরণ সহ সুচিতার ক্ষেত্রে পৃথক সত্তার পরিচয় বহন করে। সেই সঙ্গে ধর্মীয় ক্ষেত্রেও ক্ষত্রিয়ত্ব বজায় রাখে। এ-প্রসঙ্গে হরকিশোর অধিকারী তাঁর 'রাজবংশী কুল-প্রদীপ' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[৭৯]

পরবর্তী কালে জলপাইগুড়ির কৃতী সন্তান ও বিশিষ্ট সমাজসেবক উপেন্দ্রনাথ বর্মন তাঁর 'রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস' শীর্ষক গ্রন্থে হিন্দুশাস্ত্র ও পুরাণ থেকে তথ্য উদ্ধৃতি করে বলেছেন যে অষ্টাদশ শতকের অনেক পূর্বেই রাজবংশীরা ক্ষত্রিয় মর্যাদা দাবি করেছিল।[৮০] এছাড়াও মণিরাম কাব্যভূষণ সহ আরও অনেকে রাজবংশীদের 'Mythic historical claim of Kshatriyas' বলে স্বীকার করেছেন।[৮১] আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও 'Kirata Jana Kiriti' গ্রন্থে বলেছেন:

> The masses of north Bengal areas are very Bodo-origin or mixed Austric-Dravidian-Mongoloid, where groups of peoples from lower Bengal (Bhati desh) and Bihar have penetrated among them. They are mainly as koch i.e. Hindu or semi Hindu Bodo who have abandoned their original Tibeto Burman speech and have adopted the northern dialect of Bengali (which has a close affinity with Assamese) and when they are a little to concious of their Hindu religion and culture and retained at the same time some vogue memory of the glories of their people particnlarly during the time of Viswa Singha and Naranarayan, they are proud to themself Rajbanshis and to claim to he called Kshatriyas.[৮২]

কোচ ও রাজবংশীদের স্বতন্ত্র গোষ্ঠী পরিচয় এবং রাজবংশীদের ক্ষত্রিয়ত্ব নিয়ে নানাবিধ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে বিভিন্ন গবেষক, নৃতাত্ত্বিক ও পণ্ডিতদের মধ্যে। কোচ-রাজবংশ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে রাজবংশী শব্দটির নিবিড় যোগকে স্বীকার করে নিয়েও বৃহত্তর এই জনগোষ্ঠী কোচদের থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র ভাবে। কিন্তু ইতিহাসবিদ, পণ্ডিত-গবেষকদের মতে কোচ ও রাজবংশী শব্দ দুটির মধ্যে কোচ নামটি আদি ও প্রকৃত। পরবর্তী কালে রাজবংশী জনগোষ্ঠী সংগঠিত হয় এবং আরও কিছু জনগোষ্ঠীর সমন্বয় ঘটে বৃহত্তর রাজবংশী সমাজ তৈরি হয়েছে।

অসমে রাজবংশী জাতির পরিচয় কোচ-রাজবংশী নামে। তারা কোচ ঐক্যসূত্র ধরে রেখেছে। পশ্চিমবঙ্গে রাজবংশীরা 'রাজবংশী ক্ষত্রিয়' হিসাবে সমধিক পরিচিত। উৎসগত কোচ নৃতত্ত্ব সূত্রকে অস্বীকার করে স্বতন্ত্র উন্নত এবং সংকর জাতি হিসাবে নিজেদের মনে করে। কিন্তু গবেষক, পণ্ডিত, ইতিহাসবিদদের মতে কোচ জাতিসত্তার বিষয়টি আদি ও প্রকৃত, রাজবংশী পরিচয়টি অর্বাচীন এবং কোচ রাজবংশ প্রতিষ্ঠার (ষোড়শ শতকে) সঙ্গে সম্পৃক্ত। কোচ-বংশের হাজো রাজার পুত্র বিশ্বসিংহ কোচ রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেই কোচ পরিচয় ত্যাগ করে 'রাজবংশী' জাতি পরিচয় গ্রহণ করেন। এছাড়া প্রাচীন শাস্ত্র, পুরাণ, উপ-পুরাণ, ধর্মীয় গ্রন্থেও রাজবংশী নামটির বিশেষ উল্লেখ নেই। একমাত্র কালিকাপুরাণ, ভ্রামরীতন্ত্রে রাজবংশী নামটি উল্লিখিত হয় প্রাথমিক ভাবে। এই গ্রন্থ থেকে জানা যায় পরশুরামের ভয়ে রাজবংশী ক্ষত্রিয়রা নিজ পরিচয় লুকিয়ে হিমালয়ের পাদদেশে এসে বসবাস শুরু করে এবং ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হয়।[৩৩] ষোড়শ শতাব্দীর পণ্ডিত রূপনারায়ণ রচিত 'কামতেশ্বর কুল তালিকা' থেকে জানা যায়:

ছিড়িয়া গলার দড়ি ক্ষত্র চিহ্ন লুপ্ত করি / প্রাণভয়ে ইতিউতি জানান্ত সকলি।
সংগ্রমক ভয় করি ভঙ্গক্ষত্রি নাম ধরি / আপনাকে মানে কেহ রাজবংশী বুলি।[৩৪]

প্রাচীন 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ', পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত দেবীবর মিশ্রের 'খেলবিধি', ধ্রুবানন্দ মিশ্রের 'কুলকারিকা' প্রভৃতি গ্রন্থে কোচ জাতির উল্লেখ আছে। সপ্তদশ শতকের 'তারিখে আসাম' ও 'আলমগীর নামা', অষ্টাদশ শতকের 'রিয়াজস মালাতিণ', উনবিংশ শতকের 'মোরসেদ জাঁহানামা' প্রভৃতি মুসলমান ঐতিহাসিক লিখিত গ্রন্থে এতদঞ্চলের অধিবাসী হিসাবে শুধুমাত্র কোচ ও মেচ জাতির উল্লেখ আছে।[৩৫] ত্রয়োদশ শতকে লিখিত মিনহাজুম সিরাজের 'তবাকাৎ-ঈ-নাসিরী' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে তৎকালীন কামরূপ অঞ্চলে 'কোচ, মেচ থারু' সম্প্রদায়গুলির বসবাস ছিল। এছাড়া বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিতে কোচ রমণীর প্রতি শিবের আসক্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই সময়ের কোনও গ্রন্থে রাজবংশী নামক জাতির উল্লেখ পাওয়া যায় না।[৩৬] দিনাজপুরে প্রাপ্ত কম্বোজ রাজবংশের রাজা গৌড় কর্তৃক ৮৮০ শক (৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে) স্থাপিত বাণগড়, শিলালিপিতে কোচ জাতির উল্লেখ আছে। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে কোচ শব্দটির সংস্কৃতায়িত রূপ 'কম্বোজ'[৩৭] এবং যোগিনীতন্ত্র ও পদ্মপুরাণে যা 'কুবাচ' কুবাচক হয়েছে।[৩৮] হজসনও বলেছেন যে বিশ্বসিংহ হাজোর পৌত্র, কোচ-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন ও

রাজবংশী নামে পরিচিত হন। তাঁর মতে Koch ও Kuvaca একই শব্দের ভিন্নরূপ।[৩৯] পৌরাণিক আমল, এমনকী হাজার বছরেরও প্রাচীন শিলালিপি ও পৌরাণিক গ্রন্থাবলীতে 'রাজবংশী' নামক কোনও জাতির উল্লেখ পাওয়া যায় না। বুকানন হ্যামিলটনই (১৮০৭-১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে) সর্বপ্রথম কোচদের সঙ্গে একত্রিত করে 'রাজবংশী'র উল্লেখ করেন।[৪০] 'কোচবিহারের ইতিহাস' গ্রন্থে হেমন্তকুমার বর্মা 'কম্বোজ' রাজবংশ থেকে রাজবংশী নামের উদ্ভব হওয়ার কথা বলেন। মনুসংহিতায় পৌণ্ড্রক, ওড্র, দ্রাবিড়, কম্বোজ, শক জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং ধরে নেওয়া যায়, কম্বোজ রাজবংশ থেকে কোচ (কম্বোজ> কুবাচ> কোচ) শব্দ এসেছে। আর কোচ জাতিই পরবর্তী কালে রাজবংশোদ্ভূত 'রাজবংশী' নাম গ্রহণ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে। তৎকালীন কোচ জাতির যেসব লোকজন আর্থিক ভাবে স্বচ্ছল ছিলেন, তারাই মহাপূজা বিশ্বসিংহের অনুগামী হয়ে 'রাজবংশী' নাম গ্রহণ করে আলাদা হয়ে যান। আর যেসব লোকজন আর্থিক ভাবে অসচ্ছল ও রাজার সংস্পর্শ থেকে দূরে ছিলেন, রাজার সাংস্কৃতিক কার্যাবলীর স্পর্শ যারা পাননি, তারা আজও কোচ জাতি হিসাবে রয়ে গেছেন। এসব কারণে কোচ ও রাজবংশীদের আচার-বিশ্বাস, সংস্কার-সংস্কৃতির মধ্যে মিল থাকলেও যথেষ্ট অমিলও পরিলক্ষিত হয়।[৪১] সাহিত্য অকাদেমির ভাষাসম্মানে ভূষিত বিশিষ্ট গবেষক গিরিজাশঙ্কর রায় তাঁর 'উত্তরবঙ্গে রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির পূজা পার্বণ' গ্রন্থে যুক্তি বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে মত ব্যক্ত করেছেন যে কোচ ও রাজবংশী শব্দ দুটির মধ্যে কোচ নামটি আদি ও প্রকৃত।[৪২] উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত প্রায় সব গবেষক, ইংরেজ প্রশাসক, চিকিৎসক, ঐতিহাসিক ও নৃ-বিজ্ঞানী রাজবংশীদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে কোচ-রাজবংশের হাত ধরে কোচ নাম ত্যাগ করে 'রাজবংশী' নাম গ্রহণ করে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ক্ষত্রিয় সমিতির দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে রাজবংশীরা ১৯৩১ সালের আদমশুমারি রিপোর্টে 'ক্ষত্রিয় জাতি' হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। এই আন্দোলনের পুরোধা পুরুষ ছিলেন রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মা। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত যে সমস্ত নৃতাত্ত্বিক গবেষক, ঔপনিবেশিক আমলের আধিকারিক, প্রশাসক, চিকিৎসক, ঐতিহাসিক ও নৃ-বিজ্ঞানী রাজবংশীদের নিয়ে গবেষণা করেছেন, তাঁরা প্রায় সকলেই মত প্রকাশ করেছেন যে কোচ শব্দটিই আদি ও প্রকৃত এবং কোচ ও পলিয়া জাতির রক্ত মিশ্রণজাত সম্প্রদায়ই হচ্ছে রাজবংশী। কিন্তু কোচ, পলিয়াদের রক্ত মিশ্রণজাত সম্প্রদায় হলেও বর্তমান সমাজ-সংস্কৃতি-ভাষা-ধর্মের দিক থেকে

রাজবংশীরা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রাজবংশীদের মঙ্গোলীয় নৃ-জাতির তিব্বত ব্রহ্মদেশীয় ভাযা শাখার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি এ-ও মন্তব্য করেছেন যে খ্রিস্টাব্দ গণনার সময় থেকেই অসম, পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে তিব্বত-ব্রহ্মদেশীয় ভাযা শাখার বৃহত্তর বোড়ো জাতির মেচ-কোচ-কাছারি প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলি বসতি স্থাপন করে।[৪৩] এ-প্রসঙ্গে তিনি আরও মন্তব্য করেন যে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে মৌর্য আমলে বাংলাদেশে আর্যীকরণের সূত্রপাত এবং গুপ্ত আমলে অর্থাৎ সপ্তম শতকে তা সম্পূর্ণ হয়।[৪৪] তাঁর মতে এই সময়ে বঙ্গদেশের উত্তরাঞ্চলে আর্যভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটে এবং রাজবংশী ক্ষত্রিয়রাও পূর্বাঞ্চলের কোনও একটি আর্যভাষা গ্রহণ করে। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ভাষার যে কয়েকটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, তা ভাষাচার্য নির্দেশিত মাগধী প্রাকৃত বা অপভ্রংশ ভাষার লক্ষণ বলা যেতে পারে।[৪৫] এ-প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের বিপরণীর উল্লেখ করেন। গিরিজাশংকর রায়ও মন্তব্য করেন, 'মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর তিব্বতী ব্রহ্মদেশীয় ভাষার সাথে পরবর্তী কালে অষ্ট্রিক দ্রাবিড় ভাষার সংমিশ্রণ ঘটেছে।'[৪৬] অনেকের মতে, সপ্তম শতকে রাজবংশী ক্ষত্রিয়গণ পূর্বাঞ্চলের কোনও এক আর্যভাষার অন্তর্গত শাখা গ্রহণ করে।

রাজবংশীদের ভাষা নিয়েও পণ্ডিত মহলে বিতর্ক আছে। অনেক ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতের মতে রাজবংশীরা বৃহত্তর বোড়ো ভাষাগোষ্ঠীর একটি সম্প্রদায় পরবর্তী কালে তারা ভিন্ন ভাষার অনুবর্তী হয়। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'The Origin and Development of the Bengali Language' গ্রন্থে 'রাজবংশী' নামটি উল্লেখ করলেও ভাষার ক্ষেত্রে তিনি 'কামরূপী' শব্দটি ব্যবহার করেন।[৪৭] স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসনই প্রথম এই ভাষার নামকরণ করেন 'রাজবংশী'। তিনি 'Linguistic Survey of India' গ্রন্থে বলেছেন:

> When we cross the river (Brahmaputrra) coming from Dacca, we met a well marked form of speech in Rangpur and the districts to its North and east. It is called Rajbanshi, and while undoubtedly belonging to eastern branch has still points of difference which lead us to class it as a separate dialect.[৪৮]

বিশিষ্ট সমাজ-সংস্কারক মনীষী পঞ্চানন বর্মা 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদে'র মুখপত্র 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা'র সম্পাদক থাকাকালীন (১৯০৫—১৯১২) উত্তরবঙ্গের ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে, প্রবন্ধ রচনায় এই ভাষাকে 'কমতা-বিহারী' ভাষা হিসাবে উল্লেখ করেন। উত্তরবঙ্গের আরেক কৃতী সন্তান মনীষী পঞ্চানন বর্মার ভাবশিষ্য উপেন্দ্রনাথ বর্মন রাজবংশী ভাষার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে রাজবংশী জাতির ভাষা সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত।"[৩১] পরবর্তী কালে ধর্মনারায়ণ বর্মা তাঁর 'কামতাপুরী ভাষা প্রসঙ্গ' গ্রন্থে রাজবংশী ভাষাকে 'কামতাপুরী' ভাষা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। রাজবংশী ভাষা নিয়ে এ-যাবৎ যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছে। অনেকে দেশী ভাষা হিসাবে উল্লেখ করতে দ্বিধা করেন না। অনেকে ভিন্ন ভিন্ন নামকরণের পাশাপাশি উপভাষা, বিভাষা হিসাবেও আখ্যায়িত করেছেন। বর্তমানেও এই ভাষা-বিতর্কের সঙ্গে নানাবিধ বিষয় ইতিহাস, ঘটনা, প্রতর্ক-বিতর্ক এমনকী রাজনৈতিক বিষয় যুক্ত হয়ে আছে। তবে সাহিত্য অকাদেমি (ভারত সরকারের সর্বোচ্চ সাহিত্য সংগঠন) ২০১০ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি রাজবংশী ভাষাকে একটি স্বনির্ভর, পৃথক এবং সম্পূর্ণ ভাষা হিসাবে আখ্যায়িত করে রাজবংশী ভাষার বিশিষ্ট লেখক গিরিজাশঙ্কর রায়কে 'রাজবংশী ভাষা' সম্মানে ভূষিত করে। এর দু'বছর পর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০১২ সালে 'রাজবংশী ভাষা আকাদেমি' গঠন করে। ইতিমধ্যে বহু লেখক, কবি, প্রবন্ধকার রাজবংশী ভাষায় সাহিত্য চর্চা করছেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাও নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে উত্তরবঙ্গ তথা নিম্ন অসমের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে। বলা যেতে পারে রাজবংশী ভাষায় সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়ে সুদীর্ঘ কাল অন্তরালে থাকা একটি ভাষা আজ নব আলোকে, নব আনন্দে ও কলেবরে জাগরিত হচ্ছে।

২

রাজবংশী জনগোষ্ঠী হাজার হাজার বছর ধরে নানা বিধ চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এসে পৌঁছেছে। সামগ্রিক ভাবে লক্ষ করলে প্রতীয়মান হয় যে সুদীর্ঘ কাল বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সঙ্গে পাশাপাশি অবস্থান এবং বর্ণহিন্দুদের ধর্ম-সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে স্বতন্ত্রতা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। নিজস্ব ধর্মীয়-বিশ্বাস, আচার-সংস্কার, দেব-দেবী, প্রকৃতিভাবনা তথা জীবন-জীবিকায় ব্যতিক্রমী ভাবনা আজও নিভৃতে বহন

করে রাজবংশী সমাজ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে হিন্দুধর্মের সংস্পর্শে শাস্ত্রীয় রীতি-নীতি অনুসরণ করলেও জীবন ধর্মে লৌকিক অধ্যায়টি বিস্তৃত অংশ জুড়ে বহমান। তবে রাজবংশী সমাজজীবনের সঙ্গে বৃহত্তর বঙ্গজীবনের সাংস্কৃতিক সংশ্লেষণ (Cultural assimilation) উত্তরোত্তর ঘটতে থাকায় বর্তমান প্রজন্মের মেলামেশা, আদব-কায়দা, শিক্ষাদীক্ষা, আদান-প্রদান, পোশাক-পরিচ্ছদ এমনকী চিন্তা-চেতনা মননভাবনার ক্ষেত্রে পরিবর্তন স্বাভাবিক ভাবে ঘটেছে। সেই সঙ্গে বিশ্বায়নের প্রভাব, লোক-সাংস্কৃতিক পরিসরের সংকোচনে রাজবংশী সমাজেও সংস্কৃতির বিবর্তন নজরে পড়ে। সামাজিক ক্ষেত্রে যেমন, ধর্মীয় ক্ষেত্রেও প্রাচীন-সংস্কার, রীতি-নীতির পরিবর্তন লক্ষণীয়। তা সত্ত্বেও বলা যায়, রাজবংশী সমাজ-সংস্কৃতি ভিন্নতর গোষ্ঠী-পরিচয় বহন করে। যা আচরিত ক্রিয়াকলাপ কিংবা জীবনচর্যার বিভিন্ন পদক্ষেপে প্রতিভাত হয়।

রাজবংশী জনগোষ্ঠী সমাজ জীবন এবং মনন চর্যার যে ভিন্ন সংস্কৃতির ধারা ও ঐতিহ্য পালন করে, তা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। সুদীর্ঘ কাল বর্ণ হিন্দুদের সঙ্গে সহাবস্থান, সংস্পর্শ, সংশ্লেষণ প্রভৃতি কারণে তারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী— সামাজিক ক্রিয়াকলাপে যেমন জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে ইত্যাদি আচার-অনুষ্ঠানে বর্ণহিন্দুদের অনুসরণ করলেও নিজস্ব লৌকিক আচার-সংস্কারের পর্বটিও নিষ্ঠা সহকারে পালন করে। সেখানে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ কোনও বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। রাজবংশী সমাজে বিভিন্ন প্রকার বিয়ের (যেমন— ঘরজেয়া বিয়ে, ঘর সোন্ধানি বিয়ে, উঠানি বিয়ে, পানি ছিটা বিয়ে ইত্যাদি) প্রচলন কম হলেও বিয়ের বিভিন্ন পর্বে লৌকিক বিষয়গুলি আজও গুরুত্বপূর্ণ। যেমন— গুয়াকাটা অনুষ্ঠান, পানিছিটা বাপ, মিস্তর ধরা, আধোয়ারি ইত্যাদি পর্বগুলি যথাসম্ভব অনুসৃত হয়। মৃত্যুর ক্ষেত্রেও কিছু কিছু অনুষ্ঠান লৌকিক স্তরেই রাজবংশী সমাজ পালন করে। যেমন— ডোকা-ভাঙা, শ্মশানে বাঁশ পুঁতে নিশান টাঙানো, প্রেতকর্ম সম্পাদন, ধুমালী কীর্তন পর্ব এবং এছাড়াও আরও কিছু লৌকিক আচার বিচার। ধর্ম পালনের ক্ষেত্রেও বর্ণহিন্দুদের প্রায় সকল দেব-দেবীর প্রতি বিশ্বস্ত থেকেও সারা বছর ধরে নিজস্ব দেব-দেবীর পূজা অর্চনা, ব্রতপালন, বিশ্বাস ও সংস্কারের মাধ্যমে নিজের ও পরিবারের মঙ্গল কামনা করে। বৃক্ষপূজা থেকে শুরু— শিব, মনসা, কালী, বুড়া ঠাকুর, তিস্তা বুড়ি, মা লক্ষ্মী, সোনারায়ের গান, জাগগান, বাঁশ খেলা, বুড়াবুড়ি, গোরখনাথের পূজা, ভাণ্ডালী প্রভৃতি জাঁকজমক সহকারে তারা পালন করে। এ ছাড়াও নানা ধরনের আঞ্চলিক লৌকিক দেব-দেবীর পূজা ও ধর্মীয় রীতির মধ্যে আমাতি বা অম্বুবাচী পালন, বিভিন্ন তিথি নক্ষত্রে সেবা প্রদান,

ধানের গাছি বোনা, ফুল আনা, যাত্রাপুজা, ব্যাঙের বিয়া ও হুদোমদ্যাওর পুজা, ষাইটন বিষহরির পূজা ও গান, মাড়েয়া বিষহরির আসর, বিভিন্ন ধরনের কালী ও শিবের পূজা, মাসান ঠাকুরের পূজা, কার্তিক পূজা, চড়ক পূজা, গারাম ঠাকুরের পাটে পূজা, বিষমা বা বিষুয়া পালন, দোল সওয়ারীর পূজা ও মেলা প্রভৃতি ছাড়াও বিভিন্ন নদীকে দেবতা জ্ঞানে পূজা, বৃক্ষপূজা, বৃক্ষকে ঘিরে উৎসব সবেতেই লৌকিক রীতি-সংস্কারে রাজবংশী জনগোষ্ঠী নিবিষ্ট হয়। এছাড়াও তন্ত্রমন্ত্র লৌকিক বিশ্বাস-সংস্কারে পরিবার ও পরিবারের বাইরের কিছু অনুষ্ঠান সুদীর্ঘ কাল ধরে সম্পন্ন হয় একেবারে শাস্ত্রীয় রীতির বাইরে অবস্থান করে। সেখানে অনেক ক্ষেত্রে ধর্ম, বিশ্বাস ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। যেমন পিরের থানে হত্যে দেওয়া, মানত, পূজা প্রদান; বিভিন্ন মেলার আয়োজন ইত্যাদি বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠীকে বরাবর ভিন্ন ভাবে আলোড়িত করে। সামগ্রিক ভাবে বলা যায় রাজবংশী সমাজের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে অদ্ভুত এক সমন্বয় যেমন দৃশ্যমান, তেমনই ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রাচীন বৌদ্ধ প্রভাব থেকে শৈব, শাক্ত প্রভাব যেমন বর্তমান; তেমনই বৈষ্ণব প্রভাবও কয়েক শতাব্দী ধরে প্রকট। অদ্ভুত সমন্বয় ও সাযুজ্যও লক্ষ করা যায়। এ-প্রসঙ্গে কোচবিহারের মদনমোহন মন্দিরের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। আবার রাজবংশী পরিবারের ঠাকুর পাটে কালী, গাবুর, রাখাল, কুবের, শিব থেকে মাসান, সোনারায়, বুড়াঠাকুর, তিস্তাবুড়ি, গৌরাঙ্গ; এমনকী পিরবাবার থানেরও অদ্ভুত সমাবেশ দেখা যায়। দুধ, চিড়া, আটিয়া কলার (বিচি যুক্ত কলা) সাধারণ নৈবেদ্য দিয়ে বাড়ির গৃহকর্তাই অনায়াসে পূজা-অর্চনায় ব্রতী হয়। সেখানে মন্ত্র থাকলেও শাস্ত্রীয় নয়। আসলে রাজবংশী সমাজের ধর্মীয় আচার-সংস্কার লৌকিক অধ্যায়টি গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে আর্য-অনার্যের বহু উপাদান লুকিয়ে আছে সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন সূচিতে। প্রকৃতিবাদ (Annimism) তথা সর্বপ্রাণবাদে রাজবংশী সমাজে বিশ্বাস আজও লক্ষণীয়। রাজবংশী সমাজে উর্বর সংস্কৃতি (Fertility Culture) প্রভাব প্রায় সমস্ত আচার-সংস্কারে দেখা যায়। বিশেষ করে ব্রতকথা, বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজার প্রকার ভেদে, বিশেষ করে কৃষি-কৃত্যাদির বিভিন্ন পর্বে। মেচেনী, হুদোমদ্যাও, ভাণ্ডালী সবেতেই উর্বরা সংস্কৃতির উপাদান সক্রিয়। বটপাকুড়ের বিয়ের ক্ষেত্রেও তা দৃশ্যমান। সকল নদীই রাজবংশী সমাজের কাছে দেব-দেবী, দেবস্থান। নদী, জনকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করার রীতি রাজবংশী সমাজে প্রচলিত। এসব জন-সংস্কৃতির (water culture) উদাহরণ। নদীতে নদীতে আত্মীয়, পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ রাজবংশী সমাজ এটা বিশ্বাস করে। তাই তো ধলরা

তিস্তা নদীর স্বামী, করলা নদী আর দুলালী দীঘি সন্তান-সন্ততি।

আদিম সংস্কৃতির উদাহরণ বহন করে লৌকিক ও প্রাকৃত বিশ্বাস। জাদু বিশ্বাস, তন্ত্রমন্ত্র সমাজ-সংস্কারে নিহিত আছে লৌকিক ধর্মের অবয়বে। রাজবংশী সমাজের ধর্মবিশ্বাস, আচার-বিচার, পূজা-অর্চনা, ব্রতকথার মূল উৎস জাদুবিদ্যা। রাজবংশীদের মধ্যে এই জাদুবিদ্যা, তন্ত্রমন্ত্রের প্রভাব জীবনচর্যার নানা স্তরে যেমন— সন্তান জন্মানোর নিয়মাচারে, রোগব্যাধির চিকিৎসায়, শুভাশুভ কামনায় ও দৈনন্দিন যাপন কার্যের পরতে পরতে সূক্ষ্ম ভাবে কাজ করে। রাজবংশী সমাজের লোক-সংস্কৃতির পরিসরটি আক্ষরিক অর্থে বিস্তৃত। আর এই পরিসরে ধরা পড়েছে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সামাজিক বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়। ফলে রাজবংশী সম্প্রদায় সুদীর্ঘ কাল বিভিন্ন জনজাতির সঙ্গে সহাবস্থান এবং বর্ণ হিন্দুদের ধর্ম-সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ রূপে বর্ণ হিন্দুর ধর্ম গ্রহণ করেননি, আবার তাদের অতীত কালের ধর্মীয় বিশ্বাস যেমন, পূজা উপলক্ষে গ্রাম মাঙ্গলিক থানে পশুবলী, নদ-নদীকে দেবতা জ্ঞানে পূজা-অর্চনা, বড় বৃক্ষকে দেবতা জ্ঞানে তেল সিঁদুর মাখিয়ে প্রণাম ও প্রার্থনা জানানো প্রভৃতি ত্যাগ করেনি। রাজবংশী জীবনের মঙ্গলবোধ, শ্রেয়োবোধ অতীত ধর্মবিশ্বাসেই তাদের মধ্যে জাগ্রত।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহারাজ বিশ্বসিংহ ও তাঁর পুত্র মহারাজ নরনারায়ণের সময় কালে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর মধ্যে হিন্দু ধর্মবিশ্বাস ছড়িয়ে পড়ে। বলা যায়, রাজবংশীদের বৃহৎ অংশ এই সময়ে হিন্দু ধর্মাবলম্বী হয়ে পড়েন। রাজবংশী হিসাবে স্বতন্ত্র পরিচয়ের সূত্রপাত এই সময় থেকেই। অবশ্য সামান্য অংশ, কোচ পরিচয় নিয়েই থেকে যায় নিজস্ব গোষ্ঠী পরিচয় বহন করে। যদিও পরবর্তী কালে তারা বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের (পঞ্চানন বর্মার ক্ষত্রিয়করণ আন্দোলন) মধ্য দিয়ে বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র রাজবংশী জনগোষ্ঠীই নয়, কোচ-খেন-যুগী-জলধা ইত্যাদি জনগোষ্ঠীও সামিল হয়। এই প্রক্রিয়ার ধারা আজও অব্যাহত। পরবর্তী কালে বৈষ্ণব প্রভাবও এই জনগোষ্ঠীকে ধর্মীয় ভাবনায় সমৃদ্ধ করেছে। শংকরদেবের প্রভাব এক্ষেত্রে ব্যাপক। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের সময় কালে বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে এবং বলা যেতে পারে শৈব, শাক্ত ভাবনার সঙ্গে বৈষ্ণব ভাবনার মহাসম্মিলন ঘটে।

রাজবংশী সমাজের প্রধান আরাধ্য দেবতা— মহাদেব, কালী এবং মনসা দেবী। সামাজিক মঙ্গল সাধন, পারিবারিক সুখ শান্তি, সমৃদ্ধি, ফসল বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে

বেশ কিছু লৌকিক পূজা রাজবংশী সমাজে প্রচলিত। বিশেষ করে মনসাদেবীর পূজা পারিবারিক যে কোনও শুভকর্মের প্রারম্ভে সম্পন্ন হয়। কালীর তো বহু প্রকারভেদ। শিবও বিভিন্ন নামে পূজিত। বাণেশ্বর, যণ্ডেশ্বর, জটেশ্বর, বটেশ্বর, জল্পেশ্বর আবার মাশান, সোনারায় সবই শিবের প্রকারভেদ। পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তীয় ভূখণ্ড (জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার) তো শৈবভূমি হিসাবে আখ্যায়িত। মহাকাল হিসাবে শিব পূজা পেয়ে আসছেন প্রান্তীয় ভূ-খণ্ডের বিভিন্ন জায়গায়। জীবজন্তুর হাত থেকে ধরা পাওয়ার উদ্দেশ্যে রাজবংশী সমাজে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা প্রচলিত। ভাণ্ডানী, শানেশ্বরী, বিষহরি, বুড়াঠাকুর গোরখনাথ, মহাকাল, সোনারায় এমনকী নবান্নোৎসবে শিয়াল ঠাকুরের নামেও অর্ঘ্য দান করা হয়।

রাজবংশী সমাজে তন্ত্রসাধনার একটি পরিসর ছিল। ওঝা, ভৌরিয়ারা তার উদাহরণ। এর মূলে রয়েছে বৌদ্ধ প্রভাব। ময়নাগুড়ি (জলপাইগুড়ি) অঞ্চলে তন্ত্রসাধনার বেশ কিছু প্রাচীন ক্ষেত্রের চিহ্ন আজও বর্তমান। নেপাল সন্নিহিত পাহাড় সংলগ্ন তরাই ডুয়ার্স সহ কামরূপ-কামাখ্যা ছিল সেকালের তন্ত্র সাধনার অন্যতম ক্ষেত্র। রাজবংশী সমাজে তন্ত্র-মন্ত্র, তাবিজ-মাদুলি, ওঝা-কবিরাজের প্রভাব যথেষ্ট। রাজবংশী সমাজে প্রাচীন কাল থেকে ব্রতকথার প্রচলন আছে। আশা-আকাঙ্ক্ষানিষ্ঠ বিশেষ ধর্মাচারণের ক্ষেত্র হিসাবে ব্রতপালন অনতি অতীতে প্রচলিত থাকলেও বর্তমানে প্রায় লুপ্তের পথে। ষাইটল, সুবচনী, ধরমঠাকুর, ষাটপূজা, কাতিপূজা কোথাও কোথাও হলেও সংখ্যায় তা হাতে গোনা। আঞ্চলিক ভেদে আরও বহু দেব-দেবীর পূজা রাজবংশী সমাজে প্রচলিত। কোথাও কোথাও ব্যক্তি কিংবা কোনও শক্তি উৎসকেও দেবতা জ্ঞানে পূজা করা হয়। যেমন— সন্ন্যাসীকাটা, ফালাকাটা, তুলাকাটা, সন্নিদ্ধ ঠাকুর, রাজাঠাকুর এরকম স্থানিকভেদে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা অর্চনা রাজবংশী সমাজে প্রচলিত। তা কখনও ব্যক্তিগত কিংবা গ্রামকে ভিত্তি করে সম্পন্ন হয়।

রাজবংশী সমাজ মূলত কৃষিজীবী। যদিও হাল আমলে বৃত্তির প্রসার ঘটেছে। বর্তমানে রাজবংশী সমাজ খাদ্যাখাদ্যের ব্যাপারে বেশ কিছু বিধিনিষেধ পালন করে। বিশেষ করে ক্ষত্রিয় আন্দোলনের প্রেক্ষিত সমাজ-সংস্কারের অংশ হিসাবে শূকরের মাংস, মদ ইত্যাদি বিষয়ে বিধিনিষেধ অনুসরণ করে। নৃতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক গবেষকদের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে রাজবংশীরা ষোড়শ শতাব্দীর পর থেকে যখন একটু একটু করে হিন্দু ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, তখন থেকেই সমাজের মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে ধীরগতিতে। সেই সময় থেকে বলা যেতে

পারে, তাদের সমাজ মাতৃতান্ত্রিকতা থেকে পিতৃতান্ত্রিকতায় প্রবেশ করে। এই সময় থেকেই সমাজব্যবস্থায় নারীর তুলনায় পুরুষের কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫০] কিন্তু রাজবংশী সমাজ হিন্দুধর্ম গ্রহণ করার পর পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় প্রবেশ করলেও তাদের অনেক সংস্কার, বিশ্বাস, প্রথা প্রভৃতি চলমান ছিল। রাজবংশী সমাজে অতীতে নারীদের বিশেষ ভূমিকা ও গুরুত্ব ছিল। বিধবা বিবাহ সুদূর অতীত কাল থেকে প্রচলিত। পর্দা প্রথারও বিশেষ প্রচলন ছিল না। রাজবংশী নারীরা পুরুষদের মতো সমান ভাবে পরিবারের কাজকর্মে অংশ নিতে পারে। অতীতে 'কন্যা পণে'র বিশেষ প্রচলন ছিল। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। 'কন্যাপণে'র পরিবর্তে বর্ণহিন্দুদের মতো 'বরপণে'র প্রথাও চালু হয়। ইদানীং সেটি রীতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। 'বেটি ব্যাচে খাওয়ার' সেই প্রচলিত প্রবাদ এখন উলটো কথা বলে। 'ঘর জামাই' রাখার প্রথাও এখন অবলুপ্ত। বিয়ের অন্যান্য প্রকারগুলোও সচরাচর চোখে পড়ে না। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, বিয়ে বিষয়ে বর্ণহিন্দুদের রীতি-নীতি বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। তবে লৌকিক বৃত্তটি এখনও রাজবংশী সমাজ মেনে চলার চেষ্টা করে। 'বৈরাতী' (বিয়ের রীতি-নীতি অনুসরণ করে এই বৈরাতী) এখনও সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। সেখানে প্রাচীন লৌকিক সংস্কার রীতিগুলো অনুসৃত হয়। রাজবংশী সমাজে বিয়ের ক্ষেত্রে বর্ণহিন্দুদের মতো 'গোত্র' মানা হয় না। রক্ত সম্পর্কিত জ্ঞাতি এবং বৈবাহিক সূত্রে জ্ঞাতিত্ব রাজবংশী সমাজে প্রধান। জ্ঞাতি-সম্পর্কিত আত্মীয়দের মধ্যে বিয়ে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। রাজবংশী সমাজে সমান্তরাল ভাইপো (Parallal Cousin) ও আড়াআড়ি ভাইপো (Cross Cousin) জ্ঞাতি-সম্পর্কিত লোকজনের সঙ্গে বিয়ে হয় না।[৫১] রাজবংশী সমাজে গোত্র বিভাগ (সবাই নিজেদের কাশ্যপ গোত্র হিসাবে পরিচয় দেয়) না-থাকলেও গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা ছিল। এক‌েকটি গ্রামে মাত্র কয়েকটি গোষ্ঠীর লোক বসবাস করতেন। ইদানীং আর্থ-সামাজিক কাঠামো পরিবর্তনের ফলে সে ছবিটা পালটে গেছে। আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেও রাজবংশী সমাজে একই গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীতে বিয়ে হত। কিন্তু বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও বর্ণ হিন্দুদের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় একই গ্রামে বিয়ের সম্বন্ধ বিরলপ্রায় হয়ে উঠেছে। রাজবংশী সমাজে বর্তমানে একরৈখিক বংশধারাই (unilinial descent) প্রচলিত, আর তা হল— পিতৃসূত্রীয় (patrilinial), মাতৃসূত্রীয় নয়। কোচ সমাজে অতীতে মাতৃসূত্রীয় বংশধারা অর্থাৎ মাতৃতান্ত্রিক রীতি-নীতি থাকলেও

বর্তমানে তাদের মধ্যেও পিতৃসূত্রীয় বিষয়টিই প্রচলিত।

রাজবংশী সমাজে একাধিক সামাজিক স্তর (social startification) নেই অর্থাৎ এই সমাজে কোনও সামাজিক অসাম্য (social inequality) নেই বলে বিয়ে বা সামাজিক কোনও ক্রিয়াকাণ্ডে জাতিগোষ্ঠীর মধ্যেই সম্পন্ন হয়। সবাই কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত। সেখানে গিরি (জমির মালিক) কিংবা আধিয়ার-প্রজার (যারা জমিতে ভাগচাষে যুক্ত) মধ্যে বৃত্তিগত কোনও প্রভেদ নেই। তবে সামাজিক মর্যাদা (Status), সামাজিক আধিপত্য (social domination) কিংবা আর্থিক বিষয়গুলি গুরুত্ব পেত। বর্তমানে সে অবস্থারও পরিবর্তন ঘটেছে। কারণ পেশাগত ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। সম্পূর্ণ ভাবে ভূমিনির্ভর সমাজ আর নেই। শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। যুক্তি-চিন্তারও বিকাশ ঘটেছে। ফলে সামাজিক বিন্যাসের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। এর প্রভাব রাজবংশী সমাজের সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। ঘরবাড়ি, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে চিন্তা-চেতনায় তা আমরা লক্ষ করেছি। ধর্মাচরণের ক্ষেত্রেও লৌকিক বৃত্তের সংকোচন ঘটেছে। বিশেষ করে শহরাঞ্চলে, শিক্ষিত লোকের মধ্যে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে ৯-১০ বছরের মধ্যে মেয়েদের বিয়ে হত। সে ধারার পরিবর্তন হয়েছে, বর্ণহিন্দুদের মতোই সময়-বয়স ধরে সম্পন্ন হয়। একাধিক বিয়ের অনুমতিও সমাজ আর অনুমোদন করে না। অতীতে এটা বহুল প্রচলিত ছিল, অবস্থাপন্ন পরিবার হামেশাই এটা করতেন। রাজবংশী সমাজে এখনও বিয়ে বা অন্য কোনও অনুষ্ঠানে 'অসমীয়া' ব্রাহ্মণের প্রতি ঝোঁক থাকলেও তথাকথিত ব্রাহ্মণদের দিয়ে কাজ করতে দ্বিধা করেন না। ওঝা, কবিরাজ, ভৌরিয়াদেরও সেই সামাজিক সম্মান নেই। মানুষের আসক্তি কমেছে। সমাজে দেওয়ানীদেরও সে আধিপত্য নেই। জমিজমা কিংবা যে কোনও বিরোধের মীমাংসায় তাদের ডাক পড়ে না। রাষ্ট্রীয় আইন ও বিচার ব্যবস্থার অধীনে সামাজিক বিরোধের বিষয়গুলি নিষ্পত্তি হয়। সম্পত্তির ভাগীদার এখন মেয়েরাও। তারাও সমান অংশের অধিকারী। অতীতে ছবিটা অন্যরকম ছিল। পারিবারিক সংস্কারের ক্ষেত্রেও শিথিলতা লক্ষণীয়। বিশেষ করে শিক্ষিত পরিবারগুলির মধ্যে। ভাই-বউ এখন বোনের মতো। ভাগনে বউয়ের হাত থেকে মামা সরাসরি কোনও জিনিস নিতে পারে। অতীতে বিধিনিষেধ ছিল। ভাসুরের সঙ্গেও এখন তেমন আড়াল নেই। অতীতে কোনও কারণে বউমার সঙ্গে কোনও স্পর্শ হলে ভাসুরকে উপোস করে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই শিথিলতা কিংবা পরিবর্তন বিশেষ পরিবর্তন লক্ষণীয়। বিশেষ করে শহরাঞ্চলে তো ব্যাপক পরিবর্তন

ঘটেছে, বর্ণহিন্দুদের মতোই আচার-সংস্কারের অনুবর্তী হয়েছে বর্তমান রাজবংশী

এসব সত্ত্বেও বলা যায়, রাজবংশী সমাজ জীবন নিয়ে পর্যালোচনা করতে হলে রাজবংশীদের উদ্ভব বিকাশ, অতীত আচরণ, ধর্মবোধ, আচার-আচরণ, সংস্কার-সংস্কৃতি কৃষি শিল্প, জীবনযাপন, বিভিন্ন অনুষ্ঠান, লৌকিক বৃত্ত ইত্যাদি বিষয় লক্ষ করতে হবে। এখনও কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিজস্ব গোষ্ঠীভাবনা, মৌলিকত্ব, মনন-চিন্তনের ভাব ব্যঞ্জনা, জীবন চর্যা ইত্যাদি রাজবংশী সমাজের বিশেষত্ব ধরা পড়ে। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের কৃষ্টি-সংস্কৃতি অনুসন্ধানে নৃতত্ত্ববিদ চারুচন্দ্র স্যানালের অভিমত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি 'The Rajbanshis of North Bengal' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন:

> The study of folk life and culture of these people has become important when attitudes are changing has due to impact of western civilization and more so after partition of Bengal when a large immigration of people from lower North and East Bengal is taking place in this area and within a very short time a profound culture mixing is sure to take place and some of the age long customs may disappear altogether.[৭]

৩

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ পালটে যায়। পালটে যায় ভৌগোলিক মানচিত্রও। একই সঙ্গে পালটায় আর্থ-সামাজিক কাঠামো সহ সমাজ মনন প্রক্রিয়া। শিক্ষা রুচির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জনগোষ্ঠীর লোকায়ত আচার পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়। বিবর্তিত হয়, পরিমার্জিত হয়। নব নব রূপে ধারাবাহিক গতিপ্রবাহে ভিন্ন সংস্কৃতি ভিন্ন ভাবনা ও বিশ্বাস আশ্রয় পায়। অন্য সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্তি ঘটে। কোচবিহার, জলপাইগুড়ির প্রান্তীয় অংশের উপরদিকে ধারাবাহিক ভাবে বিভিন্ন সংস্কৃতির আগমন ঘটে। অনন্তকাল ধরে নতুন নতুন জাতি-জনজাতি গোষ্ঠীয় ঢেউ আছড়ে পড়েছে। তাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্তি ঘটে, লৌকিক ও অলৌকিক বিশ্বাসে ধর্মীয় ভাবধারাও পুষ্ট হয়েছে। আরও আরও বিস্তৃত অঞ্চলকে প্লাবিত করেছে। বঙ্গদেশে আর্যীকরণের সূত্র ধরে রাজবংশী সমাজের হিন্দুত্বগ্রহণ, ভাষা-সংস্কৃতির আত্তীকরণ ঘটেছে। সামগ্রিক

হিন্দু শাস্ত্রীয় ধর্মকর্মাদি গৃহীত হলেও আঞ্চলিকতা ভেদে রাজবংশী সমাজের দেবদেবী, বিশ্বাস ও আচার-ব্যবহারে একটা স্বতন্ত্র ধারা আজও লক্ষণীয়। তবে এই ধারা প্রকৃতি, লোকবিশ্বাস মনন চর্চার একটা পরিবর্তনের ব্যাপ্তিও কিন্তু লক্ষণীয়। তথ্য প্রযুক্তির বিস্তার, নাগরিক স্পর্শের বিশ্বায়নে গ্রামীণ জীবনের মূলধারাও একটা ব্যাপক পরিবর্তন কিন্তু স্পষ্ট। এ-শুধু রাজবংশী সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, বলতে গেলে প্রায় সমস্ত সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেই প্রায় সমান ভাবে প্রযোজ্য।

রাজবংশী সমাজের প্রার্থনীয় কামনা-বাসনা একান্ত ভাবে পার্থিব এবং নিতান্ত দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয়তা কেন্দ্রিক। কৃষিনির্ভর সমাজ জীবনেও বেশির ভাগ দেব-দেবী, পূজাপার্বণ উপলক্ষাদি এবং তৎসম্পর্কীয় সংগীত, এমনকী মন্ত্রাদিও ক্রিয়াকর্মভিত্তিক। স্থান পেয়েছে নদী, বৃক্ষ, সময়, কখনও আলৌকিক ঘটনা কিংবা ভাবনা। আবার একই দেব-দেবী ক্ষুদ্র অঞ্চল ভেদে ভিন্ন নামে, ভিন্ন আচারে পূজিত হয়ে আসছে। লৌকিক দেব-দেবীরা ভীষণ ভাবে আঞ্চলিক এবং অনেকটা পারিবারিক ও সামাজিক। বিশ্বাসের শিকড় বহুধা বিস্তৃত। আবার এই পূজা আচারকে ঘিরেই তৈরি হয়েছে অজস্র লোকগান, লোকসাহিত্য, লোককথা সর্বোপরি লোকবিশ্বাস। আবার আঞ্চলিক সহাবস্থানে একাধিক জনজাতির দেব-দেবী বিশ্বাসের মধ্যেও সমান্তরাল মেলবন্ধন ঘটেছে। আবার আচার-বিচারেও যথেষ্ট একাত্মতার মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

রাজবংশী সমাজ সহজ-সরল নিরুপদ্রব জীবনে অভ্যস্ত ছিল। ছিল মূলত কৃষিজীবী। হাতেবোনা কাপড়চোপড়। বাহুল্যবর্জিত খাবারদাবার। বিনোদনপ্রিয়। ভাবনাচিন্তায় উদারতা, গোষ্ঠীবদ্ধতা এবং স্বাধীন খেয়ালের প্রকৃতি প্রেমিক। প্রাকৃত, অতি প্রাকৃত শক্তির পূজারি। সহজ, সরল এবং অকপট। মাতৃতান্ত্রিক। এই ছিল এক সময়ের রাজবংশী জনগোষ্ঠীর ঘরানা-পরিবার-সমাজ। অধিকাংশ লোকদেবতাই বিমূর্ত। পূজাস্থলে লাল সাদা নিশান, প্রস্তরখণ্ড, মাটির ঢিবিই দেব-দেবীজ্ঞানে পূজিত হত। হাল আমলে বিশ্বাস আচারে বহু পরিবর্তন হলেও মূল বিশ্বাসের নিদর্শন এখনও গ্রামেগঞ্জে গেলে দেখা যায়। তুলসীমঞ্চ সব বাড়িতেই অধিষ্ঠিত, ব্রাহ্মণাধারায় পরবর্তী কালে একাধিক লৌকিক দেবতা শাস্ত্রীয় স্বীকৃতিও লাভ করে আবার ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমদিকে বৈষ্ণবীয় ভাবধারায় এতদঞ্চলের প্রায় সমস্ত সম্প্রদায়ই প্রভাবিত হয়েছিল। সেই বিশ্বাসের জায়গাটা এখনও অবিকল একই রকম রয়েছে, তবে পরিবর্তনের ছোঁয়া একটু-আধটু লেগেছে বইকী!

চাঁদোয়া টাঙিয়ে পূজাপদ্ধতি আজও প্রচলিত। বাড়ির যে কোনও কাজকর্মে সে মঙ্গল কিংবা অমঙ্গলই হোক, তুলসীতলায় অধিকারী বোষ্টম দিয়ে সেবা (পূজা) দেওয়ার রীতি এখনও প্রচলিত। তবে তা গ্রামাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। আবার মৃতদেহ সংকারের পর দাহস্থানেও চাঁদোয়া টাঙিয়ে দেওয়া রাজবংশী সমাজের রীতি। নবজাতক শিশু কিংবা মৃত ব্যক্তির শান্তি স্বস্ত্যয়ন বা অশৌচ কাটানোর জন্যও তুলসীতলায় সেবা দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। আবার তুলসী মঞ্চের পাদে দণ্ডে লাল নিশানের অবস্থান প্রাচীন ভারতীয় কপিধ্বজের ক্ষীণ স্মৃতি বলে ধরে নেওয়া যায়। অন্যদিকে রাজবংশী সম্প্রদায়ের এক বিরাট বিশেষত্ব শুধু হিন্দু সংস্কৃতি নয়, বৌদ্ধ থেকে ভুটানি এমনকী মুসলমান সম্প্রদায়ের বিভিন্ন দেব-দেবী থেকে লোকাচারকে মান্যতা দিয়ে তাদের ধর্মাচারের অঙ্গীভূত করেছে। এক অসম্ভব ধর্ম সহিষ্ণুতা, উদারতার প্রতিভূ এই সমাজ অনেক কিছুকে আত্মস্থ করে আজকের বাঙালি তথা হিন্দু-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হয়েছে। শাস্ত্রীয় অথবা তথাকথিত উচ্চবর্গীয় বর্ণহিন্দুদের কাছে তাদের ব্রাত্যতা ঘুচুক বা না-ঘুচুক রাজবংশী সমাজ আধুনিক বাঙালি ধর্ম ও সংস্কৃতির অন্যতম ধারক-বাহক, এই কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। অন্তরে ও বহিরঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নিয়েছে। এমনকী বিয়ে-সাদিতেও গ্রহণ বর্জনের কোনও বিধিনিষেধ কিংবা সংরক্ষণ গোঁড়ামির মানসিকতা আর নেই। এই ব্যাপারে সমগ্র বাঙালি সমাজও বিশেষ কৃতিত্ব দাবি করতে পারে। মিলিবে আর মিলাবের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতি মিলেমিশে একাকার।

সময়ের স্রোতে শিক্ষা-সভ্যতা তথা আধুনিকতার বিস্তার ঘটেছে। নগরায়ন প্রসারিত হয়েছে। সংঘবদ্ধ সমাজ জীবনের আদি ছবি উধাও। বিশ্বায়িত বিজ্ঞাপিত আহ্লাদ আহ্বানে নতুনের হাতছানি। আমাদের চিরায়ত সংস্কৃতির ধারা, আচার-ব্যবহারের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। অনেক ক্ষেত্রে বিকৃতিও হচ্ছে। তবে সময়ের দাবি মেনে পরিবর্তনকে স্বীকার করলেও ঐতিহ্য পরম্পরগত ধারা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা যেমন জরুরি, তেমনই প্রয়োজন ঐতিহ্যের বিস্তার ও সঞ্চরণ। তবে শুধু রাজবংশী সমাজ নয়, ভারতবর্ষের অসংখ্য জনজাতি সমৃদ্ধ কৃষ্টি-সংস্কৃতির সম্ভারে ভারতাত্মার যথার্থ বার্তা ঘোষিত হবে। বিবিধের মাঝে মহানমিলনের সুর উচ্চারিত হবে। আমাদের মতো দেশে শত শত জাতির নিজস্ব সত্তাবিকাশের মধ্যে দিয়েই দেশ মাতৃকার আসল সত্তার বিকাশ নিহিত আছে। পরিবর্তনকে অস্বীকার করে নয়, সামগ্রিক গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে আত্মস্থ করতে হবে।

খাদ্যদ্রব্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘরবাড়ি, ক্রিয়াকর্ম, বিনোদন থেকে পূজা অর্চনা, আচার-ব্যবহার— সর্বত্রই রাজবংশী সংস্কৃতিতে পরিবর্তন এসেছে। রাজবংশী সমাজে লক্ষ্মীপূজার রীতি সাধারণ বাঙালি সমাজের রেওয়াজ, ক্ষত্রিয়-রাজবংশী সমাজে সংযোজিত হয়েছে। ক্ষেতি বা ডাকলক্ষ্মী পূজাই সম্ভবত রাজবংশী সমাজের আদি ও অকৃত্রিম লক্ষ্মীপূজা। সরস্বতী পূজাও আসলে নয়া সংযোজন। সরস্বতী পূজা আসলে শারদীয়া দুর্গোৎসবে দশমীর দিন যাত্রা পূজার নামান্তর। যাত্রাপূজাই রাজবংশী সমাজের প্রকৃত বাণীবন্দনা। জামাই ষষ্ঠীও রাজবংশী সমাজের নিজস্ব আচার পর্ব নয়। পরে সংযোজিত হয়েছে। বরং এখন বিয়ে বা অষ্টমঙ্গলার আনুষ্ঠানিক পর্ব হারিয়ে গেছে। হারিয়ে যাচ্ছে বিষহরা পালাগান। বিয়ের শুরুতে বিষহরা মায়েরএগ গান শুরু হয়ে অষ্টমঙ্গলায় শেষ হত। সে পর্ব সংক্ষিপ্ত হতে হতে উঠে যাবার উপক্রম হয়েছে। অবশ্য শোলার চুঙি বানিয়ে সাধারণ ভাবে বা হাতেই সারা হয়। অন্যান্য গানের পর্ব একেবারেই অন্তর্হিত। কলাপাতা কিংবা কলাগাছের খোলে সারি সারি বসে খাওয়া রেওয়াজও ক্যাটারার কেড়ে নিয়েছে। দই-চুড়ার (চিড়া) পর্বও অতি সংক্ষিপ্ত। অনেক ক্ষেত্রে পানিছিটা বাবা, মিতর ধরার পর্বও বাদ। বউভাতের দিন গ্রামের পাঁচ দেওয়ানির বধূর মান্যতা প্রদান এখন আর ততটা জরুরি নয়।

বিয়েতে গোত্রবিচার আজকাল আর বিশেষ দেখা হয় না। ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিয়ে সাদি প্রায়ই ঘটছে। বিয়ের হাজার প্রকার— ফুলবিয়ে, ঘরজিয়া বিয়ে, ছত্রদানি বিয়ে, ভাউজ বিয়ে, ঘর সোঁন্দানি বিয়ে, গন্ধর্ব বিয়ে ইত্যাদি সব এখন কাগজের পাতায়। রীতিনীতিতে একদম বর্ণহিন্দুর প্রবাব। আগে বরপক্ষ কন্যাপক্ষকে পণ দিত। এখন বরপণ না-দিলে বিয়ে হয় না। গরু গাড়িতে কোনও বরযাত্রী যাওয়ার ছবি নেই। ডিজেল, পেট্রোল গাড়ি লাগবেই।

একসময় কত রকমের দইয়ের ব্যবহার ছিল। গলেয়া দই, ট্যাঙা দই, ঝাল ট্যাঙা দই, নাথুয়া দই, গ্যারস্থ দই, ছাঁচি দই, কাঁচা দই, আম কাঁচা দই ইত্যাদি বিচিত্র নামের, বিচিত্র স্বাদের দই। তৈরিও হত বিচিত্র পদ্ধতিতে। সে-সময় মানুষ খেতেও পারত। যে কোনও অনুষ্ঠানে দই-চিড়ে অবশ্যই থাকত। পূজাপার্বণের প্রধান উপাচারও ছিল দই-চিড়ে। ধর্মীয় ব্যাপারেও ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষণীয়। লৌকিক দেবদেবীর প্রাধান্য গ্রামাঞ্চলে থাকলেও শহর, মফস্বল শহরে নেই বললেই চলে। বর্তমান প্রজন্ম এসব ঠাকুর-দেবতার নামই জানে না। যথা ঠাকুর, বিষ্টু ঠাকুর, জাখালা বুড়াঠাকুর, ধরমঠাকুর, গাবুরঠাকুর, ঠাকুরানী ইত্যাদি অসংখ্য ঠাকুরের থান অবশ্য গ্রামগঞ্জের কোথাও কোথাও

চোখে পড়ে। বাড়ির পাশে সারি সারি মাটির ঢিপি অথবা পাথরে অধিষ্ঠিত দেব-দেবীর ছোট ছোট ঘর আর পাশে পাশে নিশান। বছরে এক-আধবার পূজাও দেওয়া হয়, তবে আগের সেই উৎসবের মেজাজ নেই। সামর্থ্যেও টান পড়েছে। ধর্মভয়ও আগে যেমন ছিল, তা আর এখন নেই। ঠাকুর ধরেছে, ভূত পেয়েছে বলে আগের মতো ওঝা, গুণীন, গোঁসাই-এর কাছে মানুষ ছুটে যায় না। ঝাড়ফুঁক, তন্ত্রমন্ত্রেও সে আস্থা নেই। জলকষা আর শান্তির জলে এখন শান্তি পায় না। বরং অ্যালোপ্যাথি নির্ভরতা ষোলো আনা। তবে কবিরাজি, আয়ুর্বেদিকে এখনও বেশ আস্থা আছে। মহিলাদের মধ্যে এখনও তুকতাকে একটু-আধটু ভীতি আছে। গৃহনির্মাণেও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। উত্তরমুখো-পশ্চিমমুখো শোবার ঘরে আপত্তি নেই। 'পুবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ। উত্তরে গুয়া, দক্ষিণে ধুয়া' সে রীতি মানার বিশেষ সুযোগ নেই। ডারি ঘর উধাও। বাঁশ কাঠের বদলে পাকা বাড়ির ঝোঁক। পান সুপারির চাষ শুধু খাওয়ার জন্য নয়, রীতিমতো বাণিজ্যিক-অর্থনৈতিক ফসল। রাজবংশী সমাজ বাড়িভাড়া দেওয়ার কথা ভাবতেই পারত না, এখন বাড়ি ভাড়া দিতে যেমন আপত্তি নেই, তেমনই ভাড়া থাকতেও কুণ্ঠা নেই।

খাদ্যাভাসের ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। সকালের চিড়ে-মুড়িতে এখন আর সীমাবদ্ধ নয়। লুচি পরোটাও চলে। তবে গ্রামাঞ্চলে পান্তাভাত এখনও জনপ্রিয়। ছোঁকা, প্যালকা, শুটকা, সিদোলের ব্যবহার প্রায় উঠে যাওয়ার মতই। তবে এসব খাবারের জিনিসপত্র জোগাড় করাও বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। থালাবাড়ি কাঁসা-পিতলের বদলে স্টিলে গিয়ে ঠেকেছে। আচার-অনুষ্ঠানে কলাপাতার কিংবা খোলের ব্যবহারও উঠে যাওয়ার মতই। শালপাতার ব্যবহার সমান ভাবে চালু হয়েছে। পিঁড়ি পেতে খাওয়ার চল গ্রামাঞ্চলে থাকলেও শহরে চেয়ারটেবিলে, বেঞ্চিতে বর্তমান প্রজন্ম অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। বাড়িতে কেউ এলে এখন আর পিঁড়ি পেতে দেওয়া হয় না। চেয়ার, টুল, বেঞ্চিই দেওয়া হয়। ফাস্ট লাইফে ফাস্ট ফুডও বেশ জায়গা করে নিয়েছে। বিশেষ করে বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে।

চাষাবাসের ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। এক ফসলে আর কেউ চুপচাপ বসে থাকে না। আধুনিক পদ্ধতিতে রাসায়নিক সারে একাধিক ফসল। দেওয়া নেওয়ার পর্বও উঠে গেছে। গরু-মোষের বদলে ট্রাক্টর দিয়েও চাষবাস হচ্ছে। উন্নতমানের বীজ, বেশি ফলনের জন্য সেচ, সার, কীটনাশক প্রয়োগে দ্বিধা নেই। একসময় এ সব এলাকায় প্রায় ৫১ রকমের ধানের চাষ হত। মহারাজা, ভুসরা, পাখরি, লোহাজং,

বোচি, হুজুরি, ধাউলি, যশোয়া, বামনবোগ, নুনিয়া, কালোজিরা ইত্যাদি বিভিন্ন জাতের ধান। এসব ধান কোথাও কোথাও দেখা গেলেও অধিকাংশই হারিয়ে যাচ্ছে। চাষের কাজে 'হাওয়ালি' পদ্ধতি (পাড়া প্রতিবেশী মিলে কারও কাজ করে দেওয়া। শুধু হাঁস, মুরগি, পায়রার মাংসে দিয়ে একবেলা খাওয়া দিলেই হত) একদম উঠে যাওয়ার মতো। আগে এই পদ্ধতিতে চাষের কাজও করে নেওয়া হত। এ ভাবে পাড়া প্রতিবেশীর মহিলারা চিড়ে, চাল কুটে নিত। আগে গম, ভুট্টা, যবের গুঁড়োও করে নেওয়া হত এই ছামগাইনে। ছাতুর মতো খাওয়া হত। এখন আর হয় না। বাচ্চারাও বিস্কুটে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। ডাল ভাঙার চাকতি এখন তো গ্রামের বাড়িতেও দেখা যায় না। জিনিসপত্র গরু-মোষের গাড়ি কিংবা ঘাড়ে করেই আনা-নেওয়া করত। এখন সে জায়গায় এসেছে ঠেলা, রিক্সা, ভ্যান। মাথায় করে জিনিসপত্তর নিয়ে যাওয়ার ছবি বিশেষ দেখা যায় না। আগে রাজবংশী সমাজের মানুষ হেঁটে হেঁটেই বহুদূর যেত। তখন অবশ্য যানবাহন বিশেষ ছিল না। যান বলতে গরুর গাড়ি। এখন কিন্তু হাঁটার অভ্যাসটাও কমে গেছে। বদলে সাইকেল, ভ্যান, রিক্সা, অটো, বাস। জিনিসপত্র থাকলে তো কথাই নেই।

পোশাক-পরিচ্ছদে আলাদা পার্থক্য নেই। কী ছেলে, কী মেয়ে। পুরো আধুনিক। মধ্য বয়স্করাও প্যান্ট, শার্ট, পায়জামায় অভ্যস্ত। ধুতি পাঞ্জাবিও ধোপদুরস্ত। 'ফোতা', 'বুকুনি' প্রবীণারা ছাড়া কেউ পরে না। লুঙ্গির বহুল চল হয়েছে। মহিলারা শাড়িই পরেন। তবে গ্রামাঞ্চলে মহিলারা কাজকর্মে ও বাড়িতে থাকাকালীন ব্লাউজ সবসময় ব্যবহার করেন না। মেয়েরা চুড়িদার এমনকী প্যান্ট-শার্টও পরে। আর শহরাঞ্চলে তো পোশাকের আলাদা কোনও পার্থক্যই নেই। আধুনিক প্রজন্মের সন্তানদের কাছে টিভি, সিনেমার বিজ্ঞাপনের পোশাকই বেশি গ্রহণযোগ্য। আগে মহিলারা হাতে পায়ে গলায় নাকে বড় বড় রুপোর গয়না পরত। এখন সামান্য বর্ণহিন্দুদের অনুসারী।

নামকরণের ক্ষেত্রে আধুনিকতার ছাপ। সোমবার জন্ম হয়েছে বলে সোম্বারু, বিষুদবারে হলে বিষাদু এখন আর রাখা হয় না। নামকরণের ক্ষেত্রে বাঙালি সমাজের ক্ষেত্রে যে প্রবণতা রাজবংশী সমাজের বেলাতেও তাই। অতি আধুনিক নাম। ছেলেমেয়েদের স্কুলে পড়ার সংখ্যা বেড়েছে। গানবাজনা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেও রাজবংশী সমাজের মেয়ে মহিলারাও অকপটে অংশ নিতে পারে। কোনও বাধ্যবাধকতা বা বিধিনিষেধ আরোপিত নেই। বিভিন্ন কাজকর্মেও মহিলা, মেয়েরা এগিয়ে। তবে লক্ষণীয় যে পুরানো ধ্যানধারণা ঐতিহ্য অপেক্ষা আধুনিক নাগরিক ধ্যান-ধারণায়

বর্তমান প্রজন্ম বেশি আকৃষ্ট হচ্ছে।

বিনোদন মানসিকতাও ব্যাপক বদলে গেছে। টিভি, ভিডিও, সিনেমামুখী বিনোদন এখন রাজবংশী সমাজেও। ভাষাভঙ্গী বদলে যাচ্ছে। দোতরাডাঙ্গা, কুশানগান কিংবা পদ্মপুরাণের গান ও বাড়িতে বা মহল্লায় সে ভাবে গানবাজনার আসরও বসে না। তবে ভাওয়াইয়া সংগীতের যথেষ্ট প্রসার ঘটেছে। শুধু রাজবংশী সমাজ নয়, অন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষও ভাওয়াইয়ার সুর মাধুর্য উপভোগ করেন। তবে পালাগান লোকনাটকের ধারা গতিরুদ্ধ হওয়ায় পুরানো বেশ কিছু বাদ্যযন্ত্র হারিয়ে যাবার পথে। বেনা, সারিন্দা, খমক ইত্যাদি। তথ্যপ্রযুক্তির দৌলতে ইদানীং অবশ্য পালাগানগুলি সিডি, ফিল্মবন্দি হচ্ছে। সেটাও ভাল দিক। তবে মেঠো স্বরলিপি মাটিধুলোতেই ভাল শোনায়।

বিনোদনের আরেকটি অনুষঙ্গ লোককথা, কিচ্চা, লোকগল্পের পরিবেশ উধাও। আগে দাদু-দিদিমা-ঠাকুমাদের গল্পগুজবের মধ্য দিয়ে পরবর্তী প্রজন্মে বাহিত হত। সেটা এখন হয় না। বর্তমান প্রজন্ম পড়াশোনা আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে বড় ব্যস্ত। শীতের সন্ধ্যায় আগুনের পাশে গোল করে বসে ইতিহাস, ভূগোল, শৌর্যবীর্যের সে গল্পগাছা আর নেই। টিভি, ক্যাবল এখন গ্রামগঞ্জেও। শৈশব-কৈশোরের লোকক্রীড়া উধাও। গোল্লাছুট, দাড়িয়াবান্ধা, হাডুডু, ডাংগুলি, চোরপুলিশের খেলার উদ্দাম বিনোদন আর নেই। টিভির ফুটবল আর ক্রিকেট সময় কেড়ে নিয়েছে। মাঠে অবশ্য ছেলেরা ক্রিকেট চর্চাই করে। একসময় মাছ মারাও ছিল বিনোদন। বিশেষ করে মহিলারা দল বেঁধে হইহই করে মাছ ধরতে নামত। 'বা হো'-তে পাড়ার সবাই একযোগে মেতে উঠত। এখন সে রকম জলাশয়ও নেই, মাছ মারাও উঠে যাচ্ছে। ঝাঁখে, ঢসকা, ট্যামাই, বুরুং নয়, এখন জাল দিয়েই মাছ মারতে পছন্দ করে বেশি। বড়শি দিয়ে মাছ মারার শখ থাকলেও শৌখিনতাই বেশি। মাছ ধরার মধ্যেও এসেছে আধুনিকতা। বিনোদন নয় নিতান্ত ইচ্ছের ব্যাপার। বিনোদনে একাধিক আধুনিক বিষয় সংযুক্ত হওয়ায় স্বাভাবিক লোকক্রীড়াগুলি পরিসর হারিয়েছে। হারিয়ে গেছে গ্রামীণ মেলা পরবগুলির নিজস্বতাও। রাজবংশী সমাজের বিনোদন এখন আধুনিক বিশ্বের আধুনিক বিনোদনেই নিমগ্ন।

লৌকিক বিশ্বাসেও চিড় ধরেছে। বৃক্ষোপসনা রাজবংশী সমাজের সুপ্রাচীনকালের ঐতিহ্য। শিশুর দীর্ঘজীবন কামনায় জিগা গাছের পূজা কিংবা তার সঙ্গে সখীপাতার রেওয়াজ উঠে গেছে। বট পাকুড়ের বিয়ে দেওয়ার রীতিও প্রায় বাতিল। উঠে

যাচ্ছে সখাসখী, ভাদাভাদির মতো অনুষ্ঠানগুলি। আগে পূজাপার্বণে বর্ণহিন্দু ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ জানানোই হত না। অসমিয়া ব্রাহ্মণরাই অধিকারী ব্রাহ্মণদের সহযোগিতায় গৃহস্থবাড়ির পূজা আচ্চার কাজকর্ম সম্পন্ন করত। এখন তথাকথিত ব্রাহ্মণদের দিয়েই পূজাপার্বণ সম্পন্ন করা হয়। তারাও আসেন এবং রাজবংশী সমাজেরও কোনও সংরক্ষণ মানসিতা নেই।

জীবন-জীবিকা ব্যাপ্ত হয়েছে। একসময় রাজবংশী পরিবার জমিজিরেতের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকত। মোটা ভাত, মোটা কাপড়, মেঠো স্বরলিপি নিয়ে সহজ-সরল জীবনে অভ্যস্ত ছিল। একসময় চাকুরি বিমুখও ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সময়ের দাবি মেনে বিভিন্ন বৃত্তিতে অংশ নিচ্ছে। এখন ব্যাবসা-বাণিজ্য থেকেও যাবতীয় কাজকর্মে সক্রিয় অংশগ্রহণ চোখে পড়ার মতো। এমন কী শ্রমসাধ্য কাজ ঠেলা, রিক্সা, পুরুষ-মহিলার সংখ্যা চোখে পড়ার মতো। বাড়ির মহিলারাও পরিবারের স্বার্থে শাক-সবজি বিক্রি থেকে ঝিয়ের কাজও করে যাচ্ছেন। বর্তমানে কাজের পরিধি যেমন বেড়েছে, তেমনই রাজবংশী সমাজের অংশগ্রহণও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজবংশী সমাজের জীবন বৃত্তি জীবন-জীবিকার হাত ধরেই শহর-গ্রামের দূরত্ব কমে এসেছে। আধুনিকতা এসে যাচ্ছে গ্রামে। ভাষা, ব্যবহার, আচার-সংস্কৃতি, এমনকী মনন ক্রিয়াও পালটে যাচ্ছে। আর এভাবেই রাজবংশী সমাজের নিজস্ব সংস্কৃতির ঘেরাটোপও অদল-বদল করে নিচ্ছে মুহূর্তে মুহূর্তে।

রাজবংশী সমাজের এই বিবর্তন, পরিবর্তনের আলো-আঁধারি তার পেছনে বহু কারণ— সমাজতত্ত্ব, শিক্ষাসংস্কৃতি, যোগাযোগ, অর্থনৈতিক কাঠামো, সময়প্রেক্ষিত বহু বিষয় ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত। এমনকী রাজনৈতিক কারণও অনেকাংশে যুক্ত। সমাজ সময় প্রেক্ষিতে এই পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী ছিল। প্রগতির সূচকও বটে। এক সময়ের গোষ্ঠীবদ্ধ ও সংরক্ষণশীল রাজবংশী সমাজ বৃহত্তর বর্ণহিন্দু সংস্কৃতির সুদীর্ঘ সহাবস্থানে ভাব, শিল্প, সংস্কৃতির আদানপ্রদান হয়। ঘরে বাইরে এক ব্যাপক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। শিক্ষার প্রসার, গ্রামীণ পরিবারতন্ত্রে ভাঙন, যোগাযোগ ব্যবস্থার বৃদ্ধি, রেডিও টিভি সিনেমার প্রভাব ইত্যাদির জন্য প্রাচীন সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ত্বরান্বিত করে। শহরের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি, সামাজিক নৈকট্য, প্রতিযোগিতা ইত্যাদির জন্য সমাজ কাঠামোর অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটতে থাকে। আবার কিছু লোক শিক্ষার প্রসার, অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা তারই সঙ্গে শহরমুখী মানসিতার জন্য তারা রাজবংশী সমাজের চিরায়ত সংস্কার, কৃষ্টির কাঠামো থেকে খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

অন্যদিকে বিশাল জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশ অর্থনৈতিক দুরবস্থার প্রাচীন ধর্মকর্মানুষ্ঠানগুলি পালনে অক্ষম হয়ে পড়ে। জীবন-জীবিকার স্বার্থে তারাও নিজস্ব সংস্কৃতি আচারে খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আবার ধর্মীয় উদারতা, আদর্শায়িত সাংস্কৃতিক প্রভাব, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব সহ জাতীয়তাবাদী মানসিকতায় প্রাচীন সাংস্কৃতিক ধারার প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তন ঘটেছে। সামাজিক অবস্থান, বিভিন্ন ভাষা, ধর্মসম্প্রদায়গত পারস্পরিক বোঝাপড়া, লেনদেন, ভাববিনিময়ের মধ্য দিয়েও নিজস্ব কৃষ্টি সংস্কৃতির ঘেরাটোপ ছিন্ন হয়েছে। রাজবংশী সমাজও দ্রুত বিভিন্ন মিশ্র সংস্কৃতি, মনন মানসিকতার সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে আজকের রাজবংশী সমাজে উন্নীত হয়েছে। এই মহামিলনে বর্ণহিন্দু বাঙালি সংস্কৃতির যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তেমনই রাজবংশী সমাজের উদার মননে তা আত্মস্থ করার ক্ষমতাও সমান উল্লেখ্য। আবার পরম্পরায় নিজস্ব ঐতিহ্য, চেতনায় নিজস্ব কৃষ্টি-সংস্কৃতিও শত অসুবিধা অভাব অনটন সত্ত্বেও যথাসাধ্য ধরে রেখেছে। এটাই এই জনগোষ্ঠীর বিশেষত্ব, নিজস্বতা।

গ্রাম আর গ্রামেই নেই। সমাজের আনাচে-কানাচে তথ্যপ্রযুক্তির প্রভাব। সামগ্রিক উন্নয়ন, প্রতিযোগিতা,আধুনিক বিশ্বের বাজারমুখী মননপ্রক্রিয়া, উন্নত পৃথিবীর সমন্বিত নৈকট্য, সবকিছুই সব জনগোষ্ঠীকে এক বৃহত্তর সামাজিক অঙ্গনে, একত্রিত করেছে, ধর্মকর্মে ভাবনায় আর নিজস্ব ছোট গণ্ডী নেই। এক সার্বজনিক মাত্রা সংযোজিত হয়েছে। রাজবংশী সমাজও এর ব্যতিক্রম নয়। ভুটানের প্রভাব, ইউরোপীয় শাসন প্রভাব, আর্যায়নের সুদূরপ্রসারী আত্মিক ও ধর্মীয় প্রভাব তো ছিলই, বর্ণহিন্দুত্ব, ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতি, পরবর্তী কালে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, মিশ্র আচার-বিহারের প্রভাবে রাজবংশী সমাজের ধর্মসংস্কৃতির কাঠামোর প্রভাব ফেলে। ধীরে হলেও এই পরিবর্তন প্রক্রিয়া আজও চলছে। তবে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে ধর্মকর্ম মন্ত্রশুদ্ধি আচারবিচারে। এর জন্য তথাকথিত পুরোহিত সম্প্রদায়ের রক্ষণশীল মানসিকতা যেমন দায়ী তেমনই দায়ী পরবর্তী উত্তরসূরীর অভাব কিংবা বিশ্বাস ফাটল।

যাই হোক, আজকের দুনিয়ার প্রগতির যুগে পৃথিবীর জনগোষ্ঠী তার নিজস্ব বৃত্তে আবদ্ধ থাকতে পারে না। গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়েই পৃথিবীর প্রতিটি জনগোষ্ঠী আধুনিক হয়ে উঠেছে। রাজবংশী সমাজও এর বাইরে নয়। একটা নিরন্তর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে বলেই একান্ত চেনা লোকসমাজ মাঝে মাঝে অচেনা ঠেকছে। তবে এই সমাজ বিবর্তনের ছবি নমুনার ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ যেমন দরকার তেমনই

সংরক্ষণ, বিশ্লেষণও দরকার। কারণ, সামাজিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বর্তমানের জরুরি উপাদান ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখা দরকার। নয়তো সামাজিক ইতিহাস রচনাই দুঃসাধ্য এবং অসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে ॥

তথ্যসূত্র:

১. Robert Montogomery Martin, *The History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India*, rpt. (Delhi: Cosmo Publications, 1976), p. 538

২. Herbert Hope Risely, *The Tribes and Castes of Bengal, Vol. I*, (Calcutta: Bengal Secratariat Press, 1891), p. 491

৩. H. Beverly, *Report on the Census of Bengal*, (Calcutta: Bengal Secratariat Press, 1872), p. 130

৪. A. E. Porter, *Census of India, Vol.V, Part I*, (Delhi: 1931) p. 473

৫. William Wilson Hunter, *A Statistical Account of Bengal, Vol. V*, (London: Trubner & Co., 1872), p. 42-43

৬. "The Koches or Rajbanshis were an aboriginal tribe, apparently of Mougotain origin, which at the begining of the sixteenth cencury, more to power under thier great leader Viswa Singha." B. C. Allen (ed.) *Assam District Gazeteers, Vol.V*, (Allahabad: The Poineer Press, 1905), p. 95-96, *Assam District Gazeteers*, Vol. III, (Shillong: 1906), p. 93-94

৭. B. H. Hodgson, *Essay the first on the Kocch, Bodo and Dhimal Tribes*, (Calcutta, Baptist Mission Press, 1887), Journal of the Asiatic society of Bengal, Vol. XVIII, Part II, p. 704-706

৮. "those Koch, who are now Hindu, are principally known under the name of Rajbanshis." G. A. Grierson, *Lingnistic Survey of India*, Vol-V, part-I, p. 63

৯. O Donel, *Census Report of India*, Vol-III, (1891), p. 62 , 262

১০. S. K. Chatterji, *Kirata Jana kriti*, (Kolkata: The Asiatic Society of India, rpt. 2007) p. 54

১১. O Donel, op.cit., p. 262

১২. Dr. Pierre Bessaignet (ed), *Social Research of East Pakisthan*, (Asiatic Soci ety of Pakisthan) (54), p. 152

১৩. J. A. Vass, *Eastern Bengal and Assam District Gazzetter Rangpur*, p.155. উদ্ধৃত পিয়ের বেসাইনের প্রবন্ধ থেকে।

১৪. "the present inhabitants of Cooch Behar state do not belong to any particular race. The Meches who inhabit the Bhutan Doors comming

into contact with the immigrant from the south, **intermertin** age have taken place and descent are the modern Cooch Beharis." H. N. Choudhury, *Cooch Behar State and its Land Revenue Settlement*, 1903 rept (ed) N. Paul, p. 126

১৫. Ibid, p. 125

১৬. অশেষকুমার দাস, *মেচ জনজাতিরদের কথা*, রতন বিশ্বাস সম্পাদিত 'উত্তরবঙ্গের জাতি ও উপজাতি', (কলকাতা: পুনশ্চ, ২০০১), পৃ. ১৫৮

১৭. ক. উপেন্দ্রনাথ বর্মন, *রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস*, (জলপাইগুড়ি: ১৯৪১), পৃ. ২১-২২

খ. L. S. S. O'Malley, *Census Report of India, Vol. V, Part I*, (Calcutta: Bengal Secratariat Press, 1911), p. 445

১৮. ক. অশোক বিশ্বাস, *বাংলাদেশের রাজবংশী: সমাজ ও সংস্কৃতি*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৫), পৃ. ১৩-১৪

খ. ফকরুজ্জামান চৌধুরী, *রাজবংশী*, (ঢাকা: পাকিস্তান পাবলিকেশন, ১৯৬৬, ২য় সংস্করণ, পৃ. ১৯)

১৯. E. A. Gait, *Census of India*, (Assam Volume, 1901), p. 13

২০. B. H. Hodgson, op. cit., part II, P. VII

২১. Laurence A. Waddell, *The Tribes of the Brahmaptura Valley: A Contribution on their Physical Types and Affinities*, (New Delhi: Logos Press, rpt. 2000), p. 48

২২. Herbert H. Razley, *The Tribes and Caste of Bengal : Ethnographic Glossary, Vol. I*, (Calcutta: Bengal Secratariat Press, 1892), p. 491-92

২৩. H. Baverly, *Census of India*, Vol. I, Report of Bengal (1872), p. 130

২৪. ক. E. T. Dalton, *Descriptive Ethnology of Bengal*, (Delhi: rpt. 1995), p. 89-93

খ. W. W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, Vol. V, (1872), p. 42-43

২৫. S. K. Chatterji, ibid, p. 61

২৬. উপেন্দ্রনাথ বর্মন, প্রাগুক্ত

২৭. S. K. Chatterji, ibid

২৮. W. H. Thomson, *Census of India*, Vol. V, Part I, (1931, p. 358)

২৯. S. K. Chatterji, *The Original and Development of Bengali Language*, Part I, (1926, p. 69)

৩০. Ibid

৩১. Ibid, 78-79

২৯. হরকিশোর অধিকারী, *রাজবংশী কুল-প্রদীপ*, (গোয়ালপাড়া: ১৩১৭ বঙ্গাব্দ)

৩০. উপেন্দ্রনাথ বর্মন, প্রাগুক্ত

৩১. মণিরাম কাব্যভূষণ, *রাজবংশী ক্ষত্রিয় দীপক*, (দিনাজপুর: ১৩১৮ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১-৫৫)

৩২. S. K. Chatterji, *Kirata Jana Kriti*, ibid

৩৩. পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, *কালিকাপুরাণ*, (১৩৪৮, ৭৭ অধ্যায়)

৩৪. রূপনারায়ণ, *কামতেশ্বর ফুল কালিকা*

৩৫. খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ, *কোচবিহারের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, (কলকাতা: মডার্ণ বুক এজেন্সি, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯০), পৃ. ৪, পাদটীকা

৩৬. বেণু দত্ত রায়, *উত্তর বাংলার লোক সংগীত*, (নতুন দিল্লি: সাহিত্য অকাদেমি, ২০০২), পৃ. ১১)

৩৭. S. K. Chatterji, *ODBL*, p. 69

৩৮. S. K. Chatterji, *Kirata Jana Kriti*, p. 61

৩৯. B. H. Hodgson, Part II and VIII

৪০. হেমন্তকুমার বর্মা, *কোচবিহারের ইতিহাস*, উদ্ধৃত 'রংপুর জেলার ইতিহাস', পৃ. ৮২-১০৬

৪১. অশোক বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

৪২. ড. গিরিজাশঙ্কর রায়, *উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয়দের পূজাপার্বণ*, (শিলিগুড়ি: এন এল পাবলিকেশন,)

৪৩. S. K. Chatterji, *ODBL*, Part I, (1926, p. 69)

৪৪. Ibid, p. 69

৪৫. Ibid, p. 78-79

৪৬. Ibid, p. 69

৪৭. S. K. Chatterji, ibid

৪৮. A. Grierson, ibid, Vol. I, Part I, (Calcutta, rpt. 1963, p. 153)

৪৯. উপেন্দ্রনাথ বর্মন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮-১০

৫০. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা লোকসংগীত: ভাওয়াইয়া*, (ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৯৫), পৃ. ৯, মুখবন্ধ

৫১. রণজিৎ দেব, *উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জীবন ও সংস্কৃতি*, রতন বিশ্বাস সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

৫২. Charu Chandra Sanyal, *The Rajbansis of North Bengal*, (Calcutta: The Asiatic Socity of Bengal, 1965)